ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলিক রূপরেখা

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার মৌলিক রূপরেখা

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

বাংলা সংকলন সম্পাদনা
আবদুস শহীদ নাসিম

শতাব্দী প্রকাশনী

ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার মৌলিক রূপরেখা
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
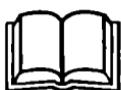
শ প্র : ৪৬
ISBN : 984-645-007-9

প্রকাশক
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোন : ৮৩১১২৯২

প্রথম বাংলা সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৯২
তৃতীয় মুদ্রণ : আগস্ট ২০০৮

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

মূল্য : ২০০.০০ টাকা মাত্র

Islami Jibon Bebosthar Moulik Rup Rekha by Sayyed Abul A'la Maudoodi, Bangla Compilation edited by Abdus Shaheed Naseem, Published by Shotabdi Prokashoni, Sponsored by Sayyid Abul A'la Maudoodi Research Academy, 491/1 Moghbazar Wireless Railgate, Dhaka-1217, Phone : 8311292, 1st Edition : November 1992, 3rd Print : August 2008.

Price : Tk. 200.00 Only.

আমাদের কথা

দীর্ঘদিন থেকে এমন একটি গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়ে আসছিল, যাতে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সমগ্র দিক ও বিভাগ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ পরিষ্কার ধারণা লিপিবদ্ধ থাকবে এবং যে গ্রন্থটি চিন্তা ও মানসিকতার দিক থেকে সর্বসাধারণ মানুষকে ইসলামের ব্যাপারে পরিতুষ্ট ও প্রত্যয়ী করে তুলবে। দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ বিষয়টি মাওলানা মওদূদীর (র) গোচরীভূত করলে তিনি এ গ্রন্থটি সংকলনের পরামর্শ দেন এবং তাঁরই সহযোগিতায় তাঁর ১১টি পুস্তিকার সমন্বয়ে প্রথমে ১৯৬২ সালে গ্রন্থটি উর্দূ ভাষায় প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় বহু আগেই পৃথক পৃথক ভাবে এই ১১টি পুস্তিকা অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। পুস্তিকাগুলো হলো :

১. তাওহীদ রিসালাত ও আখিরাত
২. শান্তি পথ
৩. ইসলাম ও জাহেলিয়াত
৪. একমাত্র ধর্ম
৫. ইসলামের নৈতিক দৃষ্টিকোণ
৬. ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি
৭. ভাংগা ও গড়া
৮. আল্লাহর পথে জিহাদ
৯. সত্যের সাক্ষ্য
১০. মুসলমানদের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মসূচী
১১. ইসলামের জীবন পদ্ধতি

এবার বাংলা ভাষায় পুস্তিকাগুলোর একত্র সংকলন প্রকাশ করতে পারায় মরহুম মাওলানার পরামর্শ বাংলা ভাষায়ও বাস্তবায়িত হলো।

আমরা আশা করি, পাঠকগণ এ গ্রন্থ থেকে এক নজরে ইসলাম সম্পর্কে স্বচ্ছ ও যথার্থ ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবেন।

আবদুস শহীদ নাসিম
ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

১
তাওহীদ রিসালাত ও আখিরাত

বিবেকের ফায়সালা

বড় বড় শহর-নগরে আমরা দেখতে পাই, শত শত কারখানা বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে চলছে। রেল ও ট্রাম-গাড়ি তীব্রভাবে ধাবমান। সন্ধ্যার সময় হাজার হাজার বিজলী বাতি জ্বলে উঠে, গ্রীষ্মকালে প্রায় ঘরে বৈদ্যুতিক পাখা চলে। কিন্তু এতোসব কাজ দেখে আমাদের মনে যেমন কোনো বিস্ময়ের উদ্রেক হয় না, তেমনি এসব জিনিস উজ্জ্বল ও তীব্র গতিসম্পন্ন হওয়ার মূল কারণ নিয়ে আমাদের মধ্যে কোনোরূপ মতবৈষম্যেরও সৃষ্টি হয় না। এর কারণ কি? ....

এর একমাত্র কারণ এই যে, যে বৈদ্যুতিক তারের সাথে এ বাতিগুলো যুক্ত রয়েছে, তা আমরা নিজেদের চোখে দেখতে পাই। যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাথে এ তারগুলো সংযোজিত, তার অবস্থাও আমাদের অজ্ঞাত নয়। বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যারা কাজ করে, তাদের অস্তিত্ব এবং বর্তমান থাকাও আমাদের জ্ঞানের আওতাভুক্ত। কর্মচারীদের উপর যে ইঞ্জিনিয়ারের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত রয়েছে সে-ও আমাদের অপরিচিত নয়। আমরা একথাও জানি যে, এ ইঞ্জিনিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

তার নিকট বিরাট যন্ত্র রয়েছে, এ যন্ত্র চালিয়ে সে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করে। বিজলী বাতির আলো, পাখার ঘূর্ণন, রেল ও ট্রাম-গাড়ির দ্রুত গমন, চাকা ও কারখানা চলা ইত্যাদির মধ্যেই আমরা সেই বিদ্যুৎ শক্তির অস্তিত্ব বাস্তবভাবে দেখতে পাই। কাজেই বিদ্যুৎ শক্তির ক্রিয়া ও বাহ্যিক নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষভাবে দেখে তার কার্যকারণ সম্পর্কে আমাদের মধ্যে কোনো মতবৈষম্যের সৃষ্টি না হওয়ার কারণ কেবল এটাই যে, এ কার্যকারণ পরম্পরা সূত্রটিই আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূত এবং প্রত্যক্ষভাবে আমাদের গোচরীভূত রয়েছে। মনে করুন, এই বিজলী বাতিগুলো যদি জ্বালানো হতো ; পাখাগুলো ঘুরতো, রেল ও ট্রাম-গাড়িগুলো দ্রুত চলতো, চাকা ও যন্ত্রদানব গতিশীল হতো, কিন্তু যে তারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ শক্তি পৌঁছায় তা যদি আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে থেকে যেতো, বিদ্যুৎ কেন্দ্রও অনুভূতি শক্তির আয়ত্বের বাইরে থাকতো, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কর্মচারীদের সম্পর্কেও আমরা যদি কিছুই জানতে না পারতাম এবং কোন্

ইঞ্জিনিয়ার নিজের জ্ঞান ও শক্তির সাহায্যে এ কারখানাটি পরিচালনা করছে, একথাও না জানতাম তা হলেও কি আমরা এমনিভাবে শান্ত মনে বসে থাকতে পারতাম? তখন কি বৈদ্যুতিক শক্তির এ বাহ্যিক কার্যক্রম দেখে তার মূল কার্যকারণ সম্পর্কে আমাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হতো না? এর উত্তরে সকলেই বলবেন, তখন আমাদের মধ্যে মতবৈষম্য না হয়ে পারতো না। কিন্তু কেন?

এজন্য যে, বাহ্যিক কার্যক্রমের কারণ যখন প্রচ্ছন্ন অগোচরীভূত ও অজ্ঞাত, তখন আমাদের মনে বিস্ময়সূচক অস্থিরতার উদ্রেক হওয়া এ অজ্ঞাত রহস্যের দ্বারোদঘাটনের জন্য উদ্বিগ্ন ও ব্যতিব্যস্ত হওয়া এবং রহস্য সম্পর্কে ধারণা-অনুমান ও মতের পার্থক্য সৃষ্টি হওয়া এক অতি স্বাভাবিক ব্যাপার।

একথাটি ধরে নেয়ার পর আরো কয়েকটি কথা চিন্তা করুন। মনে করুন উপরে যে কথাগুলি ধরে নেয়া হয়েছে, তাই বাস্তব জগতে বিদ্যমান। সহস্র-লক্ষ বিজলী বাতি জ্বলছে, লক্ষ পাখা অহর্নিশ ঘুরছে, অসংখ্য গাড়ি দ্রুত দৌড়াচ্ছে, শত সহস্র কারখানা নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলছে। কিন্তু এগুলোতে কোন্ শক্তি কাজ করছে এবং সেই শক্তিই বা কোথা হতে আসে, তা জানার কোনো উপায়ই আমাদের করায়ত্ব নয়, এসব কর্মকাণ্ড ও বাহ্যিক লক্ষণ-নিদর্শন দেখে লোকদের মন হতচকিত ও স্তম্ভিত। প্রত্যেক ব্যক্তিই উহার কার্যকারণের সন্ধানে বুদ্ধির ঘোড়া দৌড়াচ্ছে। কেউ বলছে : এ সবকিছুই স্বতস্ফূর্তভাবে উজ্জ্বল আলোক মণ্ডিত এবং স্বীয় শক্তি বলে চলমান, গতিশীল। এগুলোর নিজস্ব সত্ত্বার বাইরে এমন কোনো শক্তি নেই যে, এগুলোকে আলো বা গতি দান করতে পারে। কেউ বলছে : এসব জিনিস যেসব বস্তু হতে সৃষ্ট সেগুলোর সংযোজন ও সংগঠনই উহাদের মধ্যে আলো ও গতির উদ্ভব করেছে। অন্য কারো মতে এ বস্তুজগতের বাইরে কতোক দেবতা রয়েছে, যাদের মধ্য হতে কেউ বিজলী বাতি প্রজ্জ্বলিত করে, কেউ ট্রাম-রেলগাড়ি চালায়, কেউ পাখাগুলোতে ঘূর্ণন ও আবর্তন ঘটায় এবং কারখানা ও যন্ত্রের চাকাকে গতিশীল করে। অনেক লোক আবার এ বিষয়টি চিন্তা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এবং শেষ পর্যন্ত কাতর হয়ে বলতে শুরু করেছে যে, আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি সূক্ষ্ম ও গভীর রহস্যাবৃত তত্ত্ব পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। আমরা শুধু এতোটুকু জানতে পারি যতোটুকু আমরা নিজেদের চোখে দেখতে পাই ও অনুভব করতে পারি। তার অধিক কিছু আমরা বুঝতে পারি না। আর যা আমাদের বোধগম্য নয়, আমরা উহার সত্যতাও যেমন স্বীকার করতে পারি না, তেমনি পারি না উহার মিথ্যা বলে অস্বীকার করতে।

এসব লোক পরস্পরের সাথে লড়াই-ঝগড়া করে বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে কারো নিকট নিজস্ব চিন্তা ও মতের সমর্থনে এবং অপরের চিন্তা ও মতের প্রতিবাদ করার জন্য নিছক ধারণা-অনুমান ছাড়া নির্দিষ্ট ও সন্দেহমুক্ত জ্ঞান বলতে কিছুই নেই।

এসব মতবিরোধ ও মতবৈষম্য চলাকালে এক ব্যক্তি এসে বলে, সঠিক জ্ঞানের এমন একটি সূত্র আমার নিকট আছে, যা তোমাদের কারো কাছে নেই। আমি সেই সূত্রে জানতে পেরেছি যে, এসব বিজলী বাতি, বৈদ্যুতিক পাখা, গাড়ি, কারখানা ও যন্ত্রের চাকা এমন কতোগুলো প্রচ্ছন্ন সূক্ষ্ম তারের সাথে সংযুক্ত, যা তোমরা (কেউ) দেখতে পাওনা, অনুভবও করতে পারনা। একটি বিরাট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (power house) হতে এসব তারে শক্তি সঞ্চারিত হয়, উহাই আলো ও গতিরূপে তোমাদের সামনে অভিব্যক্ত হয়। এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বড় বড় যন্ত্র সংস্থাপিত রয়েছে, যাকে অসংখ্য ব্যক্তি চালাচ্ছে। এ ব্যক্তিগণ আবার একজন ইঞ্জিনিয়ারের অধীনে এবং এ ইঞ্জিনিয়ারের জ্ঞান ও শক্তিই এ সমগ্র ব্যবস্থাকে কায়েম করেছে, তারই পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে এ সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে।

এ ব্যক্তি পূর্ণ শক্তিতে তার উপরোক্ত দাবি পেশ করে। লোকেরা তাকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করে। সকল দল একযোগে তার বিরোধিতা করে। তাকে পাগল বলে, আঘাত করে, মারপিট করে, কষ্ট দেয়, ঘর হতে বের করে দেয়। কিন্তু এসব অমানুষিক ও দৈহিক উৎপীড়ন সত্ত্বেও সে নিজের দাবির উপর শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। কোনো প্রকার ভয়-ভীতি কিংবা প্রলোভনে পড়ে নিজের মূল কথার এক বিন্দু পরিমাণ রদবদল বা সংশোধন করতে প্রস্তুত হয়না। কোনো প্রকার বিপদেও তার দাবিতে কোনো দুর্বলতা দেখা যায়না। উপরন্তু তার প্রত্যেকটি কথাই প্রমাণ করে যে, তার কথার সত্যতার উপর তার দৃঢ় প্রত্যয় বিদ্যমান।

এরপর আর এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হয়। সে-ও ঠিক একথাই অনুরূপ দাবি সহকারে পেশ করে। তারপর তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ব্যক্তি এসেও পূর্ববর্তীদের মতোই কথা বলে নিজের দাবি উপস্থিত করে। অতপর এ ধরনের লোকদের আগমন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এমনকি তাদের সংখ্যা শত সহস্রকেও অতিক্রম করে যায়, আর এসব লোকই সেই এক প্রকারের কথাকে একই ধরনের দাবি সহকারে উপস্থাপন করে। স্থান কাল ও অবস্থার পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাদের মূল কথায় কোনোই পার্থক্য সূচিত হয়না। সকলেই বলে : আমাদের কাছে জ্ঞানের এমন এক বিশেষ সূত্র বিদ্যমান, যা অপর কারো কাছে নেই। এ সকল লোককে সমানভাবে পাগল বলে আখ্যা দেয়া হয়। সকল প্রকার নির্যাতন-নিস্পেষণে তাদেরকে জর্জরিত করে তোলা হয়। সকল দিক দিয়েই তাদেরকে কোণঠাসা ও নিরুপায় করে দেবার চেষ্টা করা হয়। তাদের কথা ও দাবি হতে তাদেরকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে সকল প্রকার উপায় অবলম্বন করা হয়। কিন্তু তাদের সকলেই নিজের কথার উপর অটল হয়ে থাকে। দুনিয়ার কোনো শক্তিই তাদেরকে এক ইঞ্চি পরিমাণ স্থান পর্যন্ত সরাতে পারেনা। এ সংকল্প, দৃঢ়তা ও স্থির সততার সাথে তাদের বিশেষ কতোগুলো গুনের ও বৈশিষ্ট্যের সংযোগ হয়। তাদের মধ্যে একজনও মিথ্যাবাদী, চোর, বিশ্বাস ভংগকারী, চরিত্রহীন, অত্যাচারী ও হারামখোর নয়। তাদের শত্রু এবং বিরোধীরাও একথা স্বীকার

করতে বাধ্য যে, এই লোকদের চরিত্র অত্যন্ত পবিত্র, স্বভাব অতিশয় নির্মল ও পূণ্যময়। নৈতিক সৌন্দর্য ও স্বভাব বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এরা অপর লোকদের তুলনায় উন্নত এবং বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। এছাড়া তাদের মধ্যে পাগলামীরও কোনো লক্ষণ দেখা যায়না। বরং উহার বিপরীতে চরিত্র সংশোধন ও মন পরিশুদ্ধকরণ এবং বৈষয়িক কায়কারবারগুলোর সংশোধন সম্পর্কে এমন সব উন্নত শিক্ষা তারা পেশ করেন, এমন সব আইন-কানুন ও নিয়ম-নীতি রচনা করেন, যার সমান আইন রচনা করা তো দূরের কথা, তার সূক্ষ্মতা অনুধাবন করার জন্যেও বড় বড় পণ্ডিত মনীষীগণকে গোটা জীবন অতিবাহিত করে দিতে হয়।

একদিকে সেই বিভিন্ন চিন্তা ও মতের লোক যারা এই লোকদের কথাকে মিথ্যা মনে করছে, এর সত্যতা অস্বীকার করছে, আর অপর দিকে রয়েছে এ ঐকমত্য পোষণকারী দাবীদারগণ। এ উভয়েরই ব্যাপারটি সুস্থ ও সঠিক জ্ঞান-বুদ্ধির আদালতে বিচার মীমাংসার উদ্দেশ্যে পেশ করা হয়। বিচারক হিসাবে বুদ্ধির কর্তব্য হচ্ছে প্রথমত স্বীয় অবস্থাকে খুব ভালো করে বুঝে নেয়া ও যাচাই করা। তার কর্তব্য পক্ষদ্বয়ের অবস্থাকে তুলনামূলকভাবে অনুধাবন করা এবং উভয়ের মধ্যে তুলনা ও যাচাই পরখ করার পর কার কথা গ্রহণযোগ্য তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

বিচারকের বিবেকের অবস্থা এই যে, প্রকৃত ব্যাপারটিকে সঠিকরূপে জেনে নেবার কোনো সূত্রই তার করায়ত্ব নয়। প্রকৃত নিগূঢ় সত্যের (ultimate reality) কোনো জ্ঞানই তার নেই। তার সামনে পক্ষদ্বয়ের বর্ণনা-বিবৃতি, যুক্তি-প্রমাণ, তাদের নিজস্ব অবস্থা ও বাহ্যিক লক্ষণ নিদর্শনই শুধু বর্তমান। তাকে গভীর তত্ত্বানুসন্ধিৎসুর দৃষ্টিতে যাচাই করে সম্ভাব্য অধিক সত্য কি হতে পারে তার ফায়সালা করতে হবে। কিন্তু সম্ভাব্য অধিক সত্য হওয়ার দৃষ্টিতেও সে কোনো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে পারে না। কেননা যা কিছু তত্ত্ব ও তথ্য তার করায়ত্ব তার ভিত্তিতে প্রকৃত ব্যাপার যে কি, তা বলাও তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। খুব বেশি হলে তার পক্ষে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে একটিকে অগ্রাধিকার দান করা সম্ভব। কিন্তু পূর্ণ নিশ্চয়তা ও দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে কাউকে সত্য বলা বা কাউকেও মিথ্যা বলে অভিহিত করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

যারা উক্ত কথা ও দাবির সত্যতা অস্বীকার করে তাদের অবস্থা নিম্নরূপ :

এক : প্রকৃত নিগূঢ় সত্য সম্পর্কে তাদের মতাদর্শ বিভিন্ন। কোনো একটি বিষয়েও তাদের মধ্যে মতঐক্য দেখতে পাওয়া যায়না।

দুই : তারা নিজেরাই একথা বলে যে, প্রকৃত সত্যকে জানার জন্য বিশেষ কোনো জ্ঞান-সূত্রও তাদের মধ্যে বর্তমান নেই। তাদের মধ্যে কোনো কোনো দল শুধু এতোটুকু মাত্র দাবি করে যে, তাদের আন্দায-অনুমান অপর লোকদের আন্দায-অনুমানের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ, এছাড়া আর কোনো জিনিসেরই তাদের

কোনো দাবি নেই। কিন্তু তাদের ধারণা-অনুমানগুলো যে নিছক ধারণা অনুমানই এর বেশি কিছু নয়, সে কথাও সকলে এক বাক্যে স্বীকার করে।

তিন : তাদের ধারণা-অনুমানের উপর তাদের বিশ্বাস, ঈমান ও প্রত্যয় অটল দৃঢ়তা পর্যন্ত পৌঁছেনি, মত পরিবর্তনের অনেক দৃষ্টান্তও তাদের মধ্যে বর্তমান। অনেক সময় দেখা গেছে যে, এক একজন ব্যক্তি দীর্ঘকাল পর্যন্ত যে মত পূর্ণ প্রত্যয় সহকারে পোষণ ও প্রচার করতো, পরের দিনই সে তার পুরাতন মতের প্রতিবাদ ও এক নতুন মত প্রচার করতে শুরু করেছে। বয়স, জ্ঞান-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার ক্রমোন্নতির সাথে সাথে প্রায়ই তাদের মত যে পরিবর্তিত হয়, তা এক প্রমাণিত সত্য।

চার : উপরোক্ত কথা অস্বীকারকারীদের কাছে একথাকে অস্বীকার করার স্বপক্ষে এতোটুকু মাত্র যুক্তি রয়েছে যে, তারা নিজেদের কথার সত্যতার অনুকূল কোনো সন্দেহমুক্ত সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পেশ করতে পারেনি। তার সেই গোপন 'তার' তাদেরকে দেখায়নি যার সাথে এ বিজলী বাতি ও পাখা ইত্যাদি যুক্ত রয়েছে বলে তারা দাবি করে। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যুতের অস্তিত্বও তাদেরকে দেখানো হয়নি। বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিভ্রমণেরও কোনো ব্যবস্থা করেনি, এর কল-কারখানা এবং যন্ত্রও দেখায়নি। সেখানকার কর্মচারীদের সাথে সাক্ষাত হয়নি, ইঞ্জিনিয়ারের সাথেও কখনো সাক্ষাত করায়নি। এমতাবস্থায় এগুলোর অস্তিত্ব ও সত্যতাকে আমরা কিভাবে মেনে নিতে পারি।

যারা উক্ত কথার দাবি পেশ করছে তাদের অবস্থা নিম্নরূপ :

এক : একথার দাবি যারা পেশ করেছেন তারা সকলেই সর্বোতভাবে একমত। মূল দাবির অন্তর্নিহিত যতো নিগূঢ় কথা ও দিক তার সব বিষয়েই তাদের মধ্যে পূর্ণ মতৈক্য বিদ্যমান রয়েছে।

দুই : তাদের সকলেরই সর্বসম্মত ঐক্যবদ্ধ দাবি এই যে, তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞানের এমন একটি সূত্র রয়েছে, যা সাধারণ লোকদের আয়ত্বাধীন নয়।

তিন : তাদের মধ্যে একথা কেউ বলেননি যে, তারা একথা শুধু ধারণা-অনুমানের ভিত্তিতে বলছে এবং সকলেই পূর্ণ ঐকমত্যের ভিত্তিতে একথা বলছে যে, ইঞ্জিনিয়ারের সাথে তাদের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে, তার কর্মচারীগণ তাদের নিকট আসা যাওয়া করে, তার কারখানা পরিভ্রমণেও তাদেরকে সুযোগ দেয়া হয়েছে। এবং তারা যা কিছু বলে, তা সন্দেহমুক্ত জ্ঞান ও দৃঢ় প্রত্যয় সহকারেই বলে, ধারণা অনুমানের ভিত্তিতে নয়।

চার : তাদের মধ্যে কেউ নিজের কথা ও দাবিতে বিন্দু পরিমাণও রদ-বদল করেছে, এরূপ একটি দৃষ্টান্তও পেশ করা যেতে পারেনা। তাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই জীবনের সূচনা হতে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত একই কথা বলেছেন।

পাঁচ : তাদের চরিত্র চূড়ান্ত পর্যায়ে পবিত্র। মিথ্যা, ধোঁকা-প্রতারণা, শঠতা, দাগাবাযীর বিন্দু পরিমাণ সম্পর্কও তাদের চরিত্রে নেই। আর জীবনের সমগ্র ব্যাপারে তারা সত্যনিষ্ঠ ও খাঁটি, তারা এ ব্যাপারে সকলে মিলে যে মিথ্যা বলবে এর যুক্তিগত কারণ কিছুই নেই।

ছয় : এরূপ দাবি করে তারা ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ উদ্ধার করতে চেয়েছে– এরূপ কোনো প্রমাণও পেশ করা যেতে পারে না। বরং বিপরীতে এই অকাট্য প্রমাণ রয়েছে যে, তাদের অধিকাংশ এ দাবির কারণে অমানুষিক কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করেছেন, সম্মুখীন হয়েছেন কঠিন বিপদ-মুসিবতের। সে জন্য তারা দৈহিক কষ্ট ভোগ করেছেন, কারারুদ্ধ হয়েছেন, আহত ও প্রহৃত হয়েছেন, দেশ হতে নির্বাসিত ও বহিস্কৃত হয়েছেন। অনেককে হত্যাও করা হয়েছে। এমনকি কাউকে কাউকে করাত দ্বারা দু টুকরা করা হয়েছে। কয়েকজন ছাড়া কারো পক্ষেই স্বচ্ছল ও সুখী জীবন যাপন করা সম্ভব হয়নি। কাজেই এ কাজের পশ্চাতে কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ নিহিত রয়েছে, এরূপ অভিযোগ আরোপ করা যায়না। বরং এরূপ প্রতিকূল অবস্থায় নিজের কথা ও দাবির উপর অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, তাদের সত্যতা সম্পর্কে তাদের চূড়ান্ত পর্যায়ের বিশ্বাস ও আস্থা ছিলো। এমন বিশ্বাস ও আস্থা যে, নিজের প্রাণ বাঁচাইবার উদ্দেশ্যও তাদের কেউ নিজ দাবি প্রত্যাহার করতে প্রস্তুত হয়নি।

সাত : তারা পাগল-বুদ্ধি বিবর্জিত ছিলো বলেও কোনো প্রমাণ নেই। জীবনের সমগ্র ব্যাপারে তারা সকলেই চূড়ান্ত পর্যায়ের বুদ্ধিমান ও সুস্থ জ্ঞানসম্পন্ন প্রমাণিত হয়েছে। তাদের বিরোধীরাও প্রায়ই তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে। এমতাবস্থায় এ বিশেষ ব্যাপারে তাদের পাগল বলে কিরূপে বিশ্বাস করা যেতে পারে? বিশেষত এ ব্যাপারটি যে কি, তাও চিন্তা করা আবশ্যক। এ বিষয়টি তাদের জন্য জীবন-মরণের প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছিল। এরই জন্য তারা বছরের পর বছর ধরে দুনিয়ার সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছিল। সেটাই ছিলো তাদের বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার মূলনীতি। যাদের বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার কথা বিরুদ্ধবাদীরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

আট : তারা নিজেরাও এটা বলেনি যে, আমরা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইঞ্জিনিয়ার বা সেখানকার কর্মচারীদের সাথে সাক্ষাত করাতে পারি। কিংবা তার গোপন কারখানাও দেখাতে পারি। অথবা বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে আমাদের দাবির যথার্থতাও প্রমাণ করতে পারি। তারা নিজেরা এ সমস্ত বিষয়কে 'অদৃশ্য' বলেই অভিহিত করে। তারা বলে : তোমরা আমাদের উপর আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করো এবং আমরা যা কিছু বলছি, তা মেনে নেও।

পক্ষদ্বয়ের আস্থা ও উভয়ের বক্তব্য সম্পর্কে চিন্তা করার পর বুদ্ধির আদালত নিম্নরূপ ফায়সালা করছে :

বুদ্ধি বলে কয়েকটি বাহ্যিক লক্ষণ, নিদর্শন ও দর্শনে ওগুলোর আভ্যন্তরীণ কার্যকারণ অনুসন্ধান কাজ উভয় পক্ষই করেছে এবং উভয় পক্ষই নিজ নিজ মতবাদ প্রকাশ করেছে। বাহ্যদৃষ্টে উভয় পক্ষের মতবাদ একটি দিক দিয়ে সমান ও 'একই রকম' মনে হয়। প্রথমত উভয় পক্ষের কারো মতে বুদ্ধির বিচারে 'অসম্ভবতা' নেই। অর্থাৎ বুদ্ধির নিয়ম-নীতির দৃষ্টিতে কোনো একটি মত সম্পর্কে একথা বলা যায় না যে, উহার নির্ভুল ও সত্য হওয়া একেবারে অসম্ভব। দ্বিতীয়ত উভয় পক্ষের কারো কথায় সত্যতা ও যথার্থতা বাস্তব অভিজ্ঞতা বা পর্যবেক্ষণের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় না। প্রথম পক্ষের লোকেরাও যেমন নিজেদের সমর্থনে না এমন কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পেশ করতে সমর্থ হয়েছে, যা প্রত্যেক ব্যক্তিকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে বাধ্য করবে। তেমনি দ্বিতীয় পক্ষও না এরূপ প্রমাণ পেশ করতে সমর্থ, না এরূপ প্রমাণ করার দাবি করে। কিন্তু আরো অধিক চিন্তা ও গবেষণার পর এমন কয়েকটি বিষয় সুপ্রতিভাত হয়ে উঠে এবং উহার ভিত্তিতে দ্বিতীয় পক্ষের 'মতবাদ' অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হয়।

প্রথম : অপর কোনো মতবাদের পক্ষে ও সমর্থনে এতো বিপুল সংখ্যক বুদ্ধিমান, পবিত্র স্বভাব-চরিত্র সম্পন্ন, সত্যবাদী লোক এতো জোরালোভাবে, এতো দৃঢ় বিশ্বাস এবং প্রত্যয় সহকারে প্রচার ও সমর্থন করেনি।

দ্বিতীয় : এরূপ স্বভাবের লোকেরাও বিভিন্ন কালের ও বিভিন্ন স্থানের। এরা সম্মিলিতভাবে দাবি করেছে যে, তাদের সকলেরই নিকট এক অসাধারণ জ্ঞান-সূত্র বিদ্ধমান এবং তারা সকলেই এই সূত্রের মাধ্যমে বাহ্যিক নিদর্শনসমূহের অন্তর্নিহিত কারণসমূহ জানতে পেরেছে। কেবলমাত্র এতোটুকু জিনিসই আমাদেরকে তাদের দাবির সত্যতা স্বীকার করে নিতে উদ্বুদ্ধ করে। বিশেষভাবে এ কারণে যে, তাদের জ্ঞান তথ্য সম্পর্কে তাদের পরস্পরের বর্ণনার মধ্যে কোনোই পার্থক্য নেই। যা কিছু জ্ঞান-তথ্যের কথা তারা প্রকাশ করেছে, তাতে বুদ্ধিগত অসম্ভবতাও কিছু নেই। কোনো লোকের মধ্যে কিছু অনন্য সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধি বর্তমান থাকা, যা অপর কারো মধ্যে পাওয়া যায় না বুদ্ধির বিচারে অসম্ভব মনে করারও কোনো কারণ নেই।

তৃতীয় : বাহ্যিক নিদর্শনসমূহের অবস্থা চিন্তা করলেও এটাই স্বাভাবিক মনে হয় যে, দ্বিতীয় পক্ষের মতবাদই ঠিক। কেননা বিজলী বাতি, পাখা, গাড়ি, কারখানা ইত্যাদি স্বতই উজ্জ্বল ও গতিশীল হতে পারেনা। এরূপ হলে উজ্জ্বল ও গতিশীল হওয়া তাদের নিজস্ব ইখতিয়ারভুক্ত হতো। আর তা যে নয়, বলাই বাহুল্য। অনুরূপভাবে তাদের আলো ও গতি তাদের বস্তুগত সংগঠনেরও ফল নয়। কেননা তা যখন গতিশীল ও উজ্জ্বল হয়না তখনও তো তাদের বস্তুগত সংগঠন এরূপ বর্তমান থাকে। আর এসব যে বিভিন্ন শক্তির অধীনও নয়, তাও সুস্পষ্ট। কেননা বাতিসমূহের যখন আলো থাকে না, তখন পাখাও বন্ধ থাকে, ট্রাম

গাড়িও বন্ধ হয়ে যায়, কারখানাও তখন চলে না, এটা সচরাচরই পরিদৃষ্ট হয়। কাজেই বাহ্যিক নিদর্শনসমূহের বিশ্লেষণ দানে প্রথম পক্ষের তরফ হতে যেসব মতবাদ পেশ করা হয়েছে, তা সবই জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক-বিচারের দৃষ্টিতে গ্রহণের অযোগ্য।

সর্বাপেক্ষা অধিক বিশুদ্ধ ও নির্ভুল কথা এটাই মনে হয় যে, এ সমস্ত নিদর্শনেই একটি শক্তি সক্রিয় রয়েছে এবং তার মূলমন্ত্র এক 'সুবিজ্ঞ শক্তিমান ও বুদ্ধিমান' সত্ত্বার হাতে নিবদ্ধ, তিনি এক 'সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা' অনুযায়ী এ শক্তিকে বিভিন্ন নিদর্শনের ক্ষেত্রে ব্যয় করছেন।

তবে সংশয়বাদীরা বলে থাকে যে, যেকথা আমাদের বোধগম্য হয় না, আমরা তাকে না সত্য বলে গ্রহণ করতে পারি আর না মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করতে পারি। বিচার- বুদ্ধি একথাকে সত্য বলে মেনে নিতে পারে না। কেননা, কোনো একটি কথার বাস্তবে সত্য হওয়া তার শ্রোতাদের বোধগম্য হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়। কেবলমাত্র নির্ভরযোগ্য বিপুল সাক্ষ্য হওয়াই তার বাস্তবতা স্বীকার করে নেয়ার জন্য যথেষ্ট। আমাদের নিকট কয়েকজন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য লোক যদি বলে যে, আমরা পশ্চিম দেশে লোকদেরকে লৌহ নির্মিত গাড়িতে বসে শূন্যলোকে উড়তে দেখেছি এবং লন্ডনে বসে আমাদের নিজেদের কানে আমেরিকার বক্তৃতা শুনে এসেছি, তবে আমরা শুধু দেখবো যে, এ লোকগুলো মিথ্যাবাদী বা বিদ্রূপকারী তো নয়? এরূপ বলার সাথে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ তো কিছু জড়িত নেই? আমরা যদি দেখি যে, বহুসংখ্যাক সত্যবাদী ও বুদ্ধিমান লোক কোনোরূপ মতদ্বৈততা ছাড়াই এবং পূর্ণ দায়িত্ব সহকারে একথা বলছে, তাহলে আমরা পূর্ণ প্রত্যয় সহকারে তা অবশ্যই মেনে নিবো। লৌহ নির্মিত গাড়ির শূন্যলোকে উড়ে যাওয়া এবং কোনো প্রকার বস্তুগত মাধ্যম ছাড়াই এক দেশের ধ্বনি কয়েক সহস্র মাইল দূরবর্তী কোনো দেশে শ্রুত হওয়ার ব্যাপারটি আমাদের বোধগম্য না হলেও তা আমরা বিশ্বাস করবো।

আলোচ্য 'মামলায়' বুদ্ধির ফায়সালা এটাই। কিন্তু মনের সত্য বিশ্বাস ও প্রত্যয়মূলক অবস্থা ইসলামী পরিভাষায় যাকে ঈমান বলা হয় এরূপ ফায়সালা হতে লাভ করা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন আন্তরিক নিষ্ঠাপূর্ণ অনুভূতি,দরকার মন লাগিয়ে দেয়ার, সেজন্য হৃদয়ের অভ্যন্তরের গভীর মর্মমূল হতে এক ধ্বনি উত্থিত হওয়ার প্রয়োজন যা মিথ্যা, সংশয়, সন্দেহ ও ইতস্তত করার সকল অবস্থার চির অবসান করে দিবে। পরিষ্কার বলে দিবে, লোকদের ধারনা অনুমান, চিন্তা-কল্পনা ভুল বাতিল। সত্যবাদী লোকেরা যা আন্দায করে নেয় নির্ভুল জ্ঞান ও অনাবিল অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে তাই সত্য, তা-ই নির্ভুল।

বিবেকের বিচারে মুহাম্মদ (স) -এর নবুয়াত

কিছুক্ষণের জন্য চর্ম চক্ষু বন্ধ করে কল্পনার দৃষ্টি উন্মোচন করুন এবং এক হাজার চারশত বছর পিছনের দুনিয়ার অবস্থার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন! ভেবে দেখুন, এটা কি রকমের জগত ছিলো। মানুষের পারস্পরিক চিন্তার আদান-প্রদানের উপায়-উপাদান তখন কতোইনা কম ছিলো। জাতি ও দেশসমূহের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ সুবিধা কতোইনা সীমাবদ্ধ ছিলো। মানুষের জ্ঞান ছিলো কতো সামান্য। চিন্তা ও মানসিকতা ছিলো কতোইনা সংকীর্ণ। চিন্তার ক্ষেত্রে ছিলো কুসংস্কার ও বর্বতার কি দৌর্দণ্ড প্রভাব। মূর্খতার অন্ধকারে জ্ঞানের আলো ছিলো কতোইনা ম্লান ও অনুজ্জ্বল, আর এ সমাচ্ছন্ন অন্ধকারকে অপসারিত করে কতইনা কষ্ট সহকারে তা বিস্তার লাভ করছিলো। তখনকার দুনিয়ায় ছিলনা তারবার্তার ব্যবস্থা, ছিলনা কোনো টেলিফোন, ছিলনা রেডিও, রেলগাড়ি ও উড়োজাহাজ। কোথাও ছিলনা মুদ্রণ যন্ত্র ও প্রকাশনালয়। ছিলনা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজের কোনো আধিক্য ও প্রাচুর্য। তখন কোনো পত্র-পত্রিকা বা সাময়িকী প্রকাশিত হতো না, না লিখিত ও প্রচারিত হতো বিপুল সংখ্যায় বই-পুস্তক। সেই যুগের একজন পণ্ডিত ব্যক্তির জ্ঞানও অনেক দিক দিয়ে বর্তমান যুগের একজন সাধারণ লোকের তুলনায় ছিলো অতি সামান্য। সেকালের উচ্চ সমাজের এক ব্যক্তিও বর্তমান যুগের এক মজুর-শ্রমিক অপেক্ষাও ছিলো কম সভ্যতা মণ্ডিত। ঐ সময়ের একজন উন্নত শিক্ষিত ব্যক্তি একালের এক কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তি অপেক্ষা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিলো। আজ যে কথা ছোট-বড় সকলেই জানে, সেকালে তা কয়েক বছরকালীন অবিশ্রান্ত শ্রম-মেহনত, অনুসন্ধান ও গবেষণার পরও জানা কঠিন ছিলো। যেসব জ্ঞান বর্তমানে আলোর মতো সমগ্র পরিবেশে ছড়িয়ে রয়েছে এবং যা প্রত্যেকটি বালক পর্যন্ত চৈতন্যোদয় হওয়ার সাথে সাথেই জানতে পারে, অনুরূপ জ্ঞানের জন্য সেকালে শত সহস্র মাইল পথ সফর করতে হতো। এর অনুসন্ধানে জীবন অতিবাহিত করে দেয়া হতো। আজ যেসব কথা ও চিন্তাকে কুসংস্কার বলে আখ্যা দেয়া হয়, সেকালে তাই ছিলো গভীর সূক্ষ্ম জ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত। বর্তমানে যেসব কাজ অবাঞ্ছনীয় বর্বরতামূলক বলে বিবেচিত হয়, সেকালে তা ছিলো লোকদের নিত্য নৈমিত্তিক কাজ। যেসব উপায় ও পন্থাকে আজ মানুষের মন ঘৃণা করে, সেকালের নৈতিকতায় তা কেবল বৈধই ছিলো না, তার বিপরীতও কোনো পন্থা বা উপায় হতে পারে তা ছিলো নিতান্ত ধারণাতীত। বিস্ময়কর জিনিসের প্রতি সেকালের লোকদের মনে আকর্ষণ ছিলো সীমাতিরিক্ত। অতি-প্রাকৃতিক, অস্বাভাবিক ও অসাধারণ না হলে সেকালে কোনো জিনিসই সত্য, মহান ও পবিত্র বলে স্বীকৃতি হতো না। উপরন্তু সেকালের মানুষ নিজেকে এতোদূর হীন ও লাঞ্ছিত মনে করতো যে, মানুষ যে আল্লাহকে পেতে পারে ও আল্লাহ প্রাপ্ত

কোনো সত্ত্বা যে মানুষ হতে পারে, তা তাদের ধারণার পরিসীমায়ও পৌঁছতে পারতো না।

এ অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে পৃথিবীর এমন এক ক্ষুদ্র দেশ ছিলো, যেখানে এই অন্ধকার অধিকতর পুঞ্জীভূত হয়েছিল। সেকালের সভ্যতা ও তামাদ্দুনের দৃষ্টিতে যেসব দেশ সভ্য বলে গণ্য হতো সেগুলোর মাঝখানে আরব দেশ সব দেশ হতে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন। চতুর্দিকে পারস্য, রোম, মিশর দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির কতোকটা নিদর্শন পাওয়া যেতো। কিন্তু বালির অসীম সমুদ্র আরব দেশকে তা হতে রেখেছিল সম্পূর্ণ সতন্ত্র করে। আরব সওদাগর উষ্টযান যোগে কয়েক মাস ধরে এ মরু পথ পরিক্রম করে যেতো এসব দেশে ব্যবসা ও বাণিজ্য করার জন্য এবং পণ্যের বিনিময় করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতো। সে দেশের জ্ঞান ও সভ্যতার একবিন্দু স্পর্শও তারা নিজ দেশের জন্য সাথে করে আনতো না। আরব দেশে না ছিলো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, না গ্রন্থাগার। লোকদের মধ্যে যেমন ছিলো না কোনো জ্ঞান শিক্ষার চর্চা, তেমনি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার প্রতিও তাদের ছিলো না কোনো আগ্রহ ও কৌতুহল। সমগ্র দেশে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক মাত্র কিছুটা লেখা-পড়া জানতো বটে। কিন্তু সেকালের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য তাকে আদৌ যথেষ্ট বলা চলে না। তাদের নিকট উচ্চমানের এক সুসংবদ্ধ ভাষা বর্তমান ছিলো উচ্চ চিন্তাধারা প্রকাশ করার অসাধারণ যোগ্যতাও উহার ছিলো। তাতে উন্নততর সাহিত্যিক রুচি ও মাধুর্য্যও বর্তমান ছিলো। কিন্তু তাদের সাহিত্যের যে অবশিষ্টাংশ আমরা দেখতে পেয়েছি, তা হতে মনে হচ্ছে যে, তাদের জ্ঞানের পরিধি ছিলো অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাহযীব ও তামাদ্দুনের ক্ষেত্রে তাদের মর্যাদা ছিল অত্যন্ত নিম্নস্থানীয়। অন্ধ কুসংস্কারে ভর্তি ছিলো তাদের চিন্তাধারা। বর্বরতাপূর্ণ ও জঘন্য ধরনের ছিলো আদত-অভ্যাস। তাদের নৈতিকতার ধারণা ছিলো অত্যন্ত হাস্যকর।

আরবদের এ ভূখণ্ডে কোনো সুসংবদ্ধ শাসন ব্যবস্থা ছিলো না, ছিলো না কোনো নিয়ম ও শৃঙ্খলা। প্রত্যেকটি গোত্রই ছিলো স্বাধীন, নিরংকুশ ও খোদমুখতার। কেবল 'জংলী কানুনই' সেখানে মেনে চলা হতো। সময় ও সুযোগ হলেই একজন অপরজনকে হত্যা করতো, তার অর্থ-সম্পদ দখল করে বসতো। যে ব্যক্তি তার 'গোত্র উদ্ভুত নয়' তাকে সে হত্যা করবে না কেন, কেন কেড়ে নিবে না তাদের যাবতীয় ধন-সম্পদ, তা ছিলো আরবদের বুদ্ধির অতীত।

নৈতিকতা, তাহযীব ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাদের যেসব ধারনা ছিলো তা ছিলো অত্যন্ত সাধারণ, অপরিপক্ক ও অপরিচ্ছন্ন। পাক-নাপাক, সুন্দর ও কুৎসিত, ভালো ও মন্দের যে পার্থক্য, তার সাথে তাদের ছিলো না এক বিন্দু পরিচিতি। তাদের জীবন ছিলো কদর্য রীতিনীতি ও বর্বরতামূলক। ব্যভিচার, জুয়া, মদ, লুট-তরাজ, হত্যা, রক্তপাত প্রভৃতি জঘন্য কাজ ছিলো তাদের জীবনের নিত্য

নৈমিত্তিক ঘটনা। তারা অপর লোকের সামনে সম্পূর্ণভাবে উলংগ হতেও বিন্দুমাত্র সংকোচবোধ করতো না। এ দেশের স্ত্রীলোকেরা পর্যন্ত বিবস্ত্র হয়ে কা'বা ঘর তাওয়াফ করতো। তারা নিজেদের কন্যা সন্তানদেরকে নিজেদের হাতেই জীবন্ত দাফন করতো এবং তা এ (মূর্খতাব্যঞ্জক) চিন্তা করে যে, মেয়ে জীবিত থাকলে একজনকে 'জামাই' বানাতে হবে। তারা পিতার মৃত্যুর পর সৎমাতাকে পর্যন্ত বিবাহ করতো। পানাহার, পোশাক ও পাক-পবিত্রতার সাদারণ ভদ্রতা পর্যন্ত তাদের জানা ছিলো না।

ধর্মের দৃষ্টিতে সেকালে দুনিয়া যেসব মূর্খতা ও গুমরাহীর মধ্যে লিপ্ত ছিলো এ আরবগণও তাতে সমানভাবে অংশীদার ছিলো। মূর্তি পূজা, মৃত মানুষের আত্মার পূজা, নক্ষত্র পূজা–এক আল্লাহর বন্দেগী ও উপাসনা ছাড়া তখনকার দুনিয়ার যতো ধরনের অসংখ্য প্রকারের পূজার প্রচলন ছিলো তার সবই সেই দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিলো। প্রাচীনকালের নবীগণ এবং তাদের প্রদত্ত শিক্ষা ও আদর্শ সম্পর্কে তাদের নিকট কোনো নির্ভুল জ্ঞান ছিলো না। তারা অবশ্য একথা জানতো যে, ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ) তাদের পূর্বপুরুষ, কিন্তু এ মহান পূর্বপুরুষদের দীন কি ছিলো, তারা কার বন্দেগী ও দাসত্ব করতেন, সেই সম্পর্কে তাদের বিন্দুমাত্রও ধারণা ছিলো না। 'আদ' ও 'সামুদ' প্রভৃতি প্রাচীন জাতিসমূহের কিচ্ছা-কাহিনীও তাদের কাছে অজানা ছিলো না, কিন্তু তাদের যেসব বর্ণনা আরব ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন তাতে হযরত সালেহ (আ) ও হযরত হূদ (আ) -এর শিক্ষা ও আদর্শের চিহ্নমাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের মাধ্যমে নবী ইসরাঈল বংশের নবীগণ সম্পর্কে অনেক কথাই তাদের নিকট পৌঁছেছিলো। কিন্তু তা যে কি বস্তু ছিলো কুরআনের বিভিন্ন তাফসীর লেখকের উল্লেখিত ইসরাঈলী কিংবদন্তি হতে সে সম্পর্কে অতি সহজেই ধারণা করা যায়। এ নবীগণ যে কি ধরনের লোক ছিলেন ও নবুয়াত সম্পর্কে তাদের ধারণা যে কতো নীচ ও হীন ছিলো, তা ঐসব বর্ণনা পাঠ করলেই বুঝতে পারা যায়।

ঠিক এ সময় এ ধরণেরই এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই পিতামাতা ও পিতামহের স্নেহসিক্ত ছায়া হতে বঞ্চিত হয়ে যান। ফলে এরূপ এক অনুন্নত দেশেও লেখা-পড়া ও শিক্ষা-দীক্ষা লাভের যতোটুকু সুযোগ পাওয়া সম্ভব ছিলো, তাও তিনি পেলেন না। বয়স ও জ্ঞান বৃদ্ধির পর তিনি মহল্লার ছেলে-ছোকরাদের সাথে মিলে ছাগল চরাতে শুরু করেন। যৌবনে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোনিবেশ করেন। উঠা বসা, চলাফেরা ও মিল-মিশ সবকিছুই পূর্বোল্লিখিত ধরনের আরব লোকদের সাথেই অনুষ্ঠিত হতে থাকে। লেখাপড়া ও শিক্ষার একবিন্দু স্পর্শ পর্যন্ত লাগেনি। কেননা তদানীন্তন আরবে শিক্ষিত লোকের কোনো অস্তিত্ব ছিলো না। কয়েকবার তিনি আরবের বাইরে যাওয়ার সুযোগ পান

বটে, কিন্তু এ বিদেশ যাত্রাও কেবল সিরিয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে। সেকালের আরব ব্যবসায়ী কাফেলা যে রকম চলতো তার এ সফরও অনুরূপ ছিলো। এ সফর ব্যাপদেশে কোথাও জ্ঞান ও সভ্যতার কিছু নিদর্শন তিনি দেখতে পেলেও এবং কিছুসংখ্যক শিক্ষিত লোকদের সাক্ষাত লাভ করে থাকলেও এরূপ বিক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণ ও সাময়িক দেখা-সাক্ষাতে যে কোনো লোকের চরিত্র গড়ে উঠতে পারে না, তা সুস্পষ্ট। এরূপ সাক্ষাতের প্রভাবে কোনো ব্যক্তিই তার গোটা পরিবেশ হতে এতোদুর স্বতন্ত্র ও ভিন্ন চরিত্রের হয়ে গড়ে উঠতে পারে না। এ সুযোগে এতোখানি শিক্ষালাভও কারো পক্ষে সম্ভব হয় না, যার ফলে একজন উম্মি নিরক্ষর ব্যক্তি দেশ কাল নির্বিশেষে সমগ্র দুনিয়ার ও সমগ্র কালের 'নেতা' হতে পারে। তিনি বাইরের লোকের নিকট হতে কোনো এক পর্যায়ের জ্ঞান অর্জন করে থাকলেও তখনকার দুনিয়ায় শিক্ষার অস্তিত্ব পর্যন্ত কোথাও ছিলো না। ধর্ম, নৈতিকতা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সেকালে কোনো ধারণাও ছিলো না, মানবীয় চরিত্রের নমুনাই কোথাও খুঁজে পাওয়া যেতো না, সেই সবকিছু লাভ করার কোনো উপায়ই তাঁর ছিলো না।

কেবল আরবেই নয়, তখনকার সমগ্র দুনিয়ার পরিবেশ সামনে রেখে চিন্তা করতে হবে। আলোচ্য ব্যক্তি যেসব লোকের মধ্যে জন্মগ্রহণ করলেন, যাদের মধ্যে বাল্য ও শৈশবকাল অতিবাহিত করলেন, যাদের সাথে লালিত-পালিত হয়ে যৌবনে পদার্পণ করলেন, যাদের সাথে তাঁর মেলামেশা ও চলাফেরা ছিলো, যাদের সাথে তাঁর দিন-রাতের লেনদেন, কাজ-কারবার সম্পন্ন হতো, জীবনের প্রথম হতেই অভ্যাসে, চরিত্রে সেসব লোক হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে গড়ে উঠলেন। তিনি কখনো মিথ্যা বলতেন না, তাঁর সততা-সত্যবাদিতার সাক্ষ্য দিতো তখনকার গোটা জাতিই। তার কোনো প্রাণের দুশমনও তার উপর মিথ্যা বলার কোনো অভিযোগ আরোপ করতে পারেনি। তিনি কারো সাথে অশ্লীল কথা বলতেন না, কেউ তার মুখে অশ্লীল কথা বা গালাগালি উচ্চারিত হতে শুনতে পাননি। তিনি লোকদের সাথে ভালো সম্পর্ক স্থাপন করে চলতেন, কিন্তু কখনো কারো সাথে রূঢ় ভাষা ব্যবহার বা ঝগড়া-ফাসাদ করেননি। তার কণ্ঠে কঠোর ভাষার পরিবর্তে মিষ্ট ভাষাই সবসময় উচ্চারিত হতো। ফলে যে কেউ তার সাথে সাক্ষাত করতো, তার দিকে নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট হয়ে যেতো। কারো সাথে তিনি কোনো খারাপ মোয়ামেলা বা ব্যবহার করেননি। কারো 'হক' নষ্ট বা হরণ করেননি। বছরের পর বছর ধরে ব্যবসা বাণিজ্য করা সত্ত্বেও কারো এক পয়সা পরিমাণও অন্যায়ভাবে গ্রহণ করেননি। যাদের সাথে তার লেনদেন ও কাজ-কর্মের সম্পর্ক, তারা সকলেই তার বিশ্বস্ততা ও ঈমানদারীর উপর পূর্ণ মাত্রায় নির্ভর করে। গোটা জাতিই তাকে 'আল আমীন' উপাধী দান করে। শত্রু পক্ষের লোকেরা পর্যন্ত তার নিকট নিজেদের মূল্যবান সম্পদ গচ্ছিত রাখে এবং তিনি সেই সবের পূর্ণ হেফাযত করেন। চারিদিকে প্রায় সকল লোকই লজ্জাহীন, তার

মধ্যে তিনি এমন একজন লজ্জাশীল ব্যক্তি যে, জ্ঞানের উন্মেষকাল হতে তাকে কেউ উলংগ দেখতে পায়নি। চরিত্রহীন পরিবেষ্টনীর মধ্যে তিনি একা এমন চরিত্রবান ও পূত প্রকৃতির লোক যে, তিনি কখনো কোনো অন্যায় ও অবৈধ কাজে লিপ্ত হননি। মদ পান বা জুয়া খেলায় যোগদান করেননি। নোংরা লোকদের মধ্যে তিনি এমন সুসভ্য ব্যক্তি যে, সকল প্রকার অসভ্যতা ও মলিনতাকে তিনি ঘৃণা করেন ও বর্জন করে চলেন। বরং তার প্রত্যেক কাজেই পরিচ্ছন্নতা ও শালীনতা পরিস্ফুট ছিলো। পাষাণ দিল লোকদের মধ্যে তিনি অত্যন্ত দয়ালু ব্যক্তি, সকলেরই দু:খ-দরদে তিনি শরীকদার। ইয়াতীম ও বিধবাদের সাহায্য করেন। কাউকে তিনি কোনো প্রকার আঘাত দেন না। বরং তিনি অপর লোকদের জন্য সকল প্রকার দু:খ অকাতরে স্বীকার করেন। পশু স্তরের লোকদের মধ্যে তিনি অবিচল শান্তি প্রিয় লোক, নিজ জাতির লোকদেরকে ঝগড়া-ফাসাদ ও রক্তারক্তিতে লিপ্ত দেখে কষ্টবোধ করেন। গোত্রীয় লড়াই-বিবাদ হতে তিনি অতিশয় দূরে সরে থাকেন। সন্ধি মিলন সৃষ্টির চেষ্টায় তিনি অগ্রসর। মূর্তি পূজারীদের মাঝে তিনি এক সুস্থ প্রকৃতি ও অনাবিল বুদ্ধির লোক, আকাশ ও পৃথিবীতে তিনি কোনো কিছুই পূজ্য বা পূজনীয় বলে মনে করেন না। কোনো সৃষ্টির সামনে তাঁর মাথা অবনমিত হয় না, মূর্তিদের সামনে প্রদত্ত অর্ঘ খেতেও তিনি কখনো প্রস্তুত হন না। তার দিল স্বত:স্ফূর্তভাবেই শিরক ও সৃষ্টি পূজার মলিনতা হতে পবিত্র।

এরূপ পরিবেশে এ ব্যক্তি এমনভাবে পরিদৃশ্যমান হয়ে উঠে, যেনো নিচ্ছিদ্র অন্ধকারে একটি উজ্জ্বল প্রদীপ, কিংবা পাথর স্তুপের মধ্যে একটি হীরক খণ্ড চকমক করছে।

প্রায় চল্লিশ বছর পর্যন্ত এরূপ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনের পর তার জীবনে সহসা এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। তিনি চতুর্দিকে সমাচ্ছন্ন অন্ধকার দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। তাকে পরিবেষ্টনকারী এ মূর্খতা, চরিত্রহীনতা, অনৈতিকতা, বিশৃংখলা, শিরক ও ভূত-পরস্তীর ভয়াবহ সমুদ্র হতে তিনি নিস্কৃতি পেতে চান। এ পরিবেশে কোনো একটি জিনিসও তার স্বভাবের অনুকূল মনে হয় না। তিনি সবকিছু পরিত্যাগ করে সবকিছু হতে বিচ্ছিন্ন ও নি:সম্পর্ক হয়ে লোকালয় হতে দূরে পর্বত গুহায় অবস্থান করতে শুরু করলেন। নিতান্ত একাকীত্বে পূর্ণ প্রশান্তিময় পরিবেষ্টনীতে একাধারে কয়েক দিন ও রাত অতিবাহিত করেন। এ সময় রোযা রেখে তিনি নিজের রূহ, দিল ও দিমাগকে অধিকতর পবিত্র ও সিদ্ধিপূর্ণ করে তুলতে লাগলেন। এ সাথে তিনি গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করতে থাকেন। তিনি এমন একটি প্রজ্জ্বল আলোকের সন্ধান করতে ছিলেন, যার দ্বারা চর্তুদিকে সমাচ্ছন্ন অন্ধকার দূরীভূত করতে সমর্থ হবেন। এমন এক শক্তি অর্জনেরও তিনি অভিলাষী ছিলেন, যার সাহায্যে তিনি এ অধপতিত জগতকে ভেঙ্গে-চুরে এক নতুন জগতের সৃষ্টি করতে পারবেন।

সহসা তাঁর অবস্থার এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। হঠাৎ তার হৃদয়, মনে এমন এক আলোকচ্ছটা তিনি অনুভব করতে থাকেন, যা অপূর্ব, সম্পূর্ণ অভিনব। তিনি এমন এক শক্তিও লাভ করেন, যা ইতিপূর্বে কোনো দিনই তার ছিলো না। তিনি পর্বত গুহা হতে বের হয়ে লোকালয়ে ফিরে আসেন। লোকদের সম্বোধন করে বলতে শুরু করেন : তোমরা যে মূর্তির সামনে অবনত হও, এসবের কোনোই অর্থ নেই, এটা পরিত্যাগ করো, কোনো মানুষ, কোনো বৃক্ষ, কোনো পাথর, কোনো আত্মা, কোনো গ্রহ পূজনীয় নয়, কারো সামনে মাথা নত করা যায় না। এরা তার উপযুক্তও নয়। এ সবগুলোর বন্দেগী, দাসত্ব, হুকুম-বরদারী ও আনুগত্য করা যেতে পারে না। এ জমি, চাঁদ-সরুজ, নক্ষত্র, আকাশ ও পৃথিবীর সমগ্র জিনিসই এক মহান আল্লাহর সৃষ্টি। তিনিই তোমাদের ও এসব জিনিসের সৃষ্টিকর্তা। তিনিই রিযিকদাতা, জীবন ও মৃত্যুদাতা। অতএব কেবলমাত্র তারই সামনে মাথা অবনত করো।

চুরি, লুট-তরাজ, রক্তপাত, হত্যাকাণ্ড, যুলুম, নিপীড়ন, যেনা-ব্যভিচার, দিন-রাত যেসব কাজে তোমরা লিপ্ত হয়ে আছো, এসবই গুনাহের কাজ, এটা পরিত্যাগ করো। আল্লাহ এটা কিছুমাত্র পছন্দ করেন না। সত্য কথা বলো, ইনসাফ করো, কাউকে হত্যা করো না, কারো মাল কেড়ে নিও না। যা গ্রহণ করবে সততা ও ন্যায়-পরায়ণতা সহকারে গ্রহণ করে। আর যা দিবে, ইনসাফ অনুযায়ী দাও। তোমরা সকলেই মানুষ, নীচ নহে, কেউ ইয্যতের গৌরব নিয়ে দুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেনি। সম্মান ও মর্যাদা, বংশ বা খান্দানের ভিত্তিতে স্থিরকৃত হয় না। কেবল আল্লাহর আনুগত্য, সত্যানুশীলন ও পবিত্রতাই হচ্ছে একমাত্র মানদণ্ড। যে আল্লাহকে ভয় করে, সত্যানুসারী, পবিত্র চরিত্র সম্পন্ন, সে-ই হচ্ছে উন্নত মানুষ। আর যে সেই রূপ নয়, সে কিছুই নয়। মৃত্যুর পর তোমাদের সকলকেই আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে। তোমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ কাজের জন্য আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। আর সেই আল্লাহ তিনিই, যিনি সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তোমরা কোনো জিনিস তার নিকট হতে গোপন করতে পারো না। তোমাদের জীবনের আমলনামা যথাযথরূপে কোনোরূপ কমবেশী ও রদ-বদল ছাড়াই তার সামনে হাজির করা হবে। আর সেই আমলনামার দৃষ্টিতেই তোমাদের পরিণাম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। প্রকৃত সুবিচারক মহান আল্লাহর সামনে কোনো প্রকার সুপারিশ কাজে আসবে না, ঘুষদানের কোনো সুযোগ পাওয়া যাবে না। কারো বংশীয় মর্যাদারও সেই দিন কোনো মূল্য হবে না। সেখানে মূল্য হবে কেবলমাত্র ঈমান ও নেক আমলের। এ মূলধন সেদিন যার নিকট থাকবে, সে-ই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে আর যার নিকট এসবের কিছুই থাকবে না সে ব্যর্থ হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। এ পয়গাম নিয়েই তিনি পর্বত গুহা হতে বের হয়েছিলেন।

মূর্খ জাতি তাঁর বিরুদ্ধতা করতে শুরু করে। গালাগালি করে, মন্দ বলতে শুরু করে। মারার জন্য হাত উত্তোলন করে। একদিন, দুই দিন নয়, এক সাথে তেরটি বছর পর্যন্ত তাঁর উপর কঠোরভাবে অত্যাচার ও নির্যাতন চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তাঁকে স্বদেশ হতে বের করে দেয়া হয়। আর কেবল বের করে দিয়েই তারা ক্ষ্যান্ত হয়নি। স্বদেশ হতে বের হয়ে যেখানে গিয়ে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেখানে গিয়ে পর্যন্ত তারা তাঁকে নানাভাবে উৎপীড়ন করতে থাকে। সমগ্র আরব দেশকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করে তোলে। দীর্ঘ আট বছর পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে তারা সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে থাকে। আর তিনি এই সমস্ত অত্যাচার-উৎপীড়ন অকাতরে সহ্য করতে থাকেন, কিন্তু স্বীয় আদর্শ ও কাজ হতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি।

কিন্তু এ জাতি তাঁর দুশমন হলো কেন? তাদের সাথে অর্থ বা নারী নিয়ে কোনো বিবাদ ছিলো কি? রক্তপাত বা খুন-খারাবীর কোনো ব্যাপার ছিলো কি? তিনি কি তাদের নিকট পার্থিব কোনো জিনিস পাবার জন্য দাবি জানিয়ে ছিলেন? .... না, তা কিছুই নয়। সমস্ত শত্রুতার মূল কারণ ছিলো একটি এবং তা এই যে, তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর দাসত্ব কবুল করতে, পরহেযগারী ও ন্যায়নীতি পালন করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। এ অপরাধ তিনি কেন করলেন? মূর্তিপূজা, শিরক ও খারাপ কাজের বিরুদ্ধে কেন তিনি প্রচার করলেন? পূজারী ও পুরোহিতদের পেশার উপর আঘাত হানলেন কেন? মোড়ল সরদারদের মোড়লীসরদারী কেন পন্ড করতে চাইলেন সমাজ থেকে পাথর্ক্য প্রাচীর চূর্ণ করতে চান কেন? বংশীয় ও গোত্রীয় হিংসা-দ্বেষকে মুর্খতা বলে প্রচার করেন কেন? প্রাচীনকাল থেকে যেরূপ সামাজিক ব্যবস্থাপনা চলে আসছে, তা তিনি চূর্ণ করতে চান কেন? বস্তুত জাতির দৃষ্টিতে তার এই সমস্ত কথাই বংশীয় ঐতিহ্য ও জাতীয় রীতিনীতির বিপরীত। তাই জাতির লোকেরা তাঁকে এ কাজ পরিত্যাগ করতে বললো, অন্যথায় তাঁর জীবন সংকটাপন্ন করে দেয়া হবে বলে হুমকি প্রদান করলো।

তাহলে সেই প্রশ্ন জাগে : তিনি এরূপ নির্যাতন ভোগ করলেন কেন? জাতির লোকেরা তো তাঁকে দেশের বাদশাহী দিবার জন্য প্রস্তুত ছিলো। তাঁর পায়ের তলে ধন-সম্পদের স্তুপ করে দেয়ার জন্য তৈরি ছিলো। এর জন্য শুধু এ শর্তটুকু আরোপ করেছিল যে, তাঁকে তাঁর আদর্শ প্রচার বন্ধ করতে হবে। কিন্তু তিনি এ সবকিছুকেই উপক্ষে করলেন। আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি প্রস্তরাঘাত ও সকল প্রকার যুলুম-নির্যাতন বরদাশত করতে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু কেন, কিসের জন্য তিনি এরূপ করলেন? লোকদের আল্লাহর অনুগত নেক্কার ও চরিত্রবান হওয়ায় তাঁর কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ নিহিত ছিলো কি? এবং সেই স্বার্থ কি রাজ ক্ষমতা, নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব, ধন-দৌলত ও আয়েশ-আরামের দুর্নিবার মোহ

অপেক্ষাও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। সেই স্বার্থ কি এতোই বড় ছিলো, যার জন্য এক ব্যক্তি কঠোর দৈহিক ক্লেশ ও মানসিক অশান্তিতে নিমজ্জিত হতে এবং দীর্ঘ তেইশটি বছর পর্যন্ত তা অকাতরে সহ্য করতে পারেন? এটা বাস্তবিকই প্রণিধানযোগ্য। এক ব্যক্তি নিজের কোনো স্বার্থের জন্যও নয়, বরং জনগণের মানসিক মংগল বিধানের উদ্দেশ্যেই প্রাণান্তকর কষ্ট ভোগ করতে প্রস্তুত হলেন–আত্মত্যাগ, পরার্থপরতা ও কুরবানী স্বীকারে এতদপেক্ষা উন্নত কোনো মান ধারণা করা যায় কি? সেই সাথে এটাও বিবেচ্য যে, যাদের মংগলের জন্য তিনি এই সমস্ত প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, তারাই তাঁকে প্রস্তরাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করছে, অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করছে, জন্মভূমি হতে বিতাড়িত ও নির্বাসিত করছে, এমনকি বিদেশেও তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করতে ত্রুটি করছে না। অথচ এসব সত্ত্বেও তিনি তাদের কল্যাণ কামনা হতে বিন্দুমাত্র বিরত হন না।

দ্বিতীয়ত, কোনো মিথ্যাবাদী কি কোনো অমূলক বিষয়ের পশ্চাতে ছুটে এরূপ বিপদ ও দু:খ-মুসিবত সহ্য করতে পারে? নিছক আন্দাজ-অনুমান দ্বারা চালিত কোনো ব্যক্তি কি কথার জন্য এরূপ অচল অটল হয়ে দাঁড়াতে এবং এজন্য পর্বত পরিমাণ বিপদ সহ্য করতে পারে? বস্তুত হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর কি কঠিন বিপদ নেমে এসেছিলো, কিরূপে সমগ্র দেশ তাঁর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলো, বড় বড় সেনাবাহিনী তাঁকে গ্রাস করার জন্য উদ্যত হয়েছিলো, তা সর্বজন বিদিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর সাধনার পথ হতে একবিন্দুও নড়তে প্রস্তুত হননি। এ দৃঢ়তা ও স্থিরচিত্ততা হতে স্বত:ই প্রমাণিত যে, তাঁর আদর্শের সত্যতা সম্পর্কে তাঁর হৃদয়ে অপরিসীম প্রত্যয় জন্মেছিলো। এ ব্যাপারে যদি তাঁর মনে একবিন্দু সন্দেহেরও উদ্রেক হতো, তাহলে তিনি ক্রমাগত তেইশ বছর পর্যন্ত উপর্যুপরি বিপদ-আপদের মুকাবিলায় কখনো দাঁড়িয়ে থাকতে পারতেন না।

আলোচ্য ব্যক্তির অবস্থা পর্যবেক্ষণের এটা একটি দিক মাত্র। তাঁর অবস্থার অপর দিক এটা হতেও বিস্ময়কর।

চল্লিশ বছর পর্যন্ত তিনি আরববাসীদের ন্যায়ই একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন। এ সময়ের মধ্যে তাঁকে একজন বড় ভাষণদাতা এবং অনন্য সাধারণ বক্তা হিসাবেও কেউ জানতে পারেনি। বুদ্ধি-জ্ঞান ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কথাবার্তা বলতেও কেউ শুনতে পায়নি। ধর্মতত্ত্ব, নীতি-দর্শন, আইন ও রাষ্ট্র বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও সমাজ-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে কথা বলতেও কেউ তাঁকে দেখেনি। কেউ তাঁর কাছ থেকে আল্লাহ, ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, নবী-রসূল, অতীতকালের বিভিন্ন জাতি, কিয়ামত, পরকালীন জীবন এবং জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে একটি কথাও শুনতে পায়নি। তিনি যদিও প্রথম হতে অত্যন্ত পবিত্র ও উন্নত চরিত্রবিশিষ্ট এবং স্বাধীনচেতা লোক ছিলেন। কিন্তু চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাঁর সত্ত্বায় এমন কোনো অনন্য সাধারণ বিষয় পরিলক্ষিত হয়নি, যার ভিত্তিতে তাঁর ভবিষ্যৎ

জীবন সম্পর্কে কিছু আশাবাদী হওয়া যেতো। তখন পর্যন্ত লোকেরা তাঁকে কেবলমাত্র একজন স্বল্পবাক, শান্তিপ্রিয় ও নিরীহ ভদ্রলোক হিসাবেই জানতো। কিন্তু চল্লিশ বছর পর তিনি যখন পর্বত গুহা থেকে এক অভিনব পয়গাম নিয়ে আসলেন, তখন তাঁকে অপূর্ব লোক হিসাবে দেখা গেলো।

এরপর তিনি এক বিস্ময়কর বাণী শুনাতে শুরু করলেন। তাঁর সেই বাণী শুনে সমগ্র আরববাসী বিস্মিত ও হতচকিত হতে লাগলো। এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া এতো তীব্র ও গভীর ছিলো যে, প্রাণের শত্রু পর্যন্ত তা শুনতে ভয় পেতো। কেননা, তা শুনলেই তাদের মর্মস্পর্শ করবে, একথা তাদের জানা ছিলো। তাঁর ভাষা সৌন্দর্য ও রচনা-সৌকর্য ওজস্বীতা ছিলো অপূর্ব, অতুলনীয়। সমগ্র আরব জাতি এবং বড় বড় লব্ধ প্রতিষ্ঠিত কবি, সাহিত্যিক ও বক্তাদেরকে তা স্পষ্ট চ্যালেঞ্জ পেশ করেছিলো এবং বারবার ঘোষণা করেছিলো যে, [তোমরা এ কালামকে যদি আল্লাহর কালাম বলে বিশ্বাস না করো মুহাম্মদ (সা)-এর নিজস্ব রচনা বলেই মনে করো, তাহলে] তোমরা সকলে মিলিত চেষ্টার মাধ্যমে এর মতো একটি সুরা-ই রচনা করে পেশ করো। কিন্তু এ কালামের সাথে মুকাবিলা করার দুঃসাহস নিয়ে কেউ এগিয়ে আসলো না। বস্তুত আরব জাতি এরূপ অতুলনীয় কালাম ইতিপূর্বে কখনও শুনতে পায়নি।

এ সময় তিনি সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবেই এক অতুলনীয় তত্ত্বজ্ঞানী, সমাজ ও নৈতিক সংস্কারক, একজন সুদক্ষ সমাজনীতিবিদ, শক্তিমান আইন প্রণেতা, উচ্চস্তরের বিচারপতি এবং অদ্বিতীয় সেনাধ্যক্ষ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেন। এহেন নিরক্ষর মরুবাসী যেসব জ্ঞান-বুদ্ধিসম্মত কথাবার্তা বললেন, তা যেমন পূর্বেও কেউ বলতে পারেনি, ভবিষ্যতেও কেউ বলতে সক্ষম হবে না। এ উম্মী ব্যক্তি ধর্মতত্ত্বের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয়গুলো সম্পর্কে ভাষণ দিতে শুরু করলেন। মানবজাতির ইতিহাস থেকে তার উত্থান ও পতন সম্পর্কে বহু অমূল্য জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা পেশ করতে শুরু করলেন। প্রাচীনকালের সমাজ সংস্কারকদের কার্যাবলী এবং বিশ্বের ধর্মমতসমূহের সমালোচনা এবং বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-বিবাদ মীমাংসা করতে লাগলেন। মানুষকে উন্নত নৈতিক আদর্শ, কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও সুসংবদ্ধতার শিক্ষা দিতে লাগলেন। সামাজিক বিধি-বিধান, অর্থনীতি, পারস্পরিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে শুরু করলেন এবং তিনি এমন সব আইন রচনা করতে সমর্থ হন, যার অন্তর্নিহিত যৌক্তিকতা, সৌন্দর্য ও কল্যাণকারিতা অনুধাবন করার জন্য দুনিয়ার পণ্ডিত বিদগ্ধ ও বুদ্ধিমান লোকদেরও গভীর চিন্তা-গবেষণা ও জীবন ব্যাপী সাধনা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হলো। আর মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যতোই বৃদ্ধি হতে থাকবে, তার অন্তর্নিহিত যৌক্তিকতা ও সৌন্দর্য ততোই উদঘাটিত ও বিকশিত হবে। তিনি ছিলেন একজন নীরব শান্তিবাদী সওদাগর।

সমগ্র জীবনে যিনি কোনো দিন তরবারি চালাননি। কখনো সামরিক শিক্ষা ও ট্রেনিং লাভ করেননি। সমগ্র জীবন যিনি একটি মাত্র যুদ্ধে একজন দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এহেন ব্যক্তিই একজন অভাবিতপূর্ণ বীরসেনানী হয়ে গেলেন। যে কোনো কঠিনতম যুদ্ধেও তিনি নিজের নির্দিষ্ট স্থান থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণ হটে যাননি। শুধু একজন সৈনিকই নন তিনি রীতিমতো একজন অনন্য সাধারণ সেনাধ্যক্ষে পরিণত হয়েছিলেন। মাত্র নয় বছরের মধ্যে আরব জাহানকে তিনি জয় করেছিলেন। তিনি এমন এক আশ্চর্য ধী-শক্তিসম্পন্ন সমরনায়ক হয়েছিলেন যে, তার সংগঠিত সামরিক ভাবধারা ও তৎপরতার প্রভাবে অবলম্বনহীন আরব জাতি মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তদানীন্তন দুনিয়ার দুটি বিরাট সামরিক শক্তিকে উৎপাটন করতে সমর্থ হন।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত নির্লিপ্ত, নির্বিকার ও নির্বাক মানুষ। চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাঁর মধ্যে কোনোরূপ রাজনৈতিক প্রবণতা ও তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়নি। সহসা তিনি এমন এক সুদক্ষ সমাজ সংস্কারক ও সমাজ পরিচালক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেন যে, তেইশ বছরের মধ্যে তিনি বার লক্ষ বর্গমাইল বিস্তৃত মরুভূমির বিক্ষিপ্ত যুদ্ধবাজ, গণ্ডমূর্খ, দুর্নীতিপরায়ণ, অসভ্য, অসামাজিক ও চিরকালের আত্মকলহপ্রিয় গোত্রসমূহকে এক ধর্ম, এক জীবন ব্যবস্থা, এক কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, এক রাষ্ট্র ও সভ্যতা, এক আইন ও এক অখণ্ড প্রশাসনিক ব্যবস্থার অধীনে সুসংবদ্ধ করে নিলেন। এ বিরাট কাজে তিনি আধুনিককালের রেলগাড়ি, টেলিগ্রাম, টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশন ও মুদ্রণযন্ত্রের কোনো সাহায্যই গ্রহণ করেননি।

উপরন্তু তিনি তাদের সমগ্র চিন্তা ও মতাদর্শ মূলগতভাবেই পরিবর্তিত করে দেন তাদের নৈতিক চরিত্র বদলিয়ে দেন। তাদের অমার্জিত জীবন-ধারাকে পরিমার্জিত করে উন্নত আদর্শে গড়ে তোলেন। তাদের বর্বরতাকে সুরুচিমণ্ডিত সভ্যতায়, তাদের চরিত্রহীনতা ও অসচ্চরিত্রতাকে পরিচ্ছন্নতা, তাকওয়া ও মহৎ চরিত্রে পরিবর্তিত করে দেন। তাদের অনমনীয়তা ও অরাজকতা অতুলনীয় অসীম আইনানুবর্তিতা ও নেতার আনুগত্যে রূপান্তরিত হয়। আরব জাতি ছিলো দীর্ঘকাল পর্যন্ত বন্ধ্যা। কয়েক শতাব্দী যাবত ও জাতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনো ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়নি। এহেন জাতিকে তিনি এমনভাবে গড়ে তোলেন যে, অতপর সেই জাতির মধ্যে হাজার হাজার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয় এবং দুনিয়ার সমাজকে তাঁরা দীন, নৈতিকতা, সভ্যতা, শিষ্টাচার ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি শিক্ষা দেবার জন্য চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েন।

কিন্তু এ বিরাট কাজ তিনি কোনো যুলুম-পীড়ন, অত্যাচার-অবিচার, জোর-যবরদস্তি ও ধোঁকা-প্রতারণার সাহায্যে সম্পন্ন করেননি করেছেন পূত-পবিত্র চরিত্র, প্রাণজয়ী ভদ্রতা ও শিষ্টতা এবং মগয দখলকারী চিন্তা ও শিক্ষার সাহায্যে। তিনি তাঁর চরিত্র বলে পরম শত্রুকেও বন্ধু বানিয়ে নিয়েছেন। দয়া,

অনুগ্রহ, সহানুভূতি ও মহানুভবতার দ্বারা তিনি মানুষের মনকে বিগলিত করেছেন। ইনসাফ ও সুবিচার সহকারে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। সত্য ও ন্যায়পরায়ণতা হতে বিন্দু পরিমাণও বিচ্যুত হননি। প্রচণ্ড যুদ্ধের সময়ও তিনি কাউকে প্রতারিত করেননি, ওয়াদা ভংগ করেননি। প্রাণের শত্রুর প্রতিও তিনি কখনো যুলুম করেননি। যারা তাঁর রক্তের পিপাসু ছিলো, যারা তাঁকে প্রস্তরাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করেছিলো, দেশ থেকে বিতাড়িত করেছিলো তাঁর বিরুদ্ধে সমগ্র আরব জাতিকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিলো, এমনকি শত্রুতার প্রতিহিংসায় তাঁর চাচার কলিজা পর্যন্ত চিবিয়েছিলো, তাদের উপর জয় লাভ করে তিনি তাদের সকলকেই ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। নিজের জন্য তিনি কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি।

এ ছাড়াও তিনি ছিলেন অতুলনীয় আত্মসংযমী স্বার্থহীনতার বাস্তব প্রতিমূর্তি। তিনি যখন সমগ্র দেশের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন, তখনো পূর্বের মতো ফকিরই ছিলেন। পর্ণ কুটীরে তিনি বাস করতেন, চট বিছিয়ে শুইতেন। মোটাসোটা কাপড় পরতেন। দীনহীনের মতোই খাদ্য গ্রহণ করতেন। অভুক্ত ও ক্ষুধার্ত থাকতেন। উপর্যুপরি কয়েক রাত পর্যন্ত তিনি আল্লাহর ইবাদাতে দাঁড়িয়ে থাকতেন। গরিব ও বিপদগ্রস্ত লোকদের খেদমত করতেন। একজন সাধারণ মজুরের মতো কাজ করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। শেষ জীবন পর্যন্ত তাঁর মধ্যে সম্রাটসুলভ দাপট, শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব ও মানুষের মতো অহংকারের এতোটুকু গন্ধও সৃষ্টি হতে পারেনি।

তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতোই লোকদের সাথে মিলিত হতেন, তাদের দুঃখ-দুর্দশায় অংশ গ্রহণ করতেন। জনসাধারণের সাথে একত্রিত হয়ে বসলে, কোন্ ব্যক্তি মজলিসের সরদার, প্রধান বা দেশের বাদশাহ তার হদীস করা অপরিচিত লোকদের পক্ষে বড়ই কঠিন হতো। এতোবড় ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও তিনি ক্ষুদ্র মানুষের সাথে তাদেরই সমান পর্যায়ের লোক হিসাবে ব্যবহার করতেন। সমগ্র জীবনের চেষ্টা ও সাধনায় তিনি নিজের জন্য কিছুই রেখে যাননি। তাঁর অবশিষ্ট ও পরিত্যক্ত সমস্ত কিছুই তিনি জাতির জন্য ওয়াকফ করে গেছেন। তাঁর অনুসারীদের উপর তিনি তাঁর নিজেদের কিংবা নিজ সন্তান ও বংশ জাতের কোনো অধিকার চাপিয়ে দেননি। এমনকি তাঁর সন্তান ও বংশধরদের যাকাত গ্রহণের অধিকার হতে বঞ্চিত করে গেছেন। অন্যথায় তাঁর অনুসারী লোকদের সম্পূর্ণ যাকাত কেবল তাঁর সন্তান ও বংশজাত লোকদেরকেই দান করা প্রবল আশংকা দেখা দিতো।

এহেন বিরাট ব্যক্তিত্বের কীর্তি ও অবদানের ফিরিস্তি এখানেই শেষ নয়। তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে হলে বিশ্ব ইতিহাসের উপর ব্যাপকভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে। এ দৃষ্টিপাতের ফলে স্পষ্ট জানা যাবে যে, চৌদ্দশত বছর পূর্বেকার অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে ভুমিষ্ঠ আরব মরুভূমির এই নিরক্ষর মরুচারীই

প্রকৃতপক্ষে আধুনিক যুগের ভিত্তি প্রতিষ্ঠাতা, সমগ্র দুনিয়ার নেতা। তাঁকে যারা নেতা মেনে নিয়েছে, তিনি কেবল তাদেরই নেতা নন, যারা তাঁকে মানে না তিনি তাদেরও নেতা। তাঁর বিরুদ্ধবাদীগণ এতোটুকু অনুভব করতে পারেন না যে, যাঁর বিরুদ্ধে তারা লম্বা লম্বা কথা বলে, তার নেতৃত্ব তাদের চিন্তা-বিশ্বাসে, জীবন পদ্ধতিতে, কর্মপ্রণালী এবং আধুনিক যুগের ভাবধারায় কতো গভীরভাবে মিশে গেছে।

দুনিয়ার যাবতীয় ধারণা-বিশ্বাসের গতিকে তিনি কুসংস্কার, অলৌকিকত্ব, পূজা ও বৈরাগ্যবাদ থেকে ফিরিয়ে বুদ্ধিবাদ, বাস্তব বিচার ও তাকওয়ামূলক বৈষয়িকতার দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন। স্থুল ও বাস্তব মুজিযাকামী দুনিয়ায় বুদ্ধি-জ্ঞান ও প্রতিভার মুজিযা অনুধাবন করা এবং তাকেই সত্যের একমাত্র মানদণ্ডরূপে স্বীকার করে নেয়ার রুচি লোকদের মধ্যে তিনি সৃষ্টি করেছেন। অস্বাভাবিক ঘটনা সংঘটনেই যারা আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শন অনুসন্ধানকারী তাদের চক্ষুকে তিনি উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীতে (natural phenomena) আল্লাহর অস্তিত্বের চিহ্ন খোঁজ করতে অভ্যস্ত করে তুলেছেন। যারা কল্পনার ঘোড়া ছুটাতে অভ্যস্ত তাদেরকে ধারণা-অনুমান (speculation) হতে ফিরিয়ে বুদ্ধি-জ্ঞানের প্রয়োগ, চিন্তা-গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের পথে তিনিই পরিচালিত করেছেন। বুদ্ধি-জ্ঞান, ইন্দ্রিয়ানুভূতির ও হৃদয়ানুভূতির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সীমা-সরহদ মানুষকে তিনিই দিয়েছেন। বস্তুবাদ ও আধ্যাত্মবাদে সামঞ্জস্য স্থাপন করেছেন। দীনের সাথে জ্ঞান ও কর্মের এবং জ্ঞান ও কর্মের সাথে দীনের গভীর যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। ধর্মের শক্তির সাহায্যে দুনিয়ার বৈজ্ঞানিক ভাবধারা এবং বৈজ্ঞানিক ভাবধারা থেকে বিশুদ্ধ ও প্রকৃত ধার্মিকতার সৃষ্টি করেছেন। শিরক ও সৃষ্টি পূজার সমগ্র ভিত্তিকে তিনিই উৎপাটন করেছেন। জ্ঞানের শক্তি দ্বারা তাওহীদ বিশ্বাসকে এমন দৃঢ় বুনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, মুশরিক ও মুর্তিপূজারীরা ধর্ম ও তাওহীদের ভাবধারা গ্রহন করতে বাধ্য হয়। চরিত্র, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মবাদের মৌলিক ধারণাসমূহকে তিনিই পরিবর্তন করে দিয়েছেন। যারা দুনিয়া ত্যাগ করা ও কৃচ্ছ্রসাধনকে চরিত্র বলে মনে করতো, নফস ও দেহের অধিকার আদায় করা ও বৈষয়িক জীবনের কাজ-কর্মে অংশগ্রহণের সাথে সাথে আধ্যাত্মিক উন্নতি ও পরকালীন মুক্তির সম্ভাবনাকে পর্যন্ত স্বীকার করতো না। তাদেরকে তিনিই সভ্যতা, সামাজিকতা ও বৈষয়িক কাজ-কর্মে নৈতিকতার বৈশিষ্ট্য, আধ্যাত্মিক বিকাশ ও মুক্তি লাভের পন্থা নির্দেশ করেছেন। মানব জীবনের প্রকৃত মূল্যমানের সাথে তিনিই মানুষকে পরিচিত করেছেন। যারা ভগবান, অবতার ও আল্লাহর পুত্র ছাড়া অন্য কাউকে প্রকৃত হেদায়াতকারী ও পথপ্রদর্শকরূপে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলো না, তাদেরকে তিনিই একথা বুঝিয়ে দিলেন যে, মানুষ তাদেরই মতো মানুষ আসমানী বাদশাহীর প্রতিনিধি ও মহান বিশ্ব মালিকের খলিফা হতে পারে। যারা প্রত্যেক শক্তিশালী ব্যক্তিকে নিজের রব বানিয়ে নিতো, তাদেরকে তিনিই একথা বুঝিয়ে ছিলেন যে,

প্রকৃতপক্ষে মানুষ মানুষই, মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়, কোনো মানুষ পবিত্রতা, প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বের জন্মগত অধিকার নিয়ে দুনিয়ায় আগমন করেনি। কারো উপর মলিনতা, অপবিত্রতা, গোলামী ও পরাধীনতার জন্মগত কলংক লাগানো নেই। বস্তুত তাঁর এ বিপ্লবী শিক্ষার ফলেই দুনিয়ায় মানুষের ঐক্য, একত্ব, সাম্য, গণতন্ত্র এবং আযাদীর চিন্তা-কল্পনা ব্যাপক ব্যপ্তি লাভ করতে পেরেছে।

ধারণা ও কল্পনার জগত হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে বাস্তবতার দৃষ্টিতে বিচার করলে স্বীকার করতে হবে যে, দুনিয়ায় আইন-কানুন, রীতিনীতি, প্রথা-প্রচলন ও যাবতীয় কাজ- কর্মের উপর এ উম্মী নবীর অসাধারণ নেতৃত্বের গভীর ও বিরাট প্রভাব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। নৈতিক চরিত্র, সভ্যতা, সংস্কৃতি, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে তাঁর প্রচারিত অসংখ্য মূলনীতি সমস্ত দুনিয়ায় বিস্তার লাভ করেছে। সমাজ ও সামাজিক জীবন সম্পর্কে তিনি যেসব আইন ও বিধান রচনা করেছেন, দুনিয়া তার অনেক কিছুই গ্রহণ করে নিয়েছে, বর্তমানেও নিচ্ছে। অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁর উপস্থাপিত আদর্শ ও মতবাদমূলক বিধানের ভিত্তিতে দুনিয়ায় অসংখ্য আন্দোলন গড়ে উঠেছে, আর এখনো উঠছে। রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার যে পন্থা ও পদ্ধতি তিনি অবলম্বন করেছিলেন, তাঁর প্রভাবে দুনিয়ার রাষ্ট্র-দর্শনেও রাজনৈতিক মতবাদের বিপ্লব সূচিত হয়েছে ও হচ্ছে। আইন ও ন্যায় বিচারের জন্য তিনি যেসব মূলনীতি রচনা করেছিলেন তা দুনিয়ার সকল বিচার ব্যবস্থা ও আইন দর্শনকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। বর্তমানেও তার প্রভাব নীরবে নিঃশব্দে বিস্তার লাভ করছে। যুদ্ধ, সন্ধি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধের এক নবতর পর্যায় যিনি কার্যত দুনিয়ায় প্রবর্তন করেছিলেন, তিনি আসলে ছিলেন আরবের এক উম্মী নবী। অন্যথায় যুদ্ধেরও কোনো সংস্কৃতি ও শিষ্টাচার হতে পারে এবং বিভিন্ন জাতির মিলিত মনুষত্বের বুনিয়াদেও দুনিয়ার কাজ-কর্ম সম্পন্ন হতে পারে, সেই সম্পর্কে এর পূর্বে দুনিয়াবাসি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলো।

মানবেতিহাসের পটভূমিকায় এ আশ্চর্যজনক ব্যক্তির মহান ব্যক্তিত্ব এতোদূর কালজয়ী মনে হয় যে, প্রথম থেকে বড় বড় ঐতিহাসিক ব্যক্তি বিশ্বের খ্যাতনামা হিরোগণকেও (heroes) তাঁর তুলনায় অত্যন্ত ম্লান ও ক্ষীণ মনে হয়। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্বের কৃতিত্ব মানব জীবনের প্রথমত দুটি ক্ষেত্রেই প্রবলভাবে দেখা যায়, এটাকে অতিক্রম করা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। এক শ্রেণীর লোক হচ্ছেন চিন্তা-কল্পনা ও নীতি-মতবাদের বাদশাহ বাস্তব কর্মশক্তি হতে একেবারেই বঞ্চিত। আর অপর শ্রেণী হচ্ছেন কর্মবীর চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত দুর্বল। কারো প্রতিভা রাজনৈতিক জ্ঞান-বুদ্ধি ব্যবস্থাপনা পর্যন্তই সীমিত। কেউ নিছক সামরিক কৃতিত্ব ও দক্ষতার প্রতিরূপ। কেউ আবার সমাজ জীবনের বিশেষ একটি দিকের উপর এমনভাবে দৃষ্টি নিবন্ধ করেছেন যে, সমাজ জীবনের অপরাপর যাবতীয় দিক তার দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেছে। কেউ শুধু মাত্র

নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছে, কিন্তু জীবন-জীবিকা, অর্থনীতি, রাজনীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফেল। কেউ নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতাকে সম্পূর্ণ বর্জন করে কেবলমাত্র রাজনীতি ও অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল হয়েছে। মোটকথা ইতিহাসে কেবল একদেশদর্শী নেতা ও হিরোই পরিলক্ষিত হচ্ছে, কেবলমাত্র এ এক ব্যক্তিই হচ্ছেন এমন যার মধ্যে সকল প্রকার পূর্ণতা সমন্বয় লাভ করেছে। তিনি নিজেই দার্শনিক, বিজ্ঞানী, নিজেই স্বীয় দর্শনকে বাস্তবে রূপায়িত করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত। তিনিই আবার রাষ্ট্রনীতিবিদ, সমরাধ্যক্ষ, আইন প্রণেতা, নীতি ও চরিত্রের দীক্ষাগুরু। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতাও তিনি। মানব জীবনের সমগ্র দিকের উপর তাঁর দৃষ্টি সম্প্রসারিত। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোনো বিষয়ও তার দৃষ্টির অগোচরে থাকেনি। পানাহারে নিয়ম-শিষ্টাচার, দৈহিক পবিত্রতা ও শারীরিক পরিচ্ছন্নতার কায়দা-কানুন হতে আন্তর্জাতিক বিষয় পর্যন্ত প্রত্যেকটি জিনিস সম্পর্কে তিনি সুস্পষ্ট পথনির্দেশ দান করেন, পথপ্রদর্শন করেন। নিজের মত ও আদর্শ অনুযায়ী স্বতন্ত্র এক সভ্যতা (civilization) প্রতিষ্ঠিত করে দুনিয়াবাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন। জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের মধ্যে এমনভাবে ভারসাম্য (equilibrium) স্থাপন করেছেন যে, কোথাও মাত্রাতিরিক্ততা বা ভারসাম্যহীনতা পরিলক্ষিত হয় না। মানব-জগতে এরূপ ব্যাপক-ব্যক্তিত্বের কোনো দৃষ্টান্ত কি কোথাও পাওয়া যাবে?

দুনিয়ায় প্রায় সবকটি বড় বড় ব্যক্তিত্বই পরিবেশের সৃষ্টি। কিন্তু এ ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য এদিক দিয়েও স্বতন্ত্র। তাঁর ব্যক্তিত্ব গঠনের ব্যাপারে তাঁর পরিবেশের কোনো প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় না। উপরন্তু তদানীন্তন আরব দেশের পরিবেশে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এরূপ সৃষ্টির কোনো প্রয়োজন প্রমাণ করা যেতে পারে না। খুব টানা-হেঁচড়া করে বললেও এটুকুমাত্র বলা যেতে পারে এটা অপেক্ষা অধিক কিছুই বলা যায় না যে ঐতিহাসিক আকর্ষণ এমন এক নেতার আবির্ভাবের দাবি করছিলো, যিনি গোত্রীয় বিচ্ছিন্নতা খতন করে আরব জাতিকে এক অখণ্ড জাতিতে পরিণত করে দিবেন। সেই সাথে অন্যান্য দেশ জয় করে আরবদের অর্থনৈতিক কল্যাণ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করবেন। অন্য কথায়, একজন জাতীয়তাবাদী নেতার প্রয়োজন ছিলো, যিনি তদানীন্তত আরবীয় বৈশিষ্ট্যের ধারক হবেন, যুলুম, নির্দয়তা, রক্তপাত, ধোঁকা প্রতারণা প্রভৃতি সম্ভাব্য সকল উপায়ে নিজ জাতিকে সচ্ছল বানিয়ে দিবেন। তদুপরি একটি রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভাবন ও সংগঠন করে অধ:স্তন পুরুষদের জন্য রেখে যাবেন। এছাড়া তদানীন্তন আরব ইতিহাসের অপর কোনো তাকীদ কিছুতেই প্রমান করা যায় না। হেগেলের ইতিহাস দর্শন কিংবা মার্কসের ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার দৃষ্টিতে খুব বেশি বললেও এটুকুই বলা সম্ভব যে, সেই সময়কার পরিবেশে এক জাতি ও রাষ্ট্র গঠনকারী একজন নেতার আবির্ভাব অপরিহার্য ছিলো বা আবির্ভাব হতে

পারতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও তখনকার পরিবেশ এমন এক ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রকাশ ঘটলো, যিনি উত্তম নৈতিক চরিত্র শিক্ষাদাতা, মানবেতার পুনর্বিন্যাস সাধনকারী মানুষের মন-মগয পরিশুদ্ধকারী এবং জাহেলি যুগের সকল প্রকার অন্ধত্ব, কুসংস্কার ও হিংসা-বিদ্বেষ নির্মূলকারী ছিলেন। যার দৃষ্টি জাতি, বংশ ও দেশের সীমা চূর্ণ করে বিশ্বমানবতা পর্যন্ত প্রসারিত ছিলো, যিনি নিজের জাতির জন্য নয় বিশ্বমানবের জন্য এক নৈতিক, আধ্যাত্মিক, তামাদ্দুনিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন, যিনি অর্থনৈতিক কাজকর্ম, নাগরিক রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কল্পনার জগতে নয় বাস্তব জগতে নৈতিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়েছেন। আধ্যাত্মিকতা ও বাস্তবতার এমন ভারসাম্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় সাধন করেছেন যে, তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি ও প্রতিভা সে দিনের মতো আজও সম্পূর্ণ নতুন। এমতাবস্থায় হেগেলীয় কিংবা মার্কসীয় দর্শন এর কি ব্যাখ্যা করতে পারে? এরূপ ব্যক্তিকে কি আরব জাহেলিয়াতের তদানীন্তন পরিবেশের উৎপাদন বলা যেতে পারে?

তিনি যে পরিবেশের সৃষ্টি ছিলেন না কেবল তাই নয়, তাঁর কীর্তি সম্পর্কে চিন্তা করলে নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, তা সময় ও স্থানের সীমা বন্ধন থেকে বিমুক্ত, তার দৃষ্টি সময় ও অবস্থার বাধা অতিক্রম করে, শতাব্দীকালের সহস্র আবরণ দীর্ণ করে সামনে অগ্রসর হয়। মানুষকে তা প্রত্যেক কাল ও প্রত্যেক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে থাকে। তার জন্য এমন সব নৈতিক ও বাস্তব বিধান পেশ করে, যা সকল অবস্থায়ই সমানভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে চলতে পারে। ইতিহাস যাদেরকে পুরাতন করে দেয় তা তাদের মধ্যে নয়। প্রাচীনদের তো আমরা কেবল এ হিসাবেই প্রশংসা করতে পারি যে, তাঁরা নিজেদের যুগে 'ভালো নেতা' ছিলেন। কিন্তু আলোচ্য ব্যক্তিত্ব কেবল ছিলেন না বর্তমানেও আছেন। তিনি ছিলেন সবকিছু থেকে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট। বিশ্বমানবতার এমন একজন নেতা, যিনি ইতিহাসের সাথে সাথে অগ্রসর হন এবং প্রত্যেক পরবর্তী যুগেই তিনি থাকেন ঠিক তেমনি 'নতুন', যেমন ছিলেন পূর্ববর্তী যুগে।

আমরা যেসব লোককে উদারতা সহকারে ইতিহাস স্রষ্টা (makers of history) বলে আখ্যায়িত করি, মূলত তাঁরা ইতিহাসের সৃষ্টি উৎপাদন (creation of history)। প্রকৃতপক্ষে মানবতার গোটা ইতিহাসে ইতিহাস স্রষ্টা মাত্র একজন এবং তিনিই হচ্ছেন আমাদের আলোচ্য ব্যক্তি। দুনিয়ার ইতিহাসে যে কয়জন নেতা বিপ্লব সৃষ্টি করেছেন, অনুসন্ধিৎসার দৃষ্টিতে তাদের অবস্থা বিচার করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, এ ধরনের সকল ক্ষেত্রেই বিপ্লবের সাজ-সরঞ্জাম পূর্ব থেকেই প্রস্তুত হচ্ছিলো, আর সেসব সরঞ্জাম স্বতঃই বিপ্লবের দিক নির্ণয় ও পথ নির্ধারণ করছিলো। বিপ্লবী নেতা অগ্রসর হয়ে কেবল এতোটুকু কাজই করেছেন যে, অবস্থার তাকীদ অনুযায়ী কার্যত বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছেন। আসলে তাঁর এ কাজের ক্ষেত্র ও কাজ পূর্ব থেকেই নির্ধারিত ছিলো। কিন্তু ইতিহাস স্রষ্টা কিংবা

বিপ্লব সৃষ্টিকারী এ বিরাট কাফেলায় আমাদের আলোচ্য ব্যক্তিত্বই একমাত্র ব্যক্তি, যাঁর সৃষ্ট বিপ্লবের কোনো উপাদান ও কার্যকারণ সেখানে পূর্ব থেকে আদৌ প্রস্তুত ছিলো না তা তিনি নিজেই সৃষ্টি করেছিলেন। বিপ্লবের ভাবধারা ও কার্যক্ষম-দক্ষতা সম্পন্ন লোক যেখানে দুর্লভ ছিলো, সেখানে তিনি নিজে উপযুক্ত লোক তৈরি করেছিলেন। স্বীয় ব্যক্তিত্ব বিগলিত করে শতসহস্র মানব প্রতিচ্ছবিতে তা রূপায়িত করে দিয়েছিলেন এবং তিনি তাদেরকে নিজের মতো করে নিয়েছিলেন। তাঁর শক্তি, সামর্থ ও ইচ্ছা শক্তি দ্বারা নিজেই বিপ্লবের সরঞ্জাম তৈরি করেছিলেন। নিজেই তার প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্ধারণ করেছিলেন এবং নিজেই স্বীয় ইচ্ছা-ক্ষমতার প্রাবল্যে অবস্থার গতিকে ঘুরিয়ে স্বীয় পরিকল্পিত পথে পরিচালিত করেছিলেন। বস্তুত এ মর্যাদার ইতিহাস স্রষ্টা ও এ পর্যায়ের বিপ্লব সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্ব বিশ্বের ইতিহাসে দ্বিতীয়টি দেখা যায় কি?

এখন আমরা আর একটি প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করবো। চিন্তা করার বিষয় : চৌদ্দশত বছর পূর্বেকার অন্ধকারাচ্ছন্ন দুনিয়ায় আরবের ন্যায় এক অধিক তমাশাচ্ছন্ন দেশের এক কোণে নিছক রাখাল, সওদাগর ও অশিক্ষিত মরুবাসীর মধ্যে সহসা এতো জ্ঞান, এতো আলো ও এতো শক্তি, এতো প্রতিভা-যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা এবং এতো বিরাট সুদক্ষ শক্তি সৃষ্টি হওয়ার মৌলিক কারণ এবং উপায় কি ছিলো? এটা সে ব্যক্তিরই নিজস্ব মন ও মগযের উৎপাদন ছিলো– বলার পিছনে কোনো যুক্তি থাকতে পারে কি? যদি তাই হবে, তবে তিনি আল্লাহ হওয়ার দাবি করেই বসতেন। যে দুনিয়া রামকে খোদা বানিয়ে দিয়েছে, কৃষ্ণকে ভগবান রূপে পেশ করেছে, বুদ্ধকে উপাস্য সত্তা রূপে গ্রহণ করেছে, ঈসা মসীহ (আ)-কে নিজ ইচ্ছামতো 'আল্লাহর পুত্র' হিসাবে মেনে নিয়েছে এবং সেখানে আগুন, পানি ও বাতাসের পর্যন্ত পূজা উপাসনা হতে পেরেছে, সেই দুনিয়া এহেন প্রতিভাবান ব্যক্তির সেই দাবি কেমন করে অস্বীকার করতে পারতো? .... কিন্তু এ ব্যক্তি নিজের কোনো যোগ্যতা প্রতিভামূলক কাজের কৃতিত্বই নিজে গ্রহণ করেননি ; বরং তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে, আমি একজন মানুষ, তোমাদের মতোই সাধারণ মানুষ মাত্র, আমার নিকট আমার নিজস্ব বলতে কিছু নেই, সবকিছুই একমাত্র আল্লাহর এবং আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত। আমার পেশ করা যে কালামের দৃষ্টান্ত পেশ করতে দুনিয়ার কোনো ব্যক্তিই সমর্থ হয়নি তাও আমার নিজস্ব কালাম নয়। তা আমার নিজ মস্তিস্ক প্রসূত নয়, নিজস্ব প্রতিভারও ফল নয়। এর প্রত্যেকটি শব্দ আল্লাহর নিকট থেকে আমার কাছে এসেছে আর এর প্রশংসাও আল্লাহরই প্রাপ্য। আমি যে বিরাট কৃতিত্ব দেখিয়েছি, যেসব আইন-কানুন তৈরি করেছি, যেসব রীতিনীতি ও আদর্শ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছি, এর মধ্যে কোনো একটি জিনিসও আমার রচিত নয়। আমি কোনো কিছুই আমার নিজস্ব যোগ্যতা ও প্রতিভার বলে করতে সমর্থ হইনি। প্রত্যেকটি

ব্যাপারেই আল্লাহর প্রত্যক্ষ পথপ্রদর্শনের প্রতি আমি মুখাপেক্ষী। তাঁর কাছ থেকে যে ইংগিতই আসে আমি তাই বলি।

বিবেচনার বিষয়, এ ঘোষণা কতো বিরাট সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা ও সততার কতো উজ্জ্বল নিদর্শন এটা। মিথ্যাবাদী মানুষ অপরাপর লোকের কাজের সুনাম নিজের বলে দাবি করতে ও নিজের নামে প্রচার করতে লজ্জাবোধ করে না, অথচ সেই সবের মূল উৎসের সন্ধান নেয়া সকলের পক্ষেই সহজ ও সম্ভব। কিন্তু এ মহান ব্যক্তি তাঁর সমস্ত কৃতিত্বকেও নিজের বলে দাবি করেন না, অথচ তা করলে কেউ তাঁকে মিথ্যাচারী বলতে পারতো না। কেননা তাঁর কৃতিত্বের মূল উৎসের সন্ধান করার কোনো উপায়ই কারো কাছে নেই। সততা-সত্যবাদিতার ইহা অপেক্ষা অকাট্য ও উজ্জ্বল প্রমাণ আর কি হতে পারে? তিনি অতি গোপন ও প্রচ্ছন্ন উপায়ে এসব অতুলনীয় প্রতিভা ও কৃতিত্ব লাভ করেছিলেন ; কিন্তু তিনি নিজে তার কোনোটারই দাবি না করে এর মূল উৎসের নামেই প্রচার করেছেন। এমতাবস্থায় তাঁকে সত্য নবী বলে স্বীকার না করার আর কি কারণ থাকতে পারে?

মৃত্যুর পরের জীবন

মৃত্যুর পরে জীবন আছে কি? যদি থাকে তবে তা কোন্ ধরনের জীবন? এ প্রশ্নের উত্তর প্রকৃতপক্ষে আমাদের জ্ঞান সীমার বহির্ভূত। কেননা মৃত্যুর সীমারেখার পরপারে কি আছে এবং কি নেই, তা উঁকি মেরে দেখার মতো চক্ষু আমাদের নেই। ওপারের কোনো আওয়ায শোনার মতো কান আমাদের নেই এবং এমন কোনো উপকরণও আমাদের কাছে নেই, যার দ্বারা সঠিকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে তা জানা যেতে পারে। বিজ্ঞানের যতোটুকু ক্ষেত্র, এ প্রশ্ন তার সম্পূর্ণ বহির্ভূত। যে ব্যক্তি বিজ্ঞানের নামে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে অস্বীকার করে, সে নিশ্চিতরূপে অবৈজ্ঞানিক কথা বলে। মৃত্যুর পরে কোনো জীবন আছে– বিজ্ঞানের সহায়তায় একথা যেমন বলা যায় না ; তেমনি তা নেই বলে ঘোষণা করা চলে না, যে পর্যন্ত না এতদসম্পর্কিত জ্ঞান লাভের কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্র আবিস্কৃত হয়। অন্ততঃপক্ষে তদ্বিধ নির্ভুল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি একমাত্র এটাই হতে পারে যে, আমরা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে স্বীকার বা অস্বীকার কোনোটাই করবো না।

কিন্তু বাস্তব জীবনে এ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কি কার্যকরী? মোটেই নয়। বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়ে কোনো একটা জিনিস সম্বন্ধে অবগত হওয়ার যাবতীয় উপকরণ হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত 'না' অথবা 'হাঁ' সূচক কোনো সিদ্ধান্ত থেকে দূরে থাকা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু কোনো জিনিসের সাথে যখন আমাদের কার্যপদ্ধতি স্থির করা ছাড়া কোনোই উপায় থাকে না, তখন তা অবশ্যই করতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কোনো এক ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কিছুই অবগত নন এবং তার সাথে

আপনার কোনো কাজ-কারবার করারও ইতিপূর্বে প্রয়োজন হয়নি। এমতাবস্থায় এ ব্যক্তি বিশ্বস্ত হওয়া না হওয়া সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আপনার পক্ষে সম্ভব হতে পারে না। কিন্তু উক্ত ব্যক্তির সাথে যদি আপনার কোনো কাজ-কারবার করতেই হয়, তাহলে তাকে হয়তো বিশ্বাসযোগ্য কিংবা বিশ্বাস-অযোগ্য মনে করে নিতে আপনি বাধ্য হন। আপনি নিশ্চয়ই বলতে পারেন যে, বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী বলে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত আমি তার সাথে সন্দিগ্ধ অবস্থায় কারবার করবো। কিন্তু বিশ্বাসী হওয়ার সম্পর্কে সন্দিগ্ধ মনে আপনি যে কারবার তার সাথে করবেন, বাস্তব ক্ষেত্রে তার ধরন অবিশ্বাস্য ব্যক্তির মতোই হবে। অতএব প্রকৃতপক্ষে স্বীকার ও অস্বীকার ও মধ্যবর্তী সন্দিগ্ধ অবস্থায় স্থিরিকৃত হতে পারে না। এর জন্য তো সুস্পষ্ট স্বীকার কিংবা চূড়ান্ত অস্বীকারই অপরিহার্য।

সামান্য মনোনিবেশ ও গবেষণা দ্বারাই এটা আপনার বোধগম্য হবে যে, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কীত প্রশ্নটি মাত্র একটি দার্শনিক প্রশ্নই নয়, বরং আমাদের বাস্তব জীবনের সাথে তার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যদি আমার এ ধারণা থাকে যে, জীবনের সবকিছু এ পার্থিব জীবন পর্যন্তই শেষ এবং এরপর অপর কোনো জীবন নেই, তাহলে আমার নৈতিক ব্যবহার এক ধরনের হবে। আর যদি আমার ধারণা থাকে যে, এরপর আরও একটি জীবন আছে যাতে আমার বর্তমান জীবনের হিসাব প্রদান করতে হবে এবং আমার এ জীবনের কার্যকলাপের ভিত্তিতেই সেখানে ভালো কিংবা মন্দ ফল গ্রহণ করতে হবে ; তাহলে নিশ্চয়ই আমার নৈতিক কার্যপদ্ধতি পূর্বোক্ত ধরনের জীবন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে। এর উদাহরণ এভাবে বুঝুন : যেমন এ ব্যক্তি এ ধারণা নিয়ে ভ্রমণ করছে যে, তাকে এখান থেকে করাচি পর্যন্ত যেতে হবে এবং করাচি পৌঁছার পর এ ভ্রমনের শুধু চির সমাপ্তিই ঘটবে না, বরং সে সেখানে পুলিশ আদালত এবং সওয়াল-জওয়াব করার অধিকারী সকল শক্তির নাগালের বাইরে চলে যাবে।

পক্ষান্তরে অপর এক ব্যক্তি এ ধারণা রাখে যে, এখান থেকে করাচি পর্যন্ত তার সফরের প্রথম মনজিল। এরপর তাকে সমুদ্রের পরপারে এমন এক দেশে যেতে হবে, ঐ দেশের বাদশাহই এই দেশের বাদশাহ এবং তাঁর অফিসে এ ব্যক্তি এ দেশে যা করেছে তৎসম্পর্কিত সম্পূর্ণ গুপ্ত রেকর্ড সংরক্ষিত আছে। তার কৃতকর্ম অনুসারে কোন্ ধরনের ব্যবহার তার সাথে করা যেতে পারে, তা উক্ত রেকর্ড পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। এ দুই ব্যক্তির কার্যপদ্ধতিতে কি পরিমাণ পাথর্ক্য থাকবে, তা আপনি সহজেই অনুমান করতে পারেন। প্রথম ব্যক্তি এখান থেকে করাচি পর্যন্ত সফরের উপযোগী পাথেয় সংগৃহিত করবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তির পাথেয় সংগৃহিত হবে পরবর্তী দীর্ঘ সফরের জন্যও। প্রথম ব্যক্তি মনে করবে—লাভ-লোকসান যা কিছু হবার তা পৌঁছা পর্যন্তই, এরপর আর কিছুই নেই। দ্বিতীয় ব্যক্তি মনে করবে যে, প্রকৃত লাভ-লোকসান সফরের প্রথম মনজিলে নয় বরং সর্বশেষ মনজিলেই দেখা দিবে।

প্রথম ব্যক্তি নিজের কার্যকলাপের সেই সমস্ত ফলাফলের প্রতিই নজর রাখবে যা করাচি পৌঁছা পর্যন্ত প্রকাশিত হতে পারে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তির মনোযোগ সেই সমস্ত ফলাফলের প্রতি থাকবে, যা সমুদ্রের অপর পার্শ্বস্থ দেশে পৌঁছার পর প্রকাশিত হতে পারে। এ দুই ব্যক্তির কার্যপদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য ভ্রমণ সম্পর্কে তাদের ধারণা পার্থক্যেরই যে ফল তা সুস্পষ্ট। ঠিক এভাবেই মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কিত ধারণা আমাদের বাস্তব জীবনের ধারা চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করে থাকে। বাস্তব কর্মক্ষেত্রে পদার্পণ করতে হলেই উক্ত পদক্ষেপের প্রকৃতি নিরূপণ এ প্রশ্নেরই উপর নির্ভরশীল যে, এ জীবনকেই প্রথম ও শেষ জীবন মনে করে কাজ করা হচ্ছে, অথবা পরবর্তী কোনো জীবন ও তার ফলাফলের প্রতিও আস্থা আছে। প্রথমোক্ত অবস্থায় আমাদের পদক্ষেপ এক প্রকৃতির হবে এবং শেষোক্ত অবস্থায় তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের হবে।

এ আলোচনা থেকে জানা গেলো যে, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কিত প্রশ্নটা নিছক খেয়ালী দার্শনিক প্রশ্ন নয় ; বরং বাস্তব জীবনেরই প্রশ্ন। সুতরাং এ ব্যাপারে আমাদের সন্দিগ্ধ ও দোদুল্যমান মনোভাব গ্রহণ করার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। সন্দিগ্ধ অবস্থায় জীবন যাপনের যে পদ্ধতিই আমরা অবলম্বন করবো, তা অস্বীকারকারীর জীবন পদ্ধতির মতোই হবে। ফল কথা মৃত্যুর পরে অন্য কোনো জীবন আছে কিনা, এ সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে আমরা বাধ্য। বিজ্ঞান যদি আমাদেরকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে অক্ষম হয়, তবে আমাদেরকে বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে।

এখন বুদ্ধির সাহায্যে বিচার করার জন্য আমাদের কাছে কি উপকরণ আছে তাই আমরা সর্বপ্রথম যাচাই করে দেখবো।

আমাদের সামনে প্রথম উপকরণ হচ্ছে স্বয়ং মানুষ এবং দ্বিতীয় উপকরণ হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতি। আমরা মানুষকে এ বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যস্থলে রেখে বিচার করে দেখবো যে, মানুষ হিসেবে তার সমস্ত দাবি-দাওয়া সৃষ্টির বর্তমান পরিচালনা ব্যবস্থায় মিটে যাচ্ছে, না কোনো দাবি অর্পূণ থাকছে বলে তার জন্য একটি ভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা প্রয়োজন হতে পারে। মানুষের দেহটিই বিচার করে দেখুন তা বহু খনিজ পদার্থ লবন, পানি এবং গ্যাসের সমষ্টি। এর সাথে সমান্তরালভাবে সৃষ্টি জগতে মাটি, পাথর, ধাতু, লবণ, গ্যাস এবং অনুরূপ অন্যান্য জিনিস বিদ্যমান। এ সমস্ত জিনিসের স্ব স্ব কাজ করার জন্য বিধানের প্রয়োজন। উক্ত বিধান সৃষ্টি জগতের সর্বত্রই সক্রিয় এবং তা বাইরের পরিবেশে পাহাড়, নদী ও বায়ুকে যেমন স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের পূর্ণ সুবিধা দিয়ে থাকে, তেমনি মানুষের দেহও ঐ বিধানের অধীন কাজ করার অধিকার পায়।

দ্বিতীয়ত, মানুষের দেহ চতুষ্পাশ্বস্থ দ্রব্যসমূহ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে বর্ধিত ও প্রতিপালিত হয়। এ ধরনেরই বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, ঘাস ইত্যাদি সমষ্টিসমূহের মধ্যেও বর্ধনশীল দেহধারীদের প্রয়োজনীয় বিধানের অস্তিত্ব দেখা যায়।

তৃতীয়ত, মানুষের দেহ জীবন্ত ও স্বেচ্ছায় নড়া-চড়া করে, নিজের খাদ্য নিজেই সংগ্রহ করে, নিজের রক্ষণাবেক্ষণ নিজেই করে থাকে এবং নিজের বংশ বিস্তারেরও ব্যবস্থা করে থাকে। সৃষ্টিজগতে এ ধরনেরও বিভিন্ন জীবন বিদ্যমান রয়েছে। জল, স্থল ও বায়ুমণ্ডলে এমন অসংখ্য জীব-জন্তুর সন্ধান পাওয়া যায়, যাদের সামগ্রিক জীবনের উপর পরিব্যাপ্ত থাকার উপযোগী বিধানও ঐ সমস্ত জীবন্ত অস্তিত্বের উপর পূর্ণভাবে ক্রিয়াশীল।

এসবের উর্ধ্বে অন্য ধরনের আরও একটি সত্ত্বা মানুষের আছে, যাকে আমরা নৈতিক জীবন বলে অভিহিত করি। তার মধ্যে ভালো ও মন্দ কাজ করার অনুভূতি আছে। ভালো মন্দের পার্থক্যবোধ আছে, ভালো কিংবা মন্দ কাজ অনুসন্ধান করার শক্তি আছে এবং কৃতকর্মের ভালো কিংবা মন্দ ফল প্রকাশ্যভাবে লাভ করার একটি প্রকৃতিগত বাসনাও তার মধ্যে বিরাজ করছে। যুলুম, ইনসাফ, সত্যবাদিতা ও মিথ্যা, হক ও না হক, দয়াশীলতা ও নির্মমতা, কৃতজ্ঞতা ও কৃতঘ্নতা, দানশীলতা-কার্পণ্য ও বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি শ্রেণীর নৈতিক গুনাগুণসমূহের মধ্যেও মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই পাথর্ক্য করে থাকে। এসব গুণ কাল্পনিক নয়, বরং মানুষের বাস্তব জীবনে এটা ক্রিয়াশীলরূপে পরিদৃষ্ট হয় এবং কার্যত এদের প্রভাব মানুষের তামাদ্দুনিক জীবনে প্রকাশিত হয়। অতএব মানুষ জাতি স্বভাবতই দৈহিক কাজের ফলাফলের ন্যায় নৈতিক কাজের ফলাফল লাভ করার প্রয়োজনীয়তাও তীব্রভাবে অনুভব করে।

কিন্তু সৃষ্টিজগতের পরিচালনা ব্যবস্থার প্রতি সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখুন, মানুষের নৈতিক কার্যকলাপের ফলাফল পূর্ণরূপে এখানে প্রকাশিত হতে পারেকি? আমি আপনাদেরকে পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে জ্ঞাপন করছি যে, এখানে তার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। কেননা আমাদের জানা মতে নৈতিক জীবনের অধিকারী অপর কোনো সৃষ্টির সন্ধান পাওয়া যায় না। সারাটি বিশ্ব প্রাকৃতিক বিধান অনুসারে পরিচালিত হচ্ছে। নৈতিক বিধান এর কোনো অংশেই কার্যকারীরূপে দৃষ্ট হচ্ছে না। এখানে টাকার ওজন এবং মূল্য দুই-ই আছে, কিন্তু সত্যকে ওজন করা যায় না তার মূল্যও নির্ধারণ করা চলে না। এখানে আমের বীজ থেকে সর্বদা আম বৃক্ষ অংকুরিত হয়। কিন্তু সত্যের বীজ বপনকারীদের প্রতি কখনও পুষ্প বৃষ্টি, আর কখনও জুতা বর্ষণ হয়ে থাকে। এখানে দৈহিক অস্তিত্বসম্পন্নদের জন্য নির্দিষ্ট বিধান আছে এবং সেই বিধানানুযায়ী সর্বদা ফলাফল প্রকাশিত হয়। কিন্তু নৈতিক কার্যসমূহের জন্য এমন কোনো নির্দিষ্ট

বিধান নেই যাতে ফলাফল সর্বদা একই ধরনের হতে পারে। প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলার দরুন নৈতিক ফলাফল কখনও পাওয়া সম্ভব নয়, আর পেলেও ততোটুকুমাত্র, যতোটুকু প্রাকৃতিক বিধানের অধীন সম্ভব। কখনও এরূপ হয়ে থাকে যে, কোনো একটি নৈতিক কাজ এর স্বাভাবিক পরিণতি স্বরূপ একটি বিশেষ ফলের সম্ভাবনাময় হওয়া সত্ত্বেও প্রাকৃতিক বিধানের সংমিশ্রণে এর ফল সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ হয়ে যায়। মানুষ নিজেই তাদের তামাদ্দুনিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের কার্যকলাপসমূহের এক বাঁধা-ধরা ফল প্রাপ্তির যৎসামান্য চেষ্টা করেছে। কিন্তু এ চেষ্টা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং বিরাট ক্রটিপূর্ণ। একদিকে প্রাকৃতিক বিধান এ চেষ্টাকে সীমাবদ্ধ এবং ক্রটিপূর্ণ করে রেখেছে এবং অপরদিকে মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতাসমূহ এ ক্রটিকে আরও বৃদ্ধি করে দিয়েছে।

আমি আমার বক্তব্য কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে পরিষ্কার করতে চাই। এক ব্যক্তি যদি অন্য এক ব্যক্তির শত্রুতা করে এবং তার ঘরে অগ্নিসংযোগ করে, তবে তার ঘর জ্বলে যাবে, এটা এ কাজের প্রাকৃতিক পরিণতি। এর নৈতিক ফল স্বরূপ অগ্নি সংযোগকারীর সেই পরিমাণ শাস্তি পাওয়া উচিত, যে পরিমাণ ক্ষতি উক্ত পরিবারটির হয়েছে। কিন্তু এ ফল প্রকাশিত হওয়া কয়েকটি শর্তের উপর নির্ভরশীল। যথা অগ্নি সংযোগকারীর সন্ধান পাওয়া, তাকে গ্রেফতার করতে পুলিশের সক্ষম হওয়া, তার অপরাধ প্রমাণিত হওয়া, আদালতের পক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও তাদের পরবর্তী বংশধরদের ক্ষতির সঠিক হিসাব নির্ধারণ সম্ভব হওয়া এবং ন্যায়পরায়ণতার সাথে তাকে ঠিক পরিমাণ মতো দণ্ড দান করা। এ সমস্ত শর্তের কোনো একটিও পূরণ না হলে হয় নৈতিক ফল আদৌ প্রকাশিত হবে না ; আর না হয় তা খুবই সামান্য প্রকাশিত হবে। এমনও হবার সম্ভবনা আছে যে, নিজের শত্রুকে সমূলে ধ্বংস করে সেই ব্যক্তি দুনিয়াতে পরম সুখে বর্ধিত ও প্রতিপালিত হতে থাকবে।

এটা থেকেও একটি বড় ধরনের উদাহরণ নেয়া যাক। মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক নিজেদের জাতির উপর প্রভাব বিস্তার করে বসে এবং সমগ্র জাতি তাদের নির্দেশানুসারে চলতে থাকে। এ অবস্থার সুবিধা গ্রহণ করে তারা জনমনে উৎকট জাতিপূজার রোগ ও সাম্রাজ্যবাদের তীব্র আকাঙ্খা জাগ্রত করে এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ জাতিসমূহের সাথে যুদ্ধ বাঁধায় ফলে লক্ষ লক্ষ লোক নিহত হয়। সমগ্র দেশ ধ্বংসের কবলে পতিত হয় এবং এর প্রভাব পরবর্তী কয়েক পুরুষ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এ মুষ্টিমেয় লোক যে বিরাট অপরাধে অপরাধী তার যথাযোগ্য ও ন্যায়সংগত শাস্তি এ পার্থিব জীবনে তার পাবে বলে মনে করা যায় কি? যদি তাদের দেহের গোশতসমূহ চেঁছে ফেলা যায় কিংবা জীবন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা যায়। অথবা মানুষের সাধ্যানুযায়ী অন্য কোনো কঠিনতম শাস্তিও দেয়া হয়, তথাপি কোটি কোটি মানুষ এবং তাদের বংশধরদের যে অনিষ্ট সাধন তারা

করেছে তার তুলনায় প্রদত্ত শাস্তি অতি নগণ্যই হবে। বস্তুত বর্তমান জগত যে প্রাকৃতিক বিধানের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে এতে উপরোক্ত অপরাধের যোগ্য শাস্তিদানের কোনোই উপায় নেই।

পক্ষান্তরে ঐ সমস্ত লোকের কথাও চিন্তা করুন, যারা মানব গোষ্ঠীকে সত্য এবং ন্যায়ের শিক্ষাদান করেছেন, জীবন যাপনের উজ্জ্বল পথপ্রদর্শন করেছেন, যাদের দানে অসংখ্য মানুষ পুরুষানুক্রমে কল্যাণ লাভ করে আসছে এবং আরও পরবর্তী কতো শতাব্দী পর্যন্ত লাভ করবে তার ইয়ত্তা নেই। এ মহৎ ব্যক্তিগণ তাদের কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল কি এ পার্থিব জীবনে লাভ করতে পারবে? আপনি কি ধারণা করতে পারেন যে, বর্তমান প্রাকৃতিক বিধানের অধীন এক ব্যক্তি তার এমন সমস্ত কাজের পূর্ণ প্রতিফল লাভ করতে পারে–যার প্রতিক্রিয়া তার মৃত্যুর পরও শত সহস্র বছর পর্যন্ত স্থায়ী থাকে এবং অসংখ্য মানুষকে পরিব্যাপ্ত করে নেয়।
উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, প্রথমত বিশ্বের বর্তমান ব্যবস্থা যে বিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তাতে মানুষের নৈতিক কার্যকলাপের পূর্ণ ফল লাভ করবার কোনোই অবকাশ নেই। দ্বিতীয়ত এখানকার স্বল্পকালীন জীবনে মানুষ যে সমস্ত কাজ করে থাকে তার প্রতিফল এতো সুদূর প্রসারী এবং দীর্ঘস্থায়ী যে, তা সঠিকভাবে ভোগ করবার জন্য তার হাজার হাজার বরং লক্ষ লক্ষ বছর দীর্ঘায়ুর প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমান প্রাকৃতিক বিধানের অধীন মানুষের এতো দীর্ঘায়ূ হওয়াও সম্ভব নয়। এ আলোচনা থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, মানব সত্তার মৃত্তিক আংগিক ও জৈবিক উপাদানসমূহের জন্য বর্তমান প্রাকৃতিক বিশ্বের স্বাভাবিক বিধানসমূহই যথেষ্ট ; কিন্তু নৈতিক দিকের জন্য এ দুনিয়ার জীবন মোটেই যথেষ্ট নয়। এর জন্য এমন একটি বিশ্বজনীন ব্যবস্থার প্রয়োজন, যেখানে নৈতিক বিধানই হবে প্রভাবশীল ও ভিত্তিগত বিধান এবং প্রাকৃতিক বিধান এর অধীনে থেকে সহায়ক হিসাবে কাজ করবে।

সেখানে জীবন সীমাবদ্ধ না হয়ে অসীম হবে এবং এখানে অপ্রকাশিত বা বিপরীত রূপে প্রকাশিত যাবতীয় নৈতিক ফলাফল সেখানে ঠিকভাবে প্রকাশিত হবে। সেখানে সোনা ও রূপার স্থলে সততা ও সত্যবাদিতার মূল্য ওজন হবে। সেখানে অগ্নি শুধু তাকেই দগ্ধ করবে, নৈতিক কারণে যার দগ্ধ হওয়া উচিত।

সেই স্থান সৎলোকদের জন্য সুখময় এবং অসৎলোকদের জন্য দুঃখময় হবে। বুদ্ধিমত্তা ও প্রকৃতি নি:সন্দেহে এ ধরনের একটি জগত ব্যবস্থার দাবি করে।

বুদ্ধিমত্তা আমাদেরকে 'হওয়া উচিত' পর্যন্ত পৌছিয়ে দিয়েই তার কর্তব্য শেষ করে। এখন প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের কোনো জগত আছে কিনা সেই সম্পর্কে আমাদের বুদ্ধি ও বিদ্যা উভয়ই কোনো চূড়ান্ত রায় প্রদান করতে সমর্থ নয়। এ ব্যাপারে একমাত্র পবিত্র কুরআনই আমাদের সাহায্য করে। তার ঘোষণা এই

যে, তোমাদের বুদ্ধিমত্তা ও প্রকৃতি যে জিনিসের দাবি করে, প্রকৃতপক্ষে হবেও তাই। বর্তমান প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা পরিচালিত জগত একদিন শেষ হয়ে যাবে এবং এক ভিন্ন ধরনের জগত ব্যবস্থা স্থাপিত হবে যার অধীন আসমান-যমীন এবং সকল জিনিসই ভিন্নরূপ ধারণ করবে।

অতপর সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত যতো মানুষ দুনিয়াতে জন্ম লাভ করেছে তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে এবং একই সময় সকলকে আল্লাহ তাআলার সামনে হাজির করা হবে। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক জীব এবং সমগ্র মানব গোষ্ঠীর পূর্ণ কার্যকলাপের রেকর্ড ভুল-ত্রুটি বিহীন অবস্থায় পেশ করা হবে।

প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিটি কাজে যা এবং যতোটুকু প্রতিক্রিয়া এ দুনিয়াতে দেখা দিয়েছে তার পূর্ণ বিবরণী মওজুদ থাকবে। এসব কার্যকলাপের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মহল-ই সাক্ষীর কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান হবে। মানুষের কথা এবং কাজ দ্বারা যাদের উপর সামান্যতম আঁচড়ও লেগেছে, তারাও স্ব স্ব তালিকা পেশ করবে। মানুষ তার নিজের হাত, পা, চোখ ও অন্যান্য অংগ-প্রত্যংগকে কোন্ ধরনের কাজে ব্যবহার করেছিলো এরা তার সাক্ষ্য দান করবে। অত:পর সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক এই কার্যবিবরণীর প্রতি পূর্ণ ন্যায়পরায়ণ দৃষ্টি রেখে তাঁর রায় দান করবেন। তাতে কে কি পরিমাণ পুরষ্কার বা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য তার ঘোষণা করবেন। এ পুরষ্কার বা শাস্তির ব্যপ্তি এতো বিশাল হবে যে, বর্তমান সীমাবদ্ধ দুনিয়ার মাপকাঠি অনুসারে তার অনুমান করা অসম্ভব। সেখানে সময় ও স্থানের মাপকাঠি ভিন্ন ধরনের এবং প্রাকৃতিক বিধানও অন্য প্রকারের হবে। এখানে যাদের কৃত সৎকর্মসমূহ থেকে অন্যান্য মানুষ হাজার হাজার বছর পর্যন্ত কল্যাণ লাভ করেছে, সেখানে তারা তার পূর্ণ ফল ভোগ করার সুযোগ পাবে, মৃত্যু, রোগ এবং বার্ধক্য তাদের সুখ হরণ করতে পারবে না। অনুরূপভাবে যাদের দুষ্কর্মের দরুন এ দুনিয়ার অসংখ্য মানুষ শত-সহস্র বছর যাবত যন্ত্রণা ভোগ করেছে, তারাও সেখাকে কৃত অপরাদের শাস্তি পূর্ণমাত্রায় ভোগ করবে। মৃত্যু কিংবা সংজ্ঞাহীনতা তাদেরকে শাস্তি ভোগ করা থেকে বাঁচাতে পারবে না।

এমন এক জীবন ও জগতের সম্ভবনা যারা অস্বীকার করে তাদের চিন্তাশক্তির সংকীর্ণতার জন্য আমার দুঃখ হয়। যদি আমাদের বর্তমান বিশ্বের পক্ষে বর্তমান প্রাকৃতিক বিধান সহকারে আমাদের সামনে মওজুদ থাকা সম্ভব হয়ে থাকে, তবে এরপরে অপর একটি জগত অন্য ধরনের বিধান সহকারে অস্তিত্বশীল হওয়া অসম্ভব হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে? অবশ্য এ সম্পর্কে নিশ্চয়তা দানের জন্য কোনো বাস্তব প্রমাণ পেশ করা সম্ভব নয়। তার জন্য গায়েবের (অদৃশ্য) প্রতি বিশ্বাস থাকা একান্ত আবশ্যক।

◆◆◆

২

শান্তি পথ

আল্লাহ্ তায়ালার অস্তিত্ব

যদি আপনাদের কাউকে খবর দেয়া হয় যে, অমুক বাজারের অমুক স্থানে এমন একটি দোকান আছে যার মালিক, রক্ষক, ক্রয়-বিক্রয়কারী এবং টাকা-পয়সা উসুলকারী কেউ নেই, অথচ উক্ত দোকানের রক্ষণাবেক্ষণ, ক্রয়-বিক্রয় ও টাকা-পয়সা আদান-প্রদান ইত্যাদি যাবতীয় কাজ আপনা আপনিই যথারীতি সম্পন্ন হচ্ছে তখন আপনাদের কেউ এ অদ্ভুত ধরনের কথাটি বিশ্বাস করতে পারেন কি? অথবা কেউ যদি বলে যে, এ শহরে এমন একটি কারখানা আছে, যার মালিক বলতে কেউ নাই, ইঞ্জিনিয়ার বা মিস্ত্রিও তথায় দরকার হয় না, বরং কারখানাটি উক্ত স্থানে নিজে নিজেই বিদ্যমান ; প্রত্যেকটি মেশিনও নিজ হতেই গঠিত, মেশিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলো আবশ্যক অনুযায়ী স্ব-স্ব স্থানে নিজে নিজেই লেগে যায় ; তারপর মেশিনও আপনা হতেই চলতে থাকে এবং তা হতে বহু আশ্চর্য ধরনের নুতন নুতন জিনিসও বের হতে থাকে তখন আপনারা এ খবরটিকে সত্যরূপে গ্রহণ করতে পারবেন কি? আমি জানি, নিশ্চয়ই আপনারা এ ধরনের সংবাদকে এক ফুঁৎকারে উড়িয়ে দিবেন এবং সংবাদবাহককে পাগল বলে বিদ্রূপ করবেন। অনুরূপভাবে আমাদের চোখের সামনে প্রজ্জ্বলিত বিজলী বাতিগুলো সম্বন্ধে যদি কেউ বলে যে, এই বৈদ্যুতিক লাইটগুলো যথাসময়ে আপন হতে জ্বলে উঠে ও নিভে যায়, তখন আপনারা একথাটি সত্য বলে মনে করতে পারেন কি? তদ্রুপ যে বস্ত্র আমরা পরিধান করি, যে চেয়ারে আমরা বসি এবং যে ঘরে আমরা বসবাস করি ; উক্ত বস্ত্র, চেয়ার ও থাকার ঘর আপনা হতে তৈরি হওয়ার সংবাদ কোনো নামজাদা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের মুখে শ্রবণ করলেও আপনারা তা কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না।

উল্লেখিত ঘটনাবলী দ্বারা এমন কতগুলো জিনিসের উদাহরণ আপনাদের সামনে পেশ করা হলো, যা আপনারা দৈনন্দিন কাজের ভিতর দিয়েই দেখে আসছেন। যদি একটি মামুলি দোকান-কারখানার অস্তিত্ব মালিক ও নির্মাণকারীর প্রচেষ্টা ছাড়া গড়ে উঠা সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়, তবে আকাশ ও পৃথিবীর এই বিরাট কারখানা যেখানে চন্দ্র-সূর্য ও অগণিত তারকারাজি বিদ্যমান এবং যেখানে সমুদ্রের বাষ্প

উপরে উঠে ঠাণ্ডা হাওয়ার সাহায্যে মেঘমালায় পরিণত হয় এবং পরে তা বৃষ্টিরূপে ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয়ে শুষ্ক ও মৃত জমিকে সরস সজীব করে তোলে, তারপর নানা রঙের নানা বর্ণের নুতন নুতন ফুলে ফলে এই দুনিয়াকে সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী করে মানব জাতির জীবন ধারণের মান বৃদ্ধি করে, তার প্রকাণ্ড ও বিস্ময়কর অস্তিত্ব আপনা হতে গড়ে উঠা কিরূপে সম্ভব হতে পারে? তাই আপনাদের একথা স্বীকার করতে হবে যে, এ বিরাট কারখানাটির অস্তিত্বের পিছনে কোনো এক কুদরতী হাতের কার্যকরী ইঙ্গিত অবশ্যই লুকিয়ে রয়েছে।

মানব দেহ গঠনের উপাদানগুলো বিশ্লেষণ করে বৈজ্ঞানিকগণ দেখতে পেয়েছেন যে, শরীরে কিছু পরিমাণ লৌহ, গন্ধক, কয়লা, ক্যালসিয়াম লবণ ইত্যাদি বিদ্যমান আছে। উল্লেখিত জিনিসগুলোর প্রত্যেকটি যথাপরিমাণে গ্রহণ করে যদি কোনো ব্যক্তি মানুষ সৃষ্টির চেষ্টায় যত্নবান হয়, তবে সে উক্ত কাজে কখনো কৃতকার্য হতে পারবে কি? আপনারা নিশ্চয়ই স্পষ্ট ভাষায় উত্তর দিবেন কিছুতেই নয়। যদি তা আপনাদের শেষ সিদ্ধান্ত হয়, তবে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, চলনশক্তি এবং রকমারি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার শক্তিসম্পন্ন, সুন্দর, সুগঠিত মানুষ সৃষ্টির পিছনে কোনো এক শক্তিশালী মহাজ্ঞানী সুনিপুণ ও সুবিজ্ঞ হাকিমের হেকমতি ইঙ্গিত বিদ্যমান থাকার স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আমাদের জন্য যুক্তি ও বিজ্ঞানের দিক দিয়েও খুব সহজ হয়ে দাঁড়ায়।

মাতৃগর্ভস্থ ক্ষুদ্র ফ্যাক্টরীতে সন্তান জন্ম হওয়ার নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে আপনারা কখনও চিন্তা করে দেখেছেন কি? সন্তান জন্মানোর পিছনে মাতা-পিতার তদবিরের কোনো প্রভাব বাস্তবিক পক্ষেই নেই। রেহেম বা মাতৃগর্ভস্থ ছোট থলিটিতে কিভাবে, কার কুদরতী হাতের ইশারায় স্বামী-স্ত্রীর সহবাসের পর দুটি অতীব ক্ষুদ্র কীট যা অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারাও দেখা কষ্টসাধ্য মাতৃগর্ভে পরস্পরে মিলিত হয় এবং অলৌকিকভাবে মাতার রক্ত তার খাদ্যরূপে নির্ধারিত করা হয়, তারপর ,উল্লেখিত লোহা, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি নির্জীব পদার্থ নির্দিষ্ট পরিমাণে তথায় একত্রিত হয়ে ধীরে ধীরে একটি গোশতের টুকরার সৃষ্টি হয় এবং অভিনবরূপে তা বাড়তে থাকে। অতপর উক্ত টুকরার যথাস্থানে হাত, কান, নাক, জিহ্বা, মস্তক ও মস্তিস্ক এবং শরীরের অন্যান্য অংগ-প্রত্যংগ স্থাপন করা হয়। পরে ঐ নবগঠিত দেহে প্রাণের সঞ্চার করা হয় এবং মাতৃগর্ভস্থ শিশু আশ্চর্যরূপে মাতৃরক্তে লালিত হতে থাকে। তারপর উক্ত শিশুর কানে শ্রবণশক্তি, চোখে দৃষ্টিশক্তি, নাক দিয়ে নিঃশ্বাস গ্রহণের শক্তি ও অন্তরে অনুভব করার শক্তি এবং অন্যান্য যাবতীয় শক্তি প্রদান করে কোমল দেহটিকে সর্বাংগীন সুন্দরভাবে গঠন করে তোলা হয়। উপরোক্ত কার্যাবলী সমাধানের যে পরিমাণ সময় আবশ্যক, তা অতিবাহিত হওয়ার পর হঠাৎ একদিন মাতৃগর্ভস্থ সেই ছোট ফ্যাক্টরী উক্ত সন্তানকে প্রসব বেদনার সাহায্যে বাইরে নিক্ষেপ করে। এমনিভাবে অগণিত

সন্তান উক্ত ফ্যাক্টরীর ক্ষুদ্র স্থান হতে এ বিরাট ও প্রশস্ত দুনিয়ায় আগমন করছে। তবে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সকল মানব সন্তানের দৈহিক গঠনে, মনের চিন্তাধারায়, অভ্যাসে ও যোগ্যতা প্রদর্শনে এবং অন্যান্য যাবতীয় ব্যাপারে একের সাথে অন্যের বিরাট ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়, এমনকি মাতৃগর্ভস্থ দুই সহোদরের মধ্যেও কার্যক্ষেত্র, স্বভাব-প্রকৃতি এবং অন্যান্য দিক দিয়ে বহু পরিমাণে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। মানব সন্তান সৃষ্টির উল্লেখিত তথ্যপূর্ণ লিলাসমূহ অবলোকন করার পরেও যদি কোনো ব্যক্তি বলতে সাহস পায় যে, এর পশ্চাতে কোনো শক্তিশালী, মহাজ্ঞানী, সুনিপুণ কারিগরের কারিগরি বিদ্যমান নেই, তবে আমরা উক্ত ব্যক্তিকে নির্বোধ এবং তত্ত্বপূর্ণ আলোচনার সারমর্ম গ্রহণে অক্ষম বলতে বাধ্য হবো।

একত্ববাদ

আমাদের বিবেক নি:সন্দেহে এ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, এ দুনিয়ায় ছোট-বড় যে কোনো কাজ সম্পাদনের দায়িত্বভার দুজনের হাতে অর্পণ করে আদৌ কোনো সুফল পাওয়া যায় না ; তাই একই মাদ্রাসা বা স্কুলে দু' প্রধান শিক্ষক, একদল সৈন্যের দু'জন সেনাপতি এবং একই রাজত্বে দু' রাজার কর্তৃত্ব পরিচালনার সংবাদ আমাদের গোচরীভূত হয় না এবং স্বভাবত তাহা হতেও পারে না। আমাদের জীবন পথের ছোট-খাট ব্যাপারের মধ্য দিয়েও আমরা এই অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সক্ষম হই যে, সুশৃংখলার সাথে কোনো একটি কাজ সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে তার দায়িত্বভার একজনের হাতেই অর্পণ করা আবশ্যক।

উল্লেখিত সরল ও সোজা কথাটিকে স্মৃতিপটে জাগরূক রেখে একবার বিস্তৃত সৃষ্টিলোক, এ জমি যাতে আমরা বসবাস করি, এ চন্দ্র যা রাতের বেলা আমাদের দৃষ্টিপথে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়, এ সূর্য যা প্রতিদিন উদয় হয় ও অস্ত যায়, এ অগণিত তারকারাজি যা ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আকাশে পরিদৃশ্যমান হয়, এই সমস্তের ঘূর্ণনের মধ্যে একটি সুশৃংখলিত নীতি বিদ্যমান রয়েছে। তাই রাত বা দিনের আগমন কখনো আপন আপন নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে দৃষ্ট হয় না। চাঁদ কখনো পৃথিবীর সাথে ধাক্কা খায় না। সূর্য কখনো আপন গন্তব্য পথ ছেড়ে এক কদমও এদিক ওদিক যায় না। এ অসংখ্য ভ্রাম্যমাণ তারকারাজি যার মধ্যকার কোনো কোনো তারকা আমাদের এই পৃথিবী অপেক্ষা বহুগুণে বড় প্রত্যেকটি ঘড়ির যন্ত্রপাতির ন্যায় এক বিরাট শৃংখলায় আবদ্ধ এবং এক নির্ধারিত ব্যবস্থানুযায়ী আপন নির্দিষ্ট পথে গতিশীল। কেউ আপন পথ হতে এক চুল পরিমাণও টলতে সমর্থ নয়। এসবের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের ভিতর সামান্য পরিমাণ ব্যতিক্রম ঘটলে এ পৃথিবীর সমস্ত কারখানায়ই উলট-পালট হতে বাধ্য এবং অসাবধানতা বা অনিয়মতার ফল স্বরূপ ট্রেনের সংঘর্ষের ন্যায় ভ্রাম্যমাণ তারকারাজিতেও বিরাট সংঘর্ষের সৃষ্টি হতো।

এই তো গেলো আকাশ রাজ্যের কথা। এখন একবার এ পৃথিবী ও আমাদের আপন অস্তিত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। এ ধূলির ধরায় আমাদের জীবন ধারণের সব বিচিত্র কর্মকাণ্ড ও কতকগুলি বিধি ব্যবস্থার সীমার মধ্যে আবদ্ধ। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রত্যেক জিনিসকে আপন সীমায় বেঁধে রেখেছে। উক্ত শক্তির অভাবে মুহূর্তের মধ্যে সৃষ্টির সমস্ত কলকারখানা নষ্ট হয়ে যাবে। এ কারখানার প্রত্যেকটি কল-কবজা বিশেষ শৃংখলার ভিতর দিয়েই আপন কর্তব্য সম্পাদন করছে। বাতাস আপন কর্তব্য কর্মে অবিরাম নিযুক্ত রয়েছে। পানিও তার নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করছে। আলোর করণীয় কাজও যথারীতি সম্পন্ন হচ্ছে। এভাবে বছরের ঋতুগুলোও আপন আপন কতর্ব্য প্রতিপালনে রত। মাটি, পাথর, বিদ্যুৎ, বাষ্প, গাছ ও জন্তু-জানোয়ার ইত্যাদি কারো নিজ সীমার বাইরে চলার শক্তি নেই।

এ কারখানার প্রত্যেক যন্ত্রই নিজের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে একে অন্যের সাথে মিলিতভাবে কাজ করছে এবং এ বিশ্বের সবকিছুর অস্তিত্বের পশ্চাতে উক্ত সম্মিলিত চেষ্টার ফল বিদ্যমান রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ একটি ক্ষুদ্র বীজকে গ্রহণ করুন। তা আমরা জমিতে বপন করি। উক্ত বীজ কখনো একদিনে বিরাট গাছে পরিণত হয় না, বরং আকাশ ও পৃথিবীর সম্মিলিত শক্তি এর পিছনে রয়েছে। ভূমি একে আদ্রতা ও উর্বরতার দিক দিয়ে সাহায্য প্রদান করছে। সূর্য এটাকে আলো-তাপ দিচ্ছে, পানি, বাতাস এবং রাত ও দিন একে সম্পূর্ণ জরুরি সাহায্য দান করছে। এ বিশেষ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বহুদিন, মাস, বছর ও কাল অতিবাহিত হওয়ার পর উল্লেখিত ক্ষুদ্র বীজটি এক বিরাট ফলন্ত গাছে পরিণত হয়। আমাদের জীবন ধারণের সহায়ক অগণিত ফসল ও ফল-মূল প্রাপ্তির পিছনে বহু শক্তির সম্মিলিত চেষ্টা নিহিত রয়েছে। অনুরূপভাবে আমাদের বেঁচে থাকার পিছনেও আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় শক্তির সম্মিলিত চেষ্টার ফল বিদ্যমান। কেবলমাত্র বাতাসও যদি উক্ত শক্তিসমূহ হতে বিলীন হয়, তবে আমরা মুহূর্তের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে যাবো ; যদি বাতাস ও উত্তাপের সাথে পানি সম্মিলিতভাবে কাজে যোগদান না করে, তবে আমরা এক ফোঁটা বৃষ্টিও লাভ করতে পারি না। মাটি ও পানির মিলিত চেষ্টা না হলে আমাদের বাগান শুকিয়ে যাবে, কৃষি কাজ বন্ধ হবে এবং থাকার ঘর নির্মিত হতে পারবে না। বারুদের ঘর্ষণ দ্বারা দিয়াশলাইয়ের কাঠি হতে আগুন সৃষ্টি না হলে আমাদের উনান জ্বলবে না এবং বহু কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। লোহা ও আগুন সংমিশ্রণ ভিন্ন একখানা ছোট চাকু পর্যন্ত নির্মাণ করা অসম্ভব। মোটকথা এ বিরাট বিশ্ব শুধু এজন্যই টিকে আছে যে, এ সুবৃহৎ রাজত্বের প্রত্যেকটি বিভাগ বিশেষ শৃংখলার সাথে অন্য বিভাগের সাথে মিলিত হয়ে আপন কর্তৃব্য কাজ সম্পাদন করছে ; কোনো বিভাগের কোনো কর্মীর এমন কোনো শক্তি নেই, যার দ্বারা সে আপন কর্তব্য কাজে অলসতা প্রদর্শন করতে পারে বা সম্মিলিতভাবে কাজ সমাধার পথে বিঘ্ন ঘটাতে পারে।

আমার উল্লেখিত কথায় বিশ্ব-প্রকৃতির স্বাভাবিক অবস্থার একটা বর্ণনা প্রদান করা হলো। অতিরঞ্জিত বিষয় বা মিথ্যার কোনো আশ্রয় এখানে গ্রহণ করা হয়নি। আশা করি এ সম্পর্কে আপনারা আমার সাথে একমত হবেন। অতপর আমার জিজ্ঞাসা এই যে, এ বৃহৎ শৃংখলাও এ বিস্ময়কর উন্নত শক্তির মধ্যে এতো সুন্দর সামঞ্জস্যের যথার্থ কারণ কি থাকতে পারে? লক্ষ লক্ষ বছর ধরে সৃষ্টির অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে, হাজার হাজার যুগ ধরে যমীনের উপর উদ্ভিদ ও প্রাণীর উৎপত্তি হচ্ছে, তারপর পৃথিবীর বুকে দেখা দিয়েছে মানুষ জাতির অস্তিত্ব, তাও বহু যুগযুগান্তরের কথা। কিন্তু এ সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে চাঁদ কখনো আকাশের বক্ষ হতে ভূমিতে পতিত হয়নি, সূর্য ও পৃথিবীতে কখনো সংঘর্ষ বাঁধেনি, রাত দিন কখনো আপন সীমা অতিক্রম করে পরস্পর মিলিত হয়ে যায়নি। বাতাস ও পানিতে কখনো ঝগড়া বাঁধেনি। পানি ও মাটির পারস্পরিক সম্পর্কও নষ্ট হয়নি, উত্তাপ ও অগ্নির আত্মীয়তায়ও কোনো প্রকার বিঘ্ন ঘটেনি। এখন গভীরভাবে চিন্তা করা আবশ্যক যে, এ রাজত্বের প্রতিটি বিভাগ ও ক্ষেত্র এতোটা সুশৃংখলিত ও সুনিয়ন্ত্রিত কেন? কেন এখানে কোনো প্রকার বিপর্যয় সৃষ্টি হয়নি? উত্তরে আপনার ভিতরকার মানুষটি নিঃসন্দেহে বলে উঠবে যে, উপরোক্ত সমস্ত কারখানার স্রষ্টা ও অধিকারী হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। এ এক আল্লাহর আদেশই সকলের উপর কাজ করছে এবং এ বিরাট শক্তি সমস্ত কিছুকে এক শৃংখলায় বেঁধে রেখেছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, বহু খোদা তো দূরের কথা মাত্র দুই খোদা হলেও শৃংখলাপূর্ণ ব্যবস্থাপনা ও নিয়ম-শৃংখলা কখনো ঠিক থাকতো না থাকতে পারতো না। কারণ, সামান্য একটি মাদ্রাসা বা স্কুল পরিচালনার ভার দুই হেড মাওলানা বা দুই হেড মাষ্টারের হাতে অর্পণ করে যখন সুফল পাওয়া যায় না, তখন আকাশ ও পৃথিবীর এই বিশাল রাজত্ব কি করে দুই আল্লাহ্র কর্তৃত্বে পরিচালিত হতে পারে?

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রকৃত অবস্থা এই জানা যায় যে, এ বিরাট বিশ্বের অস্তিত্ব কখনো আপনা হতে গড়ে উঠেনি, বরং এর পেছনে রয়েছে এক স্রষ্টা যিনি এক ও অদ্বিতীয়, মহাশক্তিশালী সুবিচারক। তাঁর শাসন যমীন হতে আসমান পর্যন্ত বিস্তৃত। সৃষ্টির প্রত্যেকটি জিনিস তাঁর আদেশের অনুগত, মানব জাতির জীবন ধারণ ও তার উপাদানসমূহ একমাত্র তাঁর হাতেই নিবদ্ধ। বিশ্বের এ সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা পরিস্কাররূপে এ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, দুই শাসনকর্তার হুকুম ও শাসন এখানে কখনো চলতে পারে না। কারণ একাধিক শক্তির কর্তৃত্ব ও অধিকার অনিবার্যরূপে যেখানে সেখানে বিশৃংখলা ও ঝগড়ার সৃষ্টি করে থাকে। আবার শাসন পরিচালনার জন্য শুধু শক্তিই যথেষ্ট নয়, গভীর জ্ঞান ও প্রশস্ত দৃষ্টিরও বিশেষ আবশ্যকতা রয়েছে। এর দ্বারাই সৃষ্টির বিভিন্ন বিভাগের যাবতীয় উন্নতির চিন্তা খুব অল্প সময়ের মধ্যে সমাধান করে শাসনকার্য পরিচালনা করা হয়। যদি

সর্বশক্তিমান এক আল্লাহ ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু স্রষ্টা হতো এবং এ দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে ও বিভিন্ন কাজে এদের স্বাধীনতা থাকতো, তাহলে আকাশ ও পৃথিবীর এ বিরাট কারখানা নিশ্চিতরূপে অচল হয়ে পড়তো। কারণ, আপনারা জানেন যে, একটি মামুলি মেশিন পরিচালনার ভার সুনিপুণ মিস্ত্রি বা ইঞ্জিনিয়ারের হাতে অর্পণ না করলে কখনো সুফল পাওয়া যায় না যেতে পারে না। তাই আমাদের বিবেক স্বভাবতই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, বিশ্বরাজ্যের এ নিখুঁত ও সুনিয়ন্ত্রিত পরিচালনার মালিক ও বাদশাহ হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা তাঁর কাজে কোনো অংশীদার নেই।

উল্লেখিত কথার দলিল স্বরূপ আরো বহু অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়। তবে প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ তাআলার রাজত্বে তিনি ভিন্ন কারো কর্তৃত্ব চালানোর কোনো যুক্তি থাকতে পারে না। কেননা যে সৃষ্টির অস্তিত্ব আল্লাহর কুদরতি ইঙ্গিতে গড়ে উঠেছে ও বজায় রয়েছে এবং যার সাহায্য ও দান ভিন্ন একটি মুহূর্তের জন্য সে চলতে অক্ষম, সে সৃষ্টির কোনো বস্তু বা ব্যক্তি কি আল্লাহর কর্তৃত্বে কোনোরূপ অংশীদার হতে পারে? আপনারা কখনো কোনো চাকরকে প্রভুত্ব খাটানোর ব্যাপারে আপন প্রভুর শরীক হতে দেখেছেন কি? ক্রীতদাস বা বেতনভোগী চাকরকে মালিক বা মনিব কখনো তাঁর সম্পত্তি ও স্বাধীনতার অংশীদার করেন কি? উপরোক্ত কথার সারমর্ম উপলব্ধি করার পর একটু চিন্তা করলে আপনাদের বিবেক অনায়াসে এ সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহর এ রাজ্যে তাঁর বর্ণিত মত ও পথ ভিন্ন কেউ অন্য কোনো স্বাধীন মত পোষণ ও প্রকাশ করার ন্যায়ত কোনো অধিকার রাখে না। এতদসত্ত্বেও যদি কেউ বেপরোয়াভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসে, তবে তা হবে প্রাকৃতিক নিয়ম, বাস্তবতার জ্ঞান ও সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ।

মানবজাতির ধ্বংসের মূল কারণ

উপরে বাস্তব সত্যের যে বর্ণনা দেয়া হলো, তার মধ্যেই সমগ্র জগতের নিগূঢ় রহস্য রয়েছে। অতপর অনুধাবন করার বিষয় এই যে, আমরা ও আমাদের অস্তিত্ব বিশ্বসৃষ্টির বহির্ভূত কিছুই নয় বরং আমরা এ বিরাট সৃষ্টির সামান্য অংশ মাত্র। তাই আমাদের জীবন ধারণেও বর্ণিত নিয়মাবলীর প্রকাশ্য প্রভাব স্বভাবতই বিদ্যমান থাকতে বাধ্য।

আজ আমাদের প্রত্যেকের মনে একটি জটিল প্রশ্ন অতিশয় তীব্রভাবে বারবার জাগ্রত হচ্ছে। তা এই যে, শান্তি কোথায়? মানব জীবন আজ সকল প্রকার শান্তি হতে বঞ্চিত হলো কেন? কেন আজ জাতিতে জাতিতে বিবাদ, রাজায় রাজায় ঘোর মনোমালিন্য, সবলের উৎপীড়ন ও নির্যাতনে দুর্বল আজ দুর্দশাগ্রস্ত ও নাজেহাল। বন্ধুত্ব বিশ্বাসঘাতকতায় পরিপূর্ণ, আর আমানতদারীর পরিবর্তে

খেয়ানতের এতোটা প্রাবল্য কেন? কেন মানুষের প্রতি মানুষ আস্থাহীন, ধর্মের নামে ধর্ম-ধ্বংসের বিরাট কারসাজিই বা কেন? একই আদমের সন্তান হাজার গোত্রে বিভক্ত, এক গোত্রের সাথে অন্য গোত্রের ভয়ানক বিবাদ-বিসম্বাদ, মানুষের ভয়ে মানুষ সন্ত্রস্ত। এমনিভাবে অগণিত অপকর্মে কেন আজ আমাদের সুখময় জীবনের যাত্রাপথ সকল দিক দিয়ে বিপদ-সংকুল হয়ে উঠেছে। আরও চিন্তা করার বিষয় এই যে, সৃষ্টিলোকের অন্য কোনো ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো প্রকার অশান্তি নেই, তারকারাজ্যে শান্তি বিদ্যমান, হাওয়ায় শান্তি, জলে শান্তি, স্থলে শান্তি এক কথায় মানুষ ছাড়া প্রাকৃতিক জগতের যে কোনো স্থানে শান্তি বিরাজমান ; শুধু মানুষই শান্তির সুশীতল ছায়া হতে বঞ্চিত। তাই মানব মনে আজ এটা এক জটিল সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর সমাধানের জন্য সমগ্র মানবজাতি অস্থির হয়ে উঠছে। আমি কিন্তু অতীব ধীরস্থিরভাবে উল্লেখিত জটিল প্রশ্নের সংক্ষেপে এ উত্তরই প্রদান করবো যে, মানুষ আজ তার শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের স্বভাবসিদ্ধ রীতিসমূহের বিরুদ্ধে চলতে গিয়েই পদে পদে অগণিত বিপদের সম্মুখীন হতে বাধ্য হয়েছে। আবার সে তার ভুল বুঝতে পেরে যখন আল্লাহর বিধানে বাধ্য হয়ে জীবনের যাত্রাপথ নির্ধারণে সচেষ্ট হবে, তখন তার হারানো শান্তি অবশ্যই ফিরে আসবে, অন্যথায় অশান্তি কখনো দূর হবে না, হতে পারে না। যেমন চলন্ত ট্রেনের দরজা ও তার পার্শ্ববর্তী রাস্তাকে যদি কেউ আপন ঘরের দরজা ও মেঝে মনে করে, তখন এ ভুল বুঝার জন্য ট্রেনের দরজা বা তৎপার্শ্ববর্তী রাস্তা কখনো তার থাকার ঘরের দরজা ও প্রাঙ্গণে পরিণত হবে না, পক্ষান্তরে, উল্লেখিত ভুল বুঝার শাস্তি স্বরুপ উক্ত অপচেষ্টাকারীর হয়তোবা পা ভাঙ্গবে, না হয় মাথা ফাটবে। এরপরও যদি উক্ত ব্যক্তি তার কৃতকর্মের ভুল বুঝতে সক্ষম না হয়, তবে ব্যাপারটা বড়ই দু:খজনক ও লজ্জাকর হয়ে দাঁড়াবে। এমনিভাবে যদি আপনাদের কেউ মনে করেন যে, এ বিশ্বের কোনো স্রষ্টা নেই বা মানুষই মানুষের স্রষ্টা, অথবা যদি কেউ আসল আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোনো নকল আল্লাহ মেনে বসে, তবে তার ভুল বুঝার দোষে আসল অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটবে না। বস্তুতপক্ষে এ বিশ্বের যথার্থ মালিক আল্লাহ তা'আলাই। তিনি চিরদিন আছেন ও থাকবেন এবং তাঁর বিশাল রাজত্বের সম্মুখে মানব সমাজ যে নগণ্য প্রজা ভিন্ন আর কিছুই নয় সে কথাটিও পুর্বের মতই অপরিবর্তনীয় থাকবে। তবে উল্লেখিত বাস্তব ব্যাপারসমূহকে অন্যরূপ ধারণা করার শাস্তি স্বরূপ আমাদেরকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অগণিত বাধা ও বিপদের সম্মুখীন হতে হবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

আমার উল্লেখিত কথাগুলোকে আবার নতুন করে অন্তরে স্থান দেয়ার নিবেদন জানিয়ে অতপর দ্বিতীয় কথা এই বলতে চাই যে, আল্লাহ তাআলা কারো মনগড়া খোদা নন, তাঁর কর্তৃত্ব আপনাদের মেনে নেয়ার প্রতি তিনি মুখাপেক্ষীও নন,

বরং তাঁর কর্তৃত্ব তদীয় আপন শক্তিতে বিদ্যমান। তিনিই এ বিশ্বের স্রষ্টা, আসমান-যমীন এবং চন্দ্র-সূর্য তাঁরই হুকুমে পরিচালিত, সৃষ্টির সমস্ত শক্তিই তাঁর মুখাপেক্ষী। আমাদের জীবন ও জীবন ধারণের সমস্ত সামগ্রী তাঁর প্রদত্ত জিনিসসমূহের অন্যতম এবং আমাদের অস্তিত্ব তাঁর কুদরাতের নমুনা স্বরূপ। এটাই হচ্ছে প্রকৃত ব্যাপার। আপনারা স্বীকার করুন আর না-ই করুন, এ প্রকৃত ব্যাপার কখনও অন্যরূপ ধারণ করতে পারে না। তবে প্রভেদ এই যে, আপনারা যদি এ স্বাভাবিক ও প্রকৃত সত্যকে জেনে নিয়ে এবং তা স্বীকার করে চরিত্র গঠনে সচেষ্ট হোন, তখন সৃষ্টি পরিচালনার জন্য স্রষ্টা কর্তৃক বর্ণিত ও স্বভাবসিদ্ধ আইন-কানুন মেনে নেয়ার দরুন আপনাদের জীবন সুখে শান্তিতে আনন্দে সফলতার সুনিশ্চিতরূপে ধন্য ও সার্থক হয়ে উঠবে। অন্যথায় চলন্ত ট্রেনের দরজাকে ঘরের দরজা মনে করে বাহরে পা রাখার দরুন কোনো নির্বোধ যাত্রীর অবস্থা যতোটা শোচনীয় হওয়া সম্ভব, আপনাদের অবস্থা ততোটা শোচনীয় ও লজ্জাষ্কর হতে বাধ্য।

এখন আপনারা হয়তো আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন যে, উল্লেখিত অবস্থানুযায়ী আমাদের বাস্তব স্বরূপ কি হতে পারে। তাই আমি সংক্ষেপে এর উত্তর প্রদান করছি। যদি আপনাদের কেউ বেতন ও খোরাকী দেয়ার শর্তে কোনো চাকর নিযুক্ত করেন তখন তার কর্তব্য কি হতে পারে? এটা নয় কি যে, সে আপনার হুকুম প্রতিপালন করবে, আপনার মর্জি অনুযায়ী প্রতিটি কাজ সম্পাদন করবে এবং এর মারফতেই চাকুরি ও আনুগত্যের প্রমাণ করবে। কেননা চাকরের কাজ চাকুরি ভিন্ন আর কি হতে পারে? আরও দেখুন, যদি আপনাদের কেহ সর্দার নেতা নিযুক্ত হন এবং তার অধীনে যদি কিছুসংখ্যক কর্মী থাকে, তবে সর্দারের আদেশানুযায়ী প্রত্যেক কাজ সমাধা করে তার প্রতি আনুগত্যের প্রমাণ দেয়া হবে তার কর্তব্য। অনুরূপভাবে আমাদের কেউ যদি কোনো সম্পত্তির মালিক হয়, তবে সে স্বভাবতই এটা চায় যে, উক্ত সম্পত্তির উপর যেনো তার ষোলআনা স্বার্থ ও ক্ষমতা বজায় থাকে, অথবা যদি কোনো রাজশক্তি আমাদের শাসক হয়, তখন বিনা বাক্যব্যয়ে বাদশাহী কানুন ও আদেশ মেনে চলার পথ নির্ধারণ করাই হবে আমাদের জন্য বুদ্ধিমানের কাজ। অন্যথায় বিদ্রোহী সেজে রাজ-কোপানলে পতিত হয়ে নিজেই নিজের দুঃখের কারণ সাব্যস্ত হতে হবে। উল্লেখিত উদাহরণ দ্বারা আপনি নিজেই উপলব্ধি করতে পারেন যে, আল্লাহর এ বিরাট রাজ্যে আপনাদের যথার্থ স্বরূপ কি হতে পারে। আল্লাহ-ই আপনাদের স্রষ্টা। কুদরাতের এমনি খেলা যে, আপনাদের কোনো কাজ তাঁর ইঙ্গিত ছাড়া সমাধা হয় না, আপনাদের লালন-পালন ও আহার্য বন্টন একমাত্র তাঁরই হাতে নিহিত। এক কথায় প্রত্যেক দিক দিয়ে তাঁর ও আপনাদের মধ্যে মনিব ও চাকরের সম্পর্ক বিদ্যমান। এ আকাশ ও পৃথিবী তাঁর সম্পত্তি এবং তাঁর সম্পত্তিতে তাঁরই হুকুম

ও বিধানের প্রভুত্ব ও প্রাধান্য চলবে। এখানে নিজেদের স্বাধীনতা চালাবার ন্যায়ত কোনো অধিকারই আপনাদের নেই। তাই বেপরোয়াভাবে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে চলার ইচ্ছা করলেই বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। আপনারা এখানে প্রজা ভিন্ন আর কিছু নন। প্রজাদের মধ্যে কারো একথা বলার শক্তি নেই যে, আমি গভর্নর, আমি ডিরেক্টর, আমি স্বতন্ত্র ইত্যাদি এমনকি পার্লামেন্ট বা এসেম্বলী দ্বারা ইচ্ছাধীন আইন পাশ করে আল্লাহর বান্দাগণকে এ আইন মানানোর জন্য চাপ দেয়ার কোনো অধিকারও এখানে কারো নেই। আসল বাদশাহের প্রজা হওয়া ভিন্ন নকল ও মিথ্যা বাদশাহের প্রজা হওয়া ও তার বানানো নকল আইন মেনে চলা কখনও কোনো প্রজার জন্য সিদ্ধ বা জায়েয নয়। এ ক্ষেত্রে বাদশাহীর দাবি করা বা অন্য নকল বাদশাহকে স্বীকার করা উভয়ই প্রকৃত বাদশাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সমতুল্য। আর এজন্য শাস্তিও সুনিশ্চিত। তাঁর কুদরাতের হাত হতে মুক্তি পাওয়ার শক্তি কারো নেই। এমনকি মৃত্যুর পর আমাদের শরীরের প্রতিটি অংশ মাটিতে মিশে যাক বা আগুনে পুড়ে ভস্মে পরিণত হোক বা পানিতে মিশে মাছের খোরাক হোক বা অন্য কোনো প্রকারে বিনষ্ট হোক, যখন হিসাবের জন্য তিনি আমাদের তলব করবেন তখন হাওয়া, যমীন, পানি ও মাটি ইত্যাদি তাঁর হুকুমের অধীন হয়ে নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য হবে। ফলত আমাদের দীর্ঘদিনের ধ্বংসপ্রাপ্ত শরীরকেও তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করা হবে এবং রূহ ফুঁকে দিয়ে প্রশ্ন করা হবে হে আমার বান্দাহ ! আমার প্রজা হয়ে দুনিয়াতে বাদশাহীর ক্ষমতা তুমি কোথায় পেয়েছিলে? আমার রাজত্বে তোমার হুকুম চালাবার স্বাধীনতা তোমাকে কে দিয়েছিল? আমার বাদশাহীতে তোমার আইন জারি করার অধিকার কিভাবে তুমি পেয়েছিলে? আমার বান্দাহ হয়ে অন্য বান্দাদের নিকট বন্দেগী প্রাপ্তির জন্য কোন্ সাহসে তুমি যত্নবান হয়েছিলে? আমার দাস হয়ে কিরূপে তুমি আমার অন্য বান্দাকে দাস বানিয়ে রাখলে? আমার রাজত্বে থেকে কিরূপে তুমি অন্যের রাজত্ব ও অপরের মনগড়া আইন ও বিধান স্বীকার করলে এবং কিরূপে তুমি অন্যের রাজত্ব ও অপরের মনগড়া আইন ও বিধান স্বীকার করলে এবং কিরূপে উল্লেখিত বিদ্রোহমূলক কার্যসমূহ তুমি তোমার জন্য সংগত মনে করলে? এখন বলুন তো, আপনাদের মধ্যকার কোনো ব্যক্তি সেদিনের এ সমস্ত জটিল প্রশ্নের উত্তর প্রদানে সক্ষম হবেন কি? কিংবা কোনো উকিল বা ব্যারিষ্টার আইনের মার-প্যাঁচ দ্বারা ঐ সময় আমাদের জন্য মুক্তি পথ নির্ধারণ করতে সক্ষম হতে পারবে কি? বা কোনো সুপারিশ আপনাদেরকে উল্লেখিত বিদ্রোহের অনিবার্য ফল হতে রক্ষা করতে পারবে কি? যদি মনে করেন যে, সেদিনের শাস্তি হতে অব্যাহতির যথার্থ পথ আজ প্রকৃত সৃষ্টিকর্তার আনুগত্য ও হুকুমবরদারীর মধ্যেই নিহিত, তবে আর কালবিলম্ব না করে বিশ্বজাহানের যথার্থ মালিক ও প্রতিপালকের প্রত্যেকটি আইন

ও হুকুম প্রতিপালনের ভিতর দিয়েই ইহকাল ও পরকালের সত্যিকার পথ অনুসন্ধান করুন।

অত্যাচারের কারণ

এখানে কেবল হক বা সত্যেরই প্রশ্ন নয়, সঙ্গে সঙ্গে আরো একটি প্রশ্ন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। তা এই যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'য়ালার এ অসীম কর্মময় রাজ্যে আইন প্রণয়ন ও রাজত্ব করার যথার্থ যোগ্যতা মানুষের আছে কি? আমি পূর্বে বলেছি যে, মেশিনারি কাজে অজ্ঞ ব্যক্তি মেশিন চালাতে আরম্ভ করলে তার অজ্ঞতা হেতু মেশিন নষ্ট হবেই, অজ্ঞ ব্যক্তিকে সামান্য মোটর গাড়ি চালাতে দিলে এর তিক্ত ফল আপনারা সহজেই অনুভব করতে পারবেন। এখন খুব গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন যে, যখন একটি লোহার মেশিন পরিচালনায় পাকা জ্ঞান ভিন্ন ঠিকভাবে তা চালানো সম্ভব নয়, তখন মানুষ যার সৃষ্টি কার্য অগণিত কৌশলে পরিপূর্ণ এবং যার জীবনের প্রশস্ত কর্মক্ষেত্র বহু বৈচিত্রময় কাজে জড়িত সেই সহস্র প্রকার জটিল মানব মেশিন পরিচালনার কঠিনতম কাজ কি করে ঐ সকল লোক কর্তৃক সম্ভব হতে পারে, যারা নিজেকেও যথার্থরূপে জানতে ও চিনতে অক্ষম? এ সকল অজ্ঞ ও আনাড়ী ব্যক্তি যখন আইন প্রণয়নের অধিকারী হয়ে মানব জীবনের ড্রাইভারি করার দায়িত্বপূর্ণ কার্যভার গ্রহণ করে, তখন তার অবস্থা অজ্ঞ মোটর ড্রাইভারের মোটর পরিচালনার ন্যায় দুঃসাধ্য ও বিপজ্জনক হতে বাধ্য। এজন্য যেখানে আল্লাহ ভিন্ন মানুষের রচিত আইন-কানুন স্বীকার করা হয়, এবং আল্লাহর আনুগত্য ছেড়ে মানুষের হুকুম প্রতিপালন করা হয়, সেখানে শান্তি কখনো প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, বরং মানুষই মানুষের অশান্তির সুনিশ্চিত কারণ সাব্যস্ত হয়ে থাকে। ফলত মানুষের অত্যাচার অবিচারে মানুষ নিপীড়িত ও নির্যাতিত হয়ে জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি হতে বঞ্চিত থাকে, আর আল্লাহ প্রদত্ত সমস্ত শক্তি যা মানুষের উন্নতির জন্য ব্যয় হওয়া উচিত, তা মানব জাতির ধ্বংসের জন্য ব্যয় হতে থাকে, আর কার্যত হচ্ছেও তাই। এমনিভাবে মানুষের অন্যায় কার্যের ফলে দুনিয়া জাহান্নামে পরিণত হতে চলছে। কেননা, মানুষ তার ইচ্ছাকৃত অজ্ঞতা হেতু অবুঝ বালকের ন্যায় এমন এক মেশিন চালনায় সচেষ্ট, যার সমস্ত কল-কবজা বা অংশবিশেষের যোগ্য পরিচালনায় সে কখনো অভিজ্ঞ নয়। অবশ্য মেশিন পরিচালনায় সবকিছু পুরাদস্তুর খবর রাখেন, এমন যোগ্য চালকের হাতে মেশিন পরিচালনার বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কাজ অর্পণ করাই সবদিক দিয়ে ভালো। কারণ তখন যথাযোগ্য পরিচালনার ফলে উক্ত মেশিন হতে প্রতিনিয়ত মানুষের হিতার্থে বহু মূল্যবান ও উপকারী জিনিস বের হয়ে আসবে। অন্যথায় অযোগ্য পরিচালনার কুফল মানব জাতিকে চিরদিন ভুগতে হবে।

অবিচার কেন

একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে অজ্ঞতা ভিন্ন মানবজীবনের অকৃতকার্যতার অন্য একটি কারণও আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠে। সামান্য জ্ঞান বিশিষ্ট ব্যক্তিও একথা বুঝতে পারে যে, মানুষ কোনো এক ব্যক্তি বা গোত্র বিশেষের নাম নয়, বরং মানুষ শব্দে এ দুনিয়ার সমস্ত মানব জাতিকেই বুঝায়। কিন্তু অনুরূপভাবে সুখ-শান্তি ও সম্মানের সাথে বসবাস করার দিক দিয়েও সকলের সমান অধিকার রয়েছে। মানবীয় সুখ-শান্তি অর্থে একজনের সুখ-শান্তি নয় গোটা মানব জাতির সুখ-শান্তিকেই বুঝতে হবে। তদ্রুপ কোনো এক ব্যক্তি বা গোত্র বিশেষের মুক্তিকেও সত্যিকার মুক্তি বলা চলে না, বরং গোটা সমাজের মুক্তিকেই মুক্তি নামে অভিহিত করা হয়। উল্লেখিত কথাকে জেনে ও মেনে নেয়ার পর একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, গোটা মানব সমাজের মুক্তি ও উন্নতি কি করে সাধিত হতে পারে। আমার মতে এর একমাত্র পন্থা এই যে, মানুষের জীবন যাপনের জন্য অপরিহার্য আইন-বিধান রচনার ভার তাঁরই উপর অর্পিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, যাঁর দৃষ্টিতে সমস্ত মানুষ সমান। সকলের অধিকার তিনিই সুবিচারের সাথে নির্ণয় করবেন তিনি স্বীয় স্বার্থ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হবেন এবং তাঁর সাথে কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণী বিশেষের স্বার্থ জড়িত থাকবে না। সমস্ত লোক তাঁরই আদেশ পালন করবে যিনি আদেশ প্রদানে অজ্ঞতাবশত কোনো প্রকার ভুল করবেন না এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে স্বাধীনতার অপব্যয়ও করবেন না। কাউকেও বন্ধু মনে করে তার পক্ষাবলম্বন করা এবং কাউকে দুশমন ভেবে তার বিপক্ষে দাঁড়ানোর বদ অভ্যাস হতেও তিনি সর্বদা মুক্ত থাকবেন। শুধু উল্লেখিত অবস্থাতেই নির্ভুল সুবিচার লাভ করার আশা করা যায় এবং মানব সমাজের সমস্ত ন্যায্য দাবি দাওয়া পূরণ হতে পারে। যুলুম বা অত্যাচার নির্মূল করার এটাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। এখন আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, দুনিয়ায় এমন কোনো মানুষ আছেন কি যিনি সকল স্বার্থপরতা ও উল্লেখিত মানবীয় দুর্বলতাসমূহের প্রভাব হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে সক্ষম? খুব সম্ভব এ প্রশ্নের উত্তরে আপনারা 'না' ভিন্ন 'হাঁ' বলতে সাহসী হবেন না। কেননা বাস্তবিক পক্ষে এটা কেবল আল্লাহ তা'আলারই মহিমা, তাঁরই ক্ষমতা ও গুণ মাত্র। তিনি ভিন্ন অন্য কেউ উক্ত গুণাবলীর যথার্থ অধিকারী হতে পারে না। এজন্য যেখানেই মানুষের রচিত আইন-কানুন স্বীকার করা হয়, আল্লাহ ভিন্ন মানুষের প্রাধান্য বিস্তার করা হয়, সেখানেই অত্যাচার ও অবিচার বিভিন্নরূপে প্রকাশ পেতে থাকে। সেই সকল শাহী খান্দানী লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, যারা জোরপূর্বক নিজেদের হাতে কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা রেখে দিয়েছে। তারা নিজেদের জন্য সম্মান, অতিরিক্ত দাবি, টাকা আদায়ের উপায় ও এমন সব ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, যা অন্যান্যদের জন্য রাখা হয়নি। তারা অবস্থান করছে আইনের গণ্ডীর বাইরে,

তাদের বিরুদ্ধে কোনো দাবি-দাওয়ার প্রশ্ন উত্থাপন করা যায় না। তারা যা ইচ্ছা তাই করে, কোনো আদালত তাদের বিরুদ্ধে 'সমন' পর্যন্ত জারি করতে সাহস পায় না। তাদের এই সকল অন্যায় আচরণ দেখে-শুনে লোকেরা শুধু এ ধারণার বশবর্তী হয়ে সবকিছু বিনা দ্বিধায় মেনে নেয় যে, বাদশাহগণ সকল প্রকার ভুল-ভ্রান্তি হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। অথচ দুনিয়ার প্রত্যেক লোকই একথা জানে যে, এরা সাধারণের মতই মানুষ ভিন্ন অন্য কিছু নয়। এতদসত্ত্বেও শক্তির প্রভাবে এরা খোদা সেজে উচ্চাসনে সমাসীন আর অন্যান্য দুর্বল জনসাধারণ তাদের সম্মুখে করজোড় ও কম্পিতভাবে দন্ডায়মান হয়, যেন তাদের জীবন-মরণ এবং জীবিকা ও সম্পদ তাদের হাতেই সীমাবদ্ধ। প্রজাদের শ্রমোপার্জিত টাকা-পয়সা অন্যায়ভাবে আদায় করা হয়। উক্ত টাকা-পয়সা রাজোচিত প্রাসাদ নির্মাণে ও বিলাস-সামগ্রী প্রস্তুতকরণে নির্বিবাদে ব্যয় হতে থাকে। এমন কি তাদের একটি কুকুরের জন্য এমন সব খাদ্য দ্রব্যের বন্দোবস্ত করা হয়, যা প্রজাবর্গের পাঁচজন পরিশ্রমী ব্যক্তির ভাগে অনেক সময় জোটে না। এখন চিন্তা করে দেখুন তো, এটা কি বিচার? এসব নিষ্ঠুর নিয়মাবলী কখনো এমন ন্যায় বিচারক প্রভু কর্তৃক সমর্থিত হতে পারে কি, যাঁর সামনে সমস্ত মানব জাতির দাবি-দাওয়া সমান? সেইসব ব্রাহ্মণ, পীর, নবাব, সরদার, জমিদার-জায়গীরদার এবং মহাজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, যারা স্বভাবতই নিজেদেরকে জনসাধারণ অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর লোক বলে ধারণা করে থাকে, তাদের শক্তির প্রাবল্যে দুনিয়ায় এমন বহু আইন প্রণীত হচ্ছে যা দ্বারা তারাই জনসাধারণ অপেক্ষা ঢের বেশি উপকার লাভ করে থাকে। তাদের ধারণা, তারাই নিষ্পাপ আর অন্য সকলে দোষী ও পাপী, তারা ভদ্র আর বাকি সব অভদ্র, তারা শাসক সমস্ত মানুষ শাসিত। তাই আমরা বলতে বাধ্য হবো যে, এ সকল নিষ্ঠুর নীতি ও অন্যায় আচরণ কখনও কোনো সত্যিকার ন্যায় বিচারক কর্তৃক রচিত হতে পারে না। জাতির ঐ সকল নেতা বা পরিচালকের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, যারা শক্তির প্রাবল্যে অন্য জাতিসমূহকে গোলাম বানিয়ে রেখেছে। তাদের এমন কোনো আইন বা শাসন পদ্ধতি নেই, যা স্বার্থপরতার ছোঁয়াচ হতে মুক্ত। তাদের ধারণা দুর্বলেরা মানুষ নয়, অথবা অতীব নিম্নশ্রেণীর লোক মাত্র। তারা প্রত্যেক দিক দিয়েই নিজেদেরকে অন্যের তুলনায় বড় করে দেখে এবং নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে অন্যের স্বার্থ বলি দেয়াকে ন্যায্য মনে করে থাকে। তাই তাদের রচিত প্রত্যেক আইন-কানুনের পেছনে বদনামী ও দুর্নাম লেগে আছে।

শুধু ইশারা স্বরূপই উল্লেখিত উদাহরণ কয়টি এখানে বর্ণনা করা হলো। বিস্তারিত বর্ণনার স্থান এটা নয়। আমি শুধু এ সত্যটি আপনাদের মনে জাগিয়ে দিতে চাই যে, যেখানে মানুষ আইন রচনা করে এবং মানব রচিত আইন কার্যকর রয়েছে, সেখানে অন্যায় ও অত্যাচার ভিন্নরূপে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। তাই কেউ আপন

ন্যায্য দাবি অপেক্ষা অধিক সুযোগ পেয়ে বসেছে, আর কারো যথার্থ স্বার্থ সম্পূর্ণ অন্যায় অমানুষিকভাবে দলিত মথিত হয়েছে। এর কারন এই যে, মানুষের অন্ত রে ও মস্তিষ্কে স্বভাবতই স্বজাতি ও স্বগোত্রের উপকার-উন্নতির চিন্তা অন্য জাতির উপকার অপেক্ষা বেশিভাবে জেগে থাকে, তাই অন্যের স্বার্থ বা দাবির প্রতি তারা অপেক্ষাকৃত কম সহানুভূতি সম্পন্ন হয়। এ অন্যায় অত্যাচারের যথার্থ প্রতিকারের পন্থা এই যে, মানুষের রচিত আইন-কানুন ও শাসন-পদ্ধতি ত্যাগ করত আমরা একমাত্র আল্লাহ্ প্রণীত আইন-কানুন ও আদেশ-নিষেধাবলী মেনে চলবো। একমাত্র তাঁরই দৃষ্টিতে সমগ্র মানব জাতি সমান মর্যাদাসম্পন্ন। ব্যবধান শুধু মানুষের কর্মতৎপরতা, যোগ্যতা, কর্মদক্ষতার ভিতর দিয়েই পরিলক্ষিত হবে, বংশ শ্রেণী বা জাতিগত কোনো প্রকার আভিজাত্য সেখানে কারো জন্য স্বীকৃত হয় না এবং হতেও পারে না।

শান্তি কিভাবে স্থাপিত হতে পারে

আপনারা আবশ্য জানেন যে, মানুষকে আয়ত্তাধীন রাখার প্রধানতম উপায় হচ্ছে দায়িত্বানুভূতি। তাই যদি কারো এরূপ ধারণা হয় যে, তাকে তার কোনো কাজের জন্য কারো নিকট জবাবদিহি করতে হবে না, বরং সে তার কাজে সম্পূর্ণ স্বাধীন ; এমনকি, তার নিকট কোনো অন্যায় কাজের কৈফিয়ত তলব করার এতোটুকু অধিকার পর্যন্ত কারো নেই, তখন উক্ত মানুষের অবস্থা হবে লাগামহীন উটের সমতূল্য। একথাটি কোনো এক ব্যক্তি বিশেষের বেলায় যেমন প্রযোজ্য, অনুরূপভাবে কোনো দল, সমাজ বা সমগ্র বিশ্বের মানব সমাজের জন্যও প্রযোজ্য হতে পারে। অর্থাৎ কোনো একদল লোক যখন ভাবে যে, তারা তাদের কাজে সম্পূর্ণ স্বাধীন, এমন কি তাদের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ দুটি কথাও বলার অধিকার কারো নেই, তখন উক্ত দল কর্তৃক 'ধরাকে শরা জ্ঞান করা' মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। এমনিভাবে যখন কোনো এক জাতি অন্য জাতির উপর এবং কোনো এক রাজা আপন রাজত্বের সীমায় নিজেকে সর্বদিক দিয়ে শক্তিশালী ও স্বাধীন মনে করার সুযোগ পায়, তখন উক্ত প্রবল জাতি কর্তৃক দুর্বল জাতি ও রাজা কর্তৃক নিরীহ প্রজাবর্গ নানাদিক দিয়েই নিপীড়িত ও নির্যাতিত হতে থাকে। এ নিষ্ঠুর সত্যটি এ দুনিয়ার সমস্ত অশান্তির প্রধানতম কারণ স্বরূপ বিভিন্ন রঙ্গে ও রূপে অহরহ আমাদের চোখের সামনে প্রকাশ হতে চলেছে এবং যতোদিন পর্যন্ত মানুষ তদপেক্ষা কোনো এক বিরাট শক্তির নিকট আপন কাজের জন্য দায়ি হওয়ার সত্যটি মেনে নিতে প্রস্তুত না হয়, ততোদিন পর্যন্ত অত্যাচারের দ্বার রুদ্ধ হয়ে বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হতে পারে না।

এখন আপনারা আমাকে বলুন, উক্ত বিরাট শক্তির প্রকৃত মালিক এক আল্লাহ ভিন্ন অন্য কেউ হতে পারে কি? মানুষের মধ্য হতে তো কেউ এ শক্তির অধিকারী

হতে পারে না। কারণ এ শক্তির অধিকার লাভের পর মানুষ হবে অত্যাচারী ও অবিচারী। এক কথায় সে তখন হবে এ দুনিয়ার ফেরাউনদের অন্যতম। ফলে কেউ হয়ত তার সমর্থন লাভ করে খুব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করার সুযোগ পেয়ে বসবে, আর কেউ বা তার রোষাগ্নিতে পতিত হয়ে জ্বলে-পুড়ে ছারখার হবে। তাই এ জটিল সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে ইউরোপে league of nation বা জাতিসংঘ কায়েম করা হয়েছিল, কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের সেই সংঘের অস্তিত্ব তেমন মজবুত হয়নি এবং শেষ পর্যন্ত সেই তথাকথিত জাতিসংঘ মুষ্টিমেয় কয়েকটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের হাতের ক্রীড়নক সেজে ছোট ও দুর্বল রাজ্যসমূহের সাথে অবিচার করে শান্তির পরিবর্তে সমগ্র বিশ্বের অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উল্লেখিত তিক্ত অভিজ্ঞতার পর একথা আমাদের কাছে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষের মধ্যে এমন কোনো শক্তির সৃষ্টি হওয়া সম্ভবপর নয় যা দ্বারা এ দুনিয়ার বড়-ছোট সমস্ত জাতির শক্তিকে যথাযথভাবে আয়ত্তে রাখা যায়। তাই আমরা বলতে বাধ্য হবো যে, উক্ত শক্তি নিশ্চিতরূপে মানবীয় সীমার বহু উর্ধে তদপেক্ষাও ঢের উচ্চ শ্রেণীর জিনিস, আর তা আল্লাহ তা'আলার অসীম শক্তি ও মহিমা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। তাই এ দুনিয়ায় সুখ-শান্তিতে বসবাস করার উদ্দেশ্যে সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করত বিশেষ বিনীত ও অনুগত প্রজাসম তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করা ও দৃঢ়ভাবে এ বিশ্বাস অন্তরে স্থাপন পোষণ করা আবশ্যক যে, তিনি আমাদের গুপ্ত ও প্রকাশ্য সবকিছু অবগত আছেন এবং একদিন আমাদের প্রত্যেককে স্ব-স্ব আমলনামা হাতে নিয়ে তাঁর আদালতে হাজির হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নেই।

বস্তুত একমাত্র উল্লেখিত সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা অবলম্বনের মধ্যেই মানব জাতির সত্যিকার সুখ-শান্তি নিহিত।

একটি সন্দেহ

আমার বক্তব্য শেষ করার পূর্বে আপনাদের সন্দেহ দূর করার উদ্দেশ্যে আরো একটি জরুরি কথা নিবেদন করা আবশ্যক মনে করছি। আপনারা স্বভাবতই ভাবতে পারেন যে, যখন আল্লাহর আদেশ ভিন্ন ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোনো শক্তিই এদিক-ওদিক চলবার সামর্থ নেই বলে প্রমাণ পাওয়া গেলো, যখন সমগ্র মানবসমাজ আইনগত আল্লাহর রায়ত শ্রেণীতে পরিনত হলো, তখন ক্ষুদ্র মানব কি করে আল্লাহদ্রোহী হতে সাহসী হয়? কি করে বান্দাদের উপর আপন প্রভুত্ব বিস্তার করত অন্যায় ও অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা চালিয়ে থাকে? কেন আল্লাহ তাআলা যথাসত্ত্বর উক্ত অত্যাচারীর শাস্তি বিধান করেন না?

এ সন্দেহের উত্তর এই যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহর বিরাট রাজত্বের সামনে কয়েকটি মানুষ এ দুনিয়ার শক্তিশালী কোনো এক বাদশাহ কর্তৃক তাঁর অধীনস্ত

কোনো স্থানের শাসনকার্য পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী স্বরূপ। উক্তস্থানের অন্তর্গত রেল লাইন, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, দেশ রক্ষা ও সৈন্যবাহিনী ইত্যাদি তাঁরই করতলগত। তাই তাঁর ব্যাপক শক্তির তুলনায় তৎকর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারীর ক্ষমতা অতীব তুচ্ছ ও নগণ্য। এমনকি, বাদশাহের ইচ্ছা ভিন্ন কর্মচারীর এক পা এদিক-ওদিক চলার শক্তিও নেই, কিন্তু বাদশাহ উক্ত কর্মচারীকে প্রদত্ত ক্ষমতা এবং সৎ-অসৎ ব্যবহারের পরীক্ষা করার জন্য যথেষ্ট স্বাধীনতা প্রদান করত দূর হতে নীরবে তার কার্য নিরীক্ষণ করে থাকেন। এমতাবস্থায় শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, ভদ্র ও নিমক হালাল (কৃতজ্ঞ) কর্মচারী রাজপ্রদত্ত ক্ষমতায় ক্ষমতাবান হয়েও দেশের কোনো প্রকার অন্যায় ও অত্যাচারের সৃষ্টি না করে রাজভক্ত কর্মচারীর ন্যায় আপন কতর্ব্য সম্পন্ন করে নিজেকে রায়ত বা প্রজার নিকট প্রিয় করে তুলতে সচেষ্ট হয়। ফলে বাদশাহ তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে তার পদমর্যাদা বৃদ্ধি করে থাকেন, পক্ষান্তরে কর্মচারী যদি দুষ্টবুদ্ধি ও নিমকহারাম (অকৃতজ্ঞ) হয় এবং প্রজাগণ যদি নির্বোধ বা অশিক্ষিত হয় তখন উক্ত কর্মচারী বাদশাহ প্রদত্ত ক্ষমতায় নিজেকে পূর্ণ ক্ষমতাবান মনে করে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ও নিজেকে বাদশাহ বলে ঘোষণা করার অন্যায় সাহসেও সাহসী হয়ে থাকে। আর এদিকে মূর্খ ও অশিক্ষিত প্রজাবর্গ কোর্ট আদালতে চাকুরির কাজে এমনকি ফাঁসির আদেশ প্রদানেও উক্ত কর্মচারীর পূর্ণ ক্ষমতা দর্শন করে তাকে বাদশাহ বলে স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করে না। আর ঐদিকে বাদশাহ দূর হতে অন্ধ প্রজাবর্গ ও বিদ্রোহী কর্মচারীর অন্যায় আচরণ নিরীক্ষণ করতে থাকেন। ইচ্ছা করলে মুহূর্তেই তিনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করতে পারেন, কিন্তু তিনি খুব ধীর-স্থির, তাই সত্ত্বর শাস্তির ব্যবস্থা না করে প্রজাবর্গ ও কর্মচারীকে স্বাধীনতা প্রদান করেন তাদের পরীক্ষা করতে থাকেন যেনো তাদের দুষ্টবুদ্ধির সকল মাত্রা পুর্ণভাবে প্রকাশ পায়। বাদশাহ অচিরেই এদের জন্য কোনো শাস্তি বিধান করেন না। এর কারণ এই যে, তার শক্তি এতো বিরাট ও ব্যাপক যে, উক্ত বিদ্রোহী কর্মচারী হাজার চেষ্টা করেও তাঁর বাদশাহী ছিনিয়ে নিতে কখনো সক্ষম নয় বরং বিদ্রোহী ও অকৃতজ্ঞতার দ্বারা স্বীয় ধ্বংসের সুনিশ্চিত কারণ হতে থাকবে। এরূপে প্রজাবর্গের বিদ্রোহ ও অন্যায় আচরণ যখন চরমে উঠে, তখন বাদশাহের পক্ষ হতে উভয়ের জন্য এমন কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়, যার হাত হতে অব্যাহতির কোনো তদবীরই তখন আর কার্যকরী হয় না।

বন্ধুগণ!

আমরা উক্ত রাজ-কর্মচারী এবং প্রজাবর্গের প্রত্যেক ব্যক্তি আজ উল্লেখিত কঠিন পরীক্ষায় লিপ্ত। এখানে আমাদের জ্ঞান, শক্তি, কর্তব্যপরায়ণতা ও আনুগত্যের

কঠিন পরীক্ষা চলছে। আমাদের প্রত্যেককে আজ এ মীমাংসা করতে হবে যে, আমরা আমাদের প্রকৃত বাদশাহের নিমক-হালাল প্রজা কিনা। অবশ্য আমি আমার জন্য নিমক হালাল হওয়ারই চূড়ান্ত মীমাংসায় উপনীত হয়েছি এবং প্রত্যেক আল্লাহদ্রোহীর সাথে পরিষ্কাররূপে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছি। আর আপনারাও আপনাদের স্ব-স্ব পথ নির্ধারণে সম্পূর্ণ স্বাধীন। একদিকে ঐ সকল উপকার ও অপকার, যা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত শক্তিতে শক্তিবান আল্লাহদ্রোহী কর্মচারীর মধ্যস্থতায় আপনারা পেয়ে থাকেন, অন্যদিকে ঐ সকল লাভ-লোকসান, যা স্বয়ং সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা আপন বান্দাহদের উপর পৌঁছাতে ষোলআনা সক্ষম। এখন আপনারা আপনাদের পছন্দনুযায়ী এ দুয়ের কোনো একটিকে নিজেদের জন্যে মনোনীত করুন।

৩

ইসলাম ও জাহেলিয়াত

[১৯৪১ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পেশোয়ার ইসলামিয়া কলেজের মজলিশে ইসলামিয়াতের সভায় ভাষণ দেয়ার জন্যে মাওলানাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এটি সে সভায় প্রদত্ত ভাষণ, যা পরবর্তীকালে 'ইসলাম ও জাহেলিয়াত' শিরোনামে পুস্তিকারে প্রকাশিত হয়।]

জীবনের কর্মক্ষেত্রে মানুষকে যতো বস্তুরই সংস্পর্শে আসতে হয় তার প্রত্যেকটির প্রকৃতির গুণাগুণ ও অবস্থা এবং এর সাথে তার সম্পর্ক সম্বন্ধে সর্বপ্রথমেই একটি সুস্পষ্ট মত নির্দিষ্ট করে নেয়া একান্তই আবশ্যক। পূর্বেই এমত নির্দিষ্ট না করে কোনো একটি জিনিসকেও কোনো কাজে প্রয়োগ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। সে মত মূলত ভুল কি নির্ভুল সে প্রশ্ন গৌণ, কিন্তু মত যে একটি নির্দিষ্ট করে নিতে হয়, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আর এ নির্ধারণের পূর্বে কোন্ বস্তুর সাথে কিরূপ ব্যবহার ও আচরণ করতে হবে, কার সাথে কিরূপ কর্মনীতি গ্রহণ করতে হবে চূড়ান্তভাবে তার ফায়সালা করাও কিছুতেই সম্ভব নয়। একথা বুঝাবার জন্য বিশেষ কোনো যুক্তির অবতারণা করার কোনোই আবশ্যকতা নেই। কারণ ইহা প্রত্যেকেই রাত-দিনের বাস্তব অভিজ্ঞতা হতেই বুঝে নিতে পারে। কারো সাথে প্রথম সাক্ষাত হলে তার সম্পর্কে জেনে নিতে হয় যে, কে এই ব্যক্তি, কি এর সম্মানও মর্যাদা ? কোন্ ধরনের গুণ ও যোগ্যতা এর মধ্যে রয়েছে এবং আমার সাথে তার কোন্ ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান? এ প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর না জেনে তার সাথে কোন্ ধরনের ব্যবহার বা আচরণ অবলম্বন করতে হবে, তা নির্ধারণ করা কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভুল' জ্ঞান লাভ করা যদি একান্ত অসম্ভবই হয়ে পড়ে, তবুও বাহ্যিক নিদর্শনসমূহ হতে যথাসম্ভব এসব প্রশ্নের অন্তত একটি আনুমানিক উত্তর অবশ্যই ঠিক করে নিতে হয়। অতপর তার সাথে যে ধরনেরই আচরণ করা হোকনা কেন, তা পূর্ব নির্ধারিত এই মতের ভিত্তিতেই করতে হয়। মানুষ খাদ্য হিসেবে যেসব দ্রব্য গ্রহণ করে, তা মানুষের খাদ্য প্রয়োজন পূরণ করে– এই জ্ঞান বা ধারণার ফলেই তা সম্ভব হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে মানুষ যা পরিত্যাগ করে বা দূরে নিক্ষেপ করে, যা মানুষ নিজের কোনো না কোনো কাজে ব্যবহার করে, যার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মানুষ যত্ন নেয়, যেসব জিনিসের প্রতি সম্মান বা উপেক্ষা প্রদর্শন করে, যাকে মানুষ ভয় করে বা ভালবাসে, সেসব

সম্পর্কেই তাদের সত্তা ও গুণাগুণ এবং তাদের সাথে মানুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে পূর্ব নির্ধারিত ধারণার ভিত্তিতেই উক্তরূপ আচরণ ও ব্যবহার হয়ে থাকে।

পরন্তু বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে স্থিরিকৃত এ ধারণা নির্ভুল হলে এর সাথে অবলম্বিত আচরণও নির্ভুল হবে এবং এ ধারণা ভ্রান্ত, ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ হলে এর প্রতি মানুষের ব্যবহার তদনুরূপ হবে। এই ব্যবহারে তারা পরস্পরের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু স্বয়ং সেই ধারণাটির শুদ্ধাশুদ্ধি কিসের উপর নির্ভর করে ? তা নির্ভর করে বস্তুটি সম্পর্কে মত নির্ধারণের পন্থার উপর। সেমত হয় নির্ভুল বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে গ্রহণ করা হয়, নতুবা শুধু আন্দায-অনুমান, অমূলক ধারণা কিংবা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পর্যবেক্ষণ উপায়ের উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, একটি শিশু আগুন দেখতে পায় এবং নিছক বাহ্যলব্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে তাকে 'চমৎকার খেলনা' বলে মনে করে। আগুন সম্পর্কে এমত ঠিক করার ফলেই শিশু উহা ধরবার ও উঠিয়ে নেয়ার জন্য হস্ত প্রসারিত করে দেয়। অন্য এক ব্যক্তি সেই আগুন দেখে নিছক ধারণা-অনুমানের উপর নির্ভর করে সে সম্পর্কে এমত পোষণ করতে শুরু করে যে, এর মধ্যে ঐশ্বরিক সত্তা রয়েছে অথবা এটা ঐশ্বরিক বাহ্যরূপ। এ মতের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত করে যে, তার সাথে তার প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া এবং তার সম্মুখে মাথা নত করাই কর্তব্য। তৃতীয় এক ব্যক্তি আগুন দেখে তার প্রকৃত রূপ, তার অন্তর্নিহিত গুণাগুণ, শক্তি ও ক্ষমতার অনুসন্ধান করতে শুরু করে এবং চিন্তা ও গবেষণার পর এমত নির্ধারণ করে যে, এটা উত্তাপ দানকারী পদার্থ, অতএব এটাকে একান্ত চাকরের ন্যায় ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। এ মতের উপর ভিত্তি করে আগুনকে সে খেলনা মনে করে না। উপাস্য দেবতা হিসেবেও একে গ্রহণ করে না বরং প্রয়োজন মতো একে কখনো খাদ্য প্রস্তুত কার্যে, কখনো কিছু ভস্ম করার কাজে ব্যবহার করে। একই আগুনের সাথে এরূপ বিভিন্ন প্রকার আচরণের মধ্যে শিশু ও অগ্নিপূজকের আচরণ নিতান্ত অজ্ঞতা ও অন্ধতামূলক, তাতে সন্দেহ নেই। কারণ আগুনকে খেলনা মনে করা সম্পর্কে শিশুর ধারণা বাস্তব অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হয়। অগ্নি উপাসকের মতো আগুনের খোদা হওয়া বা তাতে খোদার আত্মপ্রকাশ করার বিশ্বাসও কোনো বৈজ্ঞানিক অকাট্য প্রমাণ ভিত্তিক নয়। বরং এরূপ ধারণা নিছক খোশখেয়াল, কল্পনা ও অমূলক আন্দায-অনুমানের উপর নির্ভর করে গ্রহণ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে আগুনকে সেবা পরিচর্যার কাজে নিযুক্ত করা, এর সাহায্যে মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর কাজ সম্পন্ন করা নির্ভুল বৈজ্ঞানিক কর্মপন্থা সন্দেহ নেই। কারণ আগুন সম্পর্কে এই যে মত নির্ধারণ করা হয়েছে, ইহা জ্ঞান ও নির্ভুল বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই করা হয়েছে।

মানব জীবনের মৌলিক সমস্যা

এ ভূমিকা হৃদয়-মনে বদ্ধমূল করে নেয়ার পর খুঁটিনাটি ব্যাপার হতে মূলনীতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বিষয়টি আলোচনা করতে হবে। মানুষ এ পৃথিবীর উপর নিজেকে বর্তমান দেখতে পায়, এর একটি শরীর বা দেহও রয়েছে, তাতে অসংখ্য প্রকার শক্তি, ক্ষমতা ও প্রতিভা নিহিত রয়েছে ; তার সম্মুখে আকাশ ও পৃথিবীর এক বিশাল বিস্তৃত এলাকা বিদ্যমান, তাতে রয়েছে অসংখ্য প্রকার দ্রব্য-সামগ্রী ; মানুষের মধ্যে তা ব্যবহার করার এবং নিজের প্রয়োজনে তা হতে উপকৃত হওয়ার মতো শক্তি পুরাপুরি বর্তমান রয়েছে। তার চতুর্দিকে রয়েছে অসংখ্য মানুষ, জন্তু, উদ্ভিদ, গুল্ম, লতা, প্রস্তর ইত্যাদি। এ সবের সাথে মানুষের জীবন নানা দিক দিয়ে নিবিড়ভাবে জড়িত রয়েছে। এমতাবস্থায় প্রথমে নিজের সম্পর্কে অন্যান্য জন্তু, বস্তু ও দ্রব্য-সামগ্রী সম্পর্কে এবং এদের সাথে তার নিজের সম্পর্ক সম্বন্ধে কোনো মত ঠিক না করে এদের প্রতি কোনোরূপ আচরণ অবলম্বন করা মানুষের দ্বারা কিরূপে সম্ভব হতে পারে ? মানুষের উপর কি কোনোরূপ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে না হয়নি, সে সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী না কারো অধীন কারো অধীন হয়ে থাকলে সে কার অধীন, কার নিকট তাকে জবাবদিহি করতে হবে, এ পার্থিব জীবনের কোনো পরিণতি আছে কি নেই, থাকলে তা কি প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তর ঠিক না করে এবং এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে নিজের জীবনের জন্য কোনো পথই মানুষ বেছে নিতে পারে না। মানুষের যে দেহ এবং দেহের মধ্যে যেসব শক্তি নিহিত রয়েছে, তা তার নিজের মালিকানাস্বত্ব, না অন্য কারো দান মাত্র ; সেগুলোর হিসেব গ্রহণকারী কেউ আছে কি নেই, সেগুলোর ব্যয়-ব্যবহারের নীতি সে নিজে নির্ধারিত করবে না অন্য কেউ তা করে দিবে, এসব প্রশ্নের উত্তর ঠিক না করে সে তার নিজের শক্তি-প্রতিভাকে কোনো কাজেই নিযুক্ত করতে পারে না। চারিদিকে যে বস্তু ও দ্রব্য-সামগ্রীর অফুরন্ত ভান্ডার রয়েছে, তার মালিক ও স্বত্বাধিকারী সে নিজে না অন্য কেউ ; সেগুলোর উপর তার ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার সীমাবদ্ধ না অসীম, সীমাবদ্ধ হলে সে সীমা কে নির্ধারিত করেছে, এসব প্রশ্নের জবাব নির্দিষ্ট না করে মানুষ তার চতুষ্পার্শে অবস্থিত বস্তু ও দ্রব্যাদি ব্যবহার করার কোনো নীতিই নির্ধারিত করতে পারে না। অনুরূপভাবে মানুষ কাকে বলে, মানুষ ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য ও বৈষম্য করার ভিত্তি কি ; বন্ধুত্ব, শত্রুতা, মতৈক্য ও অনৈক্য, সহযোগিতা ও অসহযোগিতাই বা কিসের ভিত্তিতে করা হবে। এ বিষয়ে কোনো মত স্থির করার পূর্বে মানুষ পরস্পরের সাথে কোনোরূপ ব্যবহার আচরণের নীতি ঠিক করতে পারে না। পরন্তু এই বিশ্ব-প্রকৃতির স্বরূপ এবং এর ব্যবস্থা কোন্ ধরনের এবং এখানে মানুষের অবস্থান কোন্ স্তরে তা ঠিক না করে কোনো মানুষই সমষ্টিগত এই দুনিয়ার সাথে কোনোরূপ ব্যবহার করতে পারে না।

উপরোল্লিখিত ভূমিকার ভিত্তিতে একথা অকুণ্ঠভাবে বলা যেতে পারে যে, ঐসব সম্পর্কে একটা না একটা মত স্থির না করে এর কোনো একটিকেও কোনো কাজে ব্যবহার করা অসম্ভব, আর বস্তুতই এসব প্রশ্নের কোনো না কোনো উত্তর চেতনায় হোক কি অচেতনায় পৃথিবীর মানুষের মনে বর্তমান থাকেই, এর উত্তর ঠিক করতে মানুষ একান্তভাবে বাধ্য। যেহেতু এ মত নির্ধারণের পূর্বে সে কোনো কাজই করতে সমর্থ হয় না। অবশ্য প্রত্যেকের মনের যে এসব প্রশ্নের দার্শনিক উত্তর বর্তমান থাকবে, প্রত্যেকটি মানুষকেই যে দার্শনিক যুক্তি দ্বারাই এদের উত্তর নির্ধারণ করতে হবে এবং এক একটি প্রশ্নের সূক্ষ্মভাবে যাচাই করে এর সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত মনের মধ্যে বদ্ধমূল করে নিতে হবে, এমন কোনো কথা নয়। কারণ সকলের পক্ষে তা সম্ভব হয় না অনেক লোকের মনে এসব প্রশ্ন আদৌ কোনো নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে না ; স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ঐসব বিষয়ে অনেক সময় একটু চিন্তাও হয়ত অনেকে করে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রত্যেকটি মানুষই ঐসব প্রশ্নের অত্যন্ত অস্পষ্ট ও মোটামুটিভাবে ইতিবাচক বা নেতিবাচক উত্তর নিশ্চয়ই স্থির করে নেয়। ফলে তার জীবনের যে নীতিই হোক না কেন তা যে ঐ মতেরই অনিবার্য পরিণতি তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে না।

উপরোক্ত কথা ব্যষ্টি সম্পর্কে যতোখানি সত্য, বিভিন্ন জাতি বা দল সম্পর্কেও তা অনুরূপভাবে সত্য ও প্রযোজ্য। এই প্রশ্নসমূহ মানব জীবনের মৌলিক সমস্যার সহিত সংশ্লিষ্ট বলে এ সবের উত্তর ঠিক করার পূর্বে সমাজ ও সভ্যতার জন্য কোনোরূপ বিধান এবং মানব সমষ্টির জন্য কোনোরূপ কার্যসূচী গ্রহণ করা আদৌ সম্ভব নয়। এসব প্রশ্নের যে উত্তর নির্ধারিত হবে সে অনুসারেই নৈতিক চরিত্র সম্পর্কেও একটি বিশেষ মত স্থিরকৃত হবে, এর স্বরূপ অনুযায়ী জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের বাস্তব রূপায়ণ হবে। এক কথায় ঐ প্রশ্নের উত্তর অনুযায়ী সমগ্র সমাজ সংস্কৃতি গড়ে উঠবে এ ব্যাপারে কোনোরূপ ব্যতিক্রম আদৌ সম্ভব নয়। ব্যষ্টি কিংবা সমষ্টি উভয় বিষয়েই এসব প্রশ্নের যে উত্তর হবে, বাস্তবক্ষেত্রে তা-ই রূপায়িত হবে। এমন কি, এক ব্যক্তি বা একটি সমাজের আচার-আচরণ এবং কাজ-কর্মের যাচাই ও পুংখানুপংখু বিশ্লেষণ করে এর পশ্চাতে উক্ত মৌলিক প্রশ্নসমূহের কোন্ উত্তর কার্যকরী রয়েছে তা অতি সহজেই জানতে পারা যায়। কারণ, এসব প্রশ্নের উত্তর যে ধরনের হবে, ব্যক্তিগত বা দলগত আচরণ এর বিপরীত হওয়া মোটেই সম্ভব নয়। মৌলিক দাবি এবং বাস্তব আচরণের মধ্যে পার্থক্য নিশ্চয়ই হতে পারে ; কিন্তু উল্লিখিত প্রশ্নসমূহের যে উত্তর প্রকৃতপক্ষে মানব মনের গভীরতম পটে মুদ্রিত রয়েছে, তার স্বরূপ ও প্রকৃতি এবং বাস্তব আচরণের প্রকৃতিতে কোনোরূপ পার্থক্য হতে পারে না।

এর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। মানব জীবনের উক্ত মৌলিক প্রশ্নসমূহ মনের মধ্যে যার কোনো উত্তর ঠিক না করে মানুষ এ দুনিয়ার কোনো কাজে এক বিন্দু পদক্ষেপও করতে পারে না বলে প্রমাণিত হলো মূলত এ সবই অদৃশ্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। বিশ্বপ্রকৃতির ললাটে এর কোনো উত্তর এমনভাবে লিখিত হয়নি, যা প্রত্যেকটি মানুষ ভূ-পৃষ্ঠে পদার্পণ করার সংগে সংগেই পাঠ করে নিজ যোগ্যতার বলে সঠিক উত্তর জেনে নিবে। অধিকন্তু প্রশ্নগুলোর কোনো উত্তর এমন সহজ ও সুস্পষ্ট নয় যে, প্রত্যেকটি মানুষই তা স্বতঃই জেনে নিবে। এ জন্যই উল্লিখিত প্রশ্নাবলীর নির্দিষ্ট একটি উত্তর সকল মানুষ একত্রিত হয়েও গ্রহণ করতে পারেনি। এই উত্তর সম্পর্কে সকল সময়ই মানুষের মধ্যে বিরাট মতবৈষম্য বর্তমান রয়েছে। আর সত্য কথা এই যে, বিভিন্ন পন্থায়ই উল্লিখিত প্রশ্নাবলীর উত্তর দিতে চিরদিন চেষ্টা করেছে। বস্তুত উল্লিখিত প্রশ্নাবলীর উত্তর নির্ধারণের কোন্ কোন্ পন্থা সম্ভব হতে পারে এবং আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে সে জন্য কোন্ পন্থা গ্রহণ করা হয়েছে, আর সেই বিভিন্ন পন্থায় কোন্ ধরনের উত্তর লাভ করা যায়, তা জেনে নেয়া একান্তই আবশ্যক।

উল্লিখিত প্রশ্নাবলীর উত্তর নির্ধারণের একটি উপায় হচ্ছে নিজের বাহ্যেন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করা এবং তদলব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে উক্ত প্রশ্নাবলীর উত্তর নির্ধারণ করা। দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ এবং এর সাথে অনুমান ধারণার যোগ করে একটি নীতি ঠিক করা। তৃতীয় পন্থা হচ্ছে পয়গাম্বর আল্লাহর প্রেরিত পুরুষগণ প্রত্যক্ষভাবে নিগূঢ় সত্য জ্ঞানের ধারক হওয়ার দাবি করে উক্ত প্রশ্নাবলীর যে উত্তর দিয়েছেন তা গ্রহণ করা।

মানব জীবনের উল্লিখিত মৌলিক প্রশ্নসমূহের উত্তর নির্ধারণের জন্য দুনিয়াতে আজ পর্যন্ত এই তিনটি পন্থাই অবলম্বিত হয়েছে। আর সম্ভবত এই কাজের জন্য এতদ্ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ও বর্তমান নেই। এর মধ্যে প্রত্যেকটি পন্থাই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়। প্রত্যেকটির উত্তর হতে একটি বিশেষ আচরণ নীতি লাভ করা যায় ; একটি বিশেষ নৈতিক আদর্শ এবং সমাজ ও সংস্কৃতির ব্যবস্থা অস্তিত্ব লাভ করে। এদের প্রত্যেকটিই নিজ নিজ মৌলিক বিশেষত্বের দিক দিয়ে অন্যান্য সকল উত্তর হতে উদ্ভুত আচরণ নীতিসমূহ হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ভিন্ন। এসব বিভিন্ন পন্থা হতে উক্ত প্রশ্নাবলীর কি কি উত্তর লাভ করা গিয়েছে এবং প্রত্যেকটি উত্তর হতে কোন্ ধরণের আচরণ নীতি লাভ হয়েছে, অতপর আমি তাই বিস্তারিতভাবে দেখাতে চেষ্টা করবো।

খালেছ জাহেলিয়াত বা নিরেট অন্ধতা

নিছক বাহ্যেন্দ্রিয়ের উপর একান্তভাবে নির্ভর করে মানুষ যখন উল্লিখিত প্রশ্নসমূহের উত্তর লাভ করতে চেষ্টা করে এবং এই উপায়ে কোনো মত নির্দিষ্ট

করে নেয়, তখন এ চিন্তাপদ্ধতির অতি স্বাভাবিক পরিণতি ক্রমেই যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হয় তা এই যে, সৃষ্টিজগতের এই বিরাট ও বিস্ময়কার ব্যবস্থা নিছক একটি আকস্মিক ঘটনার বাস্তব প্রকাশ মাত্র। এর পশ্চাতে কোনো সদিচ্ছা বা মহৎ উদ্দেশ্য বর্তমান নেই, ইহা স্বতস্ফূর্তভাবেই অস্তিত্ব লাভ করেছে, নিজস্ব শক্তির সাহায্যে এর কার্যক্রম চলছে এবং শেষ পর্যন্ত নিজে নিজেই চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাবে। এই বিরাট বিশ্ব প্রকৃতির কোনো স্বত্বাধিকারী কোথাও বর্তমান নেই। আর তা থাকলেও মানুষের বাস্তব জীবনের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। মানুষকে এক প্রকার 'জন্তু' বলেই মনে করা হয় এবং সম্ভবত এক দূর্ঘটনার ফলেই এই পৃথিবীতে জন্মলাভ করেছে বলে ধারণা করা হয়। তাকে কেউ সৃষ্টি করেছে, না নিজেই তার সত্তা লাভ করেছে, তা সকলেরই অজ্ঞাত। আর মূলত এই প্রশ্ন এখানে অবান্তর। মানুষকে এই পৃথিবীতে জীবন্ত ও বিচরণশীল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তার মধ্যে নানাবিধ ইচ্ছা, বাসনা ও লালসা রয়েছে, তার প্রকৃতি নিহিত শক্তি এর চরিতার্থ করার জন্য অহর্নিশ প্রবলভাবে উত্তেজনা দেয়। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অস্ত্র-সরঞ্জাম রয়েছে ; সে সবের সাহায্যে তার অন্তর্নিহিত লালসা-বাসনা চরিতার্থ করা যেতে পারে। মানুষের চতুস্পার্শ্বের এই বিশাল বিস্তৃত ভূমির বুকে সীমা-সংখ্যাহীন উপাদান-উপকরণ বিদ্যমান রয়েছে, এ সবের উপর মানুষ নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও অস্ত্র-শস্ত্র প্রয়োগ করে নিজের বাসনা পূর্ণ করতে পারে :

অতএব তার অন্তর্নিহিত যাবতীয় শক্তি ও ক্ষমতার সাহায্যে নিজস্ব লালসা-বাসনা পূর্ণরূপে চরিতার্থ করা ভিন্ন এর ব্যবহার ক্ষেত্র আর কিছু নেই এবং সমগ্র দুনিয়া অফুরন্ত দ্রব্য-সামগ্রীর একটি ভান্ডার ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষ তার উপর হস্ত প্রসারিত করবে এবং নিজের ইচ্ছামত দ্রব্য-সামগ্রী হস্তগত করবে পৃথিবীর এটাই একমাত্র কাজ। এর উপর এমন কোনো শক্তিসম্পন্ন ও কর্তৃত্বশীল সত্তা নেই, যার নিকট মানুষ জবাবদিহি করতে বাধ্য হতে পারে। মানুষের জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য অপরিহার্য আইন-বিধান লাভ হতে পারে সত্যজ্ঞান ও পথনির্দেশ লাভের এমন কোনো উৎস কোথাও নেই। ফলত মানুষ স্বাধীন, দায়িত্বহীন ও স্বাধিকার সমন্বিত এক সত্তা। নিজের জন্য প্রয়োজনীয় আইন-বিধান রচনা, তার অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহের ব্যবহার ক্ষেত্র নির্ধারণ করা এবং পৃথিবীতে বর্তমান সকল প্রকার জীব-জন্তু ও বস্তুর সাথে নিজের সম্পর্ক ও কর্মনীতি নির্ধারণ করা তাদের নিজেদেরই কাজ। এ ব্যাপারে কোনোরূপ পথনির্দেশ লাভ করতে হলে জন্তু-জানোয়ারের জীবনে, প্রস্তর-পর্বতের ইতিকাহিনীতে এবং স্বয়ং মানুষেরই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান সম্ভারের উপর নির্ভর করতে হবে। মানুষ কারো নিকট দায়ী নয়, কারো নিকট তাকে যদি একান্তই জবাবদিহি করতে হয় তবে তা তার নিজের নিকট ; অথবা

জনগণের মধ্য হতে উদ্ভূত ও সমাজের ব্যক্তিদের উপর প্রভাবশীল রাষ্ট্রশক্তির নিকটই তাকে জবাবদিহি করতে হবে অন্য কারো নিকট নয়। পরন্তু মানুষের ইহকালীন জীবনই একমাত্র ও চূড়ান্ত জীবন, সকল প্রকার কাজের প্রতিফল এই জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ও সমাপ্তব্য। কাজেই কেবল এ দুনিয়াতে প্রকাশিত কর্মফলের ভিত্তিতেই কোনো নীতির শুদ্ধ-অশুদ্ধ, ভুল-নির্ভুল, উপকারী-ক্ষতিকর, গ্রহণযোগ্য-বর্জনীয় ইত্যাদি সবকিছুই নির্ধারিত করতে হবে।

বস্তুত এটা একটি পরিপূর্ণ জীবন-দর্শন, এতে মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পর্যবেক্ষণের সাহায্যে মানব জীবনের সকল প্রকার মৌলিক প্রশ্নের জবাব দান সকল প্রকার সমস্যার সমাধান পেশ করা হয়েছে। এই জবাবের প্রত্যেকটি অংশই অন্যান্য অংশের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত, একটির সাথে অন্যটির স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত সামঞ্জস্য এবং সাদৃশ্য বিদ্যমান। এ জন্যই এ জীবন দর্শন গ্রহণকারী মানুষ দুনিয়াতে সংগতি ও সামঞ্জস্য পূর্ণ জীবনধারা গ্রহণ করতে পারে। এই উত্তর এবং তদোদ্ভূত আচরণ ও জীবনধারা মূলত শুদ্ধ না ত্রুটিপূর্ণ সে প্রশ্ন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

মানব জীবনের মৌলিক প্রশ্নসমূহের উক্ত জবাবের ভিত্তিতে মানুষ এই দুনিয়ার বাস্তব জীবনক্ষেত্রে যে নীতি ও ভূমিকা গ্রহণ করে, অতপর তাই আলোচনা করে দেখতে হবে।

ব্যক্তিগত জীবনে উক্তরূপ দৃষ্টিভংগি ও জীবন দর্শন গ্রহণ করার ফলে মানুষ প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত পুরাপুরি স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী ও দায়িত্বহীন কর্মপন্থা গ্রহণ করে সে নিজেকে নিজের, নিজ দেহ ও দৈহিক শক্তিসমূহের একচ্ছত্র মালিক মনে করতে শুরু করে, নিজের ইচ্ছামতই এর প্রয়োগ ও ব্যবহার করে। পৃথিবীর যে বস্তুই তার করায়ত্ব হবে, যে লোকদের উপর তার কর্তৃত্ব স্থাপিত হবে, এই বস্তুবাদী ব্যক্তি তার সাথে তার মালিক হিসেবেই ব্যবহার করবে। নিছক প্রাকৃতিক নিয়মে ও সমাজ জীবনের সংঘবদ্ধ জীবনধারা ভিন্ন আর কোনো শক্তিই তার ক্ষমতা ও স্বাধীন অধিকারকে কিছুমাত্র ক্ষুন্ন বা সীমাবদ্ধ করতে পারে না। তার নিজের হৃদয়-মনে কোনো নৈতিক অনুভূতি-দায়িত্বজ্ঞান ও জবাবদিহি করার ভয় হবে না, যা তার বল্গাহারা জীবনধারা কিছুমাত্র ব্যাহত করতে পারে। যেখানে বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতা কিছুই নেই, কিংবা তা থাকা সত্ত্বেও একে উপেক্ষা করে নিজ ইচ্ছামতো কাজ করা সম্ভব। সেখানে এই মত ও জীবন দর্শনের অনিবার্য ফলে সে অত্যাচারী-বিশ্বাসঘাতক, দুর্নীতিপরায়ণ, দুষ্প্রবৃত্তিশীল জন্মপাপী ও ধ্বংসকারী অবশ্যই হবে। স্বভাবতই সে হবে স্বার্থপর, জড়বাদী ও সুবিধাবাদী (opportunist)। তার নিজের প্রবৃত্তির লালসা-বাসনা ও পাশবিক প্রয়োজন পূর্ণ করা এবং একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই কাজ করে যাওয়া ভিন্ন তার জন্ম ও জীবনের আর কোনো লক্ষ্যই থাকে না এবং যেসব জিনিস তার এই জীবন উদ্দেশ্যের

আনুকূল্য করবে, কেবলমাত্র তাই তার দৃষ্টিতে মূল্যবান ও গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীত হবে। বস্তুত ব্যক্তিগতভাবে লোকদের মধ্যে এরূপ মনোভাব ও স্বভাব-প্রকৃতির উদ্ভব হওয়া আলোচ্য মতের স্বাভাবিক ফল, এ ধরনের লোক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এবং বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক কারণে সহানুভূতিশীল হতে পারে, স্বার্থত্যাগ ও আত্মদানের ভাবধারা তার মধ্যে থাকতে পারে, তখন এক কথায় সমগ্র জীবনে একপ্রকার দায়িত্বপূর্ণ নৈতিক অনুভূতির পরিচয় সে দিতে পারে এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তার বাস্তব কাজ-কর্ম ও আচরণের বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার বুঝতে পারা যাবে যে, মূলত এটা তার স্বার্থপরতা ও আত্মম্ভরিতারই সম্প্রসারিত রূপ মাত্র। বস্তুত সে নিজে দেশের ও জাতির কল্যাণ এবং উন্নতিতে নিজেরাই উন্নতি এবং কল্যাণ দেখতে পায় আর এ জন্যই সে তার দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে। এ ধরনের মানুষ খুব বেশি কিছু হলে একজন জাতীয়তাবাদীই হতে পারে, অন্য কিছু নয়।

এতদ্ব্যতীত, এ ধরণের মনোবৃত্তিসম্পন্ন লোকদের সমন্বয়ে যে সমাজ গঠিত হবে তার বিভিন্ন দিকের অবস্থা নিম্নরূপ হবে : এর রাজনীতি মানব প্রভুত্বের উপর স্থাপিত হবে। তা এক ব্যক্তি কিংবা একটি পরিবারেরও হতে পারে অথবা বিশেষ কোনো শ্রেণীর বা জনগণের প্রভুত্বও হতে পারে। আর সর্বাপেক্ষা উন্নত যে সংঘ কায়েম করা যেতে পারে, তা হবে রাষ্ট্রসংঘ। কিন্তু সকল অবস্থায়ই আসল আইন প্রণয়নকারী হবে মানুষ। আর নিছক ইচ্ছা, লালসা, বাসনা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই সকল প্রকার আইন রচনা এবং এর রদবদল করা হবে। সুযোগ-সন্ধানী ও সুবিধাবাদী দৃষ্টিতে সকল কাজের নীতি নির্ধারণও পরিবর্তন করা হবে। সর্বাপেক্ষা অধিক ধূর্ত, শঠ, শক্তিশালী, কপট, প্রতারক, মিথ্যাবাদী, পাষাণমনা এবং পাপিষ্ঠ আত্মার লোকই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব এবং রাষ্ট্র আধিপত্য লাভ করতে পারবে এদের উপর অর্পিত হবে সমাজের নেতৃত্ব এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা ও অধিকার। তাদের বিধানগ্রন্থে শক্তিরই নাম হবে সত্য, আর দুর্বল বাতিল বলে অভিহিত হবে।

এমতাবস্থায় সমাজ ও সভ্যতার সমগ্র ব্যবস্থায়ই আত্মপূজার ভিত্তিতে স্থাপিত হবে। সকল প্রকার স্বাদ-আস্বাদন, নৈতিক বিধি-বন্ধন হতে মুক্ত হলে যেরূপ নৈতিক মানদণ্ড স্থাপিত হবে এর ফলে উদগ্র লালসার চরিতার্থতায় খুব বেশি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হতে পারবে না।

শিল্প-সাহিত্য ও অনুরূপ মানসিকতায় প্রভাবান্বিত হবে, নগ্নতা ও পাশবিকতার ভাবধারা উত্তরোত্তর তীব্র হতেও তীব্রতর হয়ে দেখা দিবে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কখনো সামন্তবাদ ও জায়গীরদারী প্রথার বিস্তার ঘটবে, কখনও পুঁজিবাদ ও ধনতন্ত্র এর স্থানে এসে দাঁড়াবে, আবার কখনো মজুর-

শ্রমিকগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে বিপ্লব সৃষ্টি করে তাদের নিজেদের নিরংকুশ একনায়কত্ব (dictatorship) কায়েম করবে। সেখানে কোনো সুবিচারপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা কোনো মতেই সম্ভব হবে না। কারণ পৃথিবী এবং এর ধন-দৌলত সম্পর্কে এহেন সমাজে প্রত্যেকটি ব্যক্তির মৌলিক আচরণ সম্পূর্ণরূপে বস্তুবাদী হবে এবং প্রত্যেকেরই ধারণা হবে যে, এই পৃথিবী একটি লুণ্ঠনক্ষেত্র সময় সুযোগ দেখে এবং ইচ্ছামতো 'হাত সাপাই' করে যতোদূর ইচ্ছা সম্পদ আত্মসাৎ করতে কোনোরূপ বাধা নেই। এই সমাজে ব্যক্তি-চরিত্র গঠনের জন্য শিক্ষা-দীক্ষার যে ব্যবস্থা চালু হবে, তার স্বভাব-প্রকৃতিও এই জীবন দর্শন এবং এই আচরণেরই অনুরূপ হবে। এই সমাজের প্রত্যেকটি নবোদ্ভূত বংশ ও অধস্তন পুরুষের মন-মগযে পৃথিবী, মানুষ এবং পৃথিবীতে মানুষের অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে পূর্ববর্ণিত রূপ-ধারণাই বদ্ধমুল করে দেয়া হবে। সকল প্রকার তথ্য ও জ্ঞানকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে শাখা সম্পর্কে হোক না কেন এমনভাবে সজ্জিত ও গঠিত করা হবে যেন জীবন সম্পর্কে এই ধারণা স্বতঃই তাদের মন ও মস্তিষ্কে বদ্ধমূল হয়ে যায়। উপরন্তু বর্তমান জীবনেই উক্তরূপ আচরণ গ্রহণ করা এবং অনুরূপ সমাজে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের সাথে স্থান লাভ করার উপযোগী করে তুলার জন্যই তাদেরকে তৈয়ার করা হবে। এরূপ শিক্ষা-দীক্ষার পরিচয় সম্পর্কে আপনাদের নিকট কিছু বলতে হবে বলে মনে করি না এর বাস্তব অভিজ্ঞতা বর্তমান সমাজ হতেই লাভ করা যায়। যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এদেশের লোকজন শিক্ষালাভ করছে তা সবই এ মতাদর্শের ভিত্তিতেই স্থাপিত হয়েছে, যদিও এর নাম রাখা হয়েছে 'ইসলামিয়া কলেজ' ও 'মুসলিম ইউনিভার্সিটি'।

বস্তুত যেরূপ আচরণের বিশ্লেষণ এখানে করা হলো, এটা খালেছ 'জাহেলিয়াতের' আচরণ, এটা সেই শিশুর আচরণেরই অনুরূপ যে শুধু বাহ্যেন্দ্রীয়ের সাহায্যে স্থুল পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে আগুনকে একটি সুন্দর খেলনা বলে মনে করতে থাকে। তবে এতোটুকু পার্থক্য আছে যে, শিশুর পর্যবেক্ষণের ভুল সঙ্গে সঙ্গেই এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার মারফতেই ধরা পড়ে যায়। কারণ, যে আগুনকে শিশু খেলনা মনে করে একে স্পর্শ করার আচরণ গ্রহণ করেছে, তা ভস্মকারী আগুন ; স্পর্শমাত্রই প্রমাণ করে দেয় যে, এটা খেলনা নয় আগুন। পক্ষান্তরে সমাজ জীবনের এই পর্যবেক্ষণ নীতির ভ্রান্তি বহু বিলম্বেই প্রমাণিত হয়, অনেকের নিকট হয়তো সারা জীবনেও তা কখনো ধরা পড়ে না। কারণ, এরা যে 'আগুনে' হস্তক্ষেপ করে এর আঁচ ইষদুষ্ণ, সহসাই এবং স্পর্শমাত্রই এর তাপ দু:সহভাবে অনুভূত হয় না। অনেক ক্ষেত্রে তা শতাব্দীকাল পর্যন্ত উত্তপ্ত করতে থাকে। এতদসত্ত্বেও এ সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করার কারো ইচ্ছা হলে তারও যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে এ মতাদর্শের বদৌলতে জনগণের বেঈমানী, শাসকদের যুলুম-পীড়ন, বিচারকদের

অবিচার, ধনীদের স্বার্থপরতা ও শোষণ এবং সাধারণ লোকদের অসচ্চরিত্রতা ও দুর্নীতিপরায়ণতার যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ হয় এবং এ মতাদর্শের ফলে জাতি-পূজা, জাতি-প্রীতি, সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ, ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম দেশ জয় ও জাতি হত্যার যে অগ্নিস্ফুলিংগ নির্গত হয় তা প্রত্যক্ষ করে অতি সহজেই ধরে নেয়া যেতে পারে যে, এটা নিরেট অন্ধতা ও খালেছ জাহেলিয়াতেরই আচরণ, তাতে সন্দেহ নেই। বস্তুত এটা কোনো বৈজ্ঞানিক আচরণ নয়, বুদ্ধিভিত্তিক ও চিন্তামূলক আচরণও এটা নয়। কারণ নিজের এবং বিশ্ব-চরাচরের ব্যবস্থা সম্পর্কে যে ধারণা নির্দিষ্ট করে মানুষ উক্তরূপ আচরণ অবলম্বন করেছে তা প্রকৃত অবস্থা ও সত্যিকার ঘটনার অনুরূপ নয়। তাহলে এর পরিণতি যে এরূপ খারাপ হতে পারতনা, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

অতপর জ্ঞান লাভের অন্যান্য প্রচলিত পন্থারও যাচাই করে দেখা আবশ্যক। মানব জীবনের মৌলিক সমস্যার সমাধান, মৌলিক প্রশ্নের জবাব দান করার দ্বিতীয় পন্থা হচ্ছে নিছক ধারণা ও আন্দায-অনুমানের ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করা এবং জীবনের উক্ত বিষয় সম্পর্কে কোনো চূড়ান্ত মত নির্দিষ্ট করা। এ পন্থা হতে তিনটি বিভিন্ন মত কায়েম করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটি মত হতেই একটি বিশেষ ধরনের আচরণ উদ্ভূত হয়েছে।

শির্‌ক

একটি মত হচ্ছে এই যে, বিশ্ব প্রকৃতির এই বিরাট ব্যবস্থা যদিও কোনো 'রব' ব্যতীত চালু হওয়া সম্ভব হয়নি, কিন্তু এর খোদা (ইলাহ ও রব) একজন মাত্র নয়, তারা অসংখ্য বহু। বিশ্বজগতের বিভিন্ন শক্তির গোড়ার সূত্র বিভিন্ন খোদার হাতে নিবদ্ধ ; মানুষের সৌভাগ্য, দুর্ভাগ্য, সাফল্য, ব্যর্থতা, লাভ-লোকসান ইত্যাদি অসংখ্য ঐশ্বরিক সত্তার অনুগ্রহ ও অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল। এ মতাদর্শ অবলম্বনকারীগণ আন্দায-অনুমানের সাহায্যে উক্ত খোদাসুলভ শক্তিসমূহের উৎস ও অবস্থান নির্ধারণের জন্য বিশেষ চেষ্টা করছে। ফলে এই অনুসন্ধান ব্যাপদেশে যে যে শক্তির উপরই তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে, তাদেরকেই এরা 'খোদা' মনে করেছে। এ মত গ্রহণ করার পর মানবজীবনে যেরূপ আচরণ স্বত:ই কার্যকরী হয়, তার পরিচয় নিম্নরূপ :

প্রথম : এর ফলে মানুষের সমগ্র জীবন অবাস্তব আন্দায-অনুমানের পাদপীঠে পর্যবসিত হয়। মানুষ তখন বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিসম্মত পন্থা ছাড়া নিছক আন্দায-অনুমানের সাহায্যে অসংখ্য বস্তুকে অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন বলে মনে করতে শুরু করে, তারা অলৌকিক ও অতি প্রাকৃতিক পন্থায় মানুষের ভাগ্যের উপর ভালো কিংবা মন্দ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম বলে মনে করে। এ জন্য মানুষ উক্ত মতের বিশ্বাসী ব্যক্তি ভালো প্রভাবের অবাস্তব আশায় এবং মন্দ প্রভাবের

অবান্তর ভয়ে নিমজ্জিত হয়ে নিজের বিপুল শক্তি অর্থহীনভাবে অপচয় করে। কোথাও কোনো সমাধির প্রতি আশা পোষণ করতে শুরু করে যে, এটা তার অসাধ্য কাজ সুসম্পন্ন করে দিবে ; কোথাও কোনো দেবতার উপর ভরসা করা হয় এবং সে মানুষের ভাগ্য ভালো করে দিবে বলে আশা করা হয়। এরূপ কাল্পনিক উপাস্য ও অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তিকে খুশি করার জন্য এসব মানুষ চেষ্টা করে। কোথাও এতোটুকু কু-লক্ষণ দেখতে পেলে এদের মন ভেঙ্গে পড়ে হতাশায় কাতর হয়। আবার কোথাও ভালো লক্ষণের উপর আশা ভরসার কাল্পনিক প্রাসাদ রচনা করে বসে। এই জিনিসই তার মতবাদ, চিন্তাধারা এবং তার চেষ্টা-সাধনাকে স্বাভাবিক পন্থা হতে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত করে এক সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক পথে পরিচালিত করে।

দ্বিতীয় : এ মতের কারণেই পূজা পাঠ, মানত, উপহার, অর্ঘ্য এবং অন্যান্য অসংখ্য প্রকার আচার-অনুষ্ঠানের এক দীর্ঘ কর্মতালিকা রচিত হয়ে পড়ে। আর তাতে জড়িত হওয়ার কারণে মানুষের কর্ম প্রচেষ্টার একটি বিরাট অংশ অর্থহীন কার্যকলাপে ব্যয়িত হয়।

তৃতীয় : এই মুশরেকী কল্পনা-পূজার কুসংস্কারে তারা নিমজ্জিত হয়, ধূর্ত ও শঠ ব্যক্তিগণ তাদেরকে নিজেদের প্রতারণার জালে আবদ্ধ করে অর্থ লুণ্ঠন করার বিরাট সুযোগ লাভ করতে পারে। ফলে কেউ রাজা বা বাদশাহ হয়ে বসে এবং সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য দেবতার সাথে নিজের বংশের সম্পর্ক দেখিয়ে লোকদের মনে এই বিশ্বাস জন্মাতে চেষ্টা করে যে, তারাও অন্যতম খোদা ; আর তোমরা তাদের দাস। কেউ পুরোহিত সেজে বসে এবং বলে যে, যাদের হাতে তোমাদের লাভ-ক্ষতির মূল চাবিকাঠি নিহিত রয়েছে তাদের সঙ্গে আমাদের নিকট সম্পর্ক বিদ্যমান ; কাজেই তোমরা আমাদের মাধ্যমে তাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছাতে পার। কেহ পণ্ডিত, ব্রহ্মণ ও পীর হয়ে বসে, তাবীজ-তুমার, ঝাড়-ফুঁক, মন্ত্র-তন্ত্র এবং সাধনা বা 'হাসিলিয়াতের' জাল বিস্তার করে, আর লোকদের মনে এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাতে চায় যে, আমাদের এসব জিনিস অলৌকিক ও অতি প্রাকৃতিক উপায়ে তোমাদের সকল প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারে দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করতে পারে, ব্যথা-বেদনা প্রশমিত করতে পারে। এরপর এসব চতুর লোকের পরবর্তী বংশ একটি স্থায়ী ও স্বতন্ত্র মর্যাদা সম্পন্ন পরিবার বা শ্রেণীতে পরিণত হয়। ফলে তাদের অধিকার, মর্যাদা, স্বাতন্ত্র এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি কালের অগ্রগতির সংগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, সম্প্রসারিত ও গভীরতর ভিত্তিতে সুদৃঢ় হতে শুরু করে। এর দরুন এরূপ বিশ্বাস-মতবাদের দৌলতে জনসাধারণের মাথার উপর রাজ পরিবার, ধর্মীয় পদাধিকার ও আধ্যাত্মিক নেতাদের খোদায়ী মজবুতভাবে স্থাপিত হয়। এবং কৃত্রিম খোদা লোকদেরকে একান্ত দাসানুদাসে পরিণত করে

মনে হয় যেন এরা তাদের জন্য দুগ্ধ দান, ভারবহন ও যানবাহনের কাজ করার জন্তু ছাড়া আর কিছুই নয়।

চতুর্থ : এই মতাদর্শ যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য এবং পুর্ণাঙ্গ সমাজব্যবস্থা ও রাজনীতির জন্য কোনো স্থায়ী ও স্বতন্ত্র ভিত্তি উপস্থিত করতে পারে না, অনুরূপভাবে এহেন কাল্পনিক 'খোদা'দের নিকট হতে মানুষ অনুসরণযোগ্য কোনো প্রকার জীবন ব্যবস্থাও লাভ করতে পারে না। মানুষ এই কাল্পনিক 'খোদাদের' অনুগ্রহ ও সাহায্য লাভের আশায় পূজা-উপাসনা ও কয়েকটি নির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান যথারীতি পালন করতে থাকবে এই খোদাদের সাথে সম্পর্ক এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে। মানব জীবনের বৃহত্তর ও বিশালতর ক্ষেত্রে জীবনের বাস্তব কাজ-কর্মের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইন-কানুন রচনা করা ও কর্মনীতি নির্ধারণ করা মানুষের নিজেদের সম্পূর্ণ স্বাধিকারমূলক কাজ হবে মাত্র। এভাবে 'মুশরিক' শির্ক ভিত্তিক সমাজ কার্যত নিরেট অন্ধতার খালেছ জাহেলিয়াতের পূর্ববর্ণিত পথেই চলতে বাধ্য হয়। নৈতিক চরিত্র, বাস্তব কাজ-কর্ম, সামাজিক ধরণ-পদ্ধতি, রাজনীতি, অর্থব্যবস্থা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য সকল ক্ষেত্রেই শির্ক ভিত্তিক জীবন-দর্শন উদ্ভূত আচরণ খালেছ জাহেলিয়াতের আচরণেরই অনুরূপ, নীতিগতভাবে এদের মধ্যে কোনোই পার্থক্য হয় না।

বৈরাগ্যবাদ

বাস্তব পর্যবেক্ষণের সাথে অমূলক আন্দায-অনুমান সংমিশ্রণের ফলে মানব-জীবনের মৌলিক প্রশ্নের দ্বিতীয় যে উত্তরটি ঠিক করা হয়েছে, এক কথায় বলা যায় বৈরাগ্যবাদ। এ মতাদর্শের গোড়ার কথা এই যে, পৃথিবী এবং মানুষের শারীরিক সত্তা স্বয়ং মানুষের জন্য একটি 'শাস্তি কেন্দ্রবিশেষ' আর মানুষের আত্মাকে একটি দন্ডপ্রাপ্ত কয়েদীর ন্যায় পিঞ্জিরাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। বস্তু জগতের সাথে একটি জড় সম্পর্ক বর্তমান থাকায় মানুষের মধ্যে লোভ-লালসা, ইচ্ছা-বাসনা এবং প্রয়োজনীয় যা কিছুই রয়েছে মূলত তা সবই বন্দীখানার শৃংখল বিশেষ। এই পৃথিবী এবং এর দ্রব্য সামগ্রীর সাথে মানুষ যতোই সম্পর্ক রক্ষা করে চলবে, ততোই তার এই শৃংখলের বন্ধন দৃঢ়তর হবে এবং সে ততোধিক কঠোর শাস্তির যোগ্য বিবেচিত হবে। এই শাস্তি হতে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে জীবনের সকল প্রকার সম্পর্ক সম্বন্ধ ও ধান্ধা- ঝামেলা পরিপূর্ণ সাফল্যের সাথে এড়িয়ে স্বাভাবিক লোভ-লালসা ও ইচ্ছা-বাসনাকে কঠোরভাবে অবদমিত করা, স্বাদ-আস্বাদন পরিহার করা, শারীরিক প্রয়োজন এবং প্রবৃত্তির দাবি ও প্রেরণাকে দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার করা ; রক্ত-মাংসের বাস্তব সম্পর্কের কারণে হৃদয় মনে যে প্রেম-ভালবাসার উদ্রেক হয়, পূর্ণরূপে তার

মূলচ্ছেদ করা এবং এই শত্রুকে মন ও দেহকে কঠোর ও অন্তহীন কৃচ্ছসাধনার সাহায্যে এমনভাবে নিস্পেষিত করা যেনো আত্মার উপর এর কোনরূপ প্রভাব-প্রভুত্ব আদৌ স্থাপিত হতে না পারে। এর ফলে আত্মা লঘু ও পবিত্র হবে এবং মুক্তির উচ্চতম মার্গে উড্ডীন হওয়ার শক্তি লাভ করতে পারবে।

এরূপ মতাদর্শের ফলে মানবজীবনের নিম্নলিখিত রূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

প্রথমত, এর প্রভাবে মানুষের সমগ্র ঝোঁক-প্রবণতা সমষ্টিবাদ হতে ব্যষ্টিবাদের দিকে এবং সমাজ ও সভ্যতা হতে বর্বরতার দিকে নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষ পৃথিবী এবং জীবনধারা হতে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ হয়ে পড়ে। কোনো জৈবিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয় না, তার সমগ্র জীবন অসহযোগ ও সম্পর্কহীনতার বাস্তব প্রতিমূর্তিতেই পরিণত হয়। তার চরিত্র সম্পূর্ণ নেতিবাচক (negative) ভাবধারায় নিস্ক্রিয় হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত, এই মতাদর্শের প্রবল প্রভাবে সমাজের উত্তম ও সৎলোকেরা পৃথিবীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্জন একাকীত্বের নিভৃততম কোণে আশ্রয় নেয় এবং নিজের ব্যক্তিগত মুক্তি সাধনায় একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করে। ফলত পৃথিবীর সকল প্রকার দায়িত্ব ও কর্তৃত্বপূর্ণ কাজ কর্মের চাবিকাঠি সমাজের সর্বাপেক্ষা দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে।

তৃতীয়ত, সমাজ ও সভ্যতার ক্ষেত্রে এ মতের যে প্রভাব আবর্তিত হয়, তার ফলে লোকদের মধ্যে নেতিবাচক (negative) নৈতিকতা, সমাজবিরোধী (individualistic) ভাবধারা এবং নৈরাশ্যব্যঞ্জক মতবাদ সৃষ্টি হয়। তাদের কর্মশক্তি ও কার্যদক্ষতা ক্ষীণ হতেও ক্ষীণতর হয়ে যায়। অত্যাচারীদের জন্য তারা 'সহজভোগ্য' হয়ে পড়ে এবং সকল দুর্ধর্ষ নিপীড়ক সরকার তাদেরকে অতি সহজেই হস্তগত করে নিতে পারে। বস্তুত এই মতাদর্শ জনগণকে যালেম লোকদের পক্ষে বিনয়াবনত ও পোষমানা (tame) বানিয়ে দিতে যাদুর মতো অব্যর্থ।

চতুর্থত, মানব প্রকৃতির সাথে এই বৈরাগ্যবাদী জীবন দর্শনের চিরস্থায়ী যুদ্ধ শুরু হয় এবং প্রায়ই এটা সংগ্রামে পরাজিত হয়। এটা পরাজিত হলে নিজের দুর্বলতা গোপন করার জন্য তারা নানা ফন্দি ও কূটকৌশলের সাহায্যে আত্মপ্রতারণা করতে বাধ্য হয়। বিভিন্ন প্রাচীণ ধর্মে 'কাফ্ফারা' এশকে মাজাযী দুনিয়া ত্যাগের আবরণে দুনিয়া পূজার এই যে পংকিল ও লজ্জাকর অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট হয়েছে, তার মূল কারণ এখানেই নিহিত রয়েছে।

সর্বেশ্বরবাদ

অবাস্তব আন্দায-অনুমানভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলনের ফলে তৃতীয় যে মতটির সৃষ্টি হচ্ছে, তা হচ্ছে সর্বেশ্বরবাদ (pantheism)। অর্থাৎ মানুষ ও বিশ্বজগতের সমগ্র জিনিসই মূলত অপ্রকৃত। এদের আদৌ কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই। বস্তুত একটি সত্তাই এ সমগ্র বস্তুজগতকে আত্মপ্রকাশের মাধ্যমরূপে গ্রহণ করেছে মাত্র এবং তাই এ সকলের মধ্যে স্বতস্ফূর্তভাবে প্রকাশমান। বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করলে এ মতাদর্শের অসংখ্য রূপ প্রকাশিত হয়। সমগ্র সৃষ্টিজগত, বস্তুজগত একটি মাত্র সত্তারই বহি:প্রকাশ মাত্র। মূলত সেই সত্তাই বর্তমান, অন্যান্য যা কিছু পরিদৃষ্ট হয় আসলে তা কিছুই নয় এই একটি মাত্র সত্তাই হচ্ছে এর সারকথা।

এ মতাদর্শের ফলে মানুষের মনে সৃষ্টি হয় সংশয়বাদ। তার নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কেই তার মনে জেগে উঠে সন্দেহের নিরন্ধ্র তমিস্রা। ফলে তার দ্বারা বাস্তব দুনিয়ার কোনো কাজই যে স্বত:প্রবৃত্তভাবে সম্পন্ন হতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য। সে নিজেকে একটি কাষ্ঠ নির্মিত পুত্তলিকা মনে করতে শুরু করে, যাকে অন্য কেউ অন্তরালে থেকে নাচাচ্ছে, অথবা অন্য কেউ তার মধ্যে থেকে নৃত্য করছে। সে তার এই অমূলক কল্পনার গভীর পংকে আত্মনিয়োগ হয়ে পড়ে। তার নিজের জীবনের কোনো উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যই থাকতে পারে না, কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মপথও নয়। সে মনে করে আমি নিজে তো কিছুই নই আমার করারও কিছু নেই। আর আমার করার কিছু থাকতেও পারে না। মূলত সেই সার্বিক সত্তা যা আমার মধ্যে ও সমস্ত সৃষ্টিজগতের পরতে পরতে বিকাশমান যা অজ্ঞাত আদি হতে অনন্তকাল পর্যন্ত চলে আসছে, সকল কাজ তারই, সকল কর্ম সে-ই সম্পন্ন করে। সত্তা যদি পরিপুর্ণ হয়ে থাকে, তবে আমিও পরিপূর্ণ, অতএব আমার চেষ্টা-সাধনা করার কোনো প্রয়োজন নেই। আর সেই সত্তাই যদি নিজের পূর্ণতা বিধানের জন্য চেষ্টিত হয়ে থাকে, তাহলে যে বিশ্বব্যাপক গতি সহকারে সে নিজের পূর্ণতা লাভের দিকে অব্যাহতভাবে ছুটে চলেছে। একটি অংশ হিসেবে এর দিকে আবর্তনে পড়ে আমিও সে দিকে পৌঁছতে পারবো। আসলে আমি একটি অংশবিশেষ, সার্বিক সত্তা কোথায় যাচ্ছে এবং কোথায় যেতে চাচ্ছে, তা আমি কিছুই জানি না।

এরূপ চিন্তা পদ্ধতির বাস্তব ফল বৈরাগ্যবাদী জীবন দর্শনের অনুরূপই হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে এমত গ্রহণকারীদের কর্মনীতির সাথে খালেছ জাহেলিয়াতের অনুসারীদের কর্মনীতির সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। কারণ এদের সকলেই নিজেদের সমগ্র জীবনকে নিজেদের প্রবৃত্তি ও অন্ধ লালসার দাসানুদাসে পরিণত করে। ফলে তাদের প্রবৃত্তি তাদেরকে যে দিকে নিয়ে যায়, তারা

নির্বিচারে ও নির্বিকার চিত্তে সে পথেই ছুটতে থাকে। তারা মনে করে যে, তারা নিজেরা মোটেই চলছে না, যা ঘটছে তা সার্বিক সত্তাই করছে।

বস্তুত শেষোক্ত তিনটি মতাদর্শও প্রথমোল্লিখিত মতের ন্যায় জাহেলিয়াতের বিষাক্ত ভাবধারায় ভরপুর। ফলে এ মতের অনুসারীদের সমগ্র জীবন জাহেলিয়াতের বিষক্রিয়ায় জর্জরিত হয়ে পড়ে। কারণ প্রথম কথা এই যে, এসব মতাদর্শের কোনো একটিরও কোনো বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই, নিছক কল্পনা ও আন্দায-অনুমানের উপর একান্তভাবে নির্ভর করেই বিভিন্ন প্রকার মত রচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এসব মতাদর্শ প্রকৃত ও বাস্তব অবস্থার যে সম্পূর্ণ বিপরীত, তা বাস্তব অভিজ্ঞতা হতে প্রমাণিত হয়। এসবের মধ্যে একটি মতও যদি প্রকৃত অবস্থার অনুরূপ হতো তবে তদনুযায়ী কাজ করলে খারাপ ফল হওয়ার কোনোই কারণ থাকতে পারে না। একটি জিনিস ভক্ষণ করলেই যখন নিশ্চিতরূপে মানুষের পেটে ব্যথার সৃষ্টি হতে দেখা যায় তখন আমরা সকলেই একথা নির্ভুল বলে বুঝতে পারি যে, পাকস্থলীর গঠন প্রকৃতি এবং এর হজম-শক্তির সাথে এই জিনিসটির বস্তুতই কোনো সামঞ্জস্য নেই। অনুরূপভাবে শির্ক, বৈরাগ্যবাদ এবং সর্বেশ্বরবাদের মতাদর্শ গ্রহণ করলে সমগ্র মানবতা যখন নিশ্চিতরূপে বিপর্যস্ত ও সর্বতোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর এই ব্যাপারে যখন আর কোনো সন্দেহ নেই, তখন সংশ্লিষ্ট মতাদর্শের কোনো একটিও যে বাস্তব অবস্থা ও প্রকৃত সত্যের অনুরূপ নয়, তাতেও বিন্দুমাত্র সংশয় থাকতে পারে না।

ইসলাম

এরপর তৃতীয় পন্থাটি সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। মানব জীবনের মৌলিক প্রশ্নাবলীর জবাব লাভ বুনিয়াদি সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য এটাই হচ্ছে চূড়ান্ত ও সর্বশেষ উপায়। আল্লাহর প্রেরিত নবীগণ এসব প্রশ্নের যে জবাব দিয়েছেন, মানব জীবনের মৌলিক সমস্যার যে সমাধান দেখিয়েছেন, আন্তরিকতার সাথে তাই পূর্ণরূপে গ্রহণ করার নামই হচ্ছে ইসলাম।

একটি উদাহরণের সাহায্যে এ পন্থাটি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা যেতে পারে। কোনো নতুন ও অপরিচিত স্থানে সর্বপ্রথম উপস্থিত হলে আর সেই স্থান সম্পর্কে নিজের বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা না থাকলে তখন অন্য কারো নিকট জিজ্ঞেস এবং তার পথনির্দেশ অনুসারে সে স্থান পরিভ্রমণ করাই হয় একমাত্র উপায়। এরূপ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট স্থান সম্পর্কে পূর্ণ অভিজ্ঞতার দাবিদার ব্যক্তিকেই সর্বপ্রথম খুঁজে বের করতে হয়। এরূপ লোকের সাক্ষাত পেলে সে ব্যক্তি বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য কিনা, নানাভাবে পরীক্ষা ও যাচাই করে সে সম্পর্কে নি:সন্দেহ হওয়ার চেষ্টা করতে হয়। তারপরই এই ব্যক্তির নেতৃত্বে পথ চলে দেখতে হয় এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা যখন প্রমাণিত হয় যে, তার নিকট লব্ধ জ্ঞান তথ্য

অনুসারে কাজ করে বাস্তব ক্ষেত্রে কোনো ক্ষতি হয়নি বা খারাপ ফল নির্গত হয়নি, তখনই এই ব্যক্তির নির্ভুল অভিজ্ঞতা এবং সংশ্লিষ্ট স্থান সম্পর্কে তার উপস্থাপিত স্থান তথ্যের সততা সম্বন্ধে মনে আর কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ থাকে না। বস্তুত এই কর্মপন্থা মূলতই বৈজ্ঞানিক। এতদ্ব্যতীত অন্য কোনো বৈজ্ঞানিক পন্থা যখন আর হতেই পারে না, তখন মত নির্ধারণের ব্যাপারে এটাকেই বিশুদ্ধ, নির্ভুল পন্থারূপে গ্রহণ করতে হয়।

এ উদাহরণ সম্মুখে রেখে মানব জীবনের মৌলিক প্রশ্নাবলীর জবাব লাভ করার সঠিক পন্থা নির্ণয় করা খুবই সহজ। মানুষের পক্ষে এ দুনিয়া অভিনব, অপরিচিত ও অজ্ঞাতপূর্ব স্থান। এটার নিগূঢ় তত্ত্ব এবং মৌলিক অবস্থা সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানে না। এ পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা কোন্ ধরনের এবং কোন্ ধাঁচের, কোন্ আইন অনুযায়ী এ বিশ্ব-কারখানা পরিচালিত হচ্ছে, এ পৃথিবীর বুকে মানুষের পক্ষে অনুকূল আচরণ নীতি কি হতে পারে, সে সম্পর্কে মানুষ একেবারেই অনভিজ্ঞ। ফলে বাহ্যদৃষ্টিতে দুনিয়া সম্পর্কে যা কিছু ধারণা করা যায় তাই মানুষ ধারণা করে, তাকেই চূড়ান্ত সত্য বলে মনে করে এবং সে অনুসারে যেরূপ কর্মনীতি অবলম্বন করা কর্তব্য মনে হয় মানুষ তাই করে। কিন্তু এর বাস্তব ফল অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়ে।

এরপর মানুষ নিছক আন্দায-অনুমানের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন মত ঠিক করতে থাকে এবং প্রত্যেকটি মত অনুযায়ী কাজ করার পর তার তিক্ত ফল ভুগতে থাকে। এরপর সর্বশেষ ও চূড়ান্ত পন্থা এই থেকে যায় যে, মানুষ আল্লাহর প্রেরিত নবীদের নিকট পথের সন্ধান জানতে চাইবে। নবীগণ নিজেদেরকে 'প্রকৃত সত্য নিগূঢ় তথ্য সম্পর্কে পূর্ণ অভিজ্ঞরূপে' পেশ করেন তার দাবিও তাঁরা করে থাকেন। তাঁদের যাবতীয় অবস্থার যতোই পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা যায়, ততোই তাঁরা অত্যন্ত সত্যবাদী, বিশ্বাসযোগ্য আমানতদার, সততাসম্পন্ন সচ্চরিত্রবান, নিঃস্বার্থ এবং নির্ভুল চিন্তার ধারক বলে প্রমাণিত হয়। কাজেই শুরুতেই বিশ্বাস করার এবং তাদের প্রতি আস্থা স্থাপনের যুক্তিসংগত কারণ বর্তমান রয়েছে।

অতপর দুনিয়া সম্পর্কে এবং দুনিয়ার মানুষের অবস্থান সম্পর্কে যেসব জ্ঞান-তথ্য তাঁরা পরিবেশন করেন, তাঁরা সত্যাসত্য যৌক্তিকতার এবং বাস্তবক্ষেত্রে তার সামঞ্জস্য পরীক্ষা করতে হবে। উপরন্তু তার বিরুদ্ধে কোনো বাস্তব (কর্মগত) প্রমাণ আছে কিনা এবং তদনুযায়ী যে আচরণ নীতি দুনিয়ায় অবলম্বন করা হচ্ছে, বাস্তব পরীক্ষায় তা কিরূপে প্রমাণিত হলো, তাও বাছাই করে দেখতে হবে। তদন্ত ও যাচাই গবেষণার পর এ তিনটি কথারই উত্তর যদি নি:সন্দেহ রূপে লাভ করা যায়, তাহলে নবীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা কর্তব্য এবং তাঁদের

পথনির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা আর এ মতাদর্শের সাথে বাস্তব সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য জীবনের কর্মক্ষেত্রের যেরূপ আচরণ ও কর্মনীতি গ্রহণ করা উচিত তা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়।

পূর্বেই বলেছি, জাহেলিয়াতের পূর্বোক্ত পন্থাসমূহের মুকাবিলায় শেষোক্ত পন্থাটি নিঃসন্দেহে বৈজ্ঞানিক। এই বিজ্ঞানের সম্মুখে মানুষ যদি নতি স্বীকার করে, স্বেচ্ছাচারিতা ও আত্মম্ভরিতা পরিহার করে যদি এটাকেই অনুসরণ করে এবং এই 'বিজ্ঞান' মানুষের জন্য যে সীমা নির্ধারণ করেছে তা রক্ষা করেই যদি তারা জীবন যাপন করে, তবে এটাই হবে ইসলামী কর্মপন্থা।

মানুষ ও বিশ্ব সম্পর্কে নবীদের মত

নবীগণ বলেন, মানুষের চতুর্দিকে বিদ্যমান এই বিরাট বিশাল বিশ্বভূবন মানুষ যার একটি অংশ কোনো আকস্মিক দূর্ঘটনার ফল নয়। এটা এক শৃঙ্খলাপূর্ণ সুসংঘবদ্ধ ও নিয়মতন্ত্র সম্মত সাম্রাজ্য বিশেষ। আল্লাহ তায়ালাই এটা সৃষ্টি করেছেন, তিনিই এর মালিক, তিনিই এর একমাত্র শাসনকর্তা ও নিয়ন্ত্রণকারী। সমগ্র সৃষ্টিজগত একটি সার্বিক ব্যবস্থার (totalitarian system) অধীন। এখানকার সমগ্র ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব একমাত্র কেন্দ্রীয় শক্তির হস্তে নিবদ্ধ। সেই উচ্চতর ক্ষমতাসম্পন্ন সত্তা ভিন্ন এই প্রাকৃতিক জগতে অন্য কারো বিধান চলে না। বিশ্ব ব্যবস্থার যতো শক্তিই কর্মনিরত হয়ে আছে, তা সবই এক কেন্দ্রীয় ক্ষমতার অধীন এবং অনুগত। তার বিধান ও নির্দেশের বিরোধিতা করা কিংবা তার অনুমতি ব্যতীত নিজের ইচ্ছামত কোনো কাজ করার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা কারো নেই। এই সঠিক ব্যবস্থায় কোনরূপ স্বাধীনতার (independence) ও দায়িত্বহীনতার (irresponsibility) আদৌ অবকাশ নেই। আর স্বভাবতই তা থাকতে পারে না।

মানুষ এ জগতে জন্মগত প্রজা (born subject) হওয়া তার ইচ্ছা সাপেক্ষ নয় বরং প্রজা হিসেবেই তার জন্ম হয়েছে ; আর প্রজা ভিন্ন অন্য কিছু হওয়াও তার পক্ষে অসম্ভব। অতএব নিজের জন্য জীবন ব্যবস্থা রচনা করা এবং নিজের কর্তব্য নির্ধারণ করার কোনো অধিকারই তার নেই।

মানুষ নিজে বিশ্ব ভূবনের কোনো কিছুরই মালিক নয়। কাজেই মালিকানা ব্যবহারের পদ্ধতি তার রচনা করার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। তার নিজের শরীর, তার অন্তর্নিহিত সকল প্রকার ক্ষমতা-প্রতিভা একমাত্র আল্লাহর মালিকানা আল্লাহরই অবদান মাত্র। কাজেই এসবের কোনো অধিকার তার থাকতে পারে না। যিনি মানুষকে এসব জিনিস দান করেছেন, তাঁরই মর্জি ও বিধান অনুযায়ী এর ব্যবহার করাই মানুষের কর্তব্য।

অনুরূপভাবে মানুষের চতুষ্পার্শ্বে দুনিয়ার বিভিন্ন দিকে যেসব দ্রব্য-সামগ্রী ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে বর্তমান রয়েছে জমি, জন্তু, পানি, উদ্ভিদ, গাছপালা ও গুল্ম-লতা, খনিজ পদার্থ ইত্যাদি সবকিছুই আল্লাহ তায়ালার মালিকানা, মানুষ এর মালিক নয়। কাজেই সে সবের উপরও নিজের ইচ্ছামত হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকারই মানুষের নেই। বরং প্রকৃত মালিক এসব ব্যবহার করার জন্য যে নিয়ম-বিধান রচনা করে দিয়েছেন তদনুযায়ী এটা ব্যয়-ব্যবহার করা মানুষের কর্তব্য।

দুনিয়ার বুকে যতো মানুষ বসবাস করেছে, তাদের জীবন পরস্পর ওতপ্রোত জড়িত। এরা সকলেই আল্লাহ তায়ালার 'প্রজা'। অতএব এদের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন ও কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য নিয়ম-নীতি নির্ধারণের কোনো অধিকার এই মানুষের নেই। একমাত্র আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী এসব কাজ আঞ্জাম দেয়া কর্তব্য। আল্লাহর দেয়া বিধানের ভিত্তিতেই তাদের সম্পর্ক-সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু আল্লাহর সেই বিধান কি? পয়গাম্বরগণ বলেন যে, যে জ্ঞান উৎস হতে আমরা দুনিয়ার এবং স্বয়ং মানুষের নিগূঢ় তত্ত্ব জানতে পেরেছি সেই সূত্র হতে আমরা আল্লাহর বিধানও পেয়েছি, আল্লাহ নিজেই আমাদের এই জ্ঞান দান করেছেন এবং দুনিয়ার সমগ্র মানুষকে এ দিক দিয়ে পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ ও অবহিত করার জন্য আমাদেরকে আদেশ করেছেন। অতএব আমাদের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করা আমাদেরকে মহামহিমান্বিত 'বাদশাহের' প্রতিনিধি মনে করা এবং আমাদের নিকট হতে আল্লাহর প্রামাণ্য বিধান গ্রহণ করাই মানুষের কর্তব্য।

পয়গাম্বরগণ আরও বলেন, আপত দৃষ্টিতে নিখিল বিশ্বপ্রকৃতির সমগ্র কাজ সুষ্ঠু সুসংবদ্ধ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে চলতে দেখা যায় বটে কিন্তু কোথাও কোনো পরিচালক পরিদৃষ্ট হয় না, তার কর্মচারী কোনখানে দৃষ্টিগোচর হয় না। ফলে মানুষ এখানে এক প্রকারের স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারের অবকাশ অনুভব করে, মানুষ এখানে 'মালিকের' ন্যায় আচরণ করতে পারে। প্রকৃত মালিক ভিন্ন অপরের সম্মুখে দাসত্ব ও আনুগত্যের অনুভূতিতে মাথাও নত করতে পারে, আর সকল অবস্থায়ই তার 'রিযক' জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী অব্যাহতভাবে লাভ করতে সক্ষম হয়। সকল প্রকার কাজের সুবিধা লাভ করতে পারে। কিন্তু আল্লাহদ্রোহিতার প্রতিফল সংগে সংগে পায় না। মূলত এসব মানুষের পরীক্ষার জন্য করা হয়েছে। মানুষকে যেহেতু জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, উদ্ভাবন ও নির্বাচন শক্তি দান করা হয়েছে, এ কারণেই প্রকৃত 'মালিক' 'রাজাধিরাজ' নিজেকে এবং নিজের অদৃশ্য রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে লোক চক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে রেখেছেন। মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত এ শক্তিসমূহের বাস্তব প্রয়োগ ও ব্যবহার

কিভাবে করে তার পরীক্ষা ও যাচাই করাই তাঁর উদ্দেশ্য। আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি, নির্বাচন স্বাধীনতা freedom of choice) এবং এক প্রকারের 'স্বরাজ' (autonomy) দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। এখন মানুষ যদি তার জন্মগত প্রজা হওয়ার কথা হৃদয়ংগম করে এবং সাগ্রহে ও স্বেচ্ছায় এ 'মর্যাদা'কেই গ্রহণ করে এ মর্যাদা গ্রহণের জন্য কোনো দিক দিয়েই কোনরূপ যবরদস্তি না হওয়া সত্ত্বেও; তবেই মানুষ তাদের সৃষ্টিকর্তার এ পরীক্ষায় সফলকাম হতে পারবে। পক্ষান্তরে প্রজা হওয়ার মর্যাদা যদি মানুষ বুঝতে না পারে কিংবা বুঝতে পেরেও বিদ্রোহীর ভূমিকা গ্রহণ করে, তবে পরীক্ষায় তার ব্যর্থতা অনিবার্য। অথচ এ পরীক্ষার জন্যই মানুষকে দুনিয়ায় সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা দান করা হয়েছে। দুনিয়ায় অসংখ্য জিনিসই মানুষের কর্তৃত্বাধীনে রাখা হয়েছে। আর সেই সংগে একটি জীবন ব্যাপী সময় তাকে অবকাশ দেয়া হয়েছে।

অতপর পয়গাম্বরগণ এও বলেছেন যে, পার্থিব জীবন যেহেতু একটানা ও নিরবচ্ছিন্ন একটি পরীক্ষার মুহূর্ত, কাজেই কাজ কর্মের প্রকৃত হিসেব এই দুনিয়ায় হবে না, কোনো প্রতিফল শাস্তি বা সম্মানও এখানে লাভ হবে না।[১]

মানুষ এ দুনিয়াতে যা কিছু 'ভালো' লাভ করে তা যে কোনো পুণ্যের প্রতিফলই হবে এমন কোনো কথা নেই। তা মানুষের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্ট হওয়ার প্রমাণও নয়। কিংবা মানুষ যা কিছু করেছে তার নির্ভুল হওয়ারও কোনো লক্ষণ নয়। মূলত তা পরীক্ষার সরঞ্জাম বিশেষ ধন সম্পদ, সন্তান-প্রজনন শক্তি, রাষ্ট্র ও সরকার, জীবন যাপনের উপযোগী দ্রব্য-সামগ্রী সব কিছুই শুধু পরীক্ষার জন্য মানুষকে দান করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ এসব প্রয়োগ ও ব্যবহার করে নিজেদের ভালো কিংবা মন্দ কর্মক্ষমতার বাস্তব প্রমাণ পেশ করবে।

---

১. এ সম্পর্কে একটি কথা ভালো করে মনে রাখতে হবে যে, দুনিয়াতে আমরা এখন বসবাস করছি, মূলত এটা প্রাকৃতিক জগত (physical world) নৈতিক বিধানভিত্তিক জগত এটা নয়। বিশ্বজগতের বর্তমান ব্যবস্থা যেসব আইনের ভিত্তিতে স্থাপিত তাও নৈতিক নিয়ম নয়, তা প্রাকৃতিক নিয়ম। এ জন্য বর্তমান পার্থিব ব্যবস্থায় মানুষের কাজ-কর্মের নৈতিক ফল পুরাপুরিভাবে লব্ধ হতে পারে না। অবশ্য প্রাকৃতিক নিয়ম যতোখানি এই ফল নির্গমের অনুকূল পরিস্থিতির উদ্ভব করবে, ঠিক ততোখানিই নৈতিক ফল প্রকাশিত হবে। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম যদি সেই সুযোগ না দেয়, তবে তা প্রকাশ হওয়া অসম্ভব। যেমন, নরহত্যার নৈতিক ফল প্রকাশ তখনি হতে পারে, যদি প্রাকৃতিক নিয়ম হত্যাকারীর সন্ধান করতে, তার অপরাধ প্রমাণে এবং তার উপর হত্যার নৈতিক দণ্ড কার্যকরী করার ব্যাপারে সাহায্য করে। নতুবা কোনো নৈতিক 'ফল' আদৌ প্রকাশিত হতে পারবে না। তার আনুকূল্য লাভ হলেও এ কাজের পুরাপুরি নৈতিক ফল কখনও প্রকাশিত হবে না। কারণ নিহত ব্যক্তির পরিবর্তে শুধু প্রাণদণ্ড দেয়াই তার এ কাজের পূর্ণ নৈতিক ফল নয়। এ জন্যই বর্তমান পৃথিবী প্রতিফল লাভের ক্ষেত্র নয় তা হতেও পারে না। প্রতিফল দানের ক্ষেত্র হবার জন্য এমন একটি বিশ্ব ব্যবস্থার একান্ত আবশ্যক যেখানে বর্তমান প্রচলিত প্রাকৃতিক ব্যবস্থার পরিবর্তে নৈতিক নিয়মই হবে প্রধান ও প্রভাবশীল। আর প্রাকৃতিক আইন হবে তার আজ্ঞাবাহক ও অনুকূল অবস্থার উদ্ভাবক মাত্র।

অনুরূপভাবে দুঃখ-কষ্টে, ক্ষতি-আঘাতে, মানুষের বর্তমান জীবনে যা কিছু সংঘটিত হয়, তাও কোনো পাপ কাজের শাস্তি নয়। তন্মধ্যে অনেকগুলো প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন স্বতস্ফূর্তভাবেই প্রকাশিত হয়।[১] উহাদের কতকগুলি নিছক পরীক্ষা স্বরূপ।[২] আর কতকগুলো হয় প্রকৃত অবস্থার বিপরীত মত নির্ধারণের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অনিবার্যভাবে।[৩]

মোটকথা এ দুনিয়া মোটেই 'প্রতিফল লাভের ক্ষেত্র' নয়। মূলত এটা পরীক্ষার ক্ষেত্র। এখানে প্রকাশিত কর্মফল দ্বারা কোনো পন্থার বা কোনো কাজের বিশুদ্ধ, নির্ভুল বা ভ্রান্ত কিংবা পাপ অথবা পূণ্য গ্রহণযোগ্য বা বর্জনযোগ্য হওয়া প্রমাণিত হয় না। এজন্য তা কোনো মানদণ্ড হিসেবেও পরিগণিত হতে পারে না। সে জন্য প্রকৃত, নির্ভুল ও একমাত্র মাপকাঠি হচ্ছে পারলৌকিক ফলাফল। পৃথিবীর এই অবকাশের মুহূর্ত এ পার্থিব জীবন শেষ হওয়ার পর আর একটি জীবন রয়েছে। তখন পার্থিব জীবনের প্রত্যেকটি কাজ নিখুঁতভাবে যাচাই করা হবে, আর এ পরীক্ষায় কে সাফল্য লাভ করল, কে ব্যর্থকাম হলো, তার চূড়ান্ত ফায়সালা তখনি করা হবে। পারলৌকিক জীবনের সাফল্য-অসাফল্য কয়েকটি জিনিসের উপর নির্ভর করে। প্রথম এই যে, মানুষ নিজের দৃষ্টি ও যুক্তিবিন্যাস প্রতিভার নির্ভুল প্রয়োগের সাহায্যে আল্লাহ তায়ালাকে প্রকৃত ও একমাত্র ব্যবস্থাপক, আইন রচয়িতা এবং তাঁর নিকট হতে প্রাপ্ত শিক্ষা ও জীবন বিধানকে যথার্থ আল্লাহর বিধান বলে জানতে পারল কিনা। দ্বিতীয় এই নিগূঢ় সত্য জেনে নেয়ার পর পথ নির্বাচনের স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও মানুষ নিজের আন্তরিক ইচ্ছা ও আগ্রহ সহকারে আল্লাহ তায়ালার বাস্তব প্রভুত্ব এবং তাঁর শরীয়াতী বিধানের সম্মুখে মাথা নত করলো কিনা।

---

[১]. যেমন ব্যভিচারীর রোগাক্রান্ত হওয়া এটা তার এ পাপের নৈতিক শাস্তি নয়। এটা হচ্ছে প্রাকৃতিক ফলমাত্র। চিকিৎসায় সাফল্য লাভ হলে রোগ হতে সে মুক্তি পাবে বটে ; কিন্তু নৈতিক শাস্তি হতে কখনই রক্ষা পাবে না। আর 'তওবা' করলে নৈতিক শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হলেও কেবল এটার দরুনই রোগ হতে মুক্তি লাভ সম্ভব হবে না।

[২]. যেমন কারো দরিদ্র হওয়া। এ সময় সে তার প্রয়োজন মিটাবার জন্য অসংগত পন্থা অবলম্বন করেনা, ন্যায়সংগত পথেই দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকে, বিপদের কঠিন আঘাতে সত্য ও সততার পথে মজবুত থাকে, না অস্থির হয়ে অন্যায় ও পাপ পথে পদক্ষেপ করে এসব দিক দিয়ে তার পরীক্ষা হয়।

[৩]. মানুষ যখন এ দুনিয়াকে 'রব'হীন এবং নিজেকে সম্পূর্ণ 'স্বাধীন' মনে করতে শুরু করে কিন্তু যেহেতু এটা প্রকৃত অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত সেহেতু এই দুনিয়া 'রব'হীন নয় মানুষও এখানে স্বাধীন নয় ; তাই প্রকৃত ব্যাপারের বিপরীত কাজ করার ফলে আঘাত খাওয়া অনিবার্য। আগুনকে খেলনা মনে করে স্পর্শ করলে হাত পুড়ে যাবে। কারণ এ আচরণ স্বাভাবিক অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত।

ইসলামী মতবাদ

মানুষ ও পৃথিবী সম্পর্কে নবীদের উপস্থাপিত এ মতাদর্শ একটি পরিপূর্ণ মতবাদ। এর সমগ্র দিক ও বিভাগ পরস্পর জড়িত পরস্পরের মধ্যে যুক্তিসম্মত নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। এর একটি অংশ অপরটির বিপরীত বা বিরোধী নয়। এর ভিত্তিতে বিশ্বের সকল প্রকার ঘটনাবলীর পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ এবং বিশ্ব প্রকৃতির নিদর্শনসমূহের পূর্ণ ব্যাখ্যা দান অত্যন্ত সহজ। এ মতের বিশ্লেষণ করা যায় না। এমন কোনো জিনিসই কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। অতএব এটা একটি বৈজ্ঞানিক মত (scientific theory) এবং এর যে সংজ্ঞাই দেয়া হোক না কেন, এ মত সম্পর্কে তা নিঃসন্দেহে প্রযোজ্য হবে।

পরন্তু কোনো গবেষণা, প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ বা বাস্তব অভিজ্ঞতাই এ মতকে আজ পর্যন্ত 'ভ্রান্ত' প্রমাণ করতে পারেনি। বস্তুত এটা বাস্তবে পরিণত সত্য, এর সত্যতা চিরস্থায়ী। প্রমাণিত ভ্রান্ত মতবাদসমূহের মধ্যে এটাকে কোনো মতেই গণ্য করা যায় না।[১] বিশ্বপ্রকৃতির যে নিয়ম আমরা দেখতে পাচ্ছি, সে দিক দিয়েও এ মত খুবই সত্য বলে মনে হয়। বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত বিরাট ও ব্যাপক নিয়ম-শৃংখলা এবং এর সুসংবদ্ধতা দেখে স্বতই মনে হয় প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই মনে হবে যে, নিশ্চয়ই এর কোনো 'ব্যবস্থাপক' রয়েছেন; এরূপ মনে না করার মূলে কোনো যুক্তি থাকতে পারে না। অনুরূপভাবে এ সুসংবদ্ধ নিয়ম-শৃংখলা এটাকে একটি 'কেন্দ্রভিত্তিক ব্যবস্থা' এবং এই ব্যবস্থায় একজন স্বাধীন ও স্বেচ্ছাধিকারী পরিচালক থাকার জন্য বিশ্বাস করাই বুদ্ধিসম্মত মনে হয়, এটাকে বিকেন্দ্রীক মনে করা এবং এর অসংখ্য পরিচালকের অধীন চলার কথা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। বিশ্বপ্রকৃতির এই বিস্ময়কর ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, যৌক্তিকতা এবং নির্ভুল বুদ্ধির যে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, তদ্দৃষ্টে এটাকে একটি সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক ও উদ্দেশ্যমূলক ব্যবস্থা মনে করাই অধিকতর যুক্তিসংগত, এটাকে উদ্দেশ্যহীন এবং শিশুর খেলনা মনে করার মূলে কোনোই যুক্তি থাকতে পারে না।

এতদ্ব্যতীত এ বিশ্বপ্রকৃতির ব্যবস্থাকে আমরা যদি একটি বাস্তব রাজ্য এবং মানুষকে এই বিরাট ও সুসংবদ্ধ ব্যবস্থার একটি অংশ বলে মনে করি, তাহলে স্বীকার করতে হবে যে, এই নিয়ম-শৃংখলা ব্যবস্থার অধীন মানুষের স্বেচ্ছাচারিতার ও স্বাধীনতার কোনোই অবকাশ থাকতে পারেনা। এই পৃথিবীতে

---

১. কোনো বিশেষ যুগের বৈজ্ঞানিক মত এর বিপরীত হলেই এর ভ্রান্তি প্রমাণিত হয় না। বৈজ্ঞানিক মতে বাস্তব সত্যই (Facts) এটাকে চুর্ণ করতে পারে নিছক মতবাদ নয়। অতএব মানুষ ও বিশ্ব প্রকৃতি সম্পর্কে নবীদের উপস্থাপিত ধারণাকে যতোক্ষণ পর্যন্ত না কোনো বাস্তব ও সপ্রমাণিত ঘটনাই ভুল প্রমাণিত করবে ততোক্ষণ এটাকে 'অতীত কালের মতবাদসমূহের' মধ্যে গণ্য করা শুধু মারাত্মক ভুল ও অবৈজ্ঞানিকতাই নয়, তা হিংসা-বিদ্বেষমূলক কাজের পরিণামও বটে।

প্রজা হওয়াই মানুষের সঠিক মর্যাদা। এ দিক দিয়েও উল্লিখিত মতটি অত্যন্ত যুক্তিসংগত (most reasonable) বলে মনে হয়।

বাস্তব কার্যকারিতা সম্পর্কে বিচার করলেও এটা একটি বাস্তব কর্মোপযোগী (practicable) মত বলেই প্রতিপন্ন হয়। এ মতের ভিত্তিতে মানব জীবনের একটি পূর্ণাংগ ও ব্যাপক কর্মসূচী এর খুঁটিনাটিসহ খুব সহজেই রচিত হতে পারে। দর্শন, নৈতিকতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্প, রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা, যুদ্ধ-সন্ধি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধ এক কথায় জীবনের সকল দিক ও বিভাগ এবং সকল প্রয়োজন ও সমস্যার জন্য একটি স্বতন্ত্র ও স্থায়ী ব্যবস্থা এরই ভিত্তিতে লাভ করা সম্ভব। ফলে মানব জীবনের কোনো বিভাগেই কর্মনীতি নির্ধারণের জন্য এ মতাদর্শের বাইরে যাওয়ার কোনো দিনই প্রয়োজন দেখা দেবে না।

পক্ষান্তরে, এ মতাদর্শের ভিত্তিতে মানুষের এ পার্থিব জীবন কিরূপে গঠিত হয় এবং এর ফলাফলই বা কিরূপ এখন তাই আমাদের বিচার্য। এ মতবাদ ব্যক্তিগত জীবনকে অন্যান্য জাহেলি মতবাদসমূহের সম্পূর্ণ বিপরীত। অতীত দায়িত্ব জ্ঞান-সম্পন্ন এবং খুবই সুসংবদ্ধ ও শৃংখলাপূর্ণ (well diciplined) করে তোলে। এ মতাদর্শের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ এই যে, মানুষ তার দেহ তার যাবতীয় শক্তি-সামর্থ এ পৃথিবী এবং পৃথিবীর কোনো একটি বস্তুকেও নিজের মালিকানা সম্পদ মনে করে তার সাথে স্বাধীনভাবে আচরণ করবে না, বরং আল্লাহর মালিকানা মনে করে তাঁরই আইন ও বিধানের ভিত্তিতে এর ব্যবহার করবে। তার লব্ধ প্রত্যেকটি জিনিসকেই আল্লাহর আমানত মনে করবে এবং এ আমানতের হিসেব তাঁর নিকট দিতে হবে যার নিকট কোনো কাজ, মনের কোনো গোপন ইচ্ছাও অজ্ঞাত নয় এবং একথা মনে করেই এটাকে ব্যবহারে আনবে। এরূপ সচেতন মানুষ যে সকল সময় এবং সকল অবস্থায়ই একটি আদর্শের নিষ্ঠাবান অনুসারী হবে তাতে সন্দেহ নেই। এরূপ ব্যক্তি কখনই বল্গাহারা ও প্রবৃত্তির দাস হতে পারে না। অত্যাচার ও বিশ্বাসঘাতক হতে পারে না। এমন ব্যক্তির উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা সম্ভব। শৃংখলা রক্ষা ও নিয়মতন্ত্র অনুসরণের ব্যাপারে কোনো বাহ্যিক চাপের (pressure) প্রয়োজনীয়তা সে বোধ করবে না। সেজন্য একটি বিরাট শক্তিসম্পন্ন নৈতিক বাঁধন ও সংযম অনুভূতি জেগে উঠে। ফলে, যেসব অবস্থায় কোনো পার্থিব শক্তির নিকট জবাবদিহি করার কোনোই আতংক থাকে না, তখনও এ শক্তি তাকে সততা, ন্যায় ও সত্যের পথে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করে। বস্তুত সমাজের লোকদের সর্বাধিক বিশ্বাসভাজন করে তোলার জন্য আল্লাহর ভয় ও আমানতদারীর অনুভূতি অপেক্ষা উত্তম ও কার্যকরী উপায় অন্য কিছু হতে পারে না।

অধিকন্তু এ মত মানুষকে কেবল সংগ্রামী ও অবিশ্রান্ত চেষ্টানুবর্তী করে তোলে না; এর যাবতীয় চেষ্টা-সাধনাকে স্বার্থপরতা, আত্মপূজা অথবা জাতিপূজার

পংকিলতা হতে পবিত্র করে সততা ও সত্যবাদিতা এবং উচ্চতর নৈতিক আদর্শের লক্ষ্য পথে নিয়ন্ত্রিত করে। যে ব্যক্তি মনে করে যে এ দুনিয়ায় তার আগমণ উদ্দেশ্যহীন নয়, কোনো বিরাট কাজ সম্পাদনের জন্যই এখানে তাকে প্রেরণ করা হয়েছে, তার জীবন কেবল নিজের জন্যই কিংবা তার অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের জন্যই নয় বরং তার জীবন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর সন্তোষমূলক কাজে একান্তভাবে নিয়োজিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ, তাকে বিনা হিসেবে রেহাই দেয়া হবে না, তার সময় ও ক্ষমতার কতখানি কোন্ কাজে ব্যয় হয়েছে তার হিসেব নেয়া হবে। একথা যার মনে সর্বদা জাগ্রত থাকবে, তার তুলনায় অধিক পরিশ্রমী ফলপ্রসু, সুষ্ঠ ও নির্ভুল চেষ্টানুবর্তী ব্যক্তি আর কেউ হতে পারে না। কাজেই এ মতাদর্শ যতোদুর উত্তম ও আদর্শ ব্যক্তি গঠন করে, তদপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি চরিত্রের ধারণা করা যায় না।

সামগ্রিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও এর পরীক্ষা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। সর্বপ্রথম কথা এই যে, মতাদর্শ মানব সমাজের ভিত্তিমূলকেই সম্পূর্ণরূপে বদলিয়া দেয়। এ মত অনুযায়ী সমগ্র মানুষ আল্লাহর প্রজা এবং এ দুনিয়ার ক্ষেত্রে সকলের মর্যাদা, সকলের অধিকার এবং সুযোগ সুবিধা লাভের সম্ভাবনা সকলের পক্ষেই সমান। কোনো ব্যক্তি কোনো পরিবার কোনো শ্রেণী, কোনো জাতি, কোনো বংশের জন্য অন্যান্য মানুষের উপর কোনোরূপ শ্রেষ্ঠত্ব, আভিজাত্য নেই, নেই কোনো বৈষম্যমূলক অধিকার। এভাবে মানুষের প্রভুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের মুলোচ্ছেদ করা হয়। এবং রাজতন্ত্র, জায়গীরদারী, সামন্তবাদ, অভিজাততন্ত্র (aristocracy) ব্রাহ্মণ্যবাদ ও পোপতন্ত্র প্রভৃতি জাহেলি মতাদর্শ হতে যেসব মারাত্মক দোষত্রুটি ও ব্যাধি সৃষ্টি হয় ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ গঠন করলে তারা চিরতরে বিলুপ্ত হয়।

এটা বংশীয়, গোত্রীয়, ভৌগলিক, আঞ্চলিক এবং বর্ণ ভিত্তিক বৈষম্য বিদ্বেষেরও মূলোৎপাটন করে। কারণ এসব মারাত্মক ব্যাধিই মানব সমাজে আবহমানকাল যাবত রক্তপাত ও যুদ্ধ সংগ্রামের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু ইসলামী মতাদর্শের দৃষ্টিতে সমগ্র পৃথিবীর মালিক আল্লাহ, সমগ্র মানুষ এক আদমের সন্তান এবং আল্লাহর বান্দাহ। এ সমাজে গোত্র, ধন-সম্পত্তি কিংবা বর্ণের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বৈষম্য করা হয় না ; নৈতিক চরিত্রের পবিত্রতা এবং আল্লাহর ভয় থাকা না থাকার ভিত্তিতে এ পার্থক্য হতে পারে। আল্লাহভীতি যার মধ্যে সর্বাধিক, সততা ও ন্যায়পরায়ণতা, সত্যের জন্য সংগ্রামশীলতার দিক দিয়ে তিনিই শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হবেন। ইসলামী সমাজে কেবল তাঁরই শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত হবে।

এরূপে মানুষের পরস্পরের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধ কিংবা পার্থক্য বৈষম্যের ভিত্তি ও দৃষ্টিতে আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে। সমাজক্ষেত্রে মিলন

বিচ্ছেদের যে মান বা কারণ মানুষ নিজেরা আবিষ্কার করেছে তা বিশ্ব মানবতাকে অসংখ্য খণ্ডে বিভক্ত করে ; এ খণ্ডসমূহের মধ্যে দূর্লংঘ্য প্রাচীরও খাড়া করে দেয়। যেহেতু বংশ, স্বদেশ, জাতীয়তা কিংবা বর্ণ প্রভৃতির পরিবর্তন করা মানুষের সাধ্যাতীত এদের মধ্যে একটির অন্তর্ভূক্ত মানুষ কোনোক্রমেই অন্যটির মধ্যে গণ্য হতে পারে না। পক্ষান্তরে ইসলামী মতাদর্শে মানুষের মধ্যে মিলন বিচ্ছেদের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে আল্লাহর দাসত্ব স্বীকার এবং তাঁর বিধান পালনের উপরে। কাজেই সৃষ্টির দাসত্ব পরিত্যাগ করে যারা স্রষ্টার বন্দেগী শুরু করবে এবং মানুষের রচিত আইনে পদাঘাত করে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধানকে জীবনের একমাত্র আইন হিসেবে গ্রহণ করবে, তারা সকলেই একটি জামায়াতের মধ্যে গণ্য হবে। আর যারা এরূপ করবে না তারা ভিন্ন দলভুক্ত হবে এভাবে মানব সমাজের সকল প্রকার পার্থক্য-বৈষম্য বিলুপ্ত হয়ে একটি মাত্র পার্থক্যই থেকে যায় আর এই পার্থক্য সকলেই লংঘন করতে পারে। কারণ আকীদা বিশ্বাস ও জীবন যাপনের রীতিনীতি পরিবর্তন করে একটি দল হতে অপর দলের মধ্যে শামিল হওয়া প্রত্যেকের পক্ষেই সহজ।

এসব সংশোধন-সংস্কারের পর মতাদর্শের ভিত্তিতে যে সমাজ গড়ে উঠে, তার মনোবৃত্তি মানসিকতা ভাবধারা ও সমাজের গঠন অবয়ব (social structure) আমূল পরিবর্তিত হয়ে যায়। এর রাষ্ট্র মানব প্রভুত্বের ভিত্তিতে নয় আল্লাহর সার্বভৌম প্রভুত্বের বুনিয়াদেই স্থাপিত হয়।[১] এখানে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই শাসন কায়েম হয়, আল্লাহরই আইন জারী এবং কার্যকরী হয়। মানুষ কেবল আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবেই কাজ করতে থাকে। এর ফলে প্রথমত মানুষের হুকুমাত এবং মানুষের আইন রচনার অধিকারজনিত সমস্ত দোষ-ত্রুটি নিমিষেই দূর হয়।

দ্বিতীয়ত এই মতাদর্শের ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র স্থাপিত হওয়ার ফলে আর একটি বিরাট পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। তা এই যে, রাষ্ট্রের সমগ্র ব্যবস্থাই ইবাদত ও তাকওয়ার পূত ভাবধারায় পরিপ্লুত হয়। রাষ্ট্রনেতা ও জনগণ সকলেই সমানভাবে অনুভব করতে থাকে যে, তারা আল্লাহর হুকুমাতের অধীন জীবন যাপন করছে এবং গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু সম্পর্কে অবহিত আল্লাহর সংগেই তাদের প্রত্যেকটি ব্যাপার প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। করদাতা আল্লাহকেই কর দিচ্ছে মনে করে তা আদায় করে এবং তার গ্রহণকারী ও খরচকারী উভয়েই নিজেদেরকে এর আমানতদার মাত্র মনে করে। একজন সিপাহী হতে বিচারপতি ও গভর্ণর পর্যন্ত প্রত্যেক কর্মচারীই ঠিক সেই মানসিকতার সাথে কর্তব্য পালন করে, যেরূপ মনোভাব নিয়ে তারা সালাত আদায় করে ; তাদের পক্ষে এই উভয়

১. গ্রন্থকার রচিত 'ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ' দ্রষ্টব্য।

প্রকার কাজ সমানভাবে ইবাদত এবং উভয় ক্ষেত্রে একই প্রকার আল্লাহভীরুতা এবং সে জন্য শংকাপূর্ণ মনোভাবের প্রয়োজন। গণপ্রতিনিধি নির্বাচনের সময়ে তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে সন্ধান করা হয় আল্লাহর ভয়, আমানতদারী, বিশ্বাস পরায়ণতা, সততা ও সত্যবাদিতা প্রভৃতি মহৎ গুণাবলী। এর পরিণামে সমাজের সর্বাধিক উন্নতি ও উত্তম নৈতিক চরিত্র সম্পন্ন ব্যক্তিগণই নেতৃত্ব ও দায়িত্বপূর্ণ পদে অভিষিক্ত হন রাষ্ট্র ক্ষমতা তাদেরই হাতে অর্পণ করা হয়।

সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এ মতাদর্শ অনুরূপ আল্লাহভীরুতা ও নৈতিক পবিত্রতার স্বতস্ফূর্ত ভাবধারা প্রবাহিত হয়। আত্মপূজার পরিবর্তে আল্লানুগত্যের প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের পরস্পরের মধ্যে এক আল্লাহর সম্পর্কই ভিত্তিগত মর্যাদা লাভ করে, আল্লাহর আইনই পারস্পরিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত, সুসংবদ্ধ ও সুশৃংখলাপূর্ণ করে। এই আইন যেহেতু সেই মহান সত্তাই রচনা করেছের, যিনি সকল প্রকার স্বার্থপরতা ও নফসের খাহেশের পংকিলতা হতে পবিত্র, সর্বজ্ঞ, পরম বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিমান, তাই তাঁর রচিত আইনে অশান্তি ও উচ্ছৃংখলতা যুলুম-পীড়ন ও ভাঙন-বিপর্যয়মূলক কোনো ব্যবস্থাই বিন্দুমাত্র স্থান পায়নি। উপরন্তু মানব প্রকৃতির সকল দিক এবং মানুষের সকল জৈবিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই এটা রচিত হয়েছে।

এ মতাদর্শের ভিত্তিতে যে বিরাট সমাজ ও সামগ্রিক জীবন গড়ে উঠে, এখানে তার পূর্ণ চিত্র পেশ সম্ভব নয়। কিন্তু উপরে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা দ্বারা মানুষ ও পৃথিবী সম্পর্কে পয়গাম্বরদের উপস্থাপিত ধারণার ভিত্তিতেই যে ধরনের জীবনধারা গঠিত হয় এবং বাস্তব ফলাফল প্রকাশিত হয় বা হতে পারে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা পাঠকের পক্ষে সহজ হবে বলে মনে করি। উপরন্তু এটা কেবলমাত্র অসম্ভব কল্পনার সুখরাজ্য (utopia) নয়। বিশ্ব ইতিহাসের এক অধ্যায়ে এ মতাদর্শের ভিত্তিতে একটি সমাজ, একটি সমষ্টিগত জীবন একটি উন্নত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে বিশ্বমানবের সম্মুখে তার বাস্তবতার স্পষ্ট নিদর্শন স্থাপন করা হয়েছে। আর ইতিহাসও এ কথার সাক্ষ্য দিবে যে, এ আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত ব্যক্তিদের তুলনায় উত্তম লোক মানব সমাজে আর কখনও পরিদৃষ্ট হয়নি এবং এর ভিত্তিতে স্থাপিত রাষ্ট্র অপেক্ষা কোনো রাষ্ট্রই আজ পর্যন্ত নির্বিশেষে সমগ্র মানুষের পক্ষে কল্যাণকর প্রমাণিত হয়নি। এ রাষ্ট্রের প্রজা সাধারণের মধ্যে নৈতিক দায়িত্ববোধ অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠেছিল। প্রমাণ স্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। এক বেদুঈন নারী ব্যভিচারের দরুন অন্তসত্তা হয়েছিল, ইসলামী শরীয়াতে এ পাপের দণ্ড যে সংগেসার প্রস্তর খণ্ডের আঘাত দ্বারা মৃতুদণ্ড দান এর ন্যায় ভয়াবহ তা সে ভালো করেই জানতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে নিজেই রসূল (স.) এর দরবারে হাজির হয়

এবং অপরাধের দণ্ড দানের জন্য অনুরোধ করে। তাকে সন্তান প্রসবের পরে আসার জন্য বলে দেয়া হয় এবং কোনো মুচলেকা বা জামানত ছাড়াই তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। পরে সন্তান প্রসবের পর সে পুণরায় উপস্থিত হয় এবং উপযুক্ত দণ্ডদানের জন্য দাবি জানায়। কিন্তু এবারেও তাকে ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং সন্তানকে স্তনদান ও লালন পালন করার পর পুনরায় আসার নির্দেশ দেয়া হয়। ফলে আবার সে মরুভুমির দিকে প্রত্যাবর্তন করে, কিন্তু কোনো পুলিশ পাহারার প্রয়োজন বোধ হয়নি। স্তন দানের নির্দিষ্ট সময় অতীত হওয়ার পর মরুবাসিনী আবার ফিরে আসে এবং কৃত অপরাধের দণ্ডদানে তাকে পবিত্র করে দেবার প্রার্থনা জানায়। অতপর তাকে 'সংগেসার' পাথর নিক্ষেপ করে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। এভাবে যখন তার মৃত্যু ঘটে তখন তার জন্য আল্লাহর নিকট 'রহমতের দোয়া করা হয়'। এ সময় এক ব্যক্তি সহসা বলে উঠে মেয়েলোকটি বড় নির্লজ্জ ছিলো। তখন উত্তরে নবী করীম (সা) বললেন, "আল্লাহর শপথ এই নারী যেভাবে তওবা করেছে, অনুরূপ তওবা যদি সকল দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিই করত, তবে তাদেরকেও ক্ষমা করা হত।"

বস্তুত ইসলামী সমাজে নাগরিকদের এটাই ছিলো বৈশিষ্ট্য। আর রাষ্ট্র ও সরকারের বৈশিষ্ট্য ছিলো আরও বিরাট। কোটি কোটি টাকার আয় সম্পন্ন এবং ইরান, সিরিয়া ও মিসরের ন্যায় বিপুল ধন-ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ রাজ্যের বায়তুলমালের মালিক হওয়া সত্ত্বেও তার রাষ্ট্রপ্রধান মাসিক বেতনস্বরূপ মাত্র দেড়শত টাকা গ্রহণ করতেন ; আর নাগরিকদের মধ্যে ভিক্ষা গ্রহণের যোগ্য একজন লোক খুঁজেও পাওয়া যেতো না।

এই বিরাট বাস্তব ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা লাভের পরেও যদি নবীদের স্থাপিত বিশ্ব-ব্যবস্থার নিগূঢ়তত্ত্ব এবং তাতে মানুষের অবস্থা ও মর্যাদা সম্পর্কীয় মতাদর্শের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া কারও পক্ষে সম্ভব না হয়, তবে এ বিষয়ে তাকে পরিতৃপ্ত করার অন্য কোনো উপায় নেই। কারণ আল্লাহ ফিরিশতা এবং পারলৌকিক জীবনের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ এ দুনিয়ায় কোনক্রমেই সম্ভব নয়। আর যেখানে তা সম্ভব নয় তথায় বিভিন্ন কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিন্ন সত্যাসত্য নির্ধারণে অন্য মানদণ্ড আদৌ হতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, রোগীর দেহাভ্যন্তরের কোথায় কোন জটিল ও দুরারোগ্য ব্যাধির সৃষ্টি হয়েছে শত চেষ্টা করেও যদি তার প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করা সম্ভব না হয় তাহলে চিকিৎসক বিভিন্ন প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করে রোগ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন এবং যে ঔষধটি এ অজ্ঞাত রোগ নির্ধারণে সাহায্য করে তাই রোগের প্রকৃত ঔষধ বলে বিবেচিত হয়। ঐ ঔষধে রোগ দূর হওয়ার ফলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত

হয় ঐ ঔষধে দেহাভ্যন্তরস্থ রোগ চিকিৎসার সম্পূর্ণ অনুকূল ইহা অনস্বীকার্য। অনুরূপভাবে মানব জীবনের জটিল যন্ত্র অন্য কোনো মতাদর্শ অনুযায়ী যখন সঠিকভাবে চলতে পারে না। পক্ষান্তরে কেবল নবীদের উপস্থাপিত মতের ভিত্তিতেই যখন তা সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে, তখন এটাই এ মতাদর্শই প্রকৃত অবস্থার অনুকূল হওয়ার জন্য অনস্বীকার্য প্রমাণ। বস্তুত এই নিখিল বিশ্বপ্রকৃতি আল্লাহ তায়ালার একটি রাজ্য। এ জীবনের পর আরো একটি জীবন বাস্তবিকই রয়েছে এবং সেই পারলৌকিক জীবনে সমস্ত মানুষকেই ইহ-জীবনের সকল কাজ-কর্মেরই পুংখানুপুংখরূপে হিসেব দিতে হবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

৪

একমাত্র ধর্ম

[পুস্তিকাটি মূলত মাওলানার একটি ভাষণ। ১৯৪৩ সালের ২১শে মার্চ দিল্লীর 'জামেয়া ইসলামীয়ায়' মাওলানা এ ভাষণ প্রদান করেন।]

কুরআন শরীফ সমগ্র মানব জাতিকে তার নিজ প্রচারিত জীবনাদর্শের দিকে এই বলে আহবান জানাচ্ছে : إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

এ ছোট্ট আয়াতটুকু এ পুস্তকে আমার আলোচ্য বিষয়। বিস্তারিত করে বলার স্থান এটা নয়, যথাসম্ভব সংক্ষেপে এর ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করবো। এ আয়াতটুকুতে প্রকৃতপক্ষে কি দাবি উত্থাপন করা হয়েছে, তা নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা হতেই সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারা যাবে। উপরন্তু সেই দাবি গ্রহণ করা উচিত কিনা সে বিষয়েও বিশেষ আলোচনা করবো এবং কুরআনের এ দাবি মেনে নিলে কি কি কাজ করা আমাদের কর্তব্য হয়, তাকে বিশ্বাস করলে কিভাবে মানবজাতির জীবনকে গঠন করা বাঞ্ছনীয় হয়, সর্বশেষে আমি তাও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো।

সাধারণত এ ছোট আয়াতটির খুব সাদাসিদে অর্থ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আবহমানকাল হতে আপনারা এর অর্থ শুনে এসেছেন, "আল্লাহর নিকট মনোনীত ধর্ম হচ্ছে শুধু ইসলাম।" আর ইসলাম সম্পর্কে সাধারণভাবে সকলেরই মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে যে, ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা আজ হতে সাড়ে তেরোশত বছর পূর্বে আরব দেশে প্রচারিত হয়েছিল এবং যার প্রথম ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা)। "প্রথম ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন" কথাটি আমি ইচ্ছা করেই ব্যবহার করেছি। কারণ, কেবল অমুসলিমগণই নয়, অসংখ্য মুসলমান এবং ভালো ভালো শিক্ষিত ও বিদগ্ধ মুসলমান পর্যন্ত হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে "ইসলামের প্রবর্তক ও ভিত্তিস্থাপক" বলে মনে করেন এবং বই পুস্তকে সে কথাই নানাভাবে লিখে থাকেন। তাদের বিশ্বাস হযরত মুহাম্মদ (সা)-ই ইসলামের সর্বপ্রথম প্রচারক দুনিয়াতে তিনিই তার প্রথম ভিত্তিস্থাপন করেছেন। এজন্যই একজন অমুসলিম ব্যক্তি কুরআন শরীফ অধ্যয়নকালে যখন এ আয়াতটি পাঠ করে, তখন সে ধারণা করে যে, দুনিয়ার সকল ধর্মই যেমন কেবল নিজেকেই 'একমাত্র সত্য ধর্ম' বলে অভিহিত করে থাকে এবং অন্যান্য ধর্মকে বাতিল বলে মনে করে অনুরূপভাবে কুরআনও

নিজের উপস্থাপিত ধর্মের একমাত্র সত্য হওয়ার দাবি করেছে, এটা বিচিত্র কিছু নয়। অমুসলিম পাঠক এ ধারণার বশবর্তী হয়ে খুব দ্রুততার সাথেই সম্মুখে অগ্রসর হয়ে যায় এ দাবির মৌলিকতা ও যৌক্তিকতা সম্পর্কে চিন্তা করার কোনো প্রয়োজনীয়তাই বোধ করে না। পক্ষান্তরে একজন মুসলিমও এ সম্পর্কে চিন্তা করার বিশেষ কোনো প্রয়োজনীয়তা এজন্যই বোধ করে না যে, এ আয়াতে যে ধর্মকে 'একমাত্র সত্য ধর্ম' বলে দাবি করা হয়েছে, সে নিজেও তাকে সত্য ধর্ম বলেই বিশ্বাস করে। কারো মনে কোনো সময় এ সম্পর্কে চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তাবোধ হলেও সে কেবল খৃষ্ট ধর্ম, হিন্দু ধর্ম এবং এরূপ অন্যান্য ধর্মের সাথে ইসলামের তুলনা করে তার সত্যতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করে মাত্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কুরআন শরীফের এ ছোট্ট আয়াতটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এ সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাথে যতোটুকু চিন্তা করা হয়েছে তদপেক্ষা অনেক বেশি চিন্তা করা একান্ত আবশ্যক।

উক্ত আয়াতে উল্লেখিত কুরআনের দাবিকে সুস্পষ্টরূপে বুঝতে হলে সর্বপ্রথম 'আদ্-দীন' (الدين) এবং 'আল ইসলাম' (الاسلام) এ দু'টি শব্দের অন্তর্নিহিত ভাব বিস্তারিতরূপে বুঝে নিতে হবে।

আদ্-দীন (الدين) শব্দের বিশ্লেষণ

আরবি ভাষায় 'দীন' শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। তার এক অর্থ প্রভুত্ব ও প্রাধান্য, শক্তি ও আধিপত্য। দ্বিতীয় অর্থ আনুগত্য ও দাসত্ব। তৃতীয় অর্থ প্রতিফল ও কর্মফল এবং চতুর্থ অর্থ পথ, পন্থা, ব্যবস্থা, আইন।

উল্লেখিত আয়াতে 'দীন' (دين) শব্দটি এ শেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ 'দীন' শব্দের অর্থ জীবন যাপনের পন্থা কিংবা কর্মের প্রণালী, এমন পন্থা বা প্রণালী যা মানুষের জীবনে অনুসরণ করা যেতে পারে।

কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, কুরআন কেবল 'দীন'ই বলেনি কুরআন বলছে, 'আদ্-দীন', (الدين)। ইংরেজি ভাষা This is a way (এই একটি পথ)-এর পরিবর্তে This is the way (এ একমাত্র পথ) বলায় অর্থের দিক দিয়ে যতোখানি পার্থক্য হয় 'দীন' (دين) এবং 'আদ্-দীন' (الدين) শব্দের মধ্যেও অর্থের দিক দিয়ে ঠিক ততোখানি পাথর্ক্য হয়ে থাকে। অর্থাৎ কুরআন একথা বলছে না যে, "ইসলাম আল্লাহর নিকট একটি (মনোনীত) ধর্ম" বরং তার দাবি, "আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র প্রকৃত, বিশুদ্ধ ও নির্ভুল জীবনব্যবস্থা বা চিন্তা ও কর্মের প্রণালী।" এছাড়া একথাও মনে রাখতে হবে যে, কুরআন এ 'আদ্-দীন' শব্দটি কোনো সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করেনি, কুরআনে তার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক।

'জীবন ব্যবস্থা' বলতে জীবনের বিশেষ কোনো দিক বা বিশেষ কোনো বিভাগের ব্যবস্থা বুঝায় না, তার অর্থ সমগ্র জীবনের পরিপূর্ণ ব্যবস্থা-স্বতন্ত্রভাবে কেবল এক একটি মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের ব্যবস্থা নয়, তা দ্বারা সমষ্টিগতভাবে সমগ্র সমাজের ব্যবস্থাই বুঝায়। বিশেষ কোনো দেশ বা বিশেষ কোনো জাতি বা বিশেষ কোনো কাল ও যুগের জীবন ব্যবস্থা নয়, বরং সকল কালের সকল মানুষের এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে সমগ্র সমাজের ব্যবস্থার কথাই এখানে বলা হয়েছে। অতএব পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, কুরআনের উক্ত দাবির অর্থ এ নয় যে, ইসলাম আল্লাহর নিকট পূজা-উপাসনা, অতি প্রাকৃতিক ধারণা-বিশ্বাস এবং পরকালীন জীবনের প্রতি বিশ্বাসস্থাপনের একটি সমষ্টি মাত্র, তার অর্থ এটাও নয় যে, ব্যক্তি মানুষের ধর্মীয় চিন্তা কর্মপদ্ধতির (বর্তমান পাশ্চাত্য পরিভাষায় 'ধর্মীয়' শব্দটি যেমন ব্যবহৃত হচ্ছে) একটি রূপ হচ্ছে ইসলাম। পক্ষান্তরে তার অর্থে এটাও নয় যে, কেবল আরববাসীদের জন্য কিংবা একটি নির্দিষ্ট শতাব্দী পর্যন্ত অথবা একটি নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত, যথা শিল্প বিপ্লবের পরবর্তী মানুষদের জন্য ইসলাম একটি বিশুদ্ধ জীবনব্যবস্থা; বরং কুরআন শরীফ স্পষ্ট ভাষায় ও উদাত্তকণ্ঠে দাবি করছে যে, "প্রত্যেক কালের অধ্যায়ের সমগ্র মানবজাতীর জন্য পৃথিবীতে জীবন যাপন করার জন্য এবং মানব জীবনের সমগ্র বিভাগের জন্য একটি মাত্র পন্থা ও পদ্ধতি আল্লাহর নিকট বিশুদ্ধ ও মনোনীত" সেই স্বাভাবিক পদ্ধতিরই নাম হচ্ছে ইসলাম।

আমি শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছি যে, এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যবর্তী কোনো এক দেশে কুরআন শরীফের এক নুতন তফসীর প্রকাশ করা হয়েছে এবং তাতে বলা হয়েছে যে, 'দীন' (دين) শব্দটিতে শুধু আল্লাহ ও মানুষের মধ্যস্থিত ব্যক্তিগত সম্পর্কিত বিষয় বুঝায় রাষ্ট্র ও তামাদ্দুনের বিপুল ক্ষেত্রের সাথে তার কোনোই সম্পর্ক নেই। এ তফসীর যদি কুরআন হতেই গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তবে তা নিশ্চয়ই দেখার বস্তু বটে কিন্তু আমি দীর্ঘ অষ্টাদশ বছরকাল পর্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে, বিশেষ যত্ন ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি সহকারে কুরআন শরীফের যে গভীর তত্ত্বানুসন্ধান করেছি, তার উপর নির্ভর করে আমি অকুতোভয়ে ও স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করতে পারি যে, কুরআন এসব নতুন তফসীরকারদের স্বেচ্ছাচারিতা সমর্থন করে 'আদ্-দীন' (الدين) শব্দটিকে কোনো সীমাবদ্ধ অর্থে আদৌ ব্যবহার করেনি ; বরং তাকে সমগ্র কালে সমগ্র মানুষের জন্য, মানুষের চিন্তা ও কর্মের একমাত্র সুষ্ঠু বিধান বলে ঘোষণা করেছে।

আল ইসলাম (الاسلام)

এখন 'ইসলাম' শব্দটির আলোচনা করা যাক। আরবি ভাষায় 'ইসলাম' (اسلام) অর্থ আত্মসমর্পণ করা, নত হওয়া, আনুগত্য স্বীকার করা, নিজের ইচ্ছায় নিজেকে কারো নিকট সোপর্দ করে দেয়া। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় এই

যে, কুরআন শুধু 'ইসলাম' বলেনি, তার সাথে আলিফ-লাম যোগ করে 'আল ইসলাম' বলেছে ; এটা কুরআনের একটি পরিভাষা। অতএব এ বিশিষ্ট পারিভাষিক শব্দের অর্থ হলো আল্লাহর সম্মুখে নত হওয়া, তাঁর আনুগত্য স্বীকার করা, তাঁর নিকট নিজের যাবতীয় আযাদী পরিত্যাগ করা এবং নিজেকে সম্পূর্ণভাবে তাঁরই নিকট সমর্পণ করে দেয়া। কিন্তু এ আত্মসমর্পণ, আনুগত্য ও অধীনতা স্বীকার করার অর্থ প্রাকৃতিক নিয়মের (law of nature) সম্মুখে নিজেকে সোপর্দ করে দেয়া নয় যারা এ অর্থ গ্রহণ করতে চেষ্টা করে তারা ভ্রান্ত। পক্ষান্তরে মানুষের নিজের চিন্তা-কল্পনা, নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতালব্ধ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নির্দেশের কাল্পনিক ধারণার আনুগত্য করাও নয়, যদিও ভুলবশত: কোনো কোনো লোক এরূপ ধারণা করে থাকে। বস্তুত তার অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলা নিজেই নিজের রসূলের মারফতে মানুষের জন্য যে চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি নাযিল করেছেন, সম্পূর্ণরূপে তাই গ্রহণ করা এবং নিজের চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা, অন্য কথায় চিন্তা ও কর্মের বিশিষ্টতা পরিত্যাগ করে তার আনুগত্য কবুল করাই আল্লাহর মনোনীত ও মনঃপুত পন্থা। একথাটিই কুরআন 'আল ইসলাম' শব্দ দ্বারা বুঝিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 'ইসলাম' নতুন যুগের সৃষ্ট কোনো ধর্ম নয় এবং আজ হতে সাড়ে তেরোশত বছর পূর্বে আরব দেশে হযরত মুহাম্মদ (সা) কর্তৃক তার প্রথম বুনিয়াদ স্থাপিত হয়েছিল এমন ধারণা করাও মারাত্মক ভুল। বস্তুত সর্বপ্রথম যেদিন এ ভূপৃষ্ঠে বসতি শুরু হয়েছে, সেদিনই আল্লাহ তাআলা মানুষকে পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন যে, তোমাদের জন্য এ 'আল ইসলাম'-ই একমাত্র নির্ভুল জীবন ব্যবস্থা। অতপর দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে প্রত্যেক যুগের মানুষকে পথনির্দেশনার জন্য আল্লাহর তরফ থেকে যতো নবীই প্রেরিত হয়েছেন, তাঁদের সকলেই নির্বিশেষে এ এক 'আল ইসলাম'-এর দিকে নিখিল মানুষকে আহবান জানিয়েছেন। আর সর্বশেষে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)ও এদিকেই সকল মানুষকে পথনির্দেশ করেছেন। অবশ্য একথা সত্য যে, হযরত মূসা (আ)-এর অনুগামীগণ পরবর্তীকালে অসংখ্য বিভিন্ন মতবাদের সংমিশ্রণে 'ইয়াহুদী' নামে একটি স্বতন্ত্র ধর্ম রচনা করে নিয়েছে এবং হযরত ঈসা (আ)-এর অনুবর্তীগণও তদ্রুপ এক 'খৃষ্ট ধর্মের' উৎপত্তি করে নিয়েছে। এরূপে ভারতবর্ষ, ইরান, চীন এবং অন্যান্য দেশে প্রেরিত পয়গাম্বরদের উম্মতগণ বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয়ে বিভিন্ন নামে এক একটি ধর্ম রচনা করে নিয়েছে। কিন্তু এ মূসা (আ), ঈসা (আ) এবং অন্যান্য জ্ঞাত অজ্ঞাত সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামই সম্মিলিতভাবে এ এক ইসলামের দিকে আহবান জানিয়েছেন অন্য কিছুর দিকে নয়।

কুরআনের দাবি

উপরোক্ত বিশ্লেষণের পর কুরআনের দাবি অত্যন্ত স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। মোটামুটি তার দাবি এ দাঁড়ায়, আল্লাহর

সম্মুখে আনুগত্যের মস্তক অবনমিত করা এবং আল্লাহর প্রেরিত আম্বিয়ায়ে কেরামের মারফত প্রদর্শিত চিন্তা ও কর্মনীতি অনুসরণ করে চলাই নিখিল মানবজাতির জন্য একমাত্র নির্ভুল জীবন ব্যবস্থা বা ধর্ম।

বস্তুত এটাই কুরআনের ঐকান্তিক দাবি। এ দাবি সত্যই গ্রহণযোগ্য কিনা তা বিশেষ বিচক্ষণতার সাথে আমাদের বিচার-বিবেচনা করে দেখতে হবে। স্বয়ং কুরআনের দাবির সত্যতা প্রমাণ করার জন্য যে যুক্তি উপস্থিত করেছে, সেগুলো তো আমাদের যাচাই করতে হবে। কিন্তু তার পূর্বে নিজেদের চিন্তা ও গবেষণাশক্তি প্রয়োগ করতে আমরা একবার একথার বিচার করে দেখতে পারি যে, কুরআনের এ দাবিকে দ্বিধাহীনচিত্তে কুবল করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় সত্যি কি আমাদের আছে?

জীবন ব্যবস্থার আবশ্যকতা

দুনিয়াতে মানুষের সুষ্ঠু জীবন যাপনের জন্য একটি জীবন ব্যবস্থা অপরিহার্য, এটা প্রমাণ করতে বিশেষ কোনো যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপিত করার প্রয়োজন হয় না। মানুষ নদী নয়, তাই নদীর ন্যায় তার পথ মাটির চড়াই-উৎরাইয়ের ভিতর দিয়ে আপনা আপনিই সুনির্দিষ্ট হয়ে যেতে পারে না। মানুষ বৃক্ষ নয় বৃক্ষের মত তার পথ প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন নির্ধারিত হতে পারে না। মানুষ নিছক পশুও নয়, পশুর জন্য কেবল জন্মগত প্রকৃতির পথনির্দেশই যথেষ্ট মানুষের জন্য নয়। মানুষ যদিও তার জীবনের একটি বিরাট অংশে স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন তবুও সে তার জীবনের অন্যান্য অসংখ্য বিভাগে পশুর ন্যায় কোনো বাধাধরা নিয়মে এক কদমও চলতে পারে না। বস্তুত এ বিভাগসমূহে তার সম্মুখে অসংখ্য পথের দুয়ার উন্মুক্ত হয়ে থাকে, তাকে তা হতে একটি পথ নির্বাচন করে গ্রহণ করতে হয়। বিশ্বপ্রকৃতি মানুষের চিন্তাশীল মস্তিস্কের সম্মুখে চিন্তা ও গবেষণা করার জন্য অসংখ্য জটিল বিষয় উপস্থাপন করে, কিন্তু সেগুলোর কোনো স্পষ্ট সমাধান পেশ করে না। সে বিষয়গুলো সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে সুষ্ঠু মীমাংসা করে নেয়ার জন্য মানুষের জন্য একটি সুস্পষ্ট চিন্তা-পদ্ধতির প্রয়োজন। প্রকৃতির সাধারণ নিয়মে ইন্দ্রিয়নিচয়ের সাহায্যে অসংখ্য তথ্য ও তত্ত্ব-জ্ঞান মানুষের সম্মুখে মস্তিস্কে জড়িভূত হয় ; কিন্তু সেগুলো একবারে বিক্ষিপ্ত ও বিশিষ্ট হয়ে থাকে প্রকৃতি সেগুলোকে সুশৃঙ্খল ও সংঘবদ্ধ করে দেয় না। তাই সে জ্ঞানরাশিকে সুসংবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে মানুষের জ্ঞানের একটি নির্দিষ্ট পথ আবশ্যক। ব্যক্তিগত জীবনে মানুষের স্বভাব তার নিকট অসংখ্য ও বিভিন্ন দাবি পেশ করে, কিন্তু সেই দাবিগুলো পূর্ণ করার কোনো সুনির্দিষ্ট পথ সে পায় না। এ কারণে মানুষের ব্যক্তিগত আচার-আচরণের জন্য একটি মূলনীতি নির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। তার পারিবারিক জীবনের জন্য, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার জন্য, অর্থনৈতিক কাজ-কর্মের জন্য, দেশ ও রাষ্ট্রের

শৃঙ্খলা বিধানের জন্য, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধস্থাপনের জন্য এবং জীবনের অন্যান্য অসংখ্য বিভাগের জন্যও একটি সুনির্দিষ্ট পথ অপরিহার্য। যে পথে মানুষ কেবল ব্যক্তিগতভাবেই নয় একটি দল, একটি জাতি, একটি গোষ্ঠী হিসাবেও চলতে পারবে। স্বভাবগত নিয়ম অনুসারে মানব জীবনের বহু উদ্দেশ্য আছে, কিন্তু স্বভাব নিয়ম সেই উদ্দেশ্যগুলো সুস্পষ্টরূপে তার সম্মুখে পেশ করে না এবং সে উদ্দেশ্য লাভ করার জন্য স্বভাব-নিয়ম কোনো পথও নির্দিষ্ট করে দেয় না।

মানব জীবনের অখণ্ডত্ব

মানব জীবনের অসংখ্য দিক ও বিভাগে একই নিয়ম ও বিধান অবলম্বন করা মানুষের পক্ষে অপরিহার্য। কারণ প্রকৃতপক্ষে এদিক ও বিভাগগুলো পরস্পর বিরোধী, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পরস্পরের প্রতি অনির্ভরশীল নয়। এজন্যই তার কোনো একটি ক্ষেত্রেও মানুষ আলাদা পথ ও বিভিন্ন প্রকারের বিধান অবলম্বন করতে পারে না। মানুষ যদি জীবনের বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন মত ও পথ অবলম্বন করে এবং সে মত ও পথের প্রত্যেকটির লক্ষ্য ও পাথেয় যদি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়, সে পথে চলার ধরণ ও পন্থা যদি বিভিন্ন হয়, সে পথে চলার উদ্দেশ্য যদি ভিন্নতর হয় এবং তার লক্ষ্য ও মঞ্জিল মকসুদও যদি আলাদা হয়, তবে মানুষের জীবন অত্যন্ত দুঃসহ হয়ে পড়তে বাধ্য। মানুষ এবং মানব জীবনের সমস্যাগুলো যদি একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও গভীর মননশীলতার সাথে বুঝতে চেষ্টা করা হয়, তবে মানুষ নিশ্চিতরূপে জানতে পারবে এবং মানতে বাধ্য হবে যে, মানব জীবন সামগ্রীকভাবে একটি অবিভাজ্য সত্তা। তার প্রত্যেকটি দিক ও বিভাগ এবং প্রত্যেকটি অংশই পরস্পরের সাথে এক গভীর ও অটুট বন্ধনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ অংশ ও বিভাগগুলোকে কিছুতেই পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। অধিকন্তু এরা পরস্পরের উপর অনিবার্যরূপে প্রভাবশীল ও একটি অপরটি কর্তৃক প্রভাবান্বিত। এদের সকলের ধমনীতে একই রক্ত প্রবাহিত হয়। একই প্রাণশক্তি সবগুলোকেই সঞ্জীবিত ও সচেতন করে রাখে এবং এগুলোর নিবিড় সম্মিলনে যে বস্তুটি সৃষ্টি হয়, তারই নাম জীবন। কাজেই মানুষের অসংখ্য লক্ষ্য ও বিবিধ উদ্দেশ্যের প্রয়োজন নেই। তার জন্য চাই একটি মাত্র কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য। সে একই উদ্দেশ্যের সাথে ছোট বড় সমগ্র উদ্দেশ্যই পূর্ণ আনুকূল্য ও সামঞ্জস্যের সাথে এমনভাবে যুক্ত ও মিলিত হবে যে, সে একই উদ্দেশ্য লাভের সাধনার ফলে অন্যান্য সমগ্র উদ্দেশ্যই আপনা আপনি লাভ হতে পারবে। মানুষের জন্য অসংখ্য পথের আবশ্যকতা নেই তার প্রয়োজন শুধু একটি মাত্র পথ, যে পথে সে তার সমগ্র জীবনকে জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগকে নিয়ে পূর্ণ ঐক্য ও সামঞ্জস্য সহকারে স্বীয় লক্ষ্যের দিকে চলতে পারবে। চিন্তা-গবেষণা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-শিল্প, শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম ও চরিত্র, সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাজনীতি, রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন ইত্যাদির জন্য মানুষের আলাদা

আলাদা মত, পথ ও নীতির কোনো প্রয়োজন নেই। তার জন্য চাই একটি ব্যাপক ব্যবস্থা, যার অধীনে এ সমস্ত দিক পূর্ণ ঐক্য ও সামঞ্জস্যের সাথে একত্রিত ও মিলিত হবে। সেই ব্যাপক ব্যবস্থায় মানুষের এ সমগ্র বিভাগের জন্য একই প্রকৃতি এ ভাবধারা সমন্বিত আলাদা আলাদা ব্যবস্থা বর্তমান থাকবে, যা অনুসরণ করে ব্যক্তি তথা মানব জাতি এবং সামগ্রিকভাবে গোটা মানবতা তার উচ্চতম ও চরম লক্ষ্যে পৌছতে পারবে। বর্বরতার অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে মানব জীবনকে বিভিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ ও নিরপেক্ষ বিভাগে বিভক্ত করা সম্ভব বলে মনে করা হতো। এ যুগেও যদি এ ধরনের অর্থহীন মতাবলম্বী লোক বর্তমান থেকে থাকে, তবে হয় তারা একান্তভাবে প্রাচীন মতের অন্ধ আবেষ্টনীতে এখনও বসবাস করছে, অতএব তারা দয়ার পাত্র ; নয়তো তারা প্রকৃত তত্ত্ব জানতে পেরেও বিশেষ কোনো স্বার্থের বশবর্তী হয়ে এ অবলীলাক্রমে প্রচার করে যাচ্ছে। তারা একথা বলতে পেরেছে যে, মানব সমাজে তারা যে ব্যবস্থার প্রচলন করতে ইচ্ছুক, তার বিরোধী মতাবলম্বী অসংখ্য লোক সেই সমাজে বর্তমান। সেসব লোককে প্রতারিত করার জন্য তারা উদাত্ত কণ্ঠে বলে বেড়ায় যে, তোমরা আমাদের উপস্থাপিত ব্যবস্থায় তোমাদের জীবনের প্রিয় ক্ষেত্রগুলোতে পূর্ণ আযাদী ও নিরাপত্তা লাভ করতে পারবে। অথচ জীবনের বিশেষ বিশেষ বিভাগে এক ধরনের বিধান অনুসরণ করলে অন্যান্য কয়েকটি বিভাগে সে বিধানকে অমান্য করে চলা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অসম্ভব, প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী এবং কার্যত তা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমার মনে হয়, এ ধরনের কথা যারা বলে বেড়ায়, তারা নিজেরাও মর্মে মর্মে বুঝতে পারে যে, এটা বস্তুতই সম্ভব নয় ; প্রত্যেক কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাই জীবনের সমগ্র বিভাগকে তার নিজের ভাবধারা ও প্রকৃতির অনুরূপ ঢেলে সাজায়, লবনের খনিতে যাই পড়বে, খনি তাকেই লবনে পরিণত করে নিবে, তা সর্বজনবিদিত সত্য।

জীবনের ভৌগলিক ও গোত্রীয় বিভাগ

মানব জীবনকে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করার কথা যেমন অর্থহীন জীবনকে ভৌগলিক আঞ্চলিকতায় কিংবা গোত্রীয় পরিসীমায় বণ্টন করা তদপেক্ষা বেশি অর্থহীন। মানুষ দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে বিস্তৃত হয়ে আছে ; নদী, পর্বত, জংগল ও সমুদ্র কিংবা কৃত্রিম সীমারেখা তাদেরকে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, একথা কেউই অস্বীকার করতে পারে না। পক্ষান্তরে মানুষের অসংখ্য গোত্র ও অসংখ্য জাতি এ দুনিয়াতে বর্তমান এবং ঐতিহাসিক, মনস্তাত্বিক ও অন্যান্য অসংখ্য কারণে মানবতার বিকাশ ও প্রকৃতি তাদেরকে বিভিন্ন রূপ দান করছে তাও অনস্বীকার্য। কিন্তু এ বিভিন্নতাকে ভিত্তি করে যারা বলে যে, প্রত্যেক গোত্র, প্রত্যেক জাতি এবং প্রত্যেক অঞ্চলের মানুষের জন্য এক এক প্রকার জীবন ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়, তারা নির্বোধ, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাদের স্থূল

ও সীমাবদ্ধ দৃষ্টি কেবল মাত্র বাহ্যিক প্রকাশ, বাহ্যিক বাঁধা-বন্ধন ও বাহ্যিক কারণ বৈষম্যকেই বড় করে দেখেছে, এ বাহ্যিক বহুত্বের অভ্যন্তরে মানবতার মহান সত্তার অবিভাজ্য ঐক্য তাদের গোচরীভূত হয়নি। এসব বাহ্যিক বৈষম্য যদি বাস্তবিকই গুরুত্বপূর্ণ হয় এবং তার ভিত্তিতে যদি মানুষের জীবন ব্যবস্থাও বিভিন্ন হওয়া প্রয়োজন বলে মনে হয়, তাহলে মানুষকে একটি কঠিন প্রশ্নের সম্মুখিন হতে হবে। দু'দেশের অধিবাসীদের মধ্যে এবং দু'গোত্রের লোকদের মধ্যে যে বৈষম্য ও পার্থক্য বর্তমান তা একদিকে রাখুন, অন্যদিকে শুধুমাত্র নারী-পুরুষের মধ্যে দু'জন স্বতন্ত্র ব্যক্তি এবং একই মায়ের দুই সন্তানের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তাও লিপিবদ্ধ করুন। অতপর এ উভয় প্রকার পার্থক্যের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করুন। আমি দাবি করে বলতে পারি, এ উভয় প্রকার পার্থক্যের মধ্যে প্রথম প্রকার অপেক্ষা দ্বিতীয় প্রকারের পার্থক্য অত্যন্ত গভীর ও স্পষ্ট বলে প্রমাণিত হবে। একথা সত্য হলে বলতে হবে যে, আলাদাভাবে প্রত্যেকটি ব্যক্তিরই জীবনব্যবস্থা ও জীবনযাত্রা প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন হওয়া আবশ্যক। অথচ এটা যে প্রকৃত সত্যের পরিপন্থী, তা আপনিও স্বীকার করবেন। কিন্তু আপনি যখন অসংখ্য ব্যক্তি, অসংখ্য স্ত্রী-পুরুষ এবং অসংখ্য পরিবারের মধ্যে এমন এক স্থায়ী ঐক্য ও সামঞ্জস্য লক্ষ্য করেন যার ভিত্তিতে জাতি, অঞ্চল কিংবা গোত্রীয় মতবাদ গড়ে উঠতে পারে এবং সে ধরনের বুনিয়াদে একটি জাতি কিংবা একটি অঞ্চলের অসংখ্য অধিবাসীর জন্য একই প্রকার জীবন ব্যবস্থা অনুসরণ যোগ্য বলে মনে করেন তখন জাতি, গোত্র এবং আঞ্চলিক বৈষম্যের মধ্যে একটি বিরাট ও বুনিয়াদী ঐক্য আপনি দেখতে পান না কেন, যার ভিত্তিতে বিশ্বমানবতা সম্পর্কে একটি পূর্ণ ও ব্যাপক মত গড়ে উঠতে পারে এবং যার ভিত্তিতে সমগ্র বিশ্বমানবের একই 'দীন' বা জীবন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে পারে? সমগ্র ভৌগলিক, গোত্রীয় ও জাতিগত বৈষম্য সত্ত্বেও দুনিয়ার সমগ্র মানুষ একই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন জীবন যাপন করছে, একই দৈহিক নিয়মে সমস্ত মানুষ সৃষ্টি হয়েছে, একই বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্যের দরুন মানবজাতি দুনিয়ার অন্যান্য সৃষ্টি হতে স্বতন্ত্র এক সৃষ্টি বলে অভিহিত হয়, সকল মানুষের মধ্যে একই স্বাভাবিক অনুভূতি, চেতনা ও ভাবধারা বিদ্যমান সকল মানুষের মধ্যে একই প্রকার আত্মশক্তি বর্তমান এবং মানব জীবনে যেসব স্বাভাবিক, মনস্তাত্বিক, ঐতিহাসিক, তামাদ্দুনিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম অবিশ্রান্ত গতিতে চলেছে তাও সম্পূর্ণ এক ধরণের। এটা যদি সত্য হয় কে বলতে পারে যে, এটা সত্য নয়? তাহলে যে নীতি বা আদর্শ মানুষ হিসেবে সমগ্র মানুষের পক্ষে কল্যাণকর হতে পারে তা সার্বজনীন ও বিশ্ব ব্যাপক হওয়া বাঞ্ছনীয়। তার জাতিগত, গোত্রীয় কিংবা আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে বিভিন্ন হওয়ার কোনোই কারণ নেই। অবশ্য বিভিন্ন জাতি এবং গোত্র সে মূলনীতির অধীন নিজেদের বিশিষ্ট ভাবধারার প্রকাশ করতে পারে এবং আংশিকভাবে তাদের নিজেদের কাজ কর্ম-

বিভিন্ন পন্থায় আঞ্জাম দিতে পারে এটা করাও তাদের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু মানুষের মানুষ হওয়ার দিক দিয়ে যে বিশুদ্ধ জীবন ব্যবস্থার প্রয়োজন, তাকে নিশ্চিতরূপে এক ও অভিন্ন হতে হবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এক জাতির পক্ষে যা সত্য, অন্য জাতির পক্ষে তা মিথ্যা হওয়া, পক্ষান্তরে এক জাতির জন্য যা মিথ্যা, অন্য জাতির পক্ষে তা সত্য হওয়ার কথা মানুষের সুস্থ জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি কিছুতেই স্বীকার করতে পারে না।

জীবনের কালগত বিভাগ

আর এক শ্রেণীর লোক মানব জীবনের কালগত বিভাগ করতে প্রয়াস পাচ্ছে। তাদের বক্তব্য এই যে, কালের এক অধ্যায় মানুষের পক্ষে যে জীবন ব্যবস্থা সত্য ও গ্রহণযোগ্য প্রমাণিত হয় পরবর্তী অধ্যায়ে তাই বাতিল ও বর্জনীয় হয়ে পড়ে। কারণ, তাদের মতে জীবনের সমস্যা ও তৎসংক্রান্ত ব্যাপারগুলো প্রত্যেক যুগেই পরিবর্তিত রূপ ধারণ করে এবং এ সমস্যা ও ব্যাপারগুলোর প্রকৃত রূপের উপরই জীবন ব্যবস্থা সত্য কিংবা বাতিল হওয়া নির্ভর করে। বস্তুত এ উদ্ভট মতবাদকে নূতন বৈজ্ঞানিক যুগের চরম নির্বুদ্ধিতা ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। বিশেষ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এরূপ নির্বুদ্ধিতামূলক মতবাদ পূর্ণ নিশ্চয়তা ও দৃঢ়তার সাথেই প্রচার করা হয়। এটা আরো ভয়ংকররূপে মারাত্মক। এ ধরনের মতবাদ যে মানব জীবন সম্বন্ধে প্রচার করা হয়, সে সম্পর্কে সাথে সাথে আবার ক্রমবিকাশবাদের কথাও বলা হয় এবং ইতিহাসে তার সক্রিয় নিয়মগুলোও অনুসন্ধান করা হয়। সে জীবনের অতীত অভিজ্ঞতাসমূহ হতে বর্তমানের জন্য শিক্ষা এবং ভবিষ্যতের জন্য নীতি ও নিয়ম-কানুনও রচনা করা হচ্ছে। মানুষের জীবনে 'মানব প্রকৃতি' নামে একটি বস্তু আছে একথাও খুব জোর গলায় প্রচার করা হয়। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে, মানব জাতির এ অব্যাহত ঐতিহাসিক গতিধারায় কাল-অধ্যায় কিংবা যুগের সীমা নির্দেশ করার কোনো বিশ্বস্ত যন্ত্র বা মানদণ্ড আপনাদের কাছে আছে কি? সে নির্দিষ্ট সীমাগুলোর মধ্যে কোনো একটি সীমার উপর অংগুলি নির্দেশ করে আপনি কি বলতে পারেন যে, এ সীমার ওপারে জীবনের যে সমস্যা ছিলো, এপারে এসে তা আমুল বদলিয়ে গেছে? এবং ওপারে জীবনকে যেসব পরিস্থিতির সম্মুখিন হতে হয়েছে, এপারে এসে তা সবই বিলুপ্ত হয়ে গেছে? মানুষের জীবনকে এরূপ বিভিন্ন কালগত খণ্ডে বিভক্ত করা যদি বাস্তবিকই সম্ভব হয় তাহলে বলতেই হবে যে, জীবনের অতীত অংশ পরবর্তী অংশের পক্ষে একেবারে অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয়। কালের সে অংশে মানুষ যা কিছুই করেছে, তা অতীত হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে মানুষের সেই সমস্ত কীর্তিও নি:শেষ হয়ে গেছে। কালের সে অধ্যায়ের মানুষ যেমন অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, পরবর্তী অধ্যায়ে সে তা হতে কোনো শিক্ষাই লাভ করতে পারে না। কারণ মানুষ কালের এ অধ্যায়ে যে পরিস্থিতি ও সমস্যাবলীর মধ্যে বিশেষ

বিশেষ পন্থা ও নীতি গ্রহণ করে এবং বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে লাভের জন্য চেষ্টা সাধনা করে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, পরবর্তীকালে তা সবই ফুরিয়ে গেছে। কাজেই সে অভিজ্ঞতা জীবনের এ পরবর্তী অধ্যায়ে কোনো শিক্ষাই দিতে পারে না। তা যদি সত্য হয় তবে জিজ্ঞেস করেন, এ ক্রমবিকাশবাদের কথা এতো জোর গলায় কেন বলা হয়? জীবনের জন্য নিয়ম-কানুনের এরূপ অনুসন্ধিৎসা কেন? এ ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের যৌক্তিকতা কি? বস্তুত ক্রমবিকাশবাদকে যদি স্বীকারই করা হয়, তবে একথা মানতেই হবে যে, একটি নির্দিষ্ট জিনিস এহেন বিবর্তন ও পরিবর্তনের প্রাণকেন্দ্র হয়ে বর্তমান আছে এবং পরিবর্তনের দুর্বার স্রোতধারার মধ্যেও নিজেকে অক্ষত রেখে অব্যাহত গতিতে ছুটে চলেছে। আপনি যখন জীবনের নিয়মাবলীর কথা আলোচনা করবেন, তখন আপনাকে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, এ অস্থায়ী অবস্থার মধ্যে, এ গতিমান অভিব্যক্তিকে, এ ভাংগা-গড়ার আবেষ্টনীর মধ্যে এমন একটি স্থায়ী ও চিরঞ্জীব সত্য বর্তমান আছে যার নিজস্ব একটি প্রকৃতি এবং স্বকীয় কোনো নিয়ম-পদ্ধতি বর্তমান রয়েছে। আপনারা যখন ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধান করে তত্ত্ব আবিষ্কার করেন তখন তার অর্থ এ দাঁড়ায় যে, ইতিহাসের এ সুদীর্ঘ পথে যে পথিক কালের বিভিন্ন অধ্যায় অতিক্রম করে এসেছে, তার নিজস্ব কোনো সত্ত্বা এবং স্বকীয় কোনো প্রকৃতি বর্তমান আছে যে সম্পর্কে বলা যায় যে, তা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপে কাজ করে ; এক সময় তা কোনো কোনো জিনিস গ্রহণ করে, অন্য সময় আবার সেই জিনিসকেই বাতিল করে দিয়ে অপর একটি জিনিস পেতে চায়। এ জীবন্ত সত্য, এ স্থায়ী পরিবর্তনশীল বস্তু, ইতিহাস, রাজপথের এ চিরন্তন মুসাফিরকেই সম্ভবত আপনারা 'মানবতা' নামে অভিহিত করে থাকেন। কিন্তু আপনি যখন পথের বিভিন্ন মঞ্জিল, সে মঞ্জিলসমূহের বিভিন্ন অবস্থা এবং তা হতে উদ্ভূত নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করেন, তখন সে কথায় এমনভাবে তন্ময় হয়ে যান যে, তখন স্বয়ং পথিকের কথা একেবারেই ভুলে যান। জিজ্ঞেস করি, পথের মঞ্জিল, তার অবস্থাসমূহ এবং সে অবস্থা হতে উদ্ভূত সময়গুলো পরিবর্তিত হয়ে গেলে স্বয়ং পথিক এবং তার অন্তর্ভুক্ত নিগূঢ় সত্য ও কি পরিবর্তিত হয়ে যায়? আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, সৃষ্টির শুরু হতে আজ পর্যন্ত তার কাঠামো ও প্রকৃতি মোটেই বদলিয়ে যায়নি। হাজার বছর পূর্বে মানবসৃষ্টির যে উপাদান ছিলো আজও ঠিক তাই বর্তমান। তার প্রকৃতি ও স্বভাব, স্বভাবের অভিব্যক্তি, তার শক্তি ও গুণাগুণ, তার দুর্বলতা ও ক্ষমতা, তার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, তার গ্রহণ ও বর্জন, তার উপর প্রভাবশীল শক্তিনিচয় এবং তার প্রাকৃতিক পরিবেশ সবকিছুই যথাপূর্ব বর্তমান আছে ; এসবের কোনো কিছুতেই সৃষ্টির প্রথম দিন হতে আজ পর্যন্ত একবিন্দু পরিমাণ পরিবর্তন বা ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়নি। এমন দাবি করার দুঃসাহস কেউই করতে পারে না যে, ইতিহাসের এ দীর্ঘ ও একটানা পথে বিভিন্ন অবস্থা ও সে অবস্থাসমূহ হতে উদ্ভূত

জীবন সমস্যার পরিবর্তনের ফলে স্বয়ং 'মানবতা'ও পরিবর্তিত হয়ে এসেছে কিংবা মানবতার সাথে সংশ্লিষ্ট মৌলিক বিষয়সমূহও পরিবর্তিত হয়ে চলে এসেছে। এটা যদি সত্য হয়, তাহলে এমন দাবি করা একবারেই অর্থহীন যে, 'মানবতার' পক্ষে গতকাল যা বিষবৎ ছিলো, আজ তা অমৃত হয়ে গেছে, কাল যা সত্য ছিলো আজ তা মূল্যহীন হয়ে গেছে।

মানুষের প্রয়োজনীয় জীবন ব্যবস্থার রূপ

বস্তুত ব্যক্তি মানুষ ও সমষ্টিগত মানুষ ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় মানবতাকে এবং তৎসংশ্লিষ্ট মৌলিক বস্তুগুলোকে বুঝতে ভুল করে কোনো কোনো সত্য স্বীকার করার ব্যাপারে উচ্ছ্বাস ও ভাবাবেগের আতিশয্য দেখিয়ে এবং কোনো কোনোটিকে অনুভব করতে অসমর্থ হয়ে সময়ে সময়ে যেসব জীবন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে এবং মহান মানবতা (humanity at large) যেগুলোকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরে ভুল দেখতে পেয়ে তা ত্যাগ করতে এবং এ ধরনের নুতন পদ্ধতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে, সেসবের পরিপ্রেক্ষিতে তারা সিদ্ধান্ত করে নিয়েছে যে, মানবতার জন্য প্রত্যেক নুতন যুগে নুতন এক জীবন ব্যবস্থা আবশ্যক যা কেবল সে যুগের অবস্থা ও সমস্যাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট এবং সেগুলোর সমাধান করতে সচেষ্ট। অথচ প্রকৃতপক্ষে এ ঘটনা হতে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অধিকতর যুক্তিসংগত যে, এ ধরনের কালগত ও যুগগত জীবন ব্যবস্থা অন্য কথায় মৌসুমী ফসলকে বারবার পরীক্ষা ও যাচাই করায় এবং প্রত্যেকটির ব্যর্থতার পরে অপর একটির পরীক্ষা করায় মহান মানবতার বহু মূল্যবান সময় বৃথা নষ্ট হয়ে যায়, তারপর বন্ধুর হয় তার ক্রমবিকাশ এবং পূর্ণতা প্রাপ্তির পথে তার গতি ব্যাহত হয়। আসলে বিরাট মানবতার জন্য প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি প্রয়োজন এমন একটি জীবন ব্যবস্থার যাকে জেনে বুঝে এবং তৎসংক্রান্ত যাবতীয় তত্ত্ব অনুধাবন করে এক ব্যাপক, সার্বজনীন, চিরস্থায়ী ও সনাতন নীতির বুনিয়াদ কায়েম করা যেতে পারে যাকে নিয়ে মানবতা বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমগ্র বিবর্তিত পরিস্থিতির মধ্যে অতীব স্বচ্ছন্দ গতিতে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে পারে সে পরিস্থিতি হতে উদ্ভূত সমস্যাগুলোর সুষ্ঠু সমাধান করাও সম্ভব হয় জীবনের রাজপথে সংকুচিত হয়ে নয়, বরং অব্যাহত গতিতে তার মঞ্জিলে মকসুদে গিয়ে উপনীত হতে পারে।

এরূপ জীবন ব্যবস্থা কি মানুষ নিজেই রচনা করতে সক্ষম?

মানুষের জন্য 'দীন' বা জীবন পদ্ধতি একান্তভাবে অপরিহার্য, উপরে তার বাস্তব রূপ এবং পরিচয় দেয়া হয়েছে। এখন আমাদের বিশেষভাবে বিচার করে দেখতে হবে যে, এ ধরণের কোনো জীবন ব্যবস্থা যদি মানুষ নিজেই– আল্লাহর সহায়তা ভিন্ন রচনা করতে চেষ্টা করে, তবে সে চেষ্টা কোনোক্রমেই কি সফল

হতে পারে? ইতিপূর্বে মানুষ এমন কোনো জীবন ব্যবস্থা রচনা করতে সমর্থ হয়েছে কিনা, সে প্রশ্ন আমি আপনাদের কাছে করবো না ; কারণ তার উত্তরে আপনাদের সকলকেই নিশ্চিতরূপে 'না' বলতে হবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। বর্তমান যুগে যারা বড় গলায় নিজেদের রচিত 'দীন' বা জীবন ব্যবস্থা পেশ করছে এবং সেজন্য পরস্পর মারাত্মক সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে তিলে তিলে ধ্বংস হচ্ছে, তারাও এমন দাবি করতে পারে না যে, তাদের কারো 'দীন' বা জীবন ব্যবস্থা মানুষ হিসাবে মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য যথেষ্ট হতে পারে। কারো 'দীন' গোত্রীয় ও জাতিগত, কারো 'দীন' বিশেষ কোনো ভৌগলিক অঞ্চলের জন্য, কারো 'দীন' শ্রেণীগত কারো 'দীন' অতীত এক যুগের প্রয়োজন অনুসারে রচিত হয়েছিল। কাজেই তা অনাগত যুগের অবস্থা ও সমস্যার সমাধানে কিছুমাত্র কার্যকরি হবে কি না সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। কারণ যে যুগ এখন চলছে, তার ঐতিহাসিক প্রয়োজন এখনো যাচাই করে দেখা হয়নি। কাজেই মানুষ এ ধরনের কোনো জীবন ব্যবস্থা রচনা করতে সমর্থ হয়েছে কিনা সে প্রশ্ন আমি করবো না ; আমি জিজ্ঞেস করবো যে, মানুষ এ প্রচেষ্টায় সফল হতে পারে কি?

বস্তুত এটা অত্যন্ত জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সুতরাং এ সম্পর্কে ভাসা-ভাসাভাবে আলোচনা করা সমীচিন হবে না। কাজেই সর্বপ্রথম ভালভাবে বুঝে নিতে হবে যে, এখানে যা রচনা করার কথা বলা হচ্ছে, সে জিনিসটি আসলে কি? এবং যে তা রচনা করতে চায়, তারই বা যোগ্যতা ও ক্ষমতা কতখানি?

'আদ্-দীন' এর পরিচয়

মানুষের জন্য যে 'আদ্-দীন' বা একমাত্র জীবন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা এই মাত্র প্রমাণ করলাম, তা কোনো বিস্তারিত বিধান নয়, তাতে সর্বকালের সমগ্র ছোট-বড় ও খুঁটিনাটি বিষয়ের নির্দেশ বর্তমান থাকার কোনোই আবশ্যকতা নেই। বরং প্রকৃতপক্ষে এ একমাত্র জীবন ব্যবস্থার অর্থ এমন একটি সর্বব্যাপক চিরন্তনী ও মৌলিক বিধান যা সর্বাবস্থায় মানুষের পথনির্দেশ করতে পারে যা মানুষের চিন্তা ও গবেষণা, চেষ্টা সাধনা এবং সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার সঠিক দিক নির্ণয় করতে পারে এবং তাকে ভুল অভিজ্ঞতা অর্জনে সময়, শ্রম, শক্তি ব্যয় হতে রক্ষা করতে পারে। এজন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন এই যে, মানুষ নিশ্চিতরূপে জেনে নিবে নিছক আন্দাজ অনুমান দ্বারা নয়, বরং নিশ্চিত জ্ঞানের সাহায্যে জেনে নিবে যে, তার এবং এ বিশ্বপ্রকৃতির নিগূঢ় তত্ত্ব কি? এবং এ বিশাল বিশ্বে তার অবস্থান কোথায়? তারপর তাকে জানতে হবে কেবল বুঝে নিলেই চলবে না, খুব ভালো করেই জেনে নিতে হবে যে, এ দুনিয়ার জীবনই কি একমাত্র জীবন, না এটা সমগ্র জীবনের একটি প্রাথমিক অধ্যায় মাত্র? মানুষের এ অবিশ্রান্ত যাত্রা কি শুধু জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, না ইহজীবন এক সীমাহীন দীর্ঘ সফরের এক

অধ্যায় মাত্র? অতপর তাকে অবশ্যম্ভাবীরূপে জীবনের একটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে এমন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, যা প্রকৃতপক্ষেই মানব জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হতে পারে, যার জন্য মূলত মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য এমন হওয়া বাঞ্ছনীয়, যা প্রত্যেকটি ব্যক্তি প্রত্যেকটি দল এবং সমষ্টিগতভাবে সমগ্র মানবতা সকল কালেই, কোনো দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ ব্যতিরেকেই, নিজ নিজ উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করতে পারে। এরপর মানুষের নৈতিক চরিত্রের জন্য এমন এক সুদৃঢ় ও সামগ্রিক নিয়ম পদ্ধতি আবশ্যক, যা প্রকৃতির সমগ্র বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারে এবং সমগ্র সম্ভাব্য অবস্থার উপর কাল্পনিক ও বাস্তব ক্ষেত্রে খাপ খেতে পারে। কারণ এরূপ হলেই সে এ নিয়ম পদ্ধতির ভিত্তিতে নিজের স্বভাব চরিত্র গঠন করতে পারবে, সে নিয়ম পদ্ধতি পথনির্দেশ জীবন পথের প্রত্যেক মঞ্জিলে তৎসংক্রান্ত যাবতীয় অবস্থা ও সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধান করতে পারবে। ফলে বিবর্তনশীল অবস্থা ও নিত্যঘটিত সমস্যাবলীর সাথে সাথে নতুন নতুন চরিত্রনীতি রচনার আবশ্যক হবে না, অন্য কথায় নীতিহীন ও সুবিধাবাদী (characterless and opportunist) হয়ে জীবন যাপন করতে সে বাধ্য হবে না।

তারপর মানুষের জন্য এমন পূর্ণাংগ ও ব্যাপক তামাদ্দুনিক নীতি আবশ্যক, যা মানব সমাজের মূলনীতি ও উদ্দেশ্য এবং তার সহজাত বৃত্তির প্রতি লক্ষ্য রেখে বিরচিত হবে। তাতে অতিরিক্ত গোঁড়ামী কিংবা শৈথিল্য এবং অসংগত কার্যক্রমের কোনো অবকাশ থাকবে না। তাতে সমগ্র মানুষের সামগ্রিক স্বার্থ এবং সুবিধার প্রতি অবশ্যই দৃষ্টি থাকবে। তা অনুসরণ করে যেন প্রত্যেক যুগে মানব জীবনের প্রত্যেক দিকের বাস্তব রূপায়ন, পূণর্গঠন এবং উৎকর্ষ সাধনের জন্য চেষ্টা ও সাধনা করা সম্ভব হয়।

মানুষের ব্যক্তিগত আচরণ, সামাজিক কার্যক্রম এবং চেষ্টা ও সাধনাকে বিশুদ্ধ ও নির্ভুল পথে পরিচালনা এবং ভ্রান্ত পথের মারাত্মক পরিণতি হতে রক্ষা করার জন্য একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা থাকা আবশ্যক, যা জীবনের বিশাল রাজপথে পথ চিহ্নরূপে প্রত্যেক মোড়ে, প্রত্যেক চৌমাথায় এবং সংকট ক্ষেত্রে তাকে সজাগ ও সচেতন করে দিবে এবং বলতে পারবে যে, তোমার পথ ঐদিকে নয়, এদিকে।

মানুষের জন্য কতকগুলো সুস্পষ্ট কর্মনীতিও আবশ্যক যা সে সার্বজনীন চিরস্থায়ী পন্থা হিসাবে অনুসরণ করতে পারবে এবং যা এ 'আদ্-দীন' নির্ধারিত জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, নৈতিক আদর্শ, সামাজিক ও তামাদ্দুনিক নীতি এবং কর্মসীমার সাথে মানুষের জীবনকে যুক্ত করে রাখতে পারবে।

এ ধরণের জীবন পদ্ধতি রচনা করার প্রশ্ন মানুষের সম্মুখে উপস্থিত। এখন বিশেষভাবে চিন্তা করতে হতো যে, এ ধরনের কোনো 'আদ্-দীন' বা জীবন বিধান রচনা করার মতো যোগ্যতা, ক্ষমতা বা উপায় উপাদান সত্যই মানুষের আয়ত্তাধীন আছে কি?

মানুষের উপায় উপাদানের বিশ্লেষণ

মানুষের জন্য 'দীন' বা জীবন ব্যবস্থা রচনা করার মাত্র চারটি উপায় ও পন্থা মানুষের আয়ত্তাধীন রয়েছে। প্রথম উপায় হচ্ছে, মানুষের ইচ্ছাশক্তি, দ্বিতীয় মানুষের বুদ্ধি, তৃতীয় প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং চতুর্থ হচ্ছে অতীত অভিজ্ঞতাসমূহের ঐতিহাসিক সম্পদ। এ চারটি উপায় ছাড়া কোনো পঞ্চম উপায় নির্ধারণ করা প্রায় অসম্ভব। এ চারটি উপায়ের যতোদূর যাচাই ও পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব হতে পারে, তা আপনি পরীক্ষা করে দেখুন এবং বিচার করে দেখুন, এসব উপায়ের সাহায্যে মানুষের জন্য 'আদ্-দীন' বা একমাত্র জীবন ব্যবস্থা রচনা করা কি কোনো প্রকারেই সম্ভব হতে পারে? ব্যক্তিগতভাবে আমি আমার জীবনের একটি বিরাট অংশ এসব বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে ও যাচাই পরীক্ষার কাজে অতিবাহিত করেছি এবং সর্বশেষে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, এ উপায়গুলো মানুষের জীবন ব্যবস্থা রচনায় কিছুমাত্র সহায়তা করতে পারে না। অবশ্য কোনো মানবাতীত সত্তা পথপ্রদর্শক হয়ে যদি মানুষের সম্মুখে কোনো জীবন ব্যবস্থা উপস্থিত করে তবে তা বুঝতে, হৃদয়ংগম করতে, পরীক্ষা ও যাচাই করতে এবং তদনুযায়ী জীবনের বিস্তারিত বিধান সময় ও কর্মোপযোগী করে রচনা করতে এসব মানবীয় উপায় অবশ্যই কিছু না কিছু করতে পারে। কিন্তু মানুষের জন্য প্রয়োজন 'আদ্-দীন' বা পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা রচনার জন্য এসবের কোনো ক্ষমতাই নেই।

ইচ্ছাশক্তি

প্রথমে মানুষের ইচ্ছাশক্তি সম্পর্কে আলোচনা করে দেখা যাক। প্রশ্ন হচ্ছে, এটা কি মানুষের পথপ্রদর্শক হতে পারে? এ শক্তিটি যদিও মানুষের প্রেরণা লাভের প্রকৃত উৎস উদ্বোধক, কিন্তু তা সত্ত্বেও এর মূল প্রকৃতিতে যেসব দূর্বলতা বিদ্যামন রয়েছে, তার কারণে এটা কিছুতেই মানুষের পথ প্রদর্শন করার যোগ্য হতে পারে না। শুধু পথ প্রদর্শন করাতো দূরের কথা, মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিকে পর্যন্ত অনেক বিভ্রান্ত করে থাকে। নানাবিধ শিক্ষা-দীক্ষা ও ট্রেনিং দেয়ার পর এ শক্তিকে যতোদূরই আধুনিক, তেজস্বী ও জ্যোতিষ্মান করে তোলা হোক না কেন, কোনো গুরুতর ব্যাপার শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দায়িত্ব এর উপর যখনই ন্যস্ত করা হবে, তখনি এটা শতকরা অন্তত নিরানব্বইটি অবস্থায় ভ্রান্তিপূর্ণ ফায়সালা দিবে, তাতে সন্দেহ নেই। কারণ এর অভ্যন্তরে যেসব ভাবধারা বর্তমান পাওয়া যায়, তা তাকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সাহায্য করে না, বরং বঞ্চিততকে কোনো না কোনো প্রকারে অবিলম্বে লাভ করার জন্য অনুকূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য করে। এটা মানুষের ইচ্ছাশক্তির স্বাভাবিক দূর্বলতা বিশেষ। কাজেই এ শক্তি একজন ব্যক্তিরই হোক কিংবা বিশেষ কোনো শ্রেণীর হোক অথবা রুশোর কথা অনুযায়ী সার্বজনীন ইচ্ছাশক্তি (general will) হোক না কেন,

মানুষের জন্য কোনো পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা রচনার উপযোগী যোগ্যতা স্বভাবতই কোনো ইচ্ছাশক্তির নেই। অধিকন্তু মানুষের ইচ্ছাশক্তি মানব জীবনের নিগূঢ় তত্ত্ব, তার লক্ষ্য, গতি ও পরিণতি সম্পর্কীয় উচ্চতর সমস্যাগুলোর (utimate problems) কোনো সমাধানই দান করতে পারে না।

বুদ্ধি

এখন মানুষের বুদ্ধি সম্পর্কে আলোচনা করে দেখা যাক। বুদ্ধির ক্ষমতা অসাধারণ, তার যোগ্যতা ও প্রতিভা অনস্বীকার্য। মানব জীবনে তার গুরুত্ব এবং মর্যাদাও কেউ উপেক্ষা করতে পারে না। পরন্তু মানুষের অভ্যন্তরে এটা অত্যন্ত তীব্র প্রেরণাদায়ক শক্তি, তাও স্বীকার না করে উপায় নেই ; কিন্তু সমস্যা এই যে, মানুষের জন্য জীবন ব্যবস্থা রচনা করার দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত করা হলে তা করবে কার বুদ্ধি? জায়েদের বুদ্ধি না বকরের বুদ্ধি? না সমগ্র মানুষের বুদ্ধি ? না মানুষের বিশেষ কোনো দল বা শ্রেণীর বুদ্ধি? বর্তমান যুগের মানুষের বুদ্ধি? না অতীত কোনো যুগের মানুষের বুদ্ধি? কি অনাগত যুগের মানুষের বুদ্ধি? আর এ প্রশ্ন না হয় না-ই করলাম, কারণ এর সঠিক জবাব দেয়া সম্ভব নয়। এ প্রসংগে সহজ একটি প্রশ্নই জিজ্ঞেস করতে চাই। মানব বুদ্ধির চৌহদ্দি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে দেখলে মানুষের জীবন ব্যবস্থা রচনা করার মতো বিরাট ও জটিল কাজ তার উপর ন্যস্ত করা কি কোনো রকমেই শোভা পায়?

বস্তুত কোনো কিছু সম্পর্কে বুদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ একান্তরূপে নির্ভর করে পঞ্চইন্দ্রিয় কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যের উপর। এটা ভুল তথ্য সংগ্রহ করলে বুদ্ধি ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য। তা অসম্পূর্ণ তথ্য উপস্থিত করলে বুদ্ধির সিদ্ধান্ত অসম্পূর্ণই হবে এবং যেসব ব্যাপারে ইন্দ্রিয় কোনো তথ্যই সংগ্রহ করতে পারবে না, বুদ্ধির আত্মজ্ঞান থাকলে সেসব ব্যাপারে তা কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করারই দুঃসাহস করবে না। আর তা অন্ধ ও দাম্ভিক হলে অন্ধকারে কাষ্ঠ নির্মিত তীর নিক্ষেপ করে অবশ্যই ব্যর্থ হবে। যে বুদ্ধির পরিধি এতো সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ, মানব জাতির জন্য এক পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা রচনা করার দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করা কিছুতেই সমীচিন হতে পারে না। ব্যবস্থা রচনার জন্য গোড়াতেই যে উচ্চতর সমস্যাগুলোর সমাধান অপরিহার্য, ইন্দ্রিয়নিচয় তার একটিরও কোনো সমাধান পেশ করতে পারে না। তবে কি এসব সমস্যার সমাধান করা হবে অবাস্তব ধারণা-বিশ্বাস, অমূলক কল্পনা-খেয়াল এবং কুসংস্কার ও আজগুবী কিচ্ছা-কাহিনীর উপর নির্ভর করে? 'আদ্-দীন' বা পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা রচনার জন্য যেসব স্থায়ী নৈতিক মূল্য নির্ধারণ সংগ্রহ করতে একেবারে অক্ষম। এমতাবস্থায় মানব বুদ্ধি, বিশুদ্ধ, খাঁটি ও পরিপূর্ণ নৈতিক মূল্য নির্ধারণ করতে সমর্থ হবে বলে কিছুমাত্র ভরসা করা যায় কি? তদ্রুপ জীবন ব্যবস্থা (আদ্-দীন) রচনার জন্য যেসব প্রয়োজনীয় বিষয়ের আমি উল্লেখ করেছি, তার জন্য ইন্দ্রিয়ের

সাহায্যে নির্ভুল, বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ উপাদান সংগ্রহ করা আদৌ সম্ভব নয়। কাজেই মানব বুদ্ধি কেন ব্যাপক ও পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা রচনা করতে সক্ষম নয়। উপরন্তু মানব বুদ্ধির সাথে ইচ্ছাশক্তি বলতে আর একটা বস্তু শনিগ্রহের ন্যায় স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে বিরাজ করছে। তা বুদ্ধিকে কোনো সুষ্ঠু ও বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে প্রতি পদক্ষেপ বাধা প্রদান করে এবং তাকে সহজ ও সঠিক পথে চলার গতি ব্যাহত করে বাঁকা ও ভুল পথে পরিচালিত না করে ছাড়ে না। কাজেই মানব বুদ্ধি ইন্দ্রিয়নিচয়ের সংগৃহিত তথ্যের সুবিন্যাসে এবং তা দ্বারা যুক্তি প্রদান করার ব্যাপারে কোনোরূপ ভুল করবে না বলে যদি ধরেও নেয়া হয়, তবুও তার আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা নিবন্ধন জীবন ব্যবস্থা রচনার ন্যায় বিরাট দায়িত্ব বহন করার কোনো ক্ষমতাই নেই, একথা স্বতঃসিদ্ধ। এ দায়িত্ব তার উপর অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দিলে এক দিকে যেমন তার উপর যুলুম করা হবে, অন্যদিকে নিজের উপরও কম যুলুম করা হবে না।

বিজ্ঞান

এখন তৃতীয় উপায়টি সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। বিজ্ঞান বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানকেই বুঝায়। এ জ্ঞানের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ব্যাপারে বিজ্ঞানের কোনো ছাত্র অপেক্ষা আমি পশ্চাদপদই নই এবং তার একবিন্দু অবমাননাও আমি মোটেই পছন্দ করি না। কিন্তু তার স্বাভাবিক সসীমতাকে উপক্ষে করে তাকে অধিকতর প্রশস্ত, বিশাল ও অসীম শক্তিসম্পন্ন মনে করাকে আমি নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক আচরণ বলে আখ্যা না দিয়ে পারি না। কারণ বিজ্ঞানে মূলতই সে শক্তি বর্তমান নেই। মানব বিজ্ঞানের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞ প্রত্যেক ব্যক্তিই একতা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, অতি প্রাকৃতিক ও জড় অতীত সমস্যাবলী সম্পর্কে কোনো নির্দেশ দেয়ার ক্ষমতা বিজ্ঞানের নেই। যেহেতু সেই নিগূঢ় তত্ত্বও রহস্যের জগতে পৌছবার কোনো অবলম্বন আসলেই মানুষের করায়ত্বে নয়। অধিকন্তু তার প্রত্যক্ষ ও সরাসরি পর্যবেক্ষণ করার এবং অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য ও জ্ঞান রাশির সাহায্যে এমন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা মানুষের নেই, যাকে কোনোরূপ 'বিজ্ঞান' নামে অভিহিত করা যেতে পারে। জীবন ব্যবস্থা (আদ্-দীন) রচনার জন্য যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সুষ্ঠু মিমাংসা করা সর্বপ্রথম অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তাই বিজ্ঞানের আওতার বাইরে অবস্থিত। তারপরে নৈতিক মান নির্ধারণ, তামাদ্দুন ও সংস্কৃতির মূলনীতি নির্বাচন এবং ভ্রান্ত পথ হতে বিরত রাখার জন্য সীমা নির্দেশ করার কর্তব্য বিজ্ঞানের সাহায্যে সমাধা করা যায় কিনা, এ প্রশ্ন অবশ্য জাগতে পারে। কিন্তু তার উপর পাল্টা প্রশ্ন উঠবে যে, তা যদি সম্ভব বলে ধরে নেয়া যায়, তাহলে কোন্ ব্যক্তির বা কোন্ দলের অথবা কোন্ কালের বিজ্ঞান এ কাজ সমাধা করবে? কাজেই অর্থহীন বিতর্কে না গিয়ে আমরা শুধু নীতি হিসেবে

বিষয়টির আলোচনা করে দেখবো। প্রথম আমরা বিশ্লেষণ করে দেখবো যে, নিছক বৈজ্ঞানিক পন্থায় এ কাজ সম্পন্ন করার জন্য কি কি বুনিয়াদী শর্ত রয়েছে। সেজন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হলো মানুষ এ দুনিয়াতে যেসব প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন বসবাস করছে, সে সমস্ত নিয়মের তত্ত্বজ্ঞানের পরিপূর্ণ সমাহার। তার পরে মানুষের নিজের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট নানা প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূর্ণতা লাভও অত্যাবশ্যক। তৃতীয়ত, এহেন বিশ্ব-প্রাকৃতিক এবং মানবিক এ উভয় প্রকারের জ্ঞান তথ্যের সমাহার একত্রীভূত হওয়াও অপরিহার্য। এবং এমন একটি পরিপূর্ণ মননশক্তির আবশ্যক যা এ তথ্য সমাহারকে পরস্পর শ্রেণীবিন্যাস করে, তা দ্বারা সুষ্ঠু নিয়মে যুক্তি প্রয়োগ করে মানুষের জন্য নৈতিক মূল্য সমাজ ও তামাদ্দুনিক নীতি নির্ধারণ এবং সর্বপ্রকার ভুল ভ্রান্তি হতে তাকে বাঁচাবার উপায় নির্দেশ করার কাজ করবে। কিন্তু সত্য বলতে কি, এ শর্তগুলো পূরণ করা, এতে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো সংগ্রহ করা যেমন আজ পর্যন্ত আদৌ সম্ভব হয়নি। অনুরূপ আরো পাঁচ হাজার বছর পরেও তা কখনো সম্ভব হতে পারে বলে কোনো আশাও করা যায় না। অবশ্য দুনিয়ার সাথে সাথে গোটা মানবতার ধ্বংস প্রাপ্তির একদিন পূর্বে তা সম্ভব হলেও হতে পারে, কিন্তু তখন আর সেগুলোর কোনোই সার্থকতা থাকবে না।

ইতিহাস

মানুষের জ্ঞান অর্জনের সর্বশেষ উপায় হচ্ছে ইতিহাস। অন্য কথায় তাকে বলা যেতে পারে, অতীত মানুষের অভিজ্ঞতাসমূহের ঐতিহাসিক সঞ্চয় কিংবা আমলনামা। এ জিনিসটির গুরুত্ব ও সার্থকতা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু তবুও আমি একথা বলতে চাই একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে আপনিও তা বলতে বাধ্য হবেন যে, মানুষের জীবন ব্যবস্থা রচনার মতো বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য ঐতিহাসিক জ্ঞান সম্পদ মোটেই যথেষ্ট নয়। অতীতকাল হতে ইতিহাসের এ সম্পদ পূর্ণ বিশুদ্ধতা ও ব্যাপকতার সাথে আমাদের নিকট পৌছেছে কিনা, সে প্রশ্ন আমি তুলতে চাই না। পরন্তু, এহেন ঐতিহাসিক সম্পদের সাহায্যে মানুষের জন্য জীবন ব্যবস্থা রচনা করবে কোন্ ব্যক্তি? হেগেল? না মার্কস? না আর্নেষ্ট হেইকল? না অন্য কেউ? এ প্রশ্ন আমি জিজ্ঞেস করবো না। আমি শুধু এটাই জিজ্ঞেস করতে চাই যে, অতীত, বর্তমান, কিংবা ভবিষ্যতের কোন্ তারিখ পর্যন্ত ঐতিহাসিক রেকর্ড মানুষের জীবন ব্যবস্থা রচনার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করতে পারবে? তেমন কোনো তারিখ নির্দিষ্ট করা যদি বাস্তবিকই সম্ভব হয়, তবে বলতেই হবে যে, তার পরবর্তীকালের মানুষ বড়ই ভাগ্যবান। আর পূর্বে যারা চলে গেছে, তাদের কথা আমাদের ভাবার প্রয়োজন নেই।

নৈরাশ্যের অন্ধকার

মানুষের জীবন ব্যবস্থা রচনা করার জন্য অপরিহার্য মানবীয় উপাদানগুলো সম্পর্কে আলোচনা এখানেই শেষ করলাম। আমার বিশ্বাস এ আলোচনা ও বিশ্লেষণের ব্যাপারে আমি বিজ্ঞান বা যুক্তি প্রয়োগের দিক দিয়ে কোনো ভুল করিনি। মানুষের জ্ঞান লাভের উপায়সমূহের যে বিশ্লেষণ আমি করলাম, তা যদি সত্য হয়, তাহলে এখন আমি আমার সিদ্ধান্ত স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করতে পারি। উপরোক্ত কারণে আমার দৃঢ় ও সন্দেহাতীত বিশ্বাস জন্মেছে (এবং এ বিশ্বাস নষ্ট করার কোনো কারণই থাকতে পারে না) যে, মানুষ নিজের জন্য এসব উপায়ের সাহায্যে অসম্পূর্ণ অবাস্তব, ভুল-ত্রুটিতে পরিপূর্ণ আঞ্চলিক কিংবা সাময়িক কোনো ব্যবস্থা রচনা করতে সমর্থ হতেও পারে ; কিন্তু মানুষের পক্ষে এ উপায়ে কোনো পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা (الدين) রচনা করা একেবারেই অসম্ভব পূর্বেও তা সম্ভব ছিলো না, আজও সম্ভব নয় এবং অনাগত ভবিষ্যতের জন্যও এর সম্ভবনা সম্পর্কে নিরাশ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এখন মানুষের পথপ্রদর্শনের জন্য যদি সত্যই কোনো 'রব' বর্তমান না থাকে আল্লাহদ্রোহী কাফেরদের যেমন ধারণা তবে তার আত্মহত্যা করা ভিন্ন অন্য কোনো উপায়ই থাকে না। যে পথিকের কোনো পথপ্রদর্শক নেই, যে নিজে পথ চেনে না, পথ চিনার কোনো উপায়ও যার জানা নেই, তার পক্ষে চরম ও চূড়ান্ত ভাবে নিরাশ হওয়া ছাড়া উপায় থাকতে পারে না। এমতাবস্থায় তার একজন হিতাকাংখী ব্যক্তি তাকে প্রকাশ্য রাজপথে পাথরের সাথে মাথা ঠুকে সকল মুশকিল আসান করার উপদেশ দেয়া ছাড়া তার আর কিই বা উপকার করতে পারে! আর 'আল্লাহ' বলতে যদি সত্যিই কেউ থাকে, কিংবা থেকেও যদি সে মানুষের কর্মজীবনের পথ বাতলিয়ে দিতে সমর্থ না হয় কোনো কোনো দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের যেমন বিশ্বাস তবে এটা আরো অধিকতর দুঃখের বিষয়। যে আল্লাহ দুনিয়ার প্রত্যেকটি বস্তুর স্থিতি, পরিবর্ধন ও ক্রমবিকাশ লাভের জন্য নিখুঁত ব্যবস্থা করে রেখেছেন, সেই আল্লাহ-ই যদি মানুষের সর্বাপেক্ষা বেশি প্রয়োজনীয় জিনিসটি না দিয়ে থাকেন যা না হলে মানুষের জীবন একেবারে অর্থহীন, সেই জিনিসের কোনো ব্যবস্থাই যদি তিনি না করে থাকেন, তবে তাঁর সৃষ্ট এ দুনিয়ায় জীবন যাপন করা মানুষের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। তাহলে মানুষের এ জীবন একটি দুরূহ জীবন এবং একটি মস্তবড় বিপদ বিশেষ হয়ে পড়ে, এমনি বিপদ যা অপেক্ষা বড় বিপদ আর কিছু ধারণা করাও যায় না। এমতাবস্থায় গরীব, দুঃখী, সর্বহারা, রুগ্ন, আহত, মজলুম ও শোষিত জনতার দু:খের জন্য কেঁদে কি হবে, একান্তই যদি কাঁদতে হয়, তবে এই গোটা মানবতার সীমাহীন দুঃখের জন্য কাঁদুন। এমতাবস্থায় বলতে হবে যে, মানুষকে এক অন্তহীন দুঃখ সাগরে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তার অবস্থা এই হয়েছে যে, সে

বারবার ভুল অভিজ্ঞতা লাভ করে ব্যর্থ হয়। আঘাতের পর আঘাত খেয়ে পড়ে যায়, চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়, আবার উঠে চলতে শুরু করে ; কিন্তু পুণরায় সে আঘাত খেয়ে ধুলোয় লুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। প্রত্যেক আঘাতে দেশের পর দেশ, জাতির পর জাতি তাবাহ ও বরবাদ হয়ে যায়। বড়ই দু:খের বিষয় এ অর্বাচীন মানুষ এতোটুকুও জানে না যে, তার জীবন ও জন্মের উদ্দেশ্য কি? সে কিসের উদ্দেশ্যে চেষ্টা করবে, সাধনা করবে, শ্রম ও কষ্ট স্বীকার করবে আর তা সে করবেই বা কোন্ প্রণালী ও পদ্ধতি অনুসারে এতোটুকু পর্যন্ত তার জানা নেই। কিন্তু মানবতার এ মর্মান্তিক দূরবস্থা নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছেন সেই আল্লাহ যিনি মানুষকে এ দুনিয়াতে সৃষ্টি করেই কি ক্ষান্ত হয়েছে, তাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার কোনো দায়িত্বই কি তাঁর নেই।

আশার একটি আলোক রেখা

কুরআন শরীফ এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। উপরে মানুষের যে চরম দূরবস্থার কথা বলা হয়েছে, কুরআন শরীফ তার সম্পূর্ণ বিপরীত এক নুতন তত্ত্বের দ্বার উদঘাটিত করেছে। কুরআন বলছে : আল্লাহ তাআলা শুধু সৃষ্টিকর্তাই নন, মানুষকে সৎপথের সন্ধানদাতাও তিনি। তিনি বস্তুজগতের প্রত্যেকটি জিনিসকে তার প্রকৃতির প্রয়োজনকে লক্ষ্য করে হেদায়াত দান করেছেন :

اَلَّذِیْٓ اَعْطٰی کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰی -

এ হেদায়াত দান যে কতখানি সত্য, যে কোনো পিপীলিকা, মধুমক্ষিকা কিংবা মাকড়সা ধরে দেখলেই তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাবে। আল্লাহ তাআলা এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীকে যেরূপ জন্মগতভাবেই পথের সন্ধান জানিয়ে দিয়েছেন শিখিয়ে দিয়েছেন তাদের কাজ এবং কাজের পন্থা, সেরূপ তিনি মানুষের কর্মজীবনের জন্য পথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন কাজেই নিজের সর্বপ্রথম অহমিকা ভুলে গিয়ে সে আল্লাহর সম্মুখে আত্মসমর্পণ করা এবং তার পয়গাম্বরদের মারফত যে ব্যাপক জীবন ব্যবস্থা (الدين) তিনি নাযিল করেছেন, তা অনুসরণ করাই মানুষের পক্ষে একান্তভাবে কর্তব্য।

এখন দু'টি সিদ্ধান্ত আমাদের সামনে উপস্থিত : একটি মানুষের যাবতীয় শক্তি সামর্থ এবং তার জ্ঞান লাভের সমগ্র উপায়-উপাদানের বিশ্লেষণ করার পর লাভ হয়েছে আর অন্যটি পাচ্ছে কুরআনের সিদ্ধান্ত। এখন দুনিয়ার মানুষের পক্ষে হয় কুরআনের বাণী এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে, নতুবা তাকে এমন এক নৈরাশ্যের অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হতে হবে, যেখানে আশার কোনো আলোক রেখাই বিচ্ছুরিত হয় না। 'আদ্-দীন' বা জীবন ব্যবস্থা লাভের জন্য মানুষের সামনে যদি দু'টি উপায় থাকতো এবং যদি প্রশ্ন করা হতো যে, মানুষ এ দু'টির কোন্‌টিকে গ্রহণ করবে তবে অবশ্য অনেক সুবিধা ছিলো। মূলত এখানে মোটেই সেই ব্যাপার নয় সে প্রশ্নও এখানে নয়।

এখানে আসল ব্যাপার এই যে, পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা (الدين) মানুষ কেবল একটি উপায়েই লাভ করতে পারে। এখন মানুষের সামনে এ প্রশ্ন মাথা জাগিয়ে উঠেছে যে, মানুষ এই একমাত্র উপায়ের সাহায্যে প্রাপ্ত জীবন গ্রহণ করবে, না এই একমাত্র পন্থার আশ্রয় অস্বীকার করে জাহেলিয়াত ও নিরুদ্দেশের অন্ধকারে জীবন-যাপনের সিদ্ধান্ত করবে? এ দু'টি পথের যে কোনো একটিকে মানুষ অনায়াসেই গ্রহণ করতে পারে তাকে এতোটুকু স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে মাত্র।

কুরআনের যুক্তি

এই পর্যন্ত যতোকিছু আলোচনা করা হয়েছে, তা হতে আমরা শুধু এ সিদ্ধান্তই লাভ করতে পারি যে, কুরআনের দাবি এবং তার প্রদর্শিত পথ গ্রহণ না করে মানুষের সর্বকালীন কল্যাণ লাভের জন্য কোনো উপায় নেই। অন্য কথায় বলা যায়, "কাফের হওয়ার তো উপায় নেই, কাজেই বাধ্য হয়ে মুসলমান হও।" কিন্তু কুরআন নিজের দাবির সত্যতা সম্পর্কে যেসব যুক্তি প্রমাণ উপস্থিত করেছে, তা এ বাধ্যতামুলক পরিস্থিতির অনেক উর্ধ্বে তা অনেক সারগর্ভ ও অকাট্য। কুরআন মানুষকে ঠেকে মুসলমান হতে বলেনি। তার পরিবর্তে সে মানুষকে নিজ ইচ্ছা ও অনুপ্রেরণায় মুসলমান হবার উৎসাহ দিয়েছে। কুরআনের যুক্তিগুলোই মানুষের মনে এ আগ্রহের সঞ্চার করে। কুরআনের এ সম্পর্কীয় প্রমাণগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিত চারটি অত্যন্ত বলিষ্ঠ যুক্তি। এজন্য চারটিকেই বারবার উল্লেখ করা হয়েছে।

এক : মানুষের জন্য ইসলামই একমাত্র সঠিক জীবন ব্যবস্থা। কারণ এটাই প্রকৃত তত্ত্ব এবং আসল সত্যের অনুরূপ। এছাড়া অন্য সব পন্থা প্রকৃত সত্যের সম্পূর্ণ বিরোধী।

أَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ أَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّإِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ۔

"এরা কি আল্লাহ তাআলার দীন (জীবন ব্যবস্থা) ছাড়া অন্য কোনো পন্থা পেতে চায়? অথচ আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা সবই ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, সেই এক আল্লাহরই সামনে নত হয়ে আছে এবং শেষকালে সকলকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে ।" (সূরা আলে ইমরান : ৮৩)।

দুই : মানুষের জন্য এটাই একমাত্র সঠিক এবং নির্ভুল জীবন ব্যবস্থা, কারণ এটাই একমাত্র সত্য। সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখলে এছাড়া কোনো পন্থাই নির্ভুল ও খাঁটি হতে পারে না।

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيْثًا لا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِهٖ ط اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ط تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۰

"প্রকৃতপক্ষে তোমাদের 'রব' মালিক ও বাদশাহ হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা, যিনি আকাশ ও পৃথিবীকে কালের দু'টি অধ্যায়ে সৃষ্টি করেছেন এবং তার পর তিনি নিজ 'সিংহাসনে' আরোহন করেন। তিনি দিনকে রাতের পোশাক পরিয়ে দেন এবং তার পর রাতের পশ্চাতে দিন খুব দ্রুত গতিতে চলে আসে। সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্র সবকিছুই তাঁর অধীন ও অনুগত। শুনে রাখ, সৃষ্টি তাঁরই এবং আইন শাসনও কেবল তাঁরই চলবে। সারা জাহানের 'রব' আল্লাহ বড়ই মহান।" (সূরা আল আরাফ : ৫৪)।

তিন : মানুষের পক্ষে এ পন্থাই ঠিক পন্থা, এটাই খাঁটি পথ। সমগ্র সত্য সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান কেবল আল্লাহ তাআলারই থাকতে পারে এবং নির্ভুল বিধানও কেবল তিনিই দিতে পারেন।

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْئٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ ۰

"বস্তুত আকাশ ও পৃথিবীর কোনো জিনিসই আল্লাহর অগোচরে নয়।" (সূরা আলে ইমরান: ৫)

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ج وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْئٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ ۰

"তিনি মানুষের সম্মুখে যা আছে তাও জানেন, আর যা তাদের অগোচরে ও অজ্ঞাত তাও তিনি জানেন। মানুষ তার জ্ঞানকে কোনোক্রমেই আয়ত্ত করতে পারে না। অবশ্য আল্লাহ নিজেই যদি কোনো জ্ঞান মানুষকে দান করেন, তবে সেই কথা স্বতন্ত্র।" (সূরা আল বাকারা : ২২৫)।

قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ط -

"হে নবী! বলে দাও যে, আল্লাহর হেদায়াতই মানুষের জন্য একমাত্র সত্য পথ নির্দেশকারী বিধান।" (সূরা আল আনআম : ৭১)।

চার : মানুষের জন্য এটাই একমাত্র সঠিক পথ। যেহেতু এ পথ ছাড়া প্রকৃত সুবিচার স্থাপন সম্ভব নয়। এটা ছাড়া অন্য যে পথেই মানুষ চলবে একদিন না একদিন তা যুলুমেই রূপান্তরিত হবে।

وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۰

"যারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমালংঘন করে, তারাই যালেম।"

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۰

"যারা আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে নিজেদের যাবতীয় কাজ-কর্মের ফায়সালা করে না, তারাই যালেম।" (সূরা আল মায়েদা : ৪৫)।

কুরআনের এসব যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে আল্লাহর সম্মুখে মাথা নত করা এবং তাঁর নিকট প্রাপ্ত বিধান অনুসারে জীবন-যাপন করাই প্রত্যেকটি জ্ঞানী লোকের কতর্ব্য।

আল্লাহর বিধান পরীক্ষার মাপকাঠি

এখানে এসে প্রত্যেকটি মানুষের মনে এ প্রশ্ন জাগতে পারে যে, কোন্টি আল্লাহর বিধান আর কোন্টি নয়, তা কিরূপে প্রমাণিত হবে? এক একজন এসে বলবে এটা আল্লাহর বিধান, এটা গ্রহণ কর, আর অমনি কি আমরা তা গ্রহণ করবো? যদি তা না হয়, তবে আল্লাহর ব্যবস্থা এবং মানুষের তৈরি ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য করার কি মানদণ্ড আছে? এ প্রশ্ন প্রত্যেকের মনেই জাগতে পারে, জাগা স্বাভাবিক। আমার নিজের মনেই গভীরভাবে চিন্তা করার সময় এ প্রশ্ন জেগে উঠেছে এ প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে হলে বহু দীর্ঘ ও বিস্তারিত বিশ্লেষণ আবশ্যক। কিন্তু এ ক্ষুদ্র পুস্তিকায় তার অবকাশ নেই। এখানে আমি সংক্ষেপে এর জবাব দিতে চেষ্টা করবো।

মানুষের চিন্তা আর আল্লাহর বুদ্ধির মধ্যে পাথর্ক্য করার জন্য চারটি বড় বড় মাপকাঠি আছে। এখানে তা পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে।

মানুষের চিন্তাধারার প্রথম বৈশিষ্ট্য এই যে, তাতে জ্ঞানের ভ্রান্তি ও সসীমতা অবশ্যম্ভাবীরূপে বর্তমান পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে আল্লাহর ব্যবস্থায় সীমাহীন জ্ঞান এবং সঠিক ও নির্ভুল তত্ত্বের সুস্পষ্ট নিদর্শন স্বত:স্ফূর্তভাবে পরিলক্ষিত হয়। বস্তুত যে ব্যবস্থা আল্লাহর তরফ হতে হবে তার কোনো কথাই কোনো কালের বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধী হবে না কিংবা সেই সম্পর্কে কোনো দিনই একথা বলা যাবে না যে, 'ব্যবস্থাদাতা' ব্যাপারটির সকল দিক যথাযথভাবে বিচার করে দেখেননি। কিন্তু বিশ্লেষণ ও যাচাই করার এ মানদণ্ড প্রয়োগকালে একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, প্রকৃত জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক কল্পনা এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আকাশ পাতালের পার্থক্য রয়েছে। এক যুগে যেসব বৈজ্ঞানিক কল্পনা আর দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে রাখে, ভুলবশত প্রায়ই সেগুলোকে 'বিজ্ঞান' বলে মনে করা হয়। অথচ প্রকৃতপক্ষে সেগুলোর নির্ভুল হওয়ার যতো সম্ভাবনা, ভুল হওয়ারও ঠিক ততোদূরই সম্ভাবনা বর্তমান। মানুষের ধারণা-কল্পনা আর মতবাদ শেষ পর্যন্ত নির্ভুল বিজ্ঞান বলে প্রমাণিত হয়েছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসে তার নজীর খুব কমই পাওয়া গেছে।

মানুষের চিন্তা-গবেষণার আর একটি মারাত্মক দূর্বলতা হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গীর সসীমতা ও সংকীর্ণতা। কিন্তু আল্লাহর ব্যবস্থায় চিন্তা ও দৃষ্টি ব্যাপক এবং সুদুরপ্রসারী হয়ে থাকে। আল্লাহর ব্যবস্থার যে কোনো ধারাকেই আপনি লক্ষ্য করবেন, নি:সন্দেহে আপনার মনে হবে যে, এর ব্যবস্থাপক আদি হতে অন্ত পর্যন্ত নিজ

চোখে প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাচ্ছেন। গোটা সৃষ্টিজগতকে দেখছেন, সমগ্র সত্য আর তত্ত্ব সমবেতভাবে তাঁর সম্মুখে সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। এর প্রতিকূলে বড় বড় দার্শনিক আর বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে একটি শিশুর চিন্তা বলে প্রতীয়মান হবে। মানুষের চিন্তার তৃতীয় বিশেষত্ব এই যে, তাতে বিজ্ঞান ও বুদ্ধি মানুষের আবেগ-উচ্ছ্বাস ও বাসনা-লালসার সাথে কোথাও না কোথাও সন্ধি বা ষড়যন্ত্র করছে বলে পরিষ্কার মনে হবে। আল্লাহর ব্যবস্থা এটা হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। তাতে স্বচ্ছ জ্ঞান-বুদ্ধি এবং অনাবিল বুদ্ধিমত্তার পরিচয় উজ্জ্বলরূপে দেখতে পাওয়া যায়। তার আদেশ-নির্দেশে কোথাও আবেগ উচ্ছ্বাস ও একদেশদর্শিতার আবিলতা মোটেই পরিলক্ষিত হবে না।

মানুষের চিন্তার আর একটি দুর্বলতা এই যে, যে জীবন ব্যবস্থা সে নিজে রচনা করবে তাতে পক্ষপাতিত্ব, মানুষে মানুষে অবাঞ্ছনীয় বৈষম্য এবং অবৈজ্ঞানিক বুনিয়াদে একজনকে অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দানের ভাবধারা অবশ্যম্ভাবীরূপে বর্তমান পাওয়া যাবে। কারণ প্রত্যেকটি মানুষেরই কিছু না কিছু ব্যক্তিগত স্বার্থ বা কোনো কোনো মানুষের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট ভাবাবেগের দুর্বলতা থাকেই এবং তার ফলেই মানুষ একদেশদর্শী ও পক্ষপাতদুষ্ট ব্যবস্থা রচনা করতে বাধ্য হয়। কিন্তু আল্লাহর ব্যবস্থা এসব কলুষতা হতে সর্বোতভাবে মুক্ত ও পবিত্র।

যেসব জীবন ব্যবস্থা নিজেকে আল্লাহর ব্যবস্থা বা 'আদ্-দীন' বলে প্রমাণ করতে সচেষ্ট, তার প্রত্যেকটিকেই এ মানদণ্ডে যাচাই করে দেখতে হবে। যদি তা মানবীয় চিন্তা গবেষণার উল্লিখিত বিশেষত্ব হতে মুক্ত হয় তবে তাকে 'আদ্-দীন' বা মানুষের পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা বলে বিশ্বাস করতে কোনোই আপত্তি থাকতে পারে না।

ঈমানের দাবি

এখন প্রশ্ন এই যে, কুরআনের এই দাবি মানলে এবং যে জীবন বিধান আল্লাহর তরফ হতে ন্যাযিল হয়েছে বলে বিশ্বাস হবে তাকে গ্রহণ করলে, মানুষের প্রতি কি কতর্ব্য আবর্তিত হয়? উপসংহারে এ প্রশ্ন সম্পর্কেই আলোচনা করতে চাই।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ইসলামের অর্থ নত হওয়া, আত্মসমর্পণ করা এবং নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দেয়া। এ নতি স্বীকার ও আত্মসমর্পণের সাথে আত্মম্ভরিতা এবং চিন্তা ও কর্মের নিরংকুশ আযাদীর কোনো সামঞ্জস্য হতে পারে না। যে জীবন ব্যবস্থার প্রতিই মানুষ বিশ্বাস স্থাপন করবে, তার নিকট তার সমগ্র ব্যক্তি সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দিতে হবে। জীবনের কোনো ; একটি ব্যাপারকেও তার বাইরে রাখতে পারবে না। ঈমানের অর্থ এই যে, 'দীন' বা জীবন ব্যবস্থাই মানুষের মন ও মস্তিষ্কের উপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করে থাকবে ; এটাই হবে তার চোখ ও কানের ধর্ম, হাত ও পায়ের ধর্ম, পেট ও

দেহের ধর্ম, তার কলম ও মুখের ধর্ম, তার আজীবনের চেষ্টা-সাধনা ও কর্মের ধর্ম, ভালবাসা ও ঘৃণার ধর্ম, তার বন্ধুত্ব আর শত্রুতার ধর্ম। মোটকথা মানুষের ব্যক্তি সত্তার কোনো একটি দিক ও বিভাগই এহেন ধর্মের বাইরে থাকতে পারবে না। জীবনের যে কাজ বা দিকই এক দীন বা জীবন ব্যবস্থার প্রভাবমুক্ত হবে এবং যে কাজে বা জীবনের যে দিকেই এ জীবন ব্যবস্থার অনুসরণ পরিত্যক্ত হবে তার প্রতি ঈমানের দাবিতে ততোই মিথ্যা ও প্রতারণার যোগ থাকবে, এতে কিছু মাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। আর জীবনকে মিথ্যা ও প্রতারণার কলুষ হতে মুক্ত রাখা প্রত্যেক বুদ্ধিমান ও সত্যসিদ্ধ মানুষের পক্ষে অবশ্যই কতর্ব্য। এ পুস্তকের প্রথমদিকে একথাও বলা হয়েছে যে, মানুষের জীবন একটি সামগ্রিক ও অভিন্ন সত্তা ; তাকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যায় না। কাজেই মানুষের পূর্ণ জীবনের জন্য একটি মাত্র ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থাই হতে পারে। একই সময় একাধিক জীবন ব্যবস্থা অনুসরণ করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। কেননা তা করতে গেলে ঈমানের অনিশ্চিত অবস্থা, মতের বিশিষ্টতা ও অসংবদ্ধতা এবং জটিল ব্যাপার সম্বন্ধে স্থির-সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষমতাই প্রমাণ হবে। বস্তুত 'কোনো আদর্শকে' যখন মানুষ 'আদ্-দীন' বা জীবন ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করে এবং তার জীবন ব্যবস্থা হওয়া সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত করে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা হয়, তখন তা তার পূর্ণ জীবনকে সকল দিক ও বিভাগের 'একমাত্র ব্যবস্থা' হওয়া চাই এবং বাধ্য হওয়াই তাকে এভাবেই গ্রহণ করতে হবে, তাছাড়া গত্যন্তর নেই।

তাকে যদি ব্যক্তিগত ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তবে তা ঘরের ব্যবস্থা হবে, শিশু শিক্ষার ব্যবস্থা হবে, তার শিক্ষা-দীক্ষা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা হবে, তার কায় -কারবার, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও আয়-উপার্জনের, তার ঘরোয়া জীবন এবং জাতীয় কর্মনীতির, তার রাজনীতি ও তামাদ্দুনের, তার সাহিত্য ও শিল্পের ব্যবস্থা হবে, বস্তুত এরূপ না হওয়ার কোনোই কারণ থাকতে পারে না যে, একটা মুক্তাকে যখন আরো অনেক মুক্তার সাথে একই সূত্রে গেথে দেয়া হবে, তখন আর তা মুক্তা থাকবে না। তখন তা ছোলা বুট হয়ে যাবে, এমন কোনো কথাই হতে পারে না। অনুরূপভাবে একথাও যদি আমি বুঝতে পারি না যে, ব্যক্তিগতভাবে তো আমরা একটি ব্যবস্থা অনুসরণ করবো কিন্তু যখন আমাদের একাধিক লোকের জীবনকে সংঘবদ্ধ করবো তখন সেই সংঘবদ্ধ ও সমাজবদ্ধ জীবনের কোনো কোনো দিক সেই ব্যবস্থার আওতার বাইরে থাকবে। এ ধরনের কথার অন্তসারশূন্যতা সুস্পষ্ট।

ঈমান সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে, কোনো ব্যবস্থাকে যখন জীবন ব্যবস্থা হিসাবে বিশ্বাস ও গ্রহণ করা হয়, তখন সমগ্র জাতিকে তার কল্যাণ ও সৌন্দর্য গ্রহণ করার সুযোগ দেয়া অবশ্য কর্তব্য এবং তাকে সমগ্র দুনিয়ার

ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়। সত্য যেমন স্বভাবতই সর্বজয়ী হতে চায় তেমনি সত্য প্রেমিকও সত্যকে বাতিলের উপর জয়ী করার জন্য চেষ্টা না করে থাকতে পারে না। যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে দেখবে যে, বাতিল চারদিক হতে পৃথিবী এবং পৃথিবীর অধিবাসীগণকে গ্রাস করছে তখন এ দৃশ্য দেখে তার মধ্যে যদি কোনোরূপ ব্যস্ততা ব্যাকুলতা, ব্যাথা এবং অস্থিরতা জেগে না উঠে তবে মনে করতে হবে যে, সত্যের জন্য তার মনে প্রকৃতই কোনো দরদ নেই, সত্যিকার কোনো প্রেম নেই। আর তা থাকলেও একেবারে অচেতন ও গভীর নিন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কিন্তু চেতনা ও অনুভূতির এ নিদ্রা পরিণামে কাল-নিদ্রায় পরিণত না হয়, সময় থাকতেই সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়।

৫

ইসলামের নৈতিক দৃষ্টিকোণ

[১৯৪৪ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি পেশোয়ার ইসলামিয়া কলেজে মাওলানা এ প্রবন্ধটি পাঠ করেন।]

স্বাভাবিক অবস্থায় জীবন-নদী যখন ধীর-স্থীর-মন্থর গতিতে প্রবাহিত হয়, তখন মানুষ এক ধরণের নিশ্চিন্ততা অনুভব করে। কেননা উপরিভাগটা হয়ে যায় স্বচ্ছ আবরণের মতো। ময়লা, আবর্জনা ও দূষিত পদার্থ এর নীচে স্তরে স্তরে জমা হয়ে আত্মগোপন করে থাকে। আবরণের উপরের স্বচ্ছতা ও পরিচ্ছন্নতায় মানুষ ভেতরের দিকে দৃষ্টি দেবার এবং আবরণের নীচের স্তরগুলোর মধ্যে আত্মগোপনকারী বস্তুকে গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে নিরীক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা খুব কমই অনুভব করে। কিন্তু যখন এই নদীতে তুফান আসে এবং নিচের আত্মগোপনকারী সমস্ত আবর্জনা ও দূষিত পদার্থ আচানক ভেসে উঠে নদীর উপরিভাগে প্রবাহিত হতে থকে, তখন একমাত্র অন্ধ ছাড়া প্রত্যেক ব্যক্তিই যার চোখে ক্ষীণতম দৃষ্টিশক্তিও আছে নির্বিঘ্নে স্পষ্ট এবং পরিষ্কার দেখতে পায় যে, জীবন নদী কতো সব আবর্জনা বুকে নিয়ে সামনের দিকে ছুটে চলছে। অনুরূপ পরিস্থিতিতেই সাধারণ লোক জীবন নদীতে প্রবাহিত এই আবর্জনার উৎস অনুসন্ধানের প্রয়োজন অনুভব করতে পারে। একে আবর্জনামুক্ত করার এবং বিশুদ্ধ ও পরিষ্কার রাখার উপায় উদ্ভাবনের চিন্তা করার সুযোগও তারা পায়। সত্যি বলতে কি, এমন উল্লেখ্য মুহূর্তেও যদি মানুষের মনে এ প্রয়োজনের অনুভূতি জাগ্রত না হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, মানব জাতি গাফলতির নেশায় বিভোর হয়ে লাভ-ক্ষতি সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে।

আজ আমরা ঠিক এ ধরনের অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি। জীবন-নদীতে বান ডেকেছে। বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে ভীষণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত শুরু হয়েছে। এ সংঘর্ষ এতো গভীরে অনুপ্রবেশ করেছে যে, বড় বড় সমাজ-সমষ্টির সীমা পেরিয়ে ব্যক্তিকেও এর মধ্যে টেনে এনেছে। এভাবে মানবজগতের বিভিন্ন অংশ তাদের সমস্ত নৈতিক গুণাবলী যেগুলোকে তারা দীর্ঘকাল থেকে ভেতরে ভেতরে জিইয়ে রেখেছিল যেগুলোকে উদগীরণ করে জনসমক্ষে রেখে দিয়েছে।

যেসব আবর্জনার অনুসন্ধানের জন্যে কিছু না কিছু গভীর দৃষ্টির প্রয়োজন ছিলো, এখন সেগুলোকে আমরা দেখছি জীবন-নদীর উপরিভাগে। রোগীর অবস্থা

ভালো, একথা কোনো জন্মান্ধই বলতে পারে। যারা পশুর মতো নৈতিক অনুভূতিহীন অথবা যাদের নৈতিক অনুভূতি জরাগ্রস্ত কেবল তারাই এখন রোগ নির্ণয় এবং তার চিকিৎসার চিন্তা থেকে গাফেল থাকতে পারে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, অনেক জাতি সামগ্রিকভাবে ব্যাপকহারে এমন সব নিকৃষ্ট ধরনের নৈতিকতা বিরোধী কাজের প্রদর্শনী করে বেড়াচ্ছে, যেগুলোকে মানুষের বিবেক হামেশা অত্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেছে। অন্যায়, নিষ্ঠুরতা, যুলুম, নির্যাতন, মিথ্যা, প্রতারণা, প্ররোচনা, ওয়াদাভংগ, নির্লজ্জতা, স্বার্থপূজা, আমানতের খেয়ানত, অন্যায়ভাবে বল প্রয়োগ এবং এ ধরনের অন্যান্য অপরাধ আজ আর নিছক ব্যক্তিগত পর্যায়ে আবদ্ধ থাকেনি, এগুলোর মাধ্যমে আজ জাতীয় চরিত্রের প্রকাশ ঘটছে। দুনিয়ার বড়ো বড়ো জাতিরা সামগ্রিকভাবে এমন সব কাজ করে যাচ্ছে, যা পৃথকভাবে অনুষ্ঠানের অপরাধে তাদের দেশের জনগণকে আজো লৌহ কপাটের অন্তরালে পাঠিয়ে দেয়া হয়। প্রত্যেক জাতি বেছে বেছে তার সবচেয়ে বড়ো অপরাধীগণকে নিজের নেতা ও শাসক পদে অধিষ্ঠিত করেছে এবং তাদের নেতৃত্বে সমগ্র জাতি প্রকাশ্যভাবে নেহায়েত নির্লজ্জতার সংগে ব্যাপকহারে দুনিয়ার যাবতীয় নিকৃষ্টতম অপরাধ অনুষ্ঠানে ব্রত হয়েছে। প্রত্যেক জাতি অন্য জাতির বিরুদ্ধে স্তুপীকৃত মিথ্যার ইতিহাস রচনা করে প্রকাশ্যভাবে তা প্রচার করে বেড়াচ্ছে। রেডিওর মাধ্যমে এ মিথ্যাগুলো আকাশ-বাতাস দুর্গন্ধময় করে তুলেছে। এক একটি দেশ ও মহাদেশের সমগ্র অধিবাসী লুঠতরাজকারী এবং দস্যুতে পরিণত হয়েছে। দস্যুবৃত্তি করার সময় প্রত্যেক দস্যু চরম নির্লজ্জতার সংগে তার বিরোধী দস্যুর যাবতীয় পাপ কাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাচ্ছে, যে পাপে সে নিজেও তার প্রতিদ্বন্দ্বির তুলনায় কিছু কম নিমজ্জিত নয়। এ জালেমদের নিকট ইনসাফের অর্থ হলো, শুধু নিজের জাতির সংগে ইনসাফ করা। নিজের জাতির অধিকারই শুধু সংরক্ষিত থাকবে। অন্যের অধিকারের উপর সব রকমের হস্তক্ষেপ তাদের নৈতিক বিধানে শুধু বৈধই নয়, নেকীর কাজও। দুনিয়ার প্রায় সমস্ত জাতিই এখন নেবার এবং দেবার সময় ভিন্ন ভিন্ন পরিমাপ ব্যবহার করছে। নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের সময় তারা যেসব মাপকাঠি নির্ণয় করে অন্যের বেলায় সেসব পরিবর্তিত হয়ে যায়। অন্যের কাছ থেকে তারা যেসব মানদন্ডের দাবি করে সেগুলো মেনে চলা নিজেদের জন্যে হারাম মনে করে। ওয়াদাভংগ করার ব্যধি এমন ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করেছে যে, এক জাতির প্রতিনিধিবর্গ অত্যন্ত ভদ্র বেশে যখন আন্তর্জাতিক চুক্তির উপর দস্তখত করেন, তখনো তাদের মনের কোণো এ শয়তানী ইচ্ছা লুকিয়ে থাকে যে, প্রথম সুযোগেই জাতীয় স্বার্থের কোরবানগাহে এ পবিত্র ছাগ শিশুটির গলায় ছুরি চালিয়ে দেবো এবং যখন কোনো জাতির প্রসিডেন্ট অথবা উজিরে

আজম এ উদ্দেশ্যে ছুরিতে শান দিতে থাকেন তখন এ শয়তানী কাজের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদও সমগ্র জাতির মধ্য হতে উত্থিত হয় না। বরং সমগ্র দেশবাসী এ অপরাধে অংশগ্রহণ করে।

সমগ্র দুনিয়াকে প্রতারিত করা হচ্ছে। বড়ো বড়ো উন্নত, পবিত্র, নৈতিক বিধি-বিধানের আলোচনা করা হয় শুধু মানুষকে বেকুব বানিয়ে স্বার্থোদ্ধার করার জন্যে। সরল-মনা লোকদেরকে বুঝানো হয় যে, আমাদের নিজেদের স্বার্থে তোমাদের কাছ থেকে জান-মালের কুরবানী দাবি করছি না, বরং নিছক মানবতার স্বার্থেই আমরা সৎ এবং নিস্বার্থ সমাজসেবীরা এ কষ্ট সহ্য করছি।

অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা কানায় কানায় পূর্ণ হয়েছে। একটি দেশ যখন অন্য দেশের উপর আক্রমণ করে তখন শুধু অনুভূতিহীন ষ্টীমরোলারের মতো আক্রান্ত দেশের অধিবাসীদেরকে পিষে গুড়ো করেই ক্ষান্ত হয় না বরং আনন্দের সংগে সমগ্র দুনিয়ায় তার এ কার্যাবলী উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করতে থাকে। তার রকম-সকম দেখে মনে হয়, দুনিয়া থেকে যেন মানুষের বাস উঠে গেছে। এখন বুঝি শুধু মানুষ খেকো নেকড়েরই আধিপত্য।

স্বার্থান্ধ হৃদয়হীনতা চরম আকার ধারণ করেছে। একটি জাতি নিছক নিজের স্বার্থে অন্য জাতিকে পদানত করার পর শুধু নির্দয়ভাবে তার সম্পদ লুট করেই ক্ষান্ত থাকে না, বরং তার যাবতীয় উন্নত মানবীয় গুণাবলী বিনষ্ট করে। সাম্ভাব্য সকল রকমের দোষ এবং নিকৃষ্টতম অপরাধ প্রবণতা যেগুলোকে সে নিজেও অত্যন্ত ভয়াবহ মনে করে তার মধ্যে সৃষ্টি করে এবং এ জন্যে সে অত্যন্ত সুসংবদ্ধ অভিযান চালায়।

এখানে নিছক কতিপয় উল্লেখযোগ্য নৈতিক ত্রুটির নমুনা দেখালাম। নয়তো বিস্ত ারিত পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, নৈতিক দিক দিয়ে সমগ্র মানবতার দেহ পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। এক সময় বেশ্যালয় এবং জুয়ার আড্ডাকে নৈতিক অবনতির সবচেয়ে বড়ো ফোঁড়া মনে করা হতো। কিন্তু আজ যে দিকে দৃষ্টি দেয়া যায়, সমগ্র মানব সভ্যতা একটি ফোঁড়ার আকারেই পরিদৃষ্ট হচ্ছে। বিভিন্ন জাতির পার্লামেন্ট এবং জাতীয় পরিষদ, রাষ্ট্রের সেক্রেটারিয়েট এবং উজির নিকেতন, আদালতের বিচার কক্ষ ও উকিলের মন্ত্রণাগার, প্রেস প্রচার, দপ্তর, বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক এবং শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্রসমূহ সমস্তই এক একটি পাকা ফোঁড়ার মতো। এ ফোঁড়াগুলো যেন একটা শানিত ছুরির অপেক্ষায় আছে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে মর্মান্তিক ব্যাপার হলো এই যে, যে জ্ঞান মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ বলে বিবেচিত হয়, আজ তাকে মানবজ্যাতির সকল দিকের ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রকৃতি যে শক্তি-সম্পদ এবং

জীবনের উপায়-উপকরণ মানবজাতির জন্যে সৃষ্টি করেছিল, আজ তা বিপর্যয় সৃষ্টি এবং ধ্বংসের কাজে ব্যয় করা হচ্ছে। সাহসিকতা, ত্যাগ, কুরবানী, দানশীলতা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, হিম্মত, বলিষ্ঠ প্রত্যয় প্রভৃতি যেসব গুণাবলীকে মানুষের শ্রেষ্ঠ এবং উন্নততর নৈতিক গুণাবলী মনে করা হতো সেগুলোকেও আজ কতিপয় মৌলিক নৈতিকতা বিরোধী দুষ্কর্মের দাসে পরিণত করা হয়েছে।

বলা বাহুল্য ব্যক্তিগত ক্রটি যখন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় তখনই এসব সামগ্রিক ক্রটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। আপনি একথা চিন্তাও করতে পারবেন না যে, কোনো সমাজের অধিকাংশ লোক সৎ হওয়া সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে সেখানে অসৎ প্রবণতার বিকাশ ঘটবে। সৎ লোকেরা তাদের নেতৃত্ব এবং প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব অসৎ লোকদের হাতে তুলে দেবে এবং তারা তাদের যাবতীয় আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক ব্যাপার অনৈতিক বিধান মোতাবিক পরিচালিত করবে আর ঐ সৎলোকেরা তাদের এসব কার্যকলাপের উপর সন্তুষ্ট থাকবে, এ কখনো সম্ভবপর নয়। কাজেই দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি যখন আজ বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এসব নিকৃষ্টতর অনৈতিকতার প্রকাশ করছে, তখন এথেকে প্রমাণ হয় যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তমদ্দুনের যাবতীয় উন্নতি সত্ত্বেও মানবজাতি নৈতিক অবনতির গভীরে পদক্ষেপ করেছে এবং অধিকাংশ মানুষ এতে প্রতারিত হয়েছে। এ পরিস্থিতি যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে অনতিবিলম্বে মানবতা একটি বিরাট ধ্বংসের মুখোমুখি হবে এবং এক সুবিস্তীর্ণ তমসার আড়ালে ঢেকে যাবে তার সমগ্র ইতিহাস।

যদি আমরা চোখ বন্ধ করে বেধড়ক ধ্বংসের আবর্তে নেমে যেতে না চাই তাহলে আমাদের এ ক্রটির সন্ধানে বেরুতে হবে, দেখতে হবে কোত্থেকে তুফানের বেগে এগুলো বয়ে চলে আসছে। যেহেতু এগুলো নৈতিক ক্রটি, তাই এর সন্ধান পাবো আমরা দুনিয়ায় বর্তমানে প্রচলিত নৈতিক চিন্তা-ধারণার মধ্যে।

দুনিয়ার নৈতিক চিন্তা-ধারণা কি? এ প্রশ্ন সম্পর্কে অনুসন্ধান করার পর আমরা জানতে পারি যে, নীতিগতভাবে সমস্ত চিন্তা-ধারণা দু'টো বৃহত্তম ভাগে বিভক্ত।

একটি চিন্তার ভিত্তি হলো আল্লাহ এবং মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনের বিশ্বাসের উপর। দ্বিতীয়টির ভিত্তি এসব বিশ্বাস থেকে পৃথক অন্য কোনো বুনিয়াদের উপর রাখা হয়েছে।

আসুন, এখন আমরা এ দু'ধরনের চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করে দেখি, বর্তমানে এগুলো দুনিয়ায় কি অবস্থায় আছে এবং এর পরিণাম কি হচ্ছে। আল্লাহ এবং মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনের বিশ্বাসের উপর যতোগুলো নৈতিক চিন্তার বুনিয়াদ রাখা হয়েছে, এ সবগুলোর আকৃতি আল্লাহ এবং মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে

মানুষের মধ্যে যে ধরনের বিশ্বাস পাওয়া যায়, তার উপর নির্ভর করে। কাজেই আমাদের দেখতে হবে বর্তমানে দুনিয়ার মানুষ আল্লাহকে কোন্ আকৃতিতে মেনে নিয়েছে এবং জীবন সম্পর্কে তাদের সাধারণ ধারণা কি?

আল্লাহকে যারা মেনে নিয়েছে বর্তমানে তাদের অধিকাংশই শিরকের মধ্যে লিপ্ত আছে। তাদের জীবনের সংগে আল্লাহর যে সমস্ত ইখতিয়ারের সম্পর্ক রয়েছে, সেগুলোকে তারা ইচ্ছামতো অন্যান্য সত্তার মধ্যে ভাগ করে দিয়েছে। এবং নিজেদের মনের মতো করে তারা ঐসব সত্তার এমন কাল্পনিক চিত্র বানিয়ে নিয়েছে যে, তারা তাদের খোদায়ীর ইখতিয়ারগুলো ঠিক সেই ভাবেই ব্যবহার করছে, যেভাবে তারা ব্যবহার করতে চায়।

এরা গোনাহ্ করে এবং তারা মাফ করে দেয়। এরা কর্তব্যে গাফেল হয়ে অধিকার অনধিকারের সীমা লংঘন করে এবং হালাল হারামের পার্থক্য উঠিয়ে দিয়ে দুনিয়ার খেত-খামারে বল্গাহারা অশ্বের মতো ছুটে বেড়ায় আর তারা যৎসামান্য নজরানা গ্রহণ করে এদের মুক্তির জামিন হয়ে যায়। এরা চুরি করতে বেরুলে তাদের মেহেরবানীতে থানার দারোগা পুলিশ ঘুমিয়ে পড়ে। এদের এবং তাদের মধ্যে এভাবে সওদাবাজী হয়েছে যে, এরা তাদের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখবে ও নজরানা পেশ করতে থাকবে এবং এর প্রত্যুত্তরে তারা এদের যাবতীয় কাজ যা এরা করতে চায় সবকিছুই সুসম্পন্ন করে যাবে ও মৃত্যুর পর যখন আল্লাহ এদের শাস্তি দিতে চাবেন, তখন তারা মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াবে এবং বলবে, হে আল্লাহ, এরা আমাদের ছায়াতলে আছে, এদেরকে কিছুই বলবেন না। আবার অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহর কোনো প্রশ্নের সম্মুখীন হবার প্রয়োজনই হবে না। কেননা এদের গোনাহর কাফফারা পূর্বেই একজন আদায় করে দিয়েছেন। এ শিরক মিশ্রিত বিশ্বাস মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনের ধারণাকেও অর্থহীন করে দিয়েছে। এর ফলে ধর্ম যেসব নৈতিকতার ভিত্তি গড়ে তুলছিল, তা সবই অন্ত সারশূন্য হয়ে গেছে। ধর্মীয় নৈতিকতার বই-পত্র লিখিত রয়েছে। সম্মানের সংগে এগুলোর নামোচ্চরণ করা হয়। কিন্তু কার্যত এর বাঁধন এড়িয়ে চলার জন্যে শিরক অসংখ্য চোরা দরজার ব্যবস্থা করেছে। এ ব্যবস্থার মধ্যে খুঁত বের করা সহজ ব্যাপার নয়। যে কোনো দরজা দিয়ে বেরুলেই নিশ্চিন্তে নাজাতের মঞ্জিলে পৌছুনো যায়।

শিরকের কথা বাদ দিয়ে যদি আমরা এমন জায়গার কথা আলোচনা করি, যেখানে আল্লাহ পরস্তি এবং আখেরাতের বিশ্বাস কিছুটা উন্নত পর্যায়ে অবস্থান করছে, তাহলে দেখতে পাবো যে, আল্লাহর নির্দেশাবলী সেখানে জীবনের একটি ক্ষুদ্রতম গন্ডীর মধ্যে সংকুচিত হয়ে রয়েছে। কয়েকটা কাজ, কয়েকটা রসম-রেওয়াজ আর কয়েকটা বিধি-নিষেধেরই শুধু সেখানে অস্তিত্ব রয়েছে। আল্লাহ

সেখানে এগুলোর দাবি করেন মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সীমিত পরিসরে। এবং এগুলোর বিনিময়ে তিনি তাদের জন্যে একটি বিরাট বেহেশত তৈরি করে রেখেছেন। তারা শুধু এ দাবিগুলো পূর্ণ করলেই হলো, ব্যাস, তাহলে আল্লাহর তরফ থেকে আর তাদের জন্যে করার মতো কিছু বাকি থেকে যায় না। এরপর তারা নিজেদের জীবনের যাবতীয় ব্যাপার ইচ্ছামতো চালাতে পারে, এ ব্যাপারে তাদের স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ করার কেউ নেই। এতো সবকিছুর পরও যদি আল্লাহর ঐ দাবি পুরণের ব্যাপারে তাদের কিছু ত্রুটি থেকে যায়, তাহলে তাঁর মেহেরবানী এবং করুণার উপর নির্ভর করা যায়। তিনি গোনাহর স্তুপগুলো তাদের কাছ থেকে নিয়ে জান্নাতের দরজায় রেখে দিয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের জন্য সম্মানসূচক টিকেট দান করবেন। এ সংকীর্ণ ধর্মীয় ধারণা প্রথমত জীবনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় নৈতিকতার গতিকে সীমাবদ্ধ নেতৃত্ব এবং বিধি-নিষেধ লাভ করা যেতো, জীবনের যাবতীয় বৃহত্তম অংশ তার থেকে স্বাধীন হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, এ সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যেও নৈতিকতার বাধন এড়িয়ে চলার জন্যে একটা পথ খোলা রয়েছে। খুব কম লোকই এ সুযোগটি ব্যবহারের ব্যাপারে গড়িমসি করে।

উপরে যে শ্রেণীগুলোর কথা আলোচনা করা হলো এদের সবার চেয়ে যে ধর্মীয় শ্রেণীটি উন্নততর পর্যায়ে অবস্থান করছে, যার মধ্যে শিরকের ছিটেফোটাও নেই, আন্তরিকতার সংগে আল্লাহকে মেনে চলে এবং মৃত্যুপারের জীবন সম্পর্কে কোনো মিথ্যা নির্ভরশীলতার তোয়াক্কা রাখে না, তার মধ্যে অবশ্যি নির্ভেজাল নৈতিকতার অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় এবং উন্নত চরিত্রের লোকের সন্ধান তার মধ্যে পাওয়া যায়, কিন্তু ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার সীমিত ধারণাই তাদেরকে নষ্ট করে দিয়েছে। তারা দুনিয়া এবং দুনিয়ার জীবনের যাবতীয় সমস্যা হতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সম্পর্কহীন হয়ে কতিপয় বিশেষ কাজকে যেগুলোকে ধর্মীয় কাজ মনে করা হয় আগলিয়ে বসে রয়েছে। অথবা নিজেদের আত্মাকে মেঝেঘসে সাফ করছে যাতে করে এ দুনিয়ায় বসে তারা অদৃশ্য জগতের আওয়াজ শুনতে পারে এবং সৌন্দর্যের প্রতীক স্রষ্টার এক ঝলক সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করার যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। তারা মনে করে মুক্তির পথ বেরিয়ে গেছে পার্থিব জীবনের কিনারা ঘেঁসে। তাদের মতে আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথ হলো একদিকে ধর্ম যে নকশা এঁকে দিয়েছে জীবনের বাইরের অংশটিকে সেই ছাঁচে ঢালাই করতে হবে এবং অন্যদিকে আত্মশুদ্ধির কতিপয় পদ্ধতি এখতিয়ার করে আত্মাকে পরিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ করতে হবে। অতপর একটি সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে কতিপয় আধ্যাত্মিক কাজে মশগুল থেকে জীবনের দিনগুলো কাটিয়ে যেতে হবে। অন্য কথায় বলা যায়, তাদের আল্লাহর প্রয়োজন ছিলো কতিপয় ঝকমকে তকতকে কাঁচ পাত্রের, কতিপয় জোরদার লাউড স্পীকারের, কতিপয় উৎকৃষ্ট

গ্রামোফোনের, কতিপয় সূক্ষ্মতর ক্ষমতা বিশিষ্ট রেডিওর, কতিপয় সুদৃশ্য ক্যামেরার এবং একমাত্র এ উদ্দেশ্যেই তিনি এতগুলো সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, যাতে করে মানুষ নিজেদেরকে এসব বস্তুতে রূপান্তরিত করে তাঁর নিকট ফিরে যেতে পারে। ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতার ভ্রান্ত ধারণার ফলে সবচেয়ে বড় যে ক্ষতি হয়েছে তাহলো এই যে, যেসব মানুষ উন্নত এবং পবিত্রতর নৈতিক যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন, তাদেরকে জীবনের বিস্তৃত সংগ্রাম ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে গৃহকোণে আবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং নিকৃষ্ট চরিত্রের লোকদের জন্যে বিনা যুদ্ধেই ময়দান খালি করে দেয়া হয়েছে।

সমগ্র দুনিয়ার ধর্মীয় পরিস্থিতির একটা মোটামুটি চিত্র এখানে আঁকা হলো। এথেকে আপনারা ধারণা করতে পারেন যে, আল্লাহ পরস্তির ফলে মানুষের যে নৈতিক শক্তি লাভ করার সম্ভাবনা ছিলো, বেশির ভাগ মানুষ তা আদতে হাসিলই করছে না এবং মুষ্টিমেয় কতিপয় লোক তা হাসিল করছে। কিন্তু মানবজাতির নেতৃত্বের পথ থেকে তারা নিজেরাই সরে এসেছে। এ জন্যে তাদের অবস্থা বর্তমানে ঠিক সেই বালবের মতো যার মধ্যে বিজলীর ক্ষমতা সংরক্ষিত রয়েছে। আর সে বসে বসেই নিজের জীবনকাল অতিবাহিত করছে।

মানব সভ্যতার গাড়ি বর্তমানে যাদের সাহায্যে কার্যত পরিচালিত হচ্ছে, তাদের নৈতিক জগতে আল্লাহ ও আখেরাতের বুনিয়াদি ধারণার ঠাঁই নেই। জেনে বুঝেই সেখানে ঠাঁই দেয়া হয়নি। এ ছাড়াও নৈতিক জগতে আল্লাহর নেতৃত্ব গ্রহণ করতে তারা পুরোপুরি অস্বীকৃতি জানিয়েছে। অবশ্যি তাদের মধ্যে বহু লোক কোনো না কোনো ধর্মের অনুসারী। কিন্তু তাদের মতে ধর্ম মানুষের নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার। ব্যক্তি সত্তার আওতায় তাকে সীমাবদ্ধ করা উচিত। সামগ্রিক জীবন ও ব্যাপারের সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। অতপর এসব ব্যাপার পরিচালনার জন্যে প্রাকৃতিক জগতের বাইরে কোনো নির্দেশের প্রতীক্ষা করার প্রয়োজনটাই বা কি। গত শতাব্দীর শেষের দিকে আমেরিকা থেকে যে নৈতিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল এবং অগ্রসর হয়ে ইংলিশ দ্বীপপুঞ্জ এবং অন্যান্য দেশে পরিব্যপ্ত হয়েছিল (american ethical union) তার বুনিয়াদি উদ্দেশ্যের তালিকায় একথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছিল :

"মানব জীবনের যাবতীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে তা ব্যক্তিগত, সামগ্রিক, জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক পর্যায়েরই হোক না কেন ধর্মীয় বিশ্বাস অথবা অতিপ্রাকৃত ধারণাকে পুরোপুরি বাদ দিয়ে নৈতিকতার অপরিসীম গুরুত্বের উপর জোর দিতে হবে।"

এ আন্দোলনের প্রভাবাধীনে বৃটেনে union of ethical societies প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে একে ethical union-এর সংগে মিলিয়ে দেয়া হয়। এর বুনিয়াদি উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছিল :

"মানব সেবা এবং মানুষের সংগে সাহায্য সহযোগিতার জন্যে এমন পদ্ধতির নির্দেশ দেয়া, যা এ নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে যে, প্রথমত, ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য হলো সৎপ্রীতি, দ্বিতীয় নৈতিক ধারণা ও নৈতিক জীবনের জন্যে দুনিয়ার তাৎপর্য এবং মৃত্যুপারের জীবন সম্পর্কে কোনো আকীদা-বিশ্বাসের প্রয়োজন নেই এবং তৃতীয়ত, নিছক মানবিক ও প্রাকৃতিক উপায়-উপাদানের মাধ্যমে মানুষকে জীবনের যাবতীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে সত্যপ্রীতি, সত্যকে জানা এবং সত্যের জন্যে কাজ করে যাবার মতো করে তৈরি করা।"

এ শব্দগুলোর মাধ্যমে বর্তমান জগতের চিন্তা, সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন ব্যাপারে নেতৃত্বদানকারী মানব শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। বর্তমান দুনিয়ার ব্যবস্থাকে কার্যত যারা পরিচালিত করছে, উপরের মাত্র কয়েকটি বাক্যের মধ্যে পেশকৃত ধারণা তাদের সবার মানসজগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। তারা সবাই কার্যত তাদের নৈতিকতাকে আল্লাহ্ ও আখেরাতে বিশ্বাস এবং ধর্মের নৈতিক নেতৃত্ব থেকে স্বাধীন করে নিয়েছে। এখন আমাদেরকে এ ধর্মহীন নৈতিক দর্শনের অবস্থা ভালো-মন্দ পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।

নৈতিক দর্শনের প্রথম মৌলিক প্রশ্ন হলো এই যে, আসল এবং চরম সৎ কি, যার সঙ্গে পরিচিত হওয়া মানুষের চেষ্টা ও কর্মের লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং যার মানদন্ডে মানুষের কার্যধারা যাচাই করে তার ভালো মন্দ অথবা ভুল-নির্ভুলের ফয়সালা করা যায়।

এ প্রশ্নের কোনো একটি জবাব মানুষ দিতে পারেনি। এর বিভিন্ন জবাব পাওয়া গেছে। একদল আনন্দকে সেই সৎ বলে চিহ্নিত করেছে। দ্বিতীয় দলের মতে তাহলো পূর্ণতা। তৃতীয় দল বলেন, কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্য।

আবার আনন্দ সম্পর্কেও বিভিন্ন প্রশ্নের অবকশ রয়েছে। যেমন কোন্ ধরনের আনন্দ? দৈহিক কামনা এবং ইন্দ্রীয় লালসা পূর্ণ করার পর যে আনন্দ লাভ হয়,তাই কি? অথবা মানসিক উন্নতির পর্যায় অতিক্রম করার পর যে আনন্দ লাভ হয়, তাই? অথবা নিজের ব্যক্তিত্বকে শিল্প অথবা আধ্যাত্মিকতার পরিপ্রেক্ষিতে সুসজ্জিত করার পর যে আনন্দ লাভ হয়, এ ছাড়াও প্রশ্ন হয়, কার আনন্দ? প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের আনন্দ? অথবা সেই দলের আনন্দ, যার সংগে মানুষ সম্পর্কযুক্ত? অথবা সমগ্র মানবজাতির আনন্দ? অথবা অন্যের আনন্দ?

এভাবে পূর্ণতাকে চরম লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করলেও বিভিন্ন প্রশ্নের উৎপত্তি হয়। যেমন, পূর্ণতার ধারণা এবং তার মানদন্ড কি? পূর্ণতা কার চরম লক্ষ্য : ব্যক্তির? দলের? মানবজাতির? কার?

অনুরূপভাবে যারা কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্যের ধারক এবং একটি শর্তহীন অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বিধানের (categorical imperative) শর্তহীন আনুগত্যকেই

শেষ এবং চূড়ান্ত সৎ বলে গণ্য করে, তাদের ব্যাপারেও প্রশ্ন ওঠে যে, ঐ বিধানটির আসল রূপ কি? কে সেটা প্রণয়ন করলো? কার বিধান হবার কারণেই তা অবশ্য পালনীয় হয়েছে?

বিভিন্ন দল এ প্রশ্নগুলোর বিভিন্ন জবাব দিয়ে থাকে। দর্শন পুস্তকের পাতায়ই শুধু এরা বিভিন্ন নয়, বাস্তব জীবনেও এদের চেহারায় বিভিন্নতা ফুটে উঠেছে। এক বিরাট ভীড়ের মতো যে মানব সমষ্টি দেখা যাচ্ছে, যারা সবাই মিলে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির গাড়িকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্র পরিচালক উজির, সেনাবাহিনীর সাহায্যে যুদ্ধ পরিচালনাকারী সেনাপতি, মানুষের বিভিন্ন ব্যাপারে মীমাংসাকারী জজ, মানুষের যাবতীয় ব্যাপারে আইন প্রণয়নকারী আইন প্রণেতা, মানুষকে শিক্ষাদানকারী শিক্ষক, অর্থনৈতিক উপায়-উপকরণ নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবসায়ী, সমাজ এবং সংস্কৃতির পরিচালনাগারে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মী। এদের নিকট সৎ-এর কোনো একটি মাত্র মানদন্ড নেই। বরং এরা সবাই–প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেক দল পৃথক পৃথক মানদন্ডের অধিকারী। একই সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার আওতায় কাজ করেও এরা প্রত্যেকেই ভিন্নতর লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছে। কেউ আনন্দকেই চরম লক্ষ্য মনে করে এবং আনন্দ বলতে সে মনে করে তার দৈহিক কামনা ও ইন্দ্রীয় লালসার পরিতৃপ্তি। কেউ আনন্দের পেছনে ছুটে ফিরছে, তবে আনন্দ সম্পর্কে তার ধারণা আবার অন্য রকম। তার ব্যক্তিগত আনন্দ লাভ অথবা তাথেকে বঞ্চিত হবার পরিপ্রেক্ষিতেই সে সমাজ জীবনে তার জন্যে সৎ ও অসৎ কাজের ফয়সালা করে। তার ভদ্রজনোচিত চেহারাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করে। আমরা মনে করি যে, সে মানব সমাজের একজন সুযোগ্য উজির, জজ, শিক্ষক অথবা অন্য কোনো যোগ্যতাসম্পন্ন হবার কারণে সভ্যতা-যন্ত্রের একটি মূল্যবান অংশবিশেষ। অনুরূপভাবে, আনন্দ অর্থে অনেকেই শুধু মানবজাতির যে বিশেষ অংশের সংগে তারা সম্পর্কযুক্ত তার আনন্দ ও সমৃদ্ধি মনে করে। তাদের মতে এটিই একমাত্র সৎ এবং এটি হাসিল করার জন্যে প্রচেষ্টা চালানোই হলো পূণ্যের কাজ। এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলে নিজের জাতি অথবা শ্রেণী ছাড়া অন্য সবার জন্যে সে সাপ এবং বিচ্ছুর রূপ ধারণা করে। কিন্তু তার ভদ্রজনোচিত চেহারার দরুন আমরা তাকে ভদ্রলোক বলেই মনে করি। আবার পূর্ণতাকে একমাত্র সৎ বলে যারা মনে করে এবং যারা কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্যের ধারক তাদের মধ্যেও এ ধরনের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের সন্ধান পাওয়া যায়। এদের অধিকাংশের আদর্শ ও মতবাদ বাস্তব ফলাফলের দিক দিয়ে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্যে বিষময়। কিন্তু তারা সেগুলোর উপর 'মৃতসঞ্জীবনীর' লেবেল লাগিয়ে আমাদের সমাজ জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেগুলোকে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে।

এবার দ্বিতীয় প্রশ্নটির আলোচনা করা যাক। নৈতিকতা দর্শনের মৌলিক প্রশ্নগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা হলো এই যে, আমাদের নিকট ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ সম্পর্কে অবগত হবার কি মাধ্যমে আছে? ভালো কি আর মন্দ কি, ভুল কি আর নির্ভুল কি একথা জানবার জন্যে আমরা কোন্ উৎসের দিকে অগ্রসর হবো?

এ প্রশ্নের কোনো একটি মাত্র জবাব মানুষ পায়নি। এর জবাবও বিভিন্ন। কারুর মতে সে মাধ্যম ও উৎস হলো মানুষের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কেউ বলেন, জীবন বিধান ও অস্তিত্বের অবস্থা সম্পর্কিত জ্ঞান। কেউ বলেন, জ্ঞান শক্তি। কেউ বলেন, বিবেক-বুদ্ধি। এখানে এসে বিশৃংখলা চরমে পৌছে, যা প্রথম প্রশ্নের ক্ষেত্রে আপনারা প্রত্যক্ষ করেছেন। এসব জিনিসকে উৎস ও মূল গণ্য করার পর নৈতিকতার স্থায়ী নীতি এই স্বীকৃত হয় যে, তার কোনো নির্দিষ্ট মানদণ্ডই নেই বরং প্রবহমান ধাতুর মতোই সে গতিশীল এবং বিভিন্ন আকৃতি ও পরিমাপের ছাঁচে সে নিজেকে ঢালাই করে থাকে।

মানুষের পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে নির্ভুল জ্ঞান লাভের জন্যে অবশ্যি সে সম্পর্কে পূর্ণ ও বিস্তারিত তথ্য একত্রিত হওয়া এবং একটি সর্বদ্রষ্টা ও পূর্ণ ভারসাম্যের অধিকারী মস্তিস্কের তা থেকে ফলাফল লাভের প্রয়োজন। কিন্তু এ দু'টো জিনিসই অলভ্য। প্রথমত পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখনো শেষ হয়নি বরং জারি আছে। তদুপরি আবার এতোদিনকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা লব্ধ অভিজ্ঞতারও বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন লোকের সামনে রয়েছে এবং তারা বিভিন্ন পদ্ধতিতে নিজেদের বুদ্ধি-বিবেক অনুযায়ী তাথেকে ফলাফল লাভ করছে। তাহলে কি ঐ ত্রুটিপূর্ণ তথ্যাবলী থেকে বিভিন্ন অসম্পূর্ণ বিবেক-বুদ্ধি নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী যে ফলাফল লাভ করবে, তা সব নির্ভুল হতে পারে? যদি না হয়, তাহলে নিজের ভালো মন্দ জানার জন্যে যে মস্তিষ্ক ও মানসিকতা ঐ জ্ঞানের মাধ্যমকে যথেষ্ট মনে করে, তার রুগ্নতা কী ভীষণ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, তা চিন্তা করার মতো।

জীবন বিধান ও অস্তিত্বের অবস্থার ব্যাপারটিও অনুরূপ। হয় আপনি নৈতিক ভালো মন্দ জানবার জন্যে সেই সময়ের অপেক্ষা করুন যখন ঐ বিধান ও অবস্থার সন্তোষজনক পরিমাণ জ্ঞান আপনি হাসিল করতে পারবেন, নয়তো অকিঞ্চিত তথ্যাবলীকে অকিঞ্চিত জেনে এরি ভিত্তিতে বিভিন্ন মানসিকতাসম্পন্ন ও বিভিন্ন পর্যায়ের জ্ঞানী লোকেরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে ফয়সালা করতে থাকবেন যে, তাদের জন্যে ভালো কি এবং মন্দ কি? নতুন পর্যায়ের জ্ঞান লাভ করার তারা ঐ ফয়সালাগুলো পরিবর্তন করতেও থাকবেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত আজকের ভালো আগামীকাল মন্দে পরিণত হবে এবং আজকের মন্দ আগামীকাল ভালো বলে গণ্য হবে।

জ্ঞান-শক্তি ও বিবেক-বুদ্ধির ব্যাপারটিও এথেকে মোটেই ভিন্নতর নয়। অবশ্যি ভালো-মন্দকে জানবার কিছুটা ক্ষমতা বুদ্ধির আছে, এতে সন্দেহ নেই। এবং প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এ বুদ্ধির কিছু না কিছু অংশও আছে। আবার জ্ঞান শক্তির সাহায্যেও ভালো-মন্দ কিছুটা জানা যায় বৈকি এবং স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেক মানুষের বিবেকেই ইহা অনুরণন হয়। কিন্তু এই জ্ঞানের জন্যে এদের মধ্যে কোনো একটি সূত্রও তার স্বকীয়তায় যথেষ্ট নয় যার ফলে তাকেই শেষ এবং একমাত্র জ্ঞানের মাধ্যম হিসেবে ধরে নেয়া যেতে পারে। বুদ্ধি অথবা জ্ঞান যাকেই আপনি যথেষ্ট মনে করুন না কেন আবশ্যি জ্ঞানের এমন একটি মাধ্যমের উপর আপনি আস্থাশীল হবেনই যার মধ্যে শুধু স্বভাবজাত অসম্পূর্ণতা ও সীমাবদ্ধতাই নয় বরং বিভিন্ন ব্যক্তি, শ্রেণী, অবস্থা ও কালে উপনীত হয়ে সে একেবারে ভিন্ন ভিন্ন জিনিসকে ভালো ও মন্দ বলে গণ্য করবেই।

এই যেসব বিশৃংখলার কথা আমি উল্লেখ করলাম এগুলো নিছক তথ্যমূলক প্রবন্ধ ও দার্শনিক আলোচনা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নেই বরং দুনিয়ার সভ্যতা-সংস্কৃতিতে কার্যত এগুলোর সুস্পষ্ট প্রতিফলন হচ্ছে। আপনার নিজের সভ্যতা-সংস্কৃতিতেও যে সমস্ত লোক কর্মরত আছেন তারা কর্তা বা কর্মীর আসনে সমাসীন থাকুন অথবা কর্তা ও কর্মী তৈরির কাজে লিপ্ত থাকুন তারা সবাই ভালো ও মন্দ এবং ভুল ও নির্ভুলকে জানবার জন্যে নিজেদের ক্ষমতানুযায়ী ঐসব বিভিন্ন উৎসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক দলের ভালো-মন্দ অন্যের ভালো-মন্দ থেকে পৃথক। এমনকি একজনের ভালো অন্যের জন্য চরম মন্দ এবং একজনের মন্দ অন্যের জন্যে চরম ভালোয় পরিণত হয়েছে। এই বিশৃংখলা নৈতিকতা কোনো স্থায়ী ভিত্তিকে প্রতিষ্ঠিত থাকতে দেয়নি। দুনিয়ার যেসব জিনিসকে হামেশা অপরাধ ও গুনাহ মনে করা হয়েছে আজ কোনো না কোনো দলের দৃষ্টিতে সেগুলো মূর্তিমান ভালো অথবা প্রত্যক্ষ ভালো না হলেও পরোক্ষ ভালোয় পরিণত হয়েছে। অনুরূপভাবে যেসব সৎগুনাবলীকে মানুষ ভালো মনে করে এসেছে তাদের অধিকাংশই আজ নির্বুদ্ধিতা এবং হাস্যাস্পদ বলে গণ্য হয়েছে এবং বিভিন্ন দল লজ্জার সাথে নয়, সগর্বে প্রকাশ্যে এগুলোকে নাস্তনাবুদ করছে। আগের যুগে মিথ্যাবাদী মিথ্যা কথা বলতো কিন্তু সত্যকেই নৈতিকতার মানদণ্ড বলে স্বীকার করতো। কিন্তু আজকের যুগের দর্শন মিথ্যাকে ভালো ও সৎ বানিয়ে দিয়েছে। আজ মিথ্যা বলার জন্যে একটি স্থায়ী শিল্প সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্র ব্যাপক হারে মিথ্যার বেসাতি করে বেড়াচ্ছে। দিকে দিকে তার বীজ ছড়িয়ে ফিরছে। প্রত্যেক অসৎ গুনের অবস্থাও অনুরূপ। পূর্বে অসৎগুণাবলী অসৎই ছিলো কিন্তু আজ নতুন দার্শনিক মতবাদের বদৌলতে এগুলো প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সৎ ও ভালোয় পরিবর্তিত হয়েছে।

নৈতিকতা দর্শনের মৌলিক প্রশ্নাবলীর মধ্যে তৃতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে এই যে, নৈতিক সংবিধানের পেছনে কোন্ শক্তি সক্রিয় রয়েছে যার জোরে এ সংবিধান প্রবর্তিত হয়? এর জবাবে আনন্দ ও পূর্ণতার প্রসাদভোগীরা বলেন যে, যেসব সৎগুণ আনন্দ ও পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় তাদের আনুগত্য করার শক্তি তারা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে রাখে এবং যেসব অসৎগুণ দুঃখ-কষ্ট অবনতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় তারাও নিজেদের শক্তির জোরেই তাদের থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে। এছাড়া নৈতিক সংবিধানের জন্যে বাইরের কোনো কর্তৃত্বের প্রয়োজনই নেই। দ্বিতীয় দল বলেন, কর্তব্য বিধান হলো মানুষের সুসংগত ইচ্ছা শক্তি কর্তৃক নিজের সংস্থাপিত বিধান। এর জন্যে কোনো বহি:শক্তির প্রয়োজন নেই। তৃতীয় দল রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে নৈতিক বিধানের আসল প্রবর্তক শক্তি মনে করেন। এ মতের প্রেক্ষিতে আল্লাহর জন্যে পূর্বে যেসব ক্ষমতা নির্ধারিত ছিলো অর্থাৎ দেশবাসীদের কি করা উচিত এবং কি না করা উচিত এর ফয়সালা করা তা সবই রাষ্ট্রের দিকে স্থানান্তরিত হয়। চতুর্থ দল রাষ্ট্রের পরিবর্তে সমাজকে এ মর্যাদা দিয়েছে। এ জবাবগুলো কার্যত দুনিয়ার অগণিত বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে এবং এখনো করে যাচ্ছে। প্রথম জবাব দু'টো ব্যক্তিগত জুলুম, হঠধর্মিতা ও বিপথগামিতা এত বেশি বাড়িয়ে দিয়েছে যে, সমাজ জীবনের যাবতীয় ব্যবস্থা ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে বসেছে। অতপর এর প্রতিক্রিয়া অন্য দার্শনিক মতবাদের রূপে আত্মপ্রকাশ করলো। এ মতবাদগুলো রাষ্ট্রকে খোদা বানিয়ে ব্যক্তিকে পূর্ণতাতরে বান্দায় পরিণত করেছে অথবা ব্যক্তির ভাত-রুটির সংগে সংগে তার ভালো-মন্দ, সৎ ও অসতের লাগামও তুলে দিয়েছে সমাজের হাতে। অথচ রাষ্ট্র বা সমাজ এ দু'টো কোনটাই নিষ্কলুষ ও মহাপবিত্র নয়।

ঠিক একই ব্যাপার দেখা দেয় এ প্রশ্নের ক্ষেত্রেও যে, কোন্ প্রেরণা মানুষকে তার স্বভাবজাত খাহেশের বিরুদ্ধে নৈতিক নির্দেশাবলীর অনুগত করে? কারুর মতে কেবল আনন্দ-লিপসা ও দু:খ-কষ্টের ভয়ই এর জন্যে যথেষ্ট প্রেরণাদায়ক। কেউ নিছক পূর্ণতার আকাংখা এবং অপূর্ণতা থেকে বাঁচবার কামনাকে এর জন্যে যথেষ্ট মনে করেন। কেউ এ জন্যে নিছক আইনের প্রতি মানুষের ঐচ্ছিক সম্মানবোধের উপর আস্থা রাখেন। কেউ রাষ্ট্রের পুরস্কারের আশা এবং তার রোষাণলের ভয়কে গুরুত্ব দেন। কেউ সমাজের পুরস্কার এবং তার ক্রোধকে ভীত ও লালসার জন্যে ব্যবহার করার উপর জোর দেন। এর মধ্যে থেকে প্রত্যেকটি জবাবই কার্যত আমাদের নৈতিক ব্যবস্থার মধ্য থেকে কোনো না কোনোটির মধ্য অগ্রবর্তীর আসন দখল করেছে। সামান্য অনুসন্ধান করলেই সহজেই এ সত্যের দ্বারোদ্‌ঘাটিত হয় যে, এ প্রেরণাদায়ক শক্তিগুলো সৎকর্মেরও যতোটা সুষ্ঠু প্রেরণা যোগায়, অসৎকর্মেরও ঠিক ততোটা সুষ্ঠু প্রেরণা যোগাতে

পারে। বরং অসৎকাজের প্রেরণা যোগাবার ক্ষমতা এদের মধ্যে অনেক বেশি আছে। বলা বাহুল্য কোনো উন্নত পর্যায়ের নৈতিকতার জন্যে এ প্রেরণাদায়ক শক্তিগুলো একেবারেই অকিঞ্চিত।

দুনিয়ার বর্তমান নৈতিক অবস্থার এই যে পর্যালোচনাটুকু আমি করলাম এ থেকে প্রথম দৃষ্টিতেই একথা অনুভূত হবে যে, বর্তমান দুনিয়া একটি সর্বব্যাপী নৈতিক নৈরাশ্যের মধ্যে অবস্থান করছে। আল্লাহ থেকে বেনিয়াজ হয়ে মানুষ নিশ্চিন্তে তার নৈতিক পুণর্গঠন কার্য সম্পাদনের জন্যে কোনো বুনিয়াদ হাসিল করতে পারেনি। নৈতিকতার যাবতীয় মৌলিক প্রশ্নাবলীর আসলে কোনো সদুত্তর তার কাছে নেই। যে শ্রেষ্ঠতম সততার প্রচেষ্টার শেষ অধ্যায়ে পরিণত হতে পারে এবং যার পরিপ্রেক্ষিতে ভালো বা মন্দ এবং ভুল বা নির্ভুল কাজের ফয়সালা করা যেতে পারে তার কোনো সন্ধান সে লাভ করতে পারেনি। ভালো ও মন্দ, সৎ ও অসৎ সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান লাভ করার জন্যে কোনো উৎসের সন্ধানও সে পায়নি। যে কর্তৃত্বের বলে নৈতিকতার কোনো উন্নত ও সার্বজনীন বিধান প্রবর্তন করার শক্তি লাভ করা যায় তা হাসিল করতেও সে সক্ষম হয়নি এবং এমন কোনো প্রেরণাদায়ক শক্তিও সে লাভ করতে পারেনি যা মানুষকে সত্য পথে চলার এবং অসত্য থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সত্যিকারভাবে প্রলুব্ধ করে। আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মানুষ হঠধর্মিতার সংগে ঐ প্রশ্নগুলো সমাধান করতে চেয়েছিল এবং নিজেদের মতানুযায়ী সমাধান তারা করেছেও কিন্তু এই সমাধানের পরিণাম ফলই আজ আমরা দুনিয়ার চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত দেখছি যা নৈতিক পতনের ভয়াবহ তুফান রূপে অগ্রসর হয়ে সমগ্র মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের বাণী শোনাচ্ছে।

মানুষের নৈতিক বৃত্তির নির্ভুল সংগঠনের জন্যে বুনিয়াদ তালাশ করার সময় কি এখনো সমুপস্থিত হয়নি? আসলে এ তালাশ ও অনুসন্ধান নিছক একটি পুঁথিগত আলোচনা নয় বরং এটি আমাদের জীবনের একটি বাস্তব প্রয়োজন এবং পরিস্থিতির নাজুকতা একে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে পরিণত করেছে। এ প্রেক্ষিতে আমি নিজের অনুসন্ধানের ফলাফল পেশ করছি। আমি চাই যেসব লোক এ প্রয়োজনের অনুভূতি রাখেন তারা শুধু আমার এ ফলাফলের উপর ঠান্ডা মস্তিষ্কে চিন্তা করেই ক্ষান্ত হবেন না বরং মানুষের নৈতিক বৃত্তির নির্ভুল বুনিয়াদ কি হতে পারে এ সম্পর্কে তারা নিজেরাও চিন্তা করবেন।

আমি অনেক অনুসন্ধান ও গবেষণা করার পর যে সিদ্ধান্তে পৌছেছি তাহলো এই যে, নৈতিকতার জন্যে স্রেফ একটি বুনিয়াদই নির্ভুল এবং ইসলাম সে বুনিয়াদটি সরবরাহ করে। নৈতিকতার দর্শনের সমস্ত মৌলিক প্রশ্নের জবাব আমরা এখানে পাই। এমন জবাব পাই যার মধ্যে দার্শনিক জবাবসমূহের দুর্বলতাগুলোর অস্তিত্ব

নেই। ধর্মীয় নৈতিকতার যেসব দুর্বলতার ফলে সে কোনো শক্তিশালী চরিত্র গঠন করতে পারে না এবং মানুষকে তমদ্দুনের ব্যাপকতার দায়িত্ব গ্রহণ করার যোগ্যও করে না তার ছিটেফোঁটাও এখানে নেই। এখানে আমরা এমন একটি সর্বব্যাপী নৈতিক নেতৃত্ব লাভ করি যা আমাদেরকে জীবনের সমস্ত বিভাগে উন্নতির চরমতম পর্যায়ে উপনীত করতে পারে। এখানে আমরা এমন নৈতিক বিধান লাভ করি যার উপর একটি সৎ ও সর্বোত্তম তমুদ্দুনিক ব্যবস্থা কায়েম করা যেতে পারে এবং বিধানের উপর ব্যক্তি ও সমাজ চরিত্রের ভিত্তি স্থাপন করলে মানব জীবন বর্তমানে যে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে তাথেকে রেহাই পেতে পারে। কোন্ যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আপনাদের সামনে পেশ করছি।

দর্শন যে স্থান থেকে নৈতিকতার আলোচনা শুরু করে আসলে তা নৈতিক বিষয়ের প্রারম্ভিক বিন্দু নয় বরং মাঝখানের কতিপয় বিন্দু। প্রারম্ভিক বিন্দুকে ছেড়ে এখান থেকেই আলোচনা শুরু করা হয়েছে। এটিই হলো প্রথম ভুল। মানুষের কর্মকাণ্ডের ভুল ও নির্ভুলের মানদণ্ড কি এবং কোন্ সৎগুণাবলী পর্যন্ত পৌছবার জন্যে প্রচেষ্টা চালানো মানুষের প্রধানতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এ প্রশ্নগুলো আসলে পরের পর্যায়ের। এর আগের আসল প্রশ্নটি এই হওয়া উচিত যে, এ জগতে মানুষ কোন্ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত? অন্যান্য প্রশ্নগুলো থেকে এ প্রশ্নটির অগ্রবর্তী হবার কারণ আছে। মর্যাদার স্থান নির্দেশ ছাড়া নৈতিকতার প্রশ্ন শুধু অনর্থকই নয় বরং এতে খুব বেশি সম্ভাবনা থাকে যে, এভাবে যে নৈতিক বিধান নির্ধারিত হবে তা মূলতই হবে ক্রটিপূর্ণ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কোন্ সম্পত্তি সম্পর্কে আপনাকে ফয়সালা করতে হবে যে, তার মধ্যে কিভাবে আপনার কাজ করা উচিত, তাকে কিভাবে ব্যবহার করার অধিকার আপনার আছে আর কিভাবে ব্যবহার করার অধিকার আপনার নেই। এ সম্পত্তির ব্যাপারে আপনি কোন্ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত এবং এর সংগে আপনার সম্পর্ক কোন্ ধরনের, এ বিষয়টি নির্ধারিত না করেই কি আপনি এ প্রশ্নের নির্ভুল মিমাংসা করতে পারেন? যদি এ সম্পত্তির মালিক অন্য কেউ হয় এবং আপনি এতে আমানতদার ও রক্ষকের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তাহলে এতে আপনার নৈতিক কর্মপদ্ধতি অনেকটা অন্য ধরনের হবে। আর যদি আপনি নিজেই এর মালিক হন এবং এর উপর আপনার সীমাহীন মালিকানা ক্ষমতা থাকে, তাহলে এ ক্ষেত্রে আপনার নৈতিক কর্মপদ্ধতি হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। মর্যাদার প্রশ্ন নৈতিক কর্মপদ্ধতির ধরন হিসেবে চূড়ান্ত হবে ব্যাপার শুধু এতোটুকু নয় বরং আসলে এ বিষয়ের ফয়সালা এরই উপর নির্ভর করবে যে, এ সম্পত্তিতে কে আপনার জন্যে নির্ভুল কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করার অধিকার রাখে, আপনি নিজে অথবা আপনি যার আমানতদার সে?

ইসলাম সর্বপ্রথম এ প্রশ্নের দিকে মনসংযোগ করে এবং সকল দ্বিধা সন্দেহের উর্ধ্বে থেকে সুস্পষ্টভাবে আমাদেরকে বাতলিয়ে দেয় যে, এ দুনিয়ায় মানুষ আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর সহকারীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। এখানে যতো সব জিনিসের সংগে মানুষের সম্পর্ক সমস্তর-ই মালিক আল্লাহ এমনকি মানুষের নিজের দেহ এবং তার এ দেহের মধ্যে যতো শক্তি আছে কোনো কিছুরই মালিক সে নিজে নয় আল্লাহ-ই এ সবের মালিক। আল্লাহ তাকে এসব জিনিস ব্যবহার করার ক্ষমতা দিয়ে নিজের সহকারী হিসেবে এখানে নিযুক্ত করেছেন এবং এ নিযুক্তির মধ্যে রয়েছে তার পরীক্ষা। পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল এ দুনিয়ায় প্রকাশ হবে না বরং যখন ব্যক্তি, জাতি তথা সমগ্র মানবজাতির কাজ খতম হয়ে যাবে এবং মানুষের প্রচেষ্টার প্রভাব ও ফলাফল পূর্ণতার সীমায় পৌছে যাবে, তখনই আল্লাহ একই সময়ে সবার হিসেব নেবেন এবং এ বিষয়ের ফয়সালা করবেন যে, কে তাঁর বন্দেগী ও সহকারীত্বের হক সঠিকভাবে আদায় করেছে এবং কে আদায় করেনি। এ পরীক্ষা শুধু কোনো একটি ব্যাপারেই নয় বরং সমস্ত ব্যাপারেই, জীবনের শুধু একটি বিভাগেই নয় বরং সামগ্রিক ভাবে, সমগ্র জীবনব্যাপী। দেহ ও আত্মার যতো রকমের শক্তি মানুষকে দেয়া হয়েছে, সবার জন্যে এ পরীক্ষা এবং বাইরে যেসব জিনিসের উপর যে ধরনের ক্ষমতা তাকে দেয়া হয়েছে, সবগুলোর মধ্যে পরীক্ষা হচ্ছে কিভাবে সে এগুলোর উপর নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করেছে দেখার জন্যে।

মর্যাদা নির্ধারণের স্বাভাবিক ফল এই দাঁড়ায় যে, দুনিয়ায় নিজের জন্যে নৈতিক কর্মপদ্ধতি নির্ধারণের অধিকার মানুষের আর থাকে না বরং এ ফয়সালা করা আল্লাহর অধিকারে পরিণত হয়। অতপর দার্শনিকগণ নৈতিকতা দর্শনের যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তার সবগুলোরই সমাধান হয়ে যায়। আর শুধু সমাধানই নয় বরং এরপর এক একটি প্রশ্নের ছত্রিশটি জবাবের এবং এক একটি জবাবের ভিত্তিতে মানুষের এক একটি দলের নৈতিকতার এক ভিন্নতর দিকে পরিচালিত হবার এবং একই সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের আওতায় বাস করেও এ বিভিন্ন দিকে পরিচালিত লোকদের নিজেদের বিপথগামিতার মাধ্যমে বিশৃংখলা, বিপর্যয় ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করার আর কোনো মওকাই থাকে না। ইসলাম মানুষের যে মর্যাদা নির্ধারণ করেছে, তা যদি স্বীকার করে নেয়া হয়, তাহলে একথা আপনা আপনি নির্ধারিত হয়ে যায় যে, আল্লাহর পরীক্ষায় কামিয়াব হওয়া এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করাই হলো সে উন্নততর ভালো ও সৎ, যাকে হাসিল করা প্রত্যেক মানুষের প্রধানতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এবং কোনো পদ্ধতি এ সৎ হাসিল করার পক্ষে কতোটুকু সহায়ক বা প্রতিবন্ধক সে কথার উপর তার ভুল বা নির্ভুল হওয়া নির্ভর করে। অনুরূপভাবে এখান থেকে একথাও নির্ধারিত হয়ে যায়

যে, মানুষের জন্যে ভালো-মন্দ ও ভুল-নির্ভুলকে জানার আসল উৎস হলো আল্লাহর হেদায়াত এবং এছাড়া জ্ঞান লাভের অন্যান্য মাধ্যম এ আসল উৎসের সাহায্যকারী হতে পারে কিন্তু আসল উৎস হতে পারে না। এছাড়া একথাও স্থিরীকৃত হয়ে যায় যে, নৈতিক বিধান অবশ্য পালনীয় হবার আসল বুনিয়াদ হলো শুধু এই যে, এ বিধান আল্লাহ প্রবর্তিত। এবং এই সংগে একথাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সচ্চারিত্রিক গুণাবলীর আনুগত্য করা এবং অসচ্চারিত্রিক গুণাবলীকে এড়িয়ে যাবার জন্যে আসল প্রেরণাদায়ক শক্তি আল্লাহ্ প্রেম, তাঁর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান এবং তার বিরাগভাজনের আশংকা হওয়া উচিত।

অতপর এ থেকে শুধু নৈতিকতা দর্শনের সমস্ত নীতিগত প্রশ্নের মীমাংসাই হয়ে যায় না বরং এর ভিত্তিতে যে নৈতিক পদ্ধতি গড়ে উঠে তার মধ্যে চরম ভারসাম্যপূর্ণ ও সুসংগত পদ্ধতিতে সেসব নৈতিক পদ্ধতি নিজেদের উপযোগী স্থান লাভ করে, যা নৈতিকতা দর্শনের চিন্তাবিদগণ করেছেন। দর্শন ভিত্তিক নৈতিক ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে সত্যের কোনো অংশ নেই, এটিই এর আসল ত্রুটি নয় বরং এর আসল ত্রুটি হলো এই যে, এরা সত্যের একটা অংশ গ্রহণ করে তাকে পূর্ণ সত্য বানিয়ে নিয়েছে। অংশকে পূর্ণ বস্তু বানাবার জন্যে যতো পরিমাণ অতিরিক্ত বস্তুর প্রয়োজন হয় তার পূর্ণতার জন্যে অবশ্যি এদেরকে বাতিলের অনেক অংশ গ্রহণ করতে হয়। এর বিপরীত পক্ষে ইসলাম পূর্ণ সত্য পেশ করে এবং মানুষের কাছে যেসব আংশিক সত্য পৃথক পৃথকভাবে এবং অপূর্ণ অবস্থায় ছিলো তা সব এ পূর্ণ সত্যের মধ্যে একীভূত হয়ে যায়।

এখানে আনন্দেরও একটা স্থান আছে, কিন্তু তাহলো আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করার ফলে সৃষ্ট আনন্দ ও সমৃদ্ধি। এ আনন্দ ও সমৃদ্ধি শারীরিক ও বস্তু ভিত্তিক, মানসিক ও আর্থিক এবং শৈল্পিক ও আধ্যাত্মিক সব রকমের। উপরন্তু এ আনন্দ ও সমৃদ্ধি ব্যক্তি, দল এবং সমগ্র মানব জাতিরও। এ বিভিন্ন আনন্দের মধ্যে সংঘর্ষ নেই বরং সংযোগ আছে।

এখানে পূর্ণতারও একটা স্থান আছে, কিন্তু সে পূর্ণতা আল্লাহর পরীক্ষায় শতকরা একশো নম্বর লাভ করার অধিকারী এবং এ পূর্ণতা শুধু ব্যক্তির নয় বরং দলের, জাতির এবং দুনিয়ার সমস্ত মানুষের। নির্ভুল নৈতিক কর্মপদ্ধতির পরিচয় হলো এই যে, এর মাধ্যমে শুধু ব্যক্তি নিজেই পূর্ণতার দিকে অগ্রগমন করে না বরং সে অন্যের পূর্ণতার সহায়কও হয় এবং কেউ কারুর পূর্ণতা লাভের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না।

এখানে ক্যান্টের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বিধানও (categorical imperative) পূর্ণ মর্যাদা সহকারে স্থান লাভ করে এবং যে নোংগর লাভ না করার দরুন

দর্শনের দরিয়ায় এ জাহাজ দোদুল্যমান ছিলো তাও সে লাভ করে। ক্যান্ট যে অবশ্য পালনীয় বিধানের কথা উল্লেখ করেছেন এবং যার কোনো ব্যাখ্যা তিনি নিজে করতে পারেননি আসলে তাহলো আল্লাহর বিধান। আল্লাহর পক্ষ থেকেই তার রূপ নির্ধারণ করা হয়েছে। আল্লাহর বিধান হবার কারণেই তা অবশ্য পালনীয় এবং বিনা দ্বিধায় এরই আনুগত্য করার নাম হলো নেকী।

অনুরূপভাবে এখানে নৈতিক ভালো মন্দের জ্ঞান লাভের জন্যে যে উৎসের কথা আমাদেরকে বলা হয়েছে তা দার্শনিকগণ কথিত জ্ঞানলাভের অন্যান্য মাধ্যমকে অস্বীকার করে না বরং ওগুলোকে একটি পদ্ধতির অংশীভূত করে। অবশ্যি যে জিনিসটাকে অস্বীকার করে তাহলো শুধু এই যে, ওগুলোকে অথবা ওদের মধ্য থেকে কোনো একটিকে জ্ঞানলাভের আসল ও শেষ মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা। আল্লাহর হেদায়াতের মাধ্যমে ভালো মন্দ যে জ্ঞান আমাদের দান করা হয়েছে তাহলো আসল জ্ঞান। এছাড়া অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, জীবন বিধান ও অস্তিত্বের অবস্থা লব্ধ জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি প্রসূত জ্ঞান এ সবই ঐ আসল জ্ঞানের সাক্ষ্যস্থল। আল্লাহর হেদায়াত যে জিনিসগুলোকে ভালো ও সৎ বলে মানুষের অভিজ্ঞতা তার ভালো ও সৎ হবার সাক্ষ্য দেয়, জীবন বিধান তার সত্যতা প্রমাণ করে। বিবেক, বুদ্ধি উভয়ই তার সাক্ষ্য প্রদান করে। কিন্তু সত্যতার মানদণ্ড হলো একমাত্র আল্লাহর হেদায়াত, জ্ঞানের এসব মাধ্যমগুলো নয়। মানবজাতির ইতিহাস লব্ধ অভিজ্ঞতা অথবা জীবন বিধান থেকে যদি এমন কিছু প্রমাণ করা হয় অথবা জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধির সাহায্যে এমন কোনো রায় কায়েম করা যায় যা আল্লাহর হেদায়াত বিরোধী তাহলে আল্লাহর হেদায়াতকেই প্রকৃত স্বীকৃতি দেয়া হবে, ঐ প্রমাণ অথবা রায়কে নয়। আমাদের নিকট জ্ঞানের একটা সনদযুক্ত মানদণ্ড থাকায় এই লাভ হয় যে, আমাদের জ্ঞান রাজ্যে শৃংখলা কায়েম থাকে এবং সে বিশৃংখলা ও নৈরাজ্য থেকেও আমরা নিস্কৃতি লাভ করি যা কোনো মানদণ্ড না থাকায় এবং প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের নিজের রায় পেশ করার কারণে সৃষ্টি হয়।

অনুরূপভাবে এখানে নৈতিক বিধানের শক্তি সহায়ক (sanction) ও প্রেরণা সৃষ্টিকারীর সমস্যাও এভাবে সমাধান করা হয় যে, এর ফলে দার্শনিকগণ যেসব জিনিসের কথা বলেছেন তা অস্বীকার করা হয় না। বরং সেগুলোর সংশোধন হয়ে যায় এবং যেসব ভুল পরিসরে সেগুলোকে সম্প্রসারিত করে দেয়া হয়েছে অথবা তারা নিজেরাই সম্প্রসারিত হয়েছে সেখান থেকে সরিয়ে তাদেরকে একটি পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতিতে সঠিক স্থানে রাখা হয়। আল্লাহর বিধান নিজেকে আল্লাহর বিধান হবার কারণেই প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি রাখে। এ শক্তি সেই মু'মিনের মধ্যেও আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টি চাওয়ার মধ্যে আনন্দ অনুভব করে এবং যে সেই পূর্ণতা অনুসন্ধান করে ফিরছে যা আল্লাহর দিকে অগ্রসর হবার পর

লাভ করা যায়। এছাড়াও এ শক্তি মু'মিন সমাজ এবং আল্লাহর বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত সৎ রাষ্ট্রের মধ্যে রয়েছে। আইনের আনুগত্য করার জন্যে মু'মিনকে উৎসাহদান করে তার নির্ভেজাল কর্তব্যজ্ঞান, তার সত্যকে সত্য জেনে তাকে পছন্দ করার ক্ষমতা, বাতিলকে বাতিল জেনে তাকে ঘৃণা করার ক্ষমতা এবং তার আল্লাহ্প্রীতি।

এভাবে মানুষকে আল্লাহর কর্তৃত্বের বাইরে ধারণা করে নিয়ে তার জন্যে একটি নৈতিক ব্যবস্থা স্থিরীকৃত করার প্রচেষ্টা চালানোর ফলে মানুষের চিন্তা ও কর্মজগতে যে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয় ইসলাম তাকে পুরোপুরি খতম করে দেয়। অতপর আলোচনাটাকে আর একটু এগিয়ে নেয়া যাক। ইসলাম আল্লাহ্র যে ধারণা পেশ করে তাহলো এই যে, মানুষ ও সমগ্র বিশ্বজাহানের একমাত্র মালিক, স্রষ্টা, মাবুদ ও শাসক হলেন আল্লাহ। এ খোদায়ীর কাছে কেউ তাঁর শরীক নেই। তাঁর নিকট নেক দোয়া ছাড়া অন্য এমন কোনো সুপারিশের স্থান সংকুলান নেই যা জোর করে মানিয়ে নেয়া অথবা প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে। তাঁর নিকট প্রত্যেক ব্যক্তির সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভর করে তার নিজের কার্যাবলীর উপর। সেখানে কেউ কারোর গুনাহর কাফ্ফারা হতে পারে না, একজনের কাজের জন্যে অন্যজনকে দায়ি করা হয় না, একজনের কাজের ফল অন্যজন পায় না। তাঁর নিকট পক্ষপাতিত্ব নেই। কোনো একটি খান্দান, জাতি অথবা বংশের ব্যাপারে তিনি অন্য সবার চেয়ে বেশি আগ্রহশীল নন। তাঁর দৃষ্টিতে সব মানুষ সমান। সবার জন্যে একই নৈতিক বিধান রয়েছে এবং নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠিতে একজনের উপর অন্যজনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়। তিনি নিজে রহীম এবং রমহ পছন্দ করেন। তিনি নিজে দাতা এবং দানশীলতা পছন্দ করেন। তিনি নিজে ক্ষমাশীল এবং ক্ষমাশীলতা পছন্দ করেন। তিনি নিজে ইনসাফকারী এবং ইনসাফ পছন্দ করেন। তিনি নিজে জুলুম, সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগী, সংকীর্ণ মনোভাব, নির্দয়তা, নিষ্ঠুরতা, বিদ্বেষ এবং স্বার্থদুষ্ট পক্ষপাতিত্ব থেকে মুক্ত। এজন্যে তাদেরকেই পছন্দ করেন যারা এসব অসৎগুণাবলী মুক্ত। আবার শ্রেষ্ঠত্বে একমাত্র তাঁরই অধিকার রয়েছে তাই তিনি অহঙ্কার পছন্দ করেন না। উলুহিয়াত একমাত্র তাঁরই জন্যে আর সবাই তাঁর বান্দা। এজন্যে এক বান্দার উপর অন্য বান্দার খোদায়ী তিনি পছন্দ করেন না। তিনি একই মালিক এবং অন্যের কাছে যা কিছু আছে সব তাঁর আমানত হিসেবে রক্ষিত হয়েছে। এ জন্যে কোনো বান্দার স্বাধীন ক্ষমতা কারুর অন্যের জন্যে আইন প্রণয়ন এবং কারুর আনুগত্য অপরের জন্যে অবশ্য স্বীকৃত হওয়া এসব আসলে ভুল। সবই একমাত্র তাঁরই আনুগত্য করবে এবং বিনা বাক্য ব্যয়ে তাঁর আনুগত্য করাই সবার জন্যে বেহতের। আবার তিনি উপকারীও। এবং কৃতজ্ঞতা, শুকুরগুজারী ও ভালবাসার

উপরও তাঁর পূর্ণ অধিকার আছে। তিনি নেয়ামত দানকারী এবং তাঁর নেয়ামতসমূহকে তাঁরই ইচ্ছানুসারে ব্যবহার করার অধিকার রাখেন। তিনি ন্যায় বিচারক এবং মানুষ অবশ্যি তাঁর ন্যায় বিচারে সাজা লাভের ভয় এবং পুরস্কার লাভের লোভ করবে। তিনি সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী এবং দিলের গভীরতম প্রদেশে প্রচ্ছন্ন নিয়ত সম্পর্কেও অবগত। এজন্যে বাহ্যিক সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁকে প্রতারিত করা যেতে পারে না। তিনি সর্বত্রই বিরাজমান, কাজেই অপরাধ করে তাঁর হাত থেকে নিস্তার পাবার আশাও কেউ করতে পারে না।

আল্লাহ সম্পর্কিত এ ধারণা সম্পর্কে চিন্তা করুন। এথেকে একেবারে স্বাভাবিক ফল হিসেবে মানুষের জন্যে একটি পুর্ণাংগ নৈতিক জীবনের নকশা অস্তিত্ব লাভ করে এবং নকশা শির্‌কবাদী ধর্ম ও নাস্তিক্যবাদী ব্যবস্থার নৈতিক বিধানের মধ্যে যেসব দুর্বলতা পাওয়া যায় তাথেকে পুরোপুরি মুক্ত। এখানে নৈতিক দায়িত্ব থেকে গা বাঁচিয়ে বেরিয়ে আসার জন্যে কোথাও কোনো চোরা দরজা নেই। সেসব অত্যাচার ও দুষ্ট-দর্শনের কোনো স্থানও এখানে নেই যাদের কারণে মানুষ তার নিজের ইচ্ছানুসারে মানব জগতকে বিভক্ত করে তার এক অংশের জন্যে মূর্তিমান ফেরেশতা এবং অন্য অংশের জন্যে মূর্তিমান শয়তানে পরিণত হয়। নাস্তিক্যবাদী দর্শনের সেসব মৌলিক দূর্বলতাগুলোও এর মধ্যে পাওয়া যায় না যেগুলোর কারণে নৈতিকতায় কোনো প্রকার দৃঢ়তা সৃষ্টি হতে পারে। এ নেতিবাচক সৎগুণাবলীর সংগে ঐ নকশার ইতিবাচক সৎগুণও রয়েছে, এবং তাহলো এই যে, এটি নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের একটি উন্নততর ও ব্যাপকতর সীমারেখা পেশ করে যার ব্যাপকতা ও উচ্চতার কোনো সীমা পরিসীমা নেই এবং ঐ সীমান্তের দিকে অগ্রসর হবার জন্যে এমন সব প্রেরণাদায়ক শক্তি সংগ্রহ করে যা সর্বাধিক পবিত্র।

অতপর এ ধারণা যে, পরীক্ষা কোনো একটি জিনিসের মধ্যে নয় বরং আল্লাহ মানুষকে যতো জিনিস দিয়েছেন সবের মধ্যে কোনো একটি অবস্থায় নয় বরং মানুষ এখানে যতো অবস্থার সম্মুখীন হয় সমস্তর মধ্যে এবং কোনো একটি বিভাগে নয় বরং সমগ্র জীবনে এটি নৈতিকতার পরিসরকে ঠিক ততোটাই সম্প্রসারিত করে যতোটা সম্প্রসারিত হয়ে আছে পরীক্ষার পরিসর। মানুষের বুদ্ধি, তার জ্ঞানের মাধ্যম তার মানসিক ও চিন্তার শক্তি, তার ইন্দ্রিয়, তার ভাবাবেগ, তার আশা আকাংখা, তার দৈহিক শক্তি সবই পরীক্ষায় শরীক আছে। অর্থাৎ পরীক্ষা হলো মানুষের সমগ্র ব্যক্তিত্বের। আবার বাইরের দুনিয়ায় মানুষ যেসব জিনিসের সংস্পর্শে আসে, যেসব জিনিস সে ব্যবহার করে, বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব মানুষের সে মুখোমুখি হয় তাদের সবার সাথে তাঁর ব্যবহারের মধ্যে পরীক্ষা রয়েছে এবং সবচেয়ে বেশি পরীক্ষা হলো এ বিষয়ের মধ্যে যে, মানুষ কি

এসব কিছু আল্লাহর উলুহিয়াত এবং নিজের বান্দা ও প্রতিনিধি হবার অনুভূতির সংগে অথবা আজাদী ও স্বাধীন মনোবৃত্তির স্রোতে গা ভাসিয়ে করছে? অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্যের বান্দা হয়ে করছে? নৈতিকতার এই ব্যাপকতর ধারণার মধ্যে ধর্মের সীমিত ধারনা সৃষ্টি সংকীর্ণতা নেই। এটি মানুষকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী করে। প্রতি ক্ষেত্রের নৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে অবহিত করে। এবং জীবনের প্রতি ক্ষেত্রের সংগে সম্পর্কযুক্ত পরীক্ষায় কামিয়াব হবার জন্যে যেসব নৈতিক বিধানের আনুগত্যের প্রয়োজন হয়, তা সবই তাকে দান করে।

অতপর পরীক্ষার আসল ও চূড়ান্ত ফয়সালা এ জীবনে নয় বরং অন্য জীবনে হবে এবং আসল সাফল্য ও ব্যর্থতা এখানে নয় বরং ওখানে হবে এ ধারণা দুনিয়ার জীবন ও তার যাবতীয় সমস্যার ব্যাপারে মানুষের দৃষ্টির (out look) মৌলিক পরিবর্তন সাধন করে। এ ধারণার কারণেই এ দুনিয়ায় যে ফলাফল বের হয় তা আর আমাদের ভাল-মন্দ, ভুল-নির্ভুল, হক-বাতিল এবং সাফল্য-ব্যর্থতার সন্দেহাতীত, আসল ও শেষ মানদণ্ড থাকে না। এজন্যে নৈতিক আইনের আনুগত্য বা অআনুগত্য এই ফলাফলের উপর নির্ভরও করতে পারে না। যে ব্যক্তি এ ধারণাটি গ্রহণ করে নেবে সে অবশ্যি নৈতিক আইনের আনুগত্যের ক্ষেত্রে দৃঢ়পদ থাকবে তাতে এ দুনিয়ায় দৃশ্যত এর ফলাফল ভালো বা মন্দ অথবা এতে সাফল্য বা ব্যর্থতা যাই হোক না কেন। এর অর্থ এই নয় যে, তার দৃষ্টিতে দুনিয়ার ফলাফল হবে একেবারেই অবিবেচনা যোগ্য। বরং এর অর্থ হলো শুধু এই যে, সে আসল ও চরম বিবেচনা এর নয় আখেরাতের চিরন্তন ফলাফল সম্পর্কে করবে এবং নিজের জন্যে শুধু সে কর্মপদ্ধতিকে নির্ভুল মনে করবে যেটা এ ফলাফলের ভিত্তিতে গৃহীত হবে। কোনো জিনিস পরিত্যাগ অথবা গ্রহণ করার ফয়সালা করার জন্যে সে দেখবে না যে, সেটি জীবনের এ প্রারম্ভিক পর্যায়ে আনন্দ, মজা ও লাভের কারণ কিনা। বরং সে দেখবে জীবনের শেষ পর্যায়ে চূড়ান্ত ও অনিবার্য ফলাফলের দিক দিয়ে সেটা কেমন। এভাবে তার নৈতিক ব্যবস্থা অবশ্যি উন্নয়নমুখী থাকবে কিন্তু তার নৈতিক বিধান পরিবর্তনশীল হবে না। তার চরিত্র ও বিভিন্নতা দোষে দুষ্ট হবে না। অর্থাৎ তাহজীব-তমদ্দুনের উন্নতি ও অগ্রগতির সংগে সংগে তার নৈতিক ধ্যান-ধারণার মধ্যে অবশ্যি ব্যাপকতার সৃষ্টি হবে কিন্তু এ কখনো সম্ভব হবে না যে, ঘটনার পার্শ্ব পরিবর্তন হতে থাকবে এবং গিরিগিটের রং পরিবর্তনের মতো মানুষের নৈতিক ভংগীর মধ্যেও কোনো স্থায়িত্ব থাকবে না।

কাজেই নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আখেরাতের এ ইসলামী ধারণা দু'টো গুরুত্বপূর্ণ সুফল দান করে যা অন্য কোনো উপায় লাভ করা যেতে পারে না। এক : এর কারণে নৈতিক বিধি-বিধান ভীষণ শক্তিশালী হয়। তার দোদুল্যমান হবার

কোনো আশংকাই থাকে না। দুই : এর কারণে মানুষের নৈতিক চরিত্র এমন দৃঢ়তা অর্জন করে যে, ঈমানের শর্তে তার ভিন্নমুখী হবার কোনো আশংকা থাকে না। দুনিয়ায় সত্যতার দশটি বিভিন্ন ফলাফল বের হতে পারে এবং ঐ ফলাফলগুলোর উপর দৃষ্টি স্থাপনকারী কোনো সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তি সুযোগ ও সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে দশটি বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু আখেরাতের সত্যতার ফল অবশ্যি একটি মাত্র হয় এবং এর উপর দৃষ্টি স্থাপনকারী মু'মিন ব্যক্তি দুনিয়ার লাভ-ক্ষতির পরোয়া না করে অবশ্যি একটিমাত্র কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করবে। দুনিয়ার ফলাফলের কথা বিচার করলে দেখা যাবে, ভালো-মন্দ কোনো নির্দিষ্ট জিনিসের নাম নয় বরং একই জিনিস নিজের বিভিন্ন ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে কখনো ভালো আবার কখনো মন্দে পরিণত হচ্ছে এবং এর অনুপস্থিতিতে দুনিয়া-পরস্ত লোকের ভূমিকাও পরিবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু আখেরাতের ফলাফলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখা যাবে, ভালো ও মন্দ উভয়ই চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে। তখন আখেরাতে বিশ্বাস স্থাপনকারী মু'মিনের জন্যে কখনো ভালোকে অশুভ পরিণতি এবং মন্দকে শুভ পরিণতি মনে করে নিজের ভূমিকা পরিবর্তন অসম্ভব হয়ে পড়ে।

আবার মানুষ এ দুনিয়ায় আল্লাহর খলিফা এবং এখানকার যাবতীয় জিনিস ব্যবহার করার ক্ষমতা আসলে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে তাকে দেয়া হয়েছে এ ধারণা মানব জীবনের জন্যে পথ ও উদ্দেশ্য দু'টোই নির্ধারিত করে দেয়। এ ধারণার ফলে মানুষের জন্যে স্বাধীন ক্ষমতা, অন্যের বন্দেগী এবং খোদায়ীর শ্রেষ্ঠত্বের যাবতীয় দৃষ্টিভংগী ভুল প্রমাণিত হয় এবং স্রেফ এ একটিমাত্র দৃষ্টিভংগী তার জন্যে নির্ভুল প্রমাণিত হয় যে, নিজের যাবতীয় ব্যাপারে সে আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত এবং তাঁর অবতীর্ণ নৈতিক আইনের বাধ্য থাকবে। তাছাড়া এ থেকে এও প্রমাণ হয় যে, মানুষ একদিকে তার নৈতিক দৃষ্টিভংগীর ব্যাপারে এমন প্রত্যেকটি কর্মপদ্ধতিকে কঠোরভাবে এড়িয়ে চলবে যাতে স্বাধীন মনোবৃত্তি ও বিদ্রোহ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর বন্দেগী অথবা উলুহিয়াতের শ্রেষ্ঠত্বের সামান্যতম গন্ধও পাওয়া যায়। কেননা এ তিনটি জিনিস তার প্রতিনিধি মর্যাদা বিরোধী। কিন্তু অন্যদিকে আল্লাহর সম্পদকে কাজে লাগানো, আল্লাহর সৃষ্ট শক্তির সংগে তার ব্যবহার এবং আল্লাহর প্রজাদের উপর তার শাসন পরিচালনা হবে সে নৈতিকতা ও ব্যবহার মোতাবিক, যা এ রাজ্যের আসল মালিক নিজের দেশ ও প্রজাদের ক্ষেত্রে গ্রহণ করছে। কেননা প্রতিনিধি মর্যাদার স্বাভাবিক দাবির তাগিদেই শাসকের প্রতিনিধির নীতি শাসকের নীতি থেকে এবং শাসকের প্রতিনিধির নৈতিকবৃত্তি শাসকের নৈতিকবৃত্তির থেকে ভিন্নতর হবে না। এছাড়াও এ ধারনা থেকে এও প্রমাণ হয় যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে যেসব শক্তি দান

করেছেন এবং দুনিয়ায় তাকে যেসব উপায়-উপকরণ দিয়েছেন, সেসব ব্যবহার করার এবং আল্লাহর ইচ্ছানুসারে ব্যবহার করার জন্যেই তিনি মানুষকে নিযুক্ত করেছেন। অন্য কথায় বলা যায় যে, শাসকের প্রতিনিধি শাসকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার মালিকানা ও রক্ষক স্বত্বকে ব্যবহার করেছে সে মহা অপরাধী এবং সে প্রতিনিধিও মহা অপরাধী গণ্য হবে যে, শাসক প্রদত্ত ক্ষমতাবলীর মধ্যে কোনো একটি ক্ষমতাকেও ব্যবহার করেনি বরং তিনি যেসব ক্ষমতা দান করেছেন তার মধ্য থেকে কোনো ক্ষমতাকে অনর্থক নষ্ট করেছে, তার উপায়-উপাদানের সাহায্যে কাজ নেবার ক্ষেত্রে জেনে বুঝে ত্রুটি-বিচ্যুতি করেছে সে কর্তব্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে যা পালন করার হুকুম শাসক তাকে দিয়েছিল। আবার এ ধারণার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ সমগ্র মানবজাতির সমাজ জীবন এমন কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত হয় যে, সমস্ত মানুষ অর্থাৎ আল্লাহর সকল খলিফা আল্লাহ কর্তৃক তাদের উপর অর্পিত যাবতীয় কর্তব্য আদায় করার জন্যে পরস্পরের সহযোগী হয়ে যায় এবং সামাজিক ও তমদ্দুনিক ব্যবস্থায় কোনো এমন জিনিস সক্রিয় থাকে না যার কারণে একজন মানুষ অন্য মানুষের অথবা একদল মানুষ অন্য দলের খেলাফতকে কার্যত খতম করে দেয় অথবা তার প্রবর্তনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তবে অবশ্যি শুধু একটি অবস্থায় এটি হতে পারে যখন একজন বা একদল মানুষ মানুষের খেলাফত থেকে বঞ্চিত হয়ে নিজের আসল শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অপরাধে অপরাধী হয়।

খেলাফতের ধারণার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ মানুষের জন্যে এ নৈতিক পথের উদ্ভব হয়। মানুষের নৈতিক জীবনের উদ্দেশ্য এবং তার যাবতীয় কর্ম ও প্রচেষ্টাও এ ধারণার মাধ্যমে একেবারে অবশ্যম্ভাবীরূপে নির্ধারিত হয়। আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে মানুষের নিযুক্তি স্বতস্ফূর্তভাবে একথাই দাবি করে যে, মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য পৃথিবীতে আল্লাহর ইচ্ছা পূর্ণ করা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। পৃথিবীর ব্যবস্থাপনার যতোটুকুন অংশকে আল্লাহ মানুষের সংগে সম্পর্কযুক্ত করেছেন ততোটুকুন অংশে আল্লাহর আইন জারি করা, আল্লাহর ইচ্ছানুসারে শান্তি, সুবিচার ও সংস্কার ব্যবস্থা কায়েম করা ও কায়েম রাখা ঐ ব্যবস্থার মানুষ ও জিন জাতির শয়তানরা যে বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তাকে দাবিয়ে দেয়া ও নির্মূল করা এবং সেসব সৎগুণকে অত্যধিক সম্প্রসারিত করা যেগুলো আল্লাহর প্রিয় এবং যেগুলোর মাধ্যমে বিশ্বজাহানের মালিক আল্লাহ নিজের পৃথিবী ও প্রজা সাধারণকে সুসজ্জিত দেখতে চান এ উদ্দেশ্যের জন্যেই প্রত্যেকটি মানুষ যার মধ্যে আল্লাহর খলিফা হবার অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে তার যাবতীয় প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করবে। এ উদ্দেশ্যে শুধু যে কেবল ঐসব উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করে, যা বিলাসপ্রিয়, বস্তুবাদী, জাতীয়তাবাদী এবং অন্যান্য

বাজে জিনিসের আনুগত্যকারীরা নিজেদের জীবনের জন্যে নির্ধারিত করেছে, তা নয় বরং এটি ঐসব নিরর্থক উদ্দেশ্যকেও জোরেশোরে অস্বীকার করে যা আধ্যাত্মিকতার একটি ভ্রান্ত ধারণার মাধ্যমে ধর্মবাদীদের নির্ধারিত করে রেখেছে। এ উভয় ভ্রান্ত চরম পন্থার মাঝামাঝি খেলাফতে ইলাহিয়ার ধারণা মানুষের সম্মুখে এমন একটি উন্নততর ও পবিত্রতর জীবনোদ্দশ্য সংস্থাপিত করে যা তার সমগ্র শক্তি ও যোগ্যতাকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে কার্যকরী করে এবং একটি সৎ সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির কাজে তাদেরকে ব্যবহার করে।

মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্যে ইসলাম আমাদেরকে যে বুনিয়াদ দিয়েছে, তাহলো এই। ইসলাম কোনো একটি জাতির সম্পত্তি নয় বরং সমগ্র মানবজাতি উত্তরাধিকার সূত্রে এক যোগে একে লাভ করেছে এবং সমস্ত মানুষের কল্যাণই এর উদ্দেশ্য। এ জন্যে যে ব্যক্তি নিজের ও মানব জাতির কল্যাণকামী তাকে অবশ্যি চিন্তা করা উচিত যে, মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্যে ইসলাম আমাদেরকে যে বুনিয়াদগুলো দিয়েছে সেগুলো ভালো, না আধ্যাত্মিকতাবাদী ধর্ম বা দার্শনিক মতগুলো যা দেয় তাই? কারোর মন সায় দেয় যে, নৈতিকতার জন্যে এ বুনিয়াদগুলো নির্ভুলতর, তাহলে এ বুনিয়াদগুলো গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তার কোনো জাহেলী বিদ্বেষের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা উচিত নয়।

৬

ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি

[পুস্তিকাটি মূলত মাওলানা মওদূদীর একটি ভাষণ। ১৯৪৫ সালের ২১ এপ্রিল পূর্ব পাঞ্জাবস্থ পাঠান কোর্টের 'দারুল ইসলামে' নিখিল ভারত জামায়াতে ইসলামীর যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সে সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে মাওলানা এ ভাষণটি প্রদান করেন।]

আপনারা জানেন, আমাদের ইসলামী আন্দোলনের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে নেতৃত্বের আমূল পরিবর্তন। এই দুনিয়াতে আমরা যে লক্ষ্যে উপনীত হতে চাই, তা এই যে, মানব জীবনের সর্বক্ষেত্র হতে ফাসেক, আল্লাহদ্রোহী ও পাপীষ্ঠ লোকদের নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য নির্মূল করে দিয়ে তদস্থলে আমরা সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করবো। এই উদ্দেশ্যে চেষ্টা-সাধনা ও সংগ্রাম করাকে আমরা ইহকাল ও পরকাল সর্বত্রই আল্লাহর সন্তোষলাভের একমাত্র উপায় বলে বিশ্বাস করি।

কিন্তু আমরা যে জিনিসকে নিজেদের চরম উদ্দেশ্য হিসেবে নির্দিষ্ট করে নিয়েছি, বর্তমান মুসলিম অমুসলিম কেউই এর গুরুত্ব সম্পর্কে পূর্ণরূপে সচেতন ও অবহিত নয়। মুসলমানগণ একে একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য মাত্র বলে মনে করে। দীন ইসলামে এর গুরুত্ব যে কতোখানি, তা তারা মাত্র অনুধাবন করতে সমর্থ হয় না। অমুসলিমগণ কিছুটা হিংসার বশবর্তী এবং অনেকটা অজ্ঞতাবশত মানব সমাজের মূলগত সমস্যা সম্পর্কে একেবারেই অচেতন হয়ে আছে। এই দুনিয়ায় মানব সমাজের সকল দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদ-মুসিবতের মুলীভূত কারণ হচ্ছে মানুষের উপর ফাসেক আল্লাহদ্রোহী পাপী ও অসৎলোকদের নেতৃত্ব। পৃথিবীর সর্বাধিক কাজ-কর্মের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব কেবলমাত্র সৎ ও আল্লাহর অনুগত লোকদের হাতে ন্যস্ত হওয়ার উপরই মানবতার কল্যাণ একান্তভাবে নির্ভর করে। কিন্তু বর্তমানে মানুষ এই কথা মাত্রই হৃদয়ংগম করতে পারছে না। আজ বিশ্বের মানব সমাজে যে মহাবিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে, অত্যাচার-জুলুম ও নির্যাতন-নিষ্পেষণের স্বপ্লাবী সয়লাব বয়ে চলছে, মানব চরিত্রে যে সর্বাত্মক ভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, মানবীয় সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির প্রতি রন্দ্রে রন্দ্রে যে বিষ সংক্রমিত হয়েছে, পৃথিবীর যাবতীয় উপায়-উপাদান এবং মানব বুদ্ধির আবিস্কৃত সমগ্র শক্তি ও যন্ত্র যেভাবে মানুষের কল্যাণ ও উন্নতি বিধানের পরিবর্তে ধ্বংস সাধনের কাজে নিয়োজিত হচ্ছে এসবের জন্য মানব

সমাজের বর্তমান নেতৃত্বই যে একমাত্র দায়ি, তাতে আর কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। দুনিয়াতে সৎ ও সত্য প্রিয় লোকদের কোনো অভাব নেই একথা ঠিক, কিন্তু দুনিয়ার যাবতীয় কাজ-কর্মের কর্তৃত্ব এবং সমাজযন্ত্রের কোনো চাবিকাঠি তাদের হাতে নয়, এই স্বত:সিদ্ধ। বরং বর্তমান দুনিয়ার সর্বত্রই কর্তৃত্ব রয়েছে আল্লাহদ্রোহী, আল্লাহবিমুখ, জড়বাদী ও নৈতিক চরিত্রহীন লোকদের মুষ্ঠিতে। এমতাবস্থায় যদি কেউ দুনিয়ার সংস্কার-সংশোধন করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয় এবং বিপর্যয়, উচ্ছৃংখলা, অশান্তি, অসচ্চরিত্রতা এবং অন্যায়কে পরিবর্তিত করে শান্তি-শৃংখলা এবং সুসংবদ্ধতা-সচ্চরিত্রতা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টানুবর্তী হয়, তবে পুণ্য ও সওয়াবের ওয়াজ আল্লাহর বন্দেগী করার সদুপদেশ, সচ্চরিত্রতা, নির্মল নৈতিকতা গ্রহণের মৌখিক উৎসাহ দেয়াই কখনো উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যথেষ্ট হতে পারে না। বরং মনুষ্য জাতির মধ্যে সত্য প্রিয়তা ও ন্যায়পন্থী যতো লোকই পাওয়া যাবে, তাদের একত্রিত ও সংঘবদ্ধ করে সমষ্টিগত শক্তি অর্জন করা এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব ফাসেক ও আল্লাহদ্রোহী লোকদের হাত হতে কেড়ে সত্যপন্থী ও আদর্শবাদী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করাই সংস্কারবাদী প্রত্যেকটি মানুষের পক্ষে অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে পড়ে।

নেতৃত্বের গুরুত্ব

মানব জীবনের জটিল সমস্যাবলী সম্পর্কে সামান্য মাত্র জ্ঞানও যার আছে, এই নিগূঢ় সত্য সম্পর্কে সে ভালো করেই অবহিত হবে যে, মানব সমাজের যাবতীয় ব্যাপারের কর্তৃত্ব ও চাবিকাঠি কার হাতে নিবদ্ধ এই প্রশ্নের উপরই মানব জীবনের শান্তি, স্বস্তি নিরাপত্তা এবং ভাঙন-বিপর্যয় ও অধপতন একান্তভাবে নির্ভর করে। গাড়ি যেমন সবসময়ই সেই দিকেই দৌড়িয়ে থাকে যেদিকে তার পরিচালক ড্রাইভার চালিয়ে নেয় এবং তার আরোহীগণ ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক সেই দিকেই ভ্রমণ করতে বাধ্য হয় ; অনুরূপভাবে মানব সমাজের গাড়িও ঠিক সেই দিকেই অগ্রসর হয়ে থাকে যেদিকে তার নেতৃবৃন্দ ও কর্তৃত্বশীল লোকেরা নিয়ে যায়। পৃথিবীর সমগ্র উপায় উপাদান যাদের করায়ত্ব হয়ে থাকবে ; শক্তি, ক্ষমতা, ইখতিয়ারের সব চাবিকাঠি যাদের মুঠির মধ্যে থাকবে, সাধারণ জনগণের জীবন যাদের হাতে নিবদ্ধ হবে, চিন্তাধারা, মতবাদ ও আদর্শের রূপায়ণ বাস্তবায়নের জন্যে অপরিহার্য উপায় উপাদান যাদের অর্জিত হবে, ব্যক্তিগত স্বভাব-চরিত্র পুনর্গঠন, সমষ্টিগত নীতি ব্যবস্থার বাস্তবায়ন এবং নৈতিক মূল্য (value) নির্ধারণের ক্ষমতা যাদের রয়েছে, তাদের অধীন জীবনযাপনকারী লোকগণ সমষ্টিগতভাবে তার বিপরীত দিকে কিছুতেই চলতে পারে না। এই নেতৃবৃন্দ ও কর্তৃত্বশীল লোকগণ যদি আল্লাহর অনুগামী, সৎ ও সত্যাশ্রয়ী হয়, তবে সেই সমাজের লোকদের জীবনের সমগ্র গন্থী ও ব্যবস্থাই

আল্লাহভীতি, সার্বিক কল্যাণ ও ব্যাপক সত্যের উপর গড়ে উঠবে। অসৎ ও পাপী লোকও সেখানে সৎ ও পুণ্যবান হতে বাধ্য হবে। কল্যাণ ও সৎ ব্যবস্থা এবং মঙ্গলকর রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, উৎকর্ষ ও বিকাশ লাভ করবে। অন্যায় এবং পাপ নি:শেষে মিটে না গেলেও অন্তত তা উন্নতিশীল এবং বিকশিত হতে পারবে না। কিন্তু নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যদি আল্লাহদ্রোহী, ফাসেক, পাপী ও পাপলিপ্সু লোকদের করায়ত্ত হয়, তবে গোটা জীবনব্যবস্থায়ই স্বতস্ফূর্তভাবে আল্লাহ দ্রোহিতা জুলুম, অন্যায়, অনাচার ও অসচ্চরিত্রতার পথে চলতে শুরু করবে। চিন্তাধারা আদর্শ ও মতবাদ জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-শিল্প ও রাজনীতি, অর্থনীতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতি, সামাজিক রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান, নৈতিক চরিত্র ও পারস্পরিক কাজকর্ম বিচার ও আইন সমষ্টিগতভাবে এ সবকিছুই বিপর্যস্ত হবে। অন্যায় ও পাপ ফুলে-ফলে সুশোভিত হবে। কল্যাণ, ন্যায় ও সত্য পৃথিবীর কোথাও একবিন্দু খুঁজে পাওয়া যাবে না। পৃথিবী ন্যায় ও সত্যকে স্থান দিতে, বায়ু ও পানি তার লালন-পালন করতে অস্বীকার করবে। আল্লাহর এই পৃথিবী অত্যাচার জুলুম, শোষণ ও নিপীড়ন-নিস্পেষণের সয়লাব স্রোতে কানায় কানায় ভরে যাবে। এরূপ পরিবেশে অন্যায়ের পথে চলা সকলের পক্ষেই সহজ হবে ন্যায় ও সত্যের পথে চলাচল নয় শুধু দাঁড়িয়ে থাকাও হবে অত্যন্ত কঠিন। একটি জনাকীর্ণ মিছিলের সমগ্র জনতা যেদিকে চলে সেদিকে চলার জন্য উক্ত মিছিলের অন্তর্ভুক্ত কোনো ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ শক্তি ব্যয় করতে হয় না, ভিড়ের চাপেই সে স্বতই সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, কিন্তু তার বিপরীত দিকে চলার জন্য প্রবল শক্তি ব্যয় করে এক কদম পরিমাণ স্থান অগ্রসর হওয়াও কঠিন হয়ে পড়ে। এরূপ অবস্থায় বিপরীত দিকে সামান্য চললেও ভিড়ের প্রবল ও অপ্রতিরোধ্য চাপে দশ কদম পশ্চাতে সরে পড়তে বাধ্য হয় এটা এক স্বতসিদ্ধ ও সর্বজনবিদিত সত্য। মানুষের সমষ্টিগত জীবনের ধারা যখন অসৎ ও পাপাশ্রয়ী লোকদের নেতৃত্ব কুফরী ও ফাসেকী পথে অগ্রসর হতে থাকে, তখন (উপরোক্ত উদাহরণের ন্যায়) স্বতন্ত্রভাবে ব্যক্তিদের পক্ষে অন্যায়ের পথে চলা তো খুবই সহজ এতোই সহজ হয় যে, সেদিকে চলার জন্য নিজের কোনো শক্তি ব্যয় করতেই হয় না কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে চলতে চাইলে নিজের দেহ-মনের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করেও তার পক্ষে ন্যায় পথে দৃঢ় হয়ে থাকতে পারলেও সমষ্টিগতভাবে তার জীবন মানব সমষ্টির অনিবার্য চাপে পাপ ও অন্যায়ের পথেই চলতে বাধ্য হয়।

এখানে আমি যা বলছি তা এমন কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নয়, যার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য কোনো যুক্তিতর্কের আবশ্যক হতে পারে। বাস্তব ঘটনা প্রবাহই একে অনস্বীকার্য সত্যে পরিণত করেছে। কোনো সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিই এর সত্যতা

স্বীকার না করে পারে না। এই বইয়ের প্রত্যেক পাঠকই আমার উক্ত কথার সত্যতা যাচাই করতে পারেন। বিগত এক শতাব্দীকালের মধ্যে আমাদের এই দেশের লোকদের মতবাদ, চিন্তাধারা, দৃষ্টিভংগী, রুচি ও স্বভাব-প্রকৃতি, চিন্তা-পদ্ধতি ও দৃষ্টিকোণ গভীরভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে, সভ্যতা ও চরিত্রের মানদণ্ড এবং মূল্য ও গুরুত্বের মাপকাঠি বদলে গেছে। আমাদের একটি জিনিসও অপরিবর্তিত থাকতে পারেনি। এই বিরাট পরিবর্তন আমাদের এই দেশে আমাদেরই দৃষ্টির সম্মুখে সাধিত হলো। মূলত এর কি কারণ হতে পারে, তা কি একবারও ভেবে দেখেছেন? আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, এর একটি মাত্র কারণ রয়েছে আর আপনিও যতোই চিন্তা করেন, এছাড়া অন্য কোনো কারণ নির্ধারণ করা আপনার পক্ষেও সম্ভব হবে না। সে কারণ শুধু এটাই যে, যেসব লোকের হাতে এদেশের সর্বময় কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব নিবদ্ধ ছিলো সমাজ পরিচালন ও দেশ শাসনের ক্ষমতা ইখতিয়ার যাদের করায়ত্ত ছিলো, তারাই সমগ্র দেশের নৈতিক চরিত্র, মনোবৃত্তি, মনস্তত্ব, কাজকর্ম ও পারস্পরিক লেন-দেন ও আদান-প্রদান এবং সমাজ-সংস্থা ও ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের ইচ্ছা ও রুচি অনুসারেই ঢেলে গঠন করেছিলো। এই পরিবর্তনের বিরোধিতা করার জন্য যেসব শক্তি মস্তক উত্তোলন করেছিল, তারা কতোখানি সাফল্য লাভ করতে পেরেছে, আর ব্যর্থতা তাদেরকে কতোখানি অভিনন্দিত করেছে, তাও একবার গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন। একথা কি সত্য নয় যে, পরিবর্তন বিরোধী আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে যারা নেতৃত্ব দান করেছেন, তাঁদেরই সন্তান অধস্তন পুরুষ শেষ পর্যন্ত পরিবর্তন স্রোতের গড্ডালিকা প্রবাহে তৃণখণ্ডের ন্যায় ভেসে গেছে? বহির্বিশ্বের যাবতীয় বিবর্তিত রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান ও ধরণ-পদ্ধতি সবকিছুই তাদের ঘরবাড়ি নিমজ্জিত করে দিয়েছে? এটা কি কেউ অস্বীকার করতে পারে যে, অসংখ্য সম্মানিত ধর্ম নেতার বংশে আজ এমনসব লোকের জন্ম হচ্ছে, যারা আল্লাহর অস্তিত্ব এবং অহী ও নবুয়াতের প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভবনা সম্পর্কে প্রবল সন্দেহ পোষণ করছে? জাতীয় জীবনের এই বিরাট বিপর্যয় এই বাস্তব পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার পরও কি একথা অস্বীকার করা যায় যে, মানব জীবনের অসংখ্য সমস্যার মধ্যে নেতৃত্বের সমস্যাই হচ্ছে সবচেয়ে জটিল এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর সত্য কথা এই যে, এই জিনিসটির এহেন গুরুত্ব কেবল বর্তমানেই তীব্র হয়ে দেখা দেয়নি, এটা এক চিরন্তন সত্য ও চিরকালীন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। الناس على دين ملوكهم "জনগণ নেতৃবৃন্দেরই আদর্শানুসারী হয়ে থাকে" কথাটি বহু পুরাতন। হাদিস শরীফে জাতীয় উত্থান-পতন, গঠন ও ভাঙনের জন্য দায়ী করা হয়েছে জাতিসমূহের আলেম, পণ্ডিত, শিক্ষিত লোক এবং নেতৃবৃন্দকে। কারণ, সমাজের নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও পথপ্রদর্শনের গুরুদায়িত্ব চিরদিনই এদের উপর অর্পিত হয়ে থাকে।

সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা দীন ইসলামের মূল লক্ষ্য

সৎ ও আদর্শ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা দীন ইসলামে যে কতোবেশী গুরুত্বপূর্ণ, তা উপরোক্ত বিশ্লেষণ হতে খুব সহজেই অনুধাবন করতে পারা যায়। আল্লাহ প্রদত্ত দীন ইসলামের সর্বপ্রথম নির্দেশ এই যে, দুনিয়ার সকল মানুষ নিরংকুশভাবে একমাত্র আল্লাহর দাস হয়ে জীবনযাপন করবে এবং তাদের গলায় আল্লাহর দাসত্ব ছাড়া অন্য কারো দাসত্বের শৃঙ্খল থাকবে না। সেই সঙ্গেই এর আর একটি দাবি এই যে, আল্লাহর দেয়া আইনকেই মানুষের জীবনের একমাত্র আইন হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এর তৃতীয় দাবি এই যে, পৃথিবীর বুক হতে সকল অশান্তি ও বিপর্যয় নির্মূল করতে হবে, পাপ ও অন্যায়ের মূলোৎপাটন করতে হবে। যেহেতু দুনিয়ার উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হওয়ার এটাই একমাত্র কারণ।

অতএব এসব দূরীভুত করে তদস্থলে ন্যায়, সত্য, কল্যাণ ও মংগলকর ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও উৎকর্ষ সাধন করতে হবে, কারণ আল্লাহ তায়ালা এটাই পছন্দ করেন এবং ভালবাসেন। কিন্তু সকলেই বুঝতে পারেন যে, মনুষ্য জাতির নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব এবং যাবতীয় সামাজিক কার্যাবলীর মূল চাবিকাঠি যতোদিন কাফের ও ভ্রষ্ট নেতৃবৃন্দের মুষ্টিবদ্ধ হয়ে থাকবে ; আর একমাত্র সত্য ব্যবস্থা ইসলামের অনুসারী যতোদিন তাদের অধীন, তাদেরই প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগে লিপ্ত হয়ে ঘরের কোণে বসে আল্লাহর 'জিক্‌র' করার কাজে নিমগ্ন হয়ে থাকবে ততোদিন উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্য কখনই সফল হতে পারে না। এই লক্ষ্য স্বতই নেতৃত্বের আমূল পরিবর্তন দাবি করে এবং সকল ন্যায়নিষ্ঠ, ন্যায়পন্থী, আল্লাহর সন্তোষকামী লোকদেরকে পরস্পর মিলিত হয়ে সামগ্রিক শক্তি অর্জন করতে এবং সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করে আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র সত্য বিধান ইসলামকে কায়েম করতে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেয়। এই সত্য বিধান কায়েম করতে হলে নেতৃত্বের পদ ও কর্তৃত্বের সকল চাবিকাঠি সমাজের সর্বাপেক্ষা অধিক ঈমানদার, সৎ ও আদর্শবাদী লোকের হাতে অর্পণ করতে হবে। এরূপ রাষ্ট্র বিপ্লব সাধন ছাড়া দীন ইসলামের মূল লক্ষ্য এবং দাবি কখনই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। এ জন্যই সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা দীন ইসলামের সত্য বিধান বাস্তবায়নে আল্লাহ প্রদত্ত ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়েছে। এমনকি এই বিরাট কর্তব্য বিস্মৃত হওয়ার পর এমন কোনো কাজই থাকতে পারে না, যা করে আল্লাহর কিছুমাত্র সন্তোষলাভ করা সম্ভব হতে পারে। কুরআন মজীদে জামায়াতবদ্ধ হওয়া ও নেতার আদেশ শ্রবণ ও পালনের উপর এতোবেশি গুরুত্ব কেন আরোপ করা হয়েছে, তা বাস্তবিকই প্রণিধানযোগ্য। উপরন্তু কুরআনের বিধান মতো জামায়াত হতে স্বেচ্ছায় বহিস্কৃত ব্যক্তি হত্যার যোগ্য তাওহীদের কালেমায়ে তার বিশ্বাস থাকলেও এবং নামায-রোযা পালনকারী হলেও এই দণ্ড হতে সে কোনোক্রমেই

রক্ষা পেতে পারে না। এরই বা কারণ কি? এর মূলীভূত ও একমাত্র কারণ কি এই নয় যে, সৎ নেতৃত্ব ও সত্যের পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও স্থিতি সাধন দীন ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য বলেই এরূপ নির্দেশ দেয়া হয়েছে? আর এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য সমষ্টিগত ও সংঘবদ্ধ শক্তি অর্জন করা একান্তই অপরিহার্য। কাজেই যে ব্যক্তিই সামগ্রিক শক্তি ও সামাজিক শৃংখলা চূর্ণ করবে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে তার অপরাধ এতোবড় ও এতো মারাত্মক যে হাজার তাওহীদ স্বীকার এবং হাজার নামায-রোযা দ্বারা এর ক্ষতিপূরণ কিছুতেই হতে পারে না।

পরন্তু, ইসলামে জিহাদের উপর এতো অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে কেন, তাও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। জিহাদ হতে বিরত থাকলে কুরআন মজিদ তাকে 'মুনাফিক' বলে কেন অভিহিত করে? কারণ এই যে, জিহাদ ইসলামের সত্য বিধান প্রতিষ্ঠারই নামান্তর মাত্র, কুরআন শরীফে মুসলমানের ঈমান পরীক্ষার জন্য এই জিহাদকেই চূড়ান্ত মাপকাঠি বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অন্য কথায় কুরআনের বিধান অনুযায়ী ঈমানদার ব্যক্তি বাতিল ও কাফেরী শাসন ব্যবস্থার প্রাধান্যে কখনই সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। আর দীন ইসলামের সত্য ও আদর্শ জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা-সাধনা না করা এবং জান-মালের কুরবানী না দেয়া তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। আর এই কাজে এই ব্যাপারে কারো কুণ্ঠা ও ইতস্ততভাব প্রকাশিত হলে তার ঈমান সংশয়ের মধ্যে পড়ে যায়। ফলে অন্য হাজার 'সওয়াবের' কাজও তাকে কোনো কল্যাণদান করতে সমর্থ হয় না।

এই বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করার স্থান এটা নয়, এখানে তার অবকাশও নেই ; কিন্তু উপরে যা কিছু বলেছি তা হতে খুব সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা একটি কেন্দ্রীয় ও মৌলিক উদ্দেশ্য বিশেষ এবং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই এই ইসলামের প্রতি যার ঈমান আছে একমাত্র নিজের ব্যক্তিগত জীবনকেই যথাসম্ভব ইসলামী আদর্শের অনুসারী করলে তার সকল কর্তব্য সম্পন্ন হয় না তার সকল দায়িত্ব পালন হয় না। মানব সমাজের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকার কাফের ও ফাসেকদের নিকট হতে কেড়ে নিয়ে সর্বাপেক্ষা সৎ, সত্যাশ্রয়ী ও আদর্শবাদী লোকদের হাতে উহা তুলে দেয়ার জন্য সকল শক্তি নিযুক্ত করাও তার মূল ঈমানের ঐকান্তিক ও অনস্বীকার্য দাবি। কারণ, আল্লাহর মর্জি অনুযায়ী পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা ও সমাজ পরিচালনা এরূপ এক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ভিন্ন আদৌ সম্ভব নয়।

পরন্তু, এই উদ্দেশ্য যেহেতু উচ্চতর সামগ্রিক প্রচেষ্টা ছাড়া হাসিল হতে পারে না, এজন্যই এমন একটি সৎ ও আদর্শ জামায়াত গঠন করাও অপরিহার্য যা সবসময়েই ইসলামের সত্য নীতি অনুসরণ করে চলবে এবং ইসলামকে পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করা, স্থায়ী রাখা এবং তাকে ঠিকভাবে পরিচালিত করে

যাওয়া ভিন্ন তার আর কোনই উদ্দেশ্য হবে না। সারা পৃথিবীতে একটি মাত্র লোক যদি ঈমানদার হয়, তবুও সে একাকী বলে এবং নিজেকে নি:সম্বল মনে করে বাতিল শাসনব্যবস্থার প্রভাব সন্তুষ্টচিত্তে স্বীকার করা কিংবা هون البليتين 'দু'টি বিপদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সহজতম বিপদকে গ্রহণ করার, অবাঞ্ছিত কূট-কৌশলের আশ্রয় নিয়ে কুফরী ও ফাসেকী ব্যবস্থার অধীন নামেমাত্র ধর্মীয় জীবনযাপন করার সুবিধা ভোগ করা তার পক্ষে আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। বরং সেই একাকী ও নি:সংগ ঈমানদার ব্যক্তিরও কর্তব্য হচ্ছে বিশ্বমানবকে আল্লাহর মনোনীত জীবন বিধান গ্রহণ করার আহবান জানান। তার এই আহবানের প্রতি কেউ ভ্রুক্ষেপ মাত্র না করলেও সমগ্র জীবন ভর ইসলামের সত্য ও দৃঢ় পথে দাঁড়িয়ে থাকা এবং লোকদেরকে আহবান জানান ও আহবান জানাতে জানাতেই মৃত্যু মুখে ঢলে পড়া তার কর্তব্য। নিজ মুখে সত্যভ্রষ্ট দুনিয়ার পছন্দই কোনো আমন্ত্রণ প্রচার করা এবং কাফেরদের নেতৃত্বের অধীন দুনিয়া যে পথে ছুটে চলেছে, সেই দিকে অগ্রসর হওয়া অপেক্ষা সত্য পথে সত্যের বাণী প্রচার করতে করতে মৃত্যুবরণ করাও তার পক্ষে শ্রেয়। আর তার আমন্ত্রণে কিছু সংখ্যক লোক যদি একত্রিত হয়, তাদের নিয়ে একটি বিশেষ সংঘ গঠন করা এবং উল্লেখিত আদর্শের জন্য সমষ্টিগতভাবে চেষ্টা-সাধনা ও আন্দোলন করাই তার একান্ত কর্তব্য।

দীন ইসলাম সম্পর্কে আমার যতোটুকু জ্ঞান আছে এবং কুরআন ও হাদিস নিগূঢ়ভাবে অধ্যয়নের ফলে যতোটুকু বুদ্ধি ও স্বচ্ছ দৃষ্টি আমি লাভ করতে পেরেছি, তার ভিত্তিতে আমি এটাকেই দীন ইসলামের মৌলিক দাবি বলে জানতে পেরেছি। আল্লাহর কিতাব কুরআন মজীদ এটাই আমাদের নিকট দাবি করে বলে বুঝতে পেরেছি, আর আল্লাহর প্রেরিত সকল নবীর এটাই যে সুন্নাত ছিলো তা আমি নি:সন্দেহে জানতে পেরেছি। আমি আমার এ মত ত্যাগ করতে মাত্রই রাজি নই যতোক্ষণ পর্যন্ত না কেউ কুরআন ও সুন্নাহর দলিল হতেই আমার ভুল প্রমাণ করে দিবে।

নেতৃত্বের ব্যাপারে আল্লাহর নিয়ম

আমাদের এই চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ও চরম লক্ষ্য বুঝে নেয়ার পর এই ব্যাপারে বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার নিজস্ব নিয়ম-নীতি কি তাও জেনে নেয়া আবশ্যক। কারণ, আমাদের কোনো উদ্দেশ্য লাভ করতে হলে তা আল্লাহর নিয়ম অনুসারেই লাভ করা সম্ভব, তার বিপরীত নয়। আমরা যে বিশ্ব প্রকৃতির বুকে বসবাস করি, আল্লাহ তার একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ীই এটা সৃষ্টি করেছেন। এখানকার প্রত্যেকটি দ্রব্য ও বস্তুই সেই স্থায়ী ও অটল নিয়ম বিধানের অনুসারী। কেবল সদিচ্ছা ও নেক বাসনার দরুনই এখানে চেষ্টা সাফল্য লাভ করতে পারে না। মহান পবিত্র আত্মাদের (?) বরকতেই এখানে কোনো বাসনা বাস্তবে রূপায়িত

হতে পারে না। এই প্রাকৃতিক দুনিয়ায় মানুষের চেষ্টা-সাধনা ফলপ্রসু হওয়ার জন্য আল্লাহ্ নির্ধারিত নিয়ম অনুসরণ করে চলা অপরিহার্য। একজন কৃষক সে যতোবড় বুজুর্গ হোক, মহৎ গুণের আধার এবং তসবীহ পাঠে যতোই আত্মহারা হোক না কেন যতোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে পরিপূর্ণ শ্রম সহকারে কৃষিকাজ স্বম্পন্ন না করবে ততোক্ষণ পর্যন্ত তার একটি বীজও অংকুরিত হতে পারে না। অনুরূপভাবে নেতৃত্ব বিপ্লবের সেই চরম উদ্দেশ্যও কখনো কেবল দোয়া, তাবীজ, সদিচ্ছা ও নেক বাসনার সাহায্যে লাভ করা যাবে না। রাষ্ট্রে বিপ্লবের জন্য আল্লাহর নিয়ম অনুধাবন করা একান্ত আবশ্যক। কারণ, দুনিয়ার নেতৃত্ব কায়েম হওয়ার এটাই হচ্ছে স্বাভাবিক নিয়ম। এরই অধীন একজন লোক নেতৃত্ব লাভ করে এবং এ নিয়ম অনুযায়ীই এক-একজন লোক নেতৃত্ব হারায় বা নেতৃত্ব হতে বঞ্চিত হয়। এই সম্পর্কে আমার অন্যান্য রচনাবলীতেও আমি আলোচনা করেছি বটে; কিন্তু তা ছিলো সংক্ষিপ্ত আলোচনা। আজ এখানে যথাসম্ভব বিস্তারিতভাবে এই বিষয়টির বিশ্লেষণ করা দরকার বলে মনে করি। কারণ, এই বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান ও পরিষ্কার ধারণা না হলে আমাদের কর্মপন্থা এবং চলার পথ আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হবে না।

মানুষের গোটা সত্তার বিশ্লেষণ করে দেখলে নি:সন্দেহে জানতে পারা যায় যে, এর মধ্যে দু'টি দিক পরস্পর বিরোধী হয়েও পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

মানুষের একটি দিক এই যে, তার একটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ও পাশবিক সত্তা রয়েছে। তার এই সত্তার উপর ঠিক সেইসব নিয়ম ও আইন জারি হয়ে আছে, যা সমগ্র বস্তুগত ও জন্তু-জানোয়ারের উপর বর্তমান। দুনিয়ার অন্যান্য সমগ্র জড় পদার্থ ও জান্তব সত্তার কার্যকারিতা ও কর্মক্ষমতা যেসব যন্ত্রপাতি ও বৈষয়িক উপায়-উপাদান এবং জড় অবস্থার উপর একান্ত নির্ভরশীল, মানুষের এই দিকটির কার্যকারিতা ও কর্মক্ষমতা ও অনুরূপভাবে সেই সবেরই উপর নির্ভরশীল। মানুষের এই স্বাভাবিক (physical) সত্তা তার যাবতীয় কর্মক্ষমতাকে একমাত্র প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন যন্ত্রপাতি ও উপায়-উপাদানের সাহায্যে এবং স্বাভাবিক জড় অবস্থায় থেকেই ব্যবহার করতে পারে। এজন্যই তার সকল কাজের উপরই বাস্তব ও কার্যকারণ পরম্পরা জগতের সমগ্র শক্তিই বিপরীত কিংবা অনুকূল প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

মানুষের মধ্যে আর একটি দিক রয়েছে খুবই উজ্জ্বল এবং গুরুত্বপূর্ণ। তা হচ্ছে তার মানবিক দিক তার মানুষ হওয়ার দিক অন্য কথায় বলা যায়, মানুষের একটি নৈতিক দিক রয়েছে, যা কোনদিক দিয়েই প্রাকৃতিক সত্তার অধীন ও অনুসারী নয়। এই নৈতিক দিক নৈতিক সত্তাই মানুষের স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক দিকের উপর এক হিসেবে প্রভুত্ব বিস্তার করে। স্বাভাবিক ও জান্তব সত্তাকেও

এটা অস্ত্র ও উপায় হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। সেই সঙ্গে বহির্বিশ্বের কার্যকারণসমূহকেও নিজের অধীন করতে এবং নিজের উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চেষ্টা করে। আল্লাহ তায়ালা মানুষের মধ্যে যেসব নৈতিক ও চারিত্রিক গুণপণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তাই হচ্ছে এর কর্মচারী বা কার্যসম্পন্নকারী শক্তি। তার উপর প্রাকৃতিক নিয়মের কোনো প্রভুত্বই চলে না, চলে নৈতিক নিয়ম বিধানের প্রভুত্ব।

মানুষের উত্থান-পতন নৈতিক চরিত্রের উপর নির্ভরশীল

উল্লেখিত দু'টি দিক মানুষের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত রয়েছে। সমষ্টিগতভাবে তার সাফল্য ও ব্যর্থতা এবং তার উত্থান ও পতন বৈষয়িক বা বস্তুনিষ্ঠ ও নৈতিক এই উভয়বিধ শক্তির উপর একান্তভাবে নির্ভর করে। মানুষ না বস্তুনিষ্ঠ শক্তি নিরপেক্ষ হতে পারে, আর না নৈতিক শক্তির মুখাপেক্ষীহীন হয়ে কিছু সময় বাঁচতে পারে। তার উন্নতি লাভ হলে উভয় শক্তির ভিত্তিতেই হবে, আর পতন হলেও ঠিক তখনি হবে, যখন এই উভয়বিধ শক্তি হতেই সে বঞ্চিত হয়ে যাবে। অথবা এটা অন্যান্যের তুলনায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে পড়বে। কিন্তু একটু গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে চিন্তা করলে নি:সন্দেহে বুঝতে পারা যাবে যে, মানব জীবনের মূল সিদ্ধান্তকারী গুরুত্ব রয়েছে নৈতিক শক্তির বৈষয়িক বা বস্তুনিষ্ঠ শক্তির নয়। বৈষয়িক বস্তুনিষ্ঠ উপায়-উপাদান লাভ, স্বাভাবিক পন্থাসমূহের ব্যবহার এবং বাহ্যিক কার্যকারণ পরম্পরাসমূহের আনুকূল্য সাফল্যলাভের জন্য অপরিহার্য শর্ত এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কাজেই মানুষ যতোদিন এই কার্যকারণ পরম্পরা জগতে বসবাস করবে, এই শর্ত কোনোরূপেই উপেক্ষিত হতে পারে না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যে মূল জিনিসটি মানুষের পতন ঘটায়, উত্থান দান করে এবং তার ভাগ্য নির্ধারণের ব্যাপারে যে জিনিসটির সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব রয়েছে, তা একমাত্র নৈতিক শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়। এটা সুস্পষ্ট যে, মানুষকে এর দেহসত্তা বা এর পাশবিক দিকটার জন্য কখনও মানুষ বলে অভিহিত করা হয় না, বরং মানুষকে মানুষ বলা হয় এর নৈতিক গুণ-গরিমার কারণে। মানুষের একটি দেহ আছে, স্বতন্ত্র একটি সত্তা আছে, তা কতোখানি স্থান দখল করে থাকে, সে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে, কিংবা বংশ বৃদ্ধি করে ; কিন্তু শুধু এই কারণে মানুষ দুনিয়ার অন্যান্য বস্তু ও জন্তু হতে স্বতন্ত্র মর্যাদালাভের অধিকারী হতে পারে না। মানুষ নৈতিক গুণসম্পন্ন জীব, তার নৈতিক স্বাধীনতা ও নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। ঠিক এই জন্যই মানুষকে দুনিয়ার সমগ্র জীব-জন্তু ও বস্তুর উপর বিশিষ্ট মর্যাদা দান করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, মানুষকে 'দুনিয়ার বুকে আল্লাহর খলিফা' হওয়ার মহান মর্যাদায়ও অভিষিক্ত করা হয়েছে। অতএব মানবতার মূল প্রাণবস্তু সর্বাপেক্ষা প্রধান

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যখন মানুষের নৈতিকতা, তখন মানুষের জীবনে গঠন-ভাঙ্গন ও উন্নতি-অবনতির ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী গুরুত্বও যে সেই নৈতিক চরিত্রেই রয়েছে তা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। বস্তুত মানুষের উত্থান-পতনের উপর তার নৈতিক নিয়ম-বিধানের প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যমান।

এই নিগূঢ় তত্ত্ব অনুধাবন করার পর আমরা যখন নৈতিক চরিত্রের গভীরতর বিশ্লেষণ করি, তখন নীতিগতভাবে এর দু'টি প্রধান দিক আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয় একটি হচ্ছে মৌলিক মানবীয় চরিত্র, অপরটি হচ্ছে ইসলামী নৈতিক চরিত্র।

মৌলিক মানবীয় চরিত্রের বিশ্লেষণ

মৌলিক মানবীয় চরিত্র বলতে বুঝায় সেসব গুণবৈশিষ্ট্য যার উপর মানুষের নৈতিক সত্তার ভিত্তি স্থাপিত হয়। দুনিয়ার মানুষের সাফল্যলাভের জন্য অপরিহার্য যাবতীয় গুণ-গরিমাই এর অন্তর্ভুক্ত। মানুষ কোনো সৎ উদ্দেশ্যের জন্য কাজ করুক, কি ভুল ও অসৎ উদ্দেশ্যে সকল অবস্থায় তা একান্তই অপরিহার্য। মানুষ আল্লাহ, অহী, রসূল এবং পরকাল বিশ্বাস করে কি করে না, তার হৃদয় কলুষমুক্ত কিনা, নিয়ত ও লক্ষ্য কল্যাণময় কিনা, সে নিজে সৎ গুণ ও সৎকাজে ভূষিত কিনা, সদুদ্দেশ্যে কাজ করে, অসদুদ্দেশ্যে উল্লেখিত চরিত্রের ক্ষেত্রে সে প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর। কারো মধ্যে ঈমান থাকুক কি না থাকুক, তাদের জীবন পবিত্র হোক কি অপবিত্র, তার চেষ্টা-সাধনার উদ্দেশ্য সৎ হোক কি অসৎ এসব প্রশ্নের উর্ধে থেকে পার্থিব জগতে সাফল্যলাভের জন্য অপরিহার্য গুণগুলো কেউ আয়ত্ত করলেই সে নিশ্চিন্তরূপে সাফল্যমণ্ডিত হবে এবং ঐসব গুণের দিক দিয়ে যারা পশ্চাদপদ, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তারা প্রথম ব্যক্তির পশ্চাতে পড়ে থাকবে।

ঈমানদার, কাফের, নেককার, বদকার, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, বিপর্যয়কারী প্রভৃতি যে যাই হোক না কেন, তার মধ্যে যদি ইচ্ছাশক্তি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ শক্তি, প্রবল বাসনা, উচ্চাশা ও নির্ভীক সাহস, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তা তিতিক্ষা ও কৃচ্ছ্রসাধনা, বীরত্ব ও বীর্যবত্তা, সহনশীলতা ও পরিশ্রম প্রিয়তা, উদ্দেশ্যের আকর্ষণ এবং সে জন্য সবকিছুরই উৎসর্গ করার প্রবণতা, সতর্কতা, দূরদৃষ্টি ও অন্তরদৃষ্টি বোধশক্তি ও বিচার ক্ষমতা, পরিস্থিতি যাচাই করা এবং তদনুযায়ী নিজেকে ঢেলে গঠন করা ও অনুকূল কর্মনীতি গ্রহণ করার যোগ্যতা নিজের হৃদয়াবেগ, ইচ্ছা বাসনা, স্বপ্ন সাধ ও উত্তেজনার সংযমশক্তি এবং অন্যান্য মানুষকে আকৃষ্ট করা, তাদের হৃদয়মনে প্রভাব বিস্তার করা ও তাদেরকে কাজে নিযুক্ত করার দুর্বার বিচক্ষণতা যদি কারো মধ্যে পুরোপুরিভাবে বর্তমান থাকে, তবে এই দুনিয়ায় তার জয় সুনিশ্চিত।

সেই সঙ্গে এমন গুণও কিছু না কিছু থাকা অপরিহার্য, যা মনুষ্যত্বের মূল যাকে সৌজন্য ও ভদ্রতামূলক স্বভাব-প্রকৃতি বলা যায় এরই দৌলতে এক-একজন লোকের সম্মান-মর্যাদা, মানব সমাজে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। আত্মসম্মান জ্ঞান, বদান্যতা, দয়া-অনুগ্রহ, সহানুভূতি, সুবিচার, নিরপেক্ষতা, ঔদার্য ও হৃদয়মনের প্রসারতা, বিশালতা, দৃষ্টির উদারতা, সত্যবাদিতা ও সত্যপ্রিয়তা, বিশ্বাসপরায়ণতা, ন্যায়-নিষ্ঠা, ওয়াদাপূর্ণ করা, বুদ্ধিমত্তা, সভ্যতা, ভব্যতা, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা এবং মন ও আত্মার সংযম শক্তি প্রভৃতি এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

কোনো জাতির বা মানব গোষ্ঠীর অধিকাংশ লোকের মধ্যে যদি উল্লেখিত গুণাবলীর সমাবেশ হয়, তবে মানবতার প্রকৃত মূলধনই তার অর্জিত হয়েছে বলে মনে করতে হবে এবং এর ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী সমাজ সংস্থা গঠন করা তার পক্ষে অতীব সহজসাধ্য হবে। কিন্তু এই মূলধন সমাবিষ্ট হয়ে কার্যত একটি সুদৃঢ় ও ক্ষমতাসম্পন্ন সামাজিক রূপলাভ করতে পারে না যতোক্ষণ পর্যন্ত না তার সাথে আরো কিছু নৈতিক গুণ এসে মিলিত হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সমাজের সমগ্র কিংবা অধিকাংশ মানুষই একটি সামগ্রিক লক্ষ্যকে নিজেদের চরম লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করবে। সেই লক্ষ্যকে তার ব্যক্তিগত স্বার্থ এমনকি, নিজের ধন-প্রাণ ও সম্পদ-সন্তান হতেও অধিক ভালবাসবে, তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেম ভালবাসা ও সহানুভূতির মনোভাব প্রবল হবে, তাদের মধ্যে পরস্পর মিলেমিশে কাজ করার মনোভাব থাকবে। সুসংগঠিত ও সংঘবদ্ধভাবে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে চেষ্টা-সাধনার জন্য যতোখানি আত্মদান অপরিহার্য, তা করতে তারা প্রতিনিয়ত প্রস্তুত থাকবে। ভাল ও মন্দ নেতার মধ্যে পার্থক্য করার মতো বুদ্ধি-বিবেচনা তাদের থাকতে হবে যেন যোগ্যতম ব্যক্তি তাদের নেতা নিযুক্ত হতে পারে। তাদের নেতৃবৃন্দের মধ্যে অপরিসীম দূরদৃষ্টি ও গভীর ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং এছাড়া নেতৃত্বের জন্য অপরিহার্য অন্যান্য গুণাবলীও বর্তমান থাকা দরকার। সমাজের সকল লোককে নিজেদের নেতৃবৃন্দের আদেশ পালন ও অনুগমনে অভ্যস্থ হতে হবে। তাদের উপর জনগণের বিপুল আস্থা থাকতে হবে এবং নেতৃবৃন্দের নির্দেশে নিজেদের সমগ্র হৃদয়, মন, দেহের শক্তি এবং যাবতীয় বৈষয়িক উপায়-উপাদান লক্ষ্যস্থলে উপনীত হওয়ার জন্য যে কোনো কাজে জনমত প্রয়োগ করতে প্রস্তুত থাকবে শুধু তাই নয়, গোটা জাতির সামগ্রিক জনমত এতো সজাগ-সচেতন ও তীব্র হতে হবে যে সামগ্রিক কল্যাণের বিপরীত ক্ষতিকারক কোনো জিনিসকেই নিজেদের মধ্যে এক মুহূর্তের তরেও টিকতে দেবে না।

বস্তুত এগুলোই হচ্ছে মৌলিক মানবীয় চরিত্র। এগুলোকে আমি "মৌলিক মানবীয় চরিত্র" বলে এজন্য অভিহিত করেছি যে, মূলত এ নৈতিক গুণগুলোই

হচ্ছে মানুষের নৈতিক শক্তি ও প্রতিভার মূল উৎস। মানুষের মধ্যে এই গুণাবলীর তীব্র প্রভাব বিদ্যমান না থাকলে কোনো উদ্দেশ্যের জন্যই কোনো সার্থক সাধনা করা তার পক্ষে আদৌ সম্ভব হয় না। এই গুণগুলোকে ইস্পাতের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। ইস্পাতের মধ্যে দৃঢ়তা, অক্ষয়তা ও তীব্রতা রয়েছে, এরই সাহায্যে একটি হাতিয়ার অধিকতর শাণিত ও কার্যকরী হতে পারে। অতপর তা ন্যায় কাজে ব্যবহৃত হবে কি অন্যায় কাজে সে প্রশ্ন অপ্রাসংগিক। যার সৎ উদ্দেশ্য রয়েছে এবং সে জন্য কাজ করতে চাহে, ইস্পাত নির্মিত অস্ত্রই তার জন্য বিশেষ উপকারী হতে পারে, পচা কাঠ নির্মিত অস্ত্র নয়। কারণ, আঘাত সহ্য করার মতো কোনো ক্ষমতাই তাতে নেই। ঠিক এই কথাটি নবী করীম (সা) হাদিস শরীফে এরশাদ করেছেন :

خِيَارُكُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِى الْاِسْلَامِ

"তোমাদের মধ্যে ইসলাম পূর্ব জাহেলি যুগের উত্তম লোকগণ ইসলামী যুগেও উত্তম ও শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হবে।"

অর্থাৎ জাহেলি যুগে যাদের মধ্যে যোগ্যতা ও বলিষ্ঠ কর্মক্ষমতা এবং প্রতিভা বর্তমান ছিলো ইসলামের মধ্যে এসে তারাই যোগ্যতম কর্মী প্রতিপন্ন হয়েছিল। তাদের কর্মক্ষমতা উপযুক্ত ক্ষেত্রে স্বতস্ফূর্ত হয়েছে। পার্থক্য শুধু এতোটুকু যে, পূর্বে তাদের প্রতিভা ও কর্মক্ষমতা ভুল পথে ব্যবহার হতো, এখন ইসলাম তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছে। কিন্তু অকর্মণ্য ও হীনবীর্য লোক না জাহিলিয়াতের যুগে কোনো কার্যসম্পাদন করতে পেরেছে না ইসলামের কোনো বৃহত্তম খেদমত আঞ্জাম দিতে সমর্থ হয়েছে। আরব দেশে নবী করীমের (সা) যে বিরাট অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ হয়েছিল এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর সর্বগ্রাসী প্রভাব সিন্ধু নদ হতে শুরু করে আটলান্টিক মহাসাগরের বেলাভূমি পর্যন্ত দুনিয়ার একটি বিরাট অংশের উপর বিস্তারিত হয়েছিল তার মূল কারণ এটাই ছিলো যে, আরব দেশের সর্বাপেক্ষা উত্তম ও প্রতিভা সম্পন্ন মানুষ তাঁর আদর্শানুগামী হয়েছিল। তাদের মধ্যে উক্ত রূপ চরিত্রের বিরাট শক্তি নিহিত ছিলো। মনে করা যেতে পারে, আরবের অকর্মণ্য, অপদার্থ, বীর্যহীন, ইচ্ছাশক্তি বিবর্জিত, বিশ্বাস-অযোগ্য লোকদের একটি বিরাট ভিড় যদি নবী করীমের (সা) চারপাশে জমায়েত হতো, তবে অনুরূপ ফল কখনোই লাভ করা সম্ভব হতো না। একথা একেবারেই স্বতসিদ্ধ।

ইসলামী নৈতিকতা

নৈতিক চরিত্রের দ্বিতীয় প্রকার যাকে আমি "ইসলামী নৈতিকতা" বলে অভিহিত করেছি এ সম্পর্কেও আলোচনা করতে হবে। মুলত এটা মৌলিক মানবীয় চরিত্র হতে স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর কোনো জিনিস নয়, বরং তার বিশুদ্ধকারী ও পরিপূরক মাত্র।

ইসলাম সর্বপ্রথম মানুষের মৌলিক মানবীয় চরিত্রকে সঠিক ও নির্ভুল কেন্দ্রের সাথে যুক্ত করে দেয়। অতপর এটা সম্পূর্ণরূপে কল্যাণকর ও মঙ্গলময়ে পরিণত হয়। মৌলিক মানবীয় চরিত্র একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় বস্তুনিরপেক্ষ নিছক একটি শক্তি মাত্র। এই অবস্থায় তা ভালও হতে পারে, মন্দও হতে পারে, কল্যাণকরও হতে পারে, অকল্যাণের হাতিয়ারও হতে পারে। যেমন, একখানী তরবারি একটি তীর শাণিত অস্ত্র মাত্র। এটা একটি দস্যুর মুষ্টিবদ্ধ হলে যুলুম পীড়নের একটি মারাত্মক হাতিয়ারে পরিণত হবে। আর আল্লাহর পথে জিহাদকারীর হাতে পড়ে এটা হতে পারে সকল কল্যাণ ও মঙ্গলের নিয়ামক। অনুরূপভাবে "মৌলিক মানবীয় চরিত্র" কারো মধ্যে শুধু বর্তমান থাকাই তার কল্যাণকর হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং নৈতিক শক্তি সঠিক পথে নিয়োজিত হওয়ার উপরই তা একান্তভাবে নির্ভর করে। ইসলাম একে সঠিক পথে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে মাত্র। ইসলামের তাওহীদী দাওয়াতের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে আল্লাহর সন্তোষ লাভ করা। এই দাওয়াত গ্রহণকারী লোকদের পার্থিব জীবনের সমগ্র চেষ্টা-সাধনা ও শ্রম মেহনতকে আল্লাহর সন্তোষলাভের জন্যই নিয়োজিত হতে হবে। وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ "হে আল্লাহ! আমাদের সকল চেষ্টা-সাধনা এবং সকল দুঃখ ও শ্রম স্বীকারের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে তোমার সন্তোষ লাভে।" ইসলামের দাওয়াত গ্রহণকারী ব্যক্তির চিন্তা ও কর্মের সকল তৎপরতা আল্লাহ নির্ধারিত সীমার মধ্যে আবদ্ধ হবে। اِيَّاكَ نَعْبُدُوَلَكَ نُصَلِّى وَنَسْجُدُ "হে আল্লাহ! আমরা তোমারই দাসত্ব করি এবং তোমার জন্য আমরা নামায ও সিজদায় ভূলুণ্ঠিত হই।"

ইসলাম মানুষের সমগ্র জীবন ও অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহকে এভাবেই নিয়ন্ত্রিত ও সংশোধিত করে। এই মৌলিক সংশোধনের ফলে উপরোল্লিখিত সকল বুনিয়াদী মানবীয় চরিত্রই সঠিক পথে নিযুক্ত ও পরিচালিত হয় এবং তা ব্যক্তিস্বার্থ, বংশ পরিবার কিংবা জাতি ও দেশের শ্রেষ্ঠত্ব বিধানের জন্য অযথা ব্যয়িত না হয়ে একান্তভাবেই সত্যের বিজয় সম্পাদনের জন্যই সংগতরূপে ব্যয় হতে থাকে। এর ফলেই তা একটি নিছক শক্তি মাত্র হতে উন্নীত হয়ে সমগ্র পৃথিবীর জন্য একটি কল্যাণ ও রহমাতের বিরাট উৎসে পরিণত হয়।

দ্বিতীয়ত, ইসলাম মৌলিক মানবীয় চরিত্রকে সুদৃঢ় করে দেয় এবং চরম প্রান্ত সীমা পর্যন্ত এর ক্ষেত্র ও পরিধি সম্প্রসারিত করে। উদাহরণ স্বরূপ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার উল্লেখ করা যেতে পারে। সর্বাপেক্ষা অধিক ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু ব্যক্তির মধ্যেও যে ধৈর্য ক্ষমতা দেখতে পাওয়া যায়, তা যদি নিছক বৈষয়িক স্বার্থের জন্য হয় এবং শিরক ও বস্তুবাদী চিন্তার মূল হতে 'রস' গ্রহণ করে, তবে তার একটি সীমা আছে, যে পর্যন্ত পৌছিয়ে তা নি:শেষ হয়ে যায়। অতপর উহা

কেঁপে উঠে, নিস্তেজ ও নিস্প্রভ হয়ে পড়ে। কিন্তু যে ধৈর্য ও তিতিক্ষা তাওহীদের উৎসমূল হতে 'রস' গ্রহণ করে এবং যা পার্থিব স্বার্থলাভের জন্য নয় একান্তভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত তা ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও তিতিক্ষার এক অতল স্পর্শ মহাসাগরে পরিণত হবে। দুনিয়ার সমগ্র দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুসিবত মিলিত হয়েও তাকে শূন্য ও শুষ্ক করতে সমর্থ হয় না। এজন্যই 'অমুসলিম'দের ধৈর্য খুবই সংকীর্ণ ও নগণ্য হয়ে থাকে। যুদ্ধের মাঠে তারা হয়ত গোলাগুলির প্রবল আক্রমণের সামনে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে প্রতিরোধ করেছে। কিন্তু পর মুহূর্তেই নিজেদের পাশবিক লালসা চরিতার্থ করার সুযোগ আসা মাত্রই কামাতুর বৃত্তির সামান্য উত্তেজনার আঘাতে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু ইসলাম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতাকে জীবনের বিশাল ক্ষেত্রে বিস্তারিত করে দেয় এবং সামান্য ও নির্দিষ্ট কয়েকটি দু:খ-কষ্ট ও বিপদ-মুসিবত প্রতিরোধের ব্যাপারেই নয়, সকল প্রকার লোভ-লালসা, ভয়, আতঙ্ক ও আশংকা এবং প্রত্যেকটি পাশবিক বৃত্তির মোকাবিলায় স্থিতিলাভের জন্য এটা একটি বিরাট শক্তির কাজ করে। বস্তুত ইসলাম মানুষের সমগ্র জীবনকে একটি অচল-অটল ধৈর্যপূর্ণ পর্বত প্রায় সহিষ্ণু জীবনে পরিণত করে। জীবনের প্রত্যেকটি পদক্ষেপের সঠিক পন্থা অবলম্বন করাই হয় এহেন ইসলামী জীবনের মূলনীতি তাতে সীমাহীন দু:খ-দুর্দশা, বিপদ-মুসিবত, ক্ষতি-লোকসান বরদাশত করতে হলেও এই জীবনে এর কোনো 'সুফল' পাওয়া না গেলেও জীবনের গতি ধারায় একবিন্দু পরিমাণ বক্রতা সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না। চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে এই জীবন কোনরূপ স্খলন বরদাশত করতে পারে না। অভাবিত পূর্ব সুযোগ-সুবিধা লাভ, উন্নতি এবং আশা-ভরসার শ্যামল-সবুজ বাগিচা দেখতে পেলেও নয়। পরকালের নিশ্চিত সুফলের সন্দেহাতীত আশায় দুনিয়ার সমগ্র জীবনে অন্যায় ও পাপ হতে বিরত থাকা এবং পুণ্য,মঙ্গল ও কল্যাণের পথে দৃঢ়তার সাথে অগ্রসর হওয়ারই নাম হচ্ছে ইসলামী সহিষ্ণুতা ইসলামী সবর। পরন্তু, কাফেরদের জীবনের খুব সংকীর্ণতম পরিবেশের মধ্যে ততোধিক সংকীর্ণ ধারণা অনুযায়ী সহিষ্ণুতার যে রূপ দেখতে পাওয়া যায়, মুসলমানদের জীবনে তাও অনিবার্যরূপে পরিলক্ষিত হবে। এই উদাহরণের ভিত্তিতে অন্যান্য সমগ্র মৌলিক মানবীয় চরিত্র সম্পর্কেও ধারণা করা যেতে পারে এবং বিশুদ্ধ ও নির্ভুল চিন্তা ও আদর্শ ভিত্তিক না হওয়ার দরুন কাফেরদের জীবন কত দুর্বল এবং সংকীর্ণ হয়ে থাকে তাও নি:সন্দেহে অনুধাবন করা যেতে পারে। কিন্তু ইসলাম সেইসবকে বিশুদ্ধ ও সুষ্ঠু ভিত্তিতে স্থাপিত করে অধিকতর মজবুত এবং বিস্তৃত ও বিশাল অর্থদান করে।

তৃতীয়ত, ইসলাম মৌলিক মানবীয় চরিত্রের প্রাথমিক পর্যায়ের উপর মহান উন্নত নৈতিকতার একটি অতি জাঁকজমকপূর্ণ পর্যায় রচনা করে দেয়। এর ফলে মানুষ

সৌজন্য ও মাহাত্ম্যের এক চূড়ান্ত ও উচ্চ পর্যায়ে আরোহন করে থাকে। ইসলাম মানুষের হৃদয়মনকে স্বার্থপরতা, আত্মম্ভরিতা, অত্যাচার, নির্লজ্জতা ও অসংলগ্নতা, উশৃঙ্খলতা হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করে দেয় এবং তাতে আল্লাহর ভয়, তাকওয়া, আত্মশুদ্ধি, সত্যবাদিতা ও সত্যপ্রিয়তা জাগিয়ে তোলে। তার মধ্যে নৈতিক দায়িত্ববোধ অত্যন্ত তীব্র ও সচেতন করে তোলে। আত্মসংযমে তাকে সর্বতোভাবে অভ্যস্ত নিখিল সৃষ্টি জগতের প্রতি তাকে দয়াবান, সৌজন্যশীল, অনুগ্রহ সম্পন্ন, সহানুভূতিপূর্ণ, বিশ্বাসভাজন, স্বার্থহীন, সদিচ্ছাপূর্ণ, নিষ্কলুষ নির্মল ও নিরপেক্ষ, সুবিচারক এবং সর্বক্ষণের জন্য সত্যবাদী ও সত্যপ্রিয় করে দেয়। তার মধ্যে এমন এক উচ্চ পবিত্র প্রকৃতি লালিত-পালিত হতে থাকে, যার নিকট সবসময় মঙ্গলেরই আশা করা যেতে পারে অন্যায় এবং পাপের কোনো আশংকা তার দিক হতে থাকতে পারে না। উপরন্তু, ইসলাম মানুষকে কেবল ব্যক্তিগতভাবে সৎ বানিয়েই ক্ষ্যান্ত হয় না। তা যথেষ্টও মনে করে না। রসূলের বাণী অনুযায়ী তাকে : مِفْتَاحٌ لِلْخَيْرِ وَمِغْلَاقٌ لِلشَّرِّ কল্যাণের দ্বার উৎঘাটন এবং অকল্যাণের পথ রোধকারীও বানিয়ে দেয়। অন্য কথায় গঠনমূলক দৃষ্টিতে ইসলাম তার উপর ন্যায়ের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ ও মূলোৎপাটনের বিরাট কর্তব্য পালনের দায়িত্ব অর্পন করে। এরূপ স্বভাব-প্রকৃতি লাভ করতে পারলে এবং কার্যত ইসলামের বিরাট মহান মিশনের জন্য সাধনা করলে এর সর্বাত্মক বিজয়াভিযানের মোকাবিলা করা কোনো পার্থিব শক্তিরই সাধ্যায়ত্ত হবে না।

নেতৃত্ব সম্পর্কে আল্লাহর নীতির সারকথা

দুনিয়ার নেতৃত্ব কর্তৃত্ব দানের ব্যাপারে সৃষ্টির প্রথম প্রভাত হতেই আল্লাহ তায়ালার একটি স্থায়ী নিয়ম ও রীতি চলে এসেছে এবং মানব জাতি বর্তমান প্রকৃতির উপর যতোদিন জীবিত থাকবে ততোদিন তা একই ধারায় জারী থাকবে, তাতে সন্দেহ নেই। এখানে প্রসংগত সেই নিয়মের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করা আবশ্যক।

পৃথিবীর বুকে ইসলামী নৈতিকতা ও মৌলিক মানবীয় চরিত্রে ভূষিত এবং জাগতিক কার্যকারণ ও জড় উপায়-উপাদান প্রয়োগকারী কোনো সুসংগঠিত দল যখন বর্তমান থাকে, তখন আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের চাবিকাঠি এমন একটি দলের হাতে ন্যস্ত করেন যে দল অন্তত মৌলিক মানবীয় চরিত্রে ভূষিত এবং জাগতিক উপায়-উপাদানসমূহ ব্যবহার করার দিক দিয়ে অন্যান্যের তুলনায় অধিকতর অগ্রসর। কারণ, আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই পৃথিবীর শৃংখলাবিধান করতে দৃঢ় সংকল্প। এই শৃংখলাবিধানের দায়িত্ব ঠিক সেই মানব গোষ্ঠীকেই দান করেন, যারা সমসাময়িক দলসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা যোগ্যতম

প্রমাণিত হবে। বস্তুত দুনিয়ার নেতৃত্বদান সম্পর্কে এটাই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার স্থায়ী নীতি।

কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোনো সুসংগঠিত দল যদি বাস্তবিকই বর্তমান থাকে, যা ইসলামী নৈতিকতা ও মৌলিক মানবীয় চরিত্র উভয় দিক দিয়েই অবশিষ্ট সকল মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট প্রমাণিত হবে এবং জাগতিক উপায়-উপাদান ও জড় শক্তি প্রয়োগেও কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ হবে না, তবে তখন পৃথিবীর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের চাবিকাঠি অন্য কোনো দলের হাতে অর্পিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। শুধু অসম্ভবই নয় তা অস্বাভাবিকও বটে, তা মানুষের জন্য নির্ধারিত আল্লাহর স্থায়ী নিয়ম-নীতিরও সম্পূর্ণ বিপরীত। আল্লাহ্ তায়ালা সত্যপন্থী ও নিষ্ঠাবান ঈমানদার লোকদের জন্য তাঁর কিতাবে যে প্রতিশ্রুতি উল্লেখ করেছেন, এটা তারও খেলাফ হয়ে পড়ে। দুনিয়ার বুকে সৎ, সত্যাশ্রয়ী ও ন্যায়পন্থী, আল্লাহর মর্জী অনুযায়ী বিশ্বপরিচালনায় যোগ্যতাসম্পন্ন একটি একনিষ্ঠ মানব দল বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তিনি দুনিয়ার কর্তৃত্ব তার হাতে অর্পণ না করে কাফের বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ও আল্লাহদ্রোহী লোকদের হাতে ন্যস্ত করবেন একথা কিরূপে ধারণা করা যেতে পারে?

কিন্তু বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, এরূপ অনিবার্য পরিণাম ঠিক তখনি লাভ করা যেতে পারে যখন উল্লেখিত গুণাবলী সমন্বিত একটি দল বাস্তবিকই দুনিয়াতে বর্তমান থাকবে। এক ব্যক্তির সৎ হওয়া এবং বিচ্ছিন্নভাবে অসংখ্য সৎ ব্যক্তির বর্তমান থাকায় দুনিয়ার নেতৃত্বলাভের আল্লাহর নীতিতে বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম সৃষ্টি হতে পারে না সেই ব্যক্তিগণ যতোবড় অলী আল্লাহ পয়গম্বরই হোক না কেন। আল্লাহ্ তায়ালা দুনিয়ার নেতৃত্বদানের যে ওয়াদা করেছেন, তা বিক্ষিপ্ত ও অসংঘবদ্ধ কয়েকজন ব্যক্তি সম্পর্কে নয় ; এমন একটি দলকে এটা দান করার প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন যা কার্যত ও বাস্তব ক্ষেত্রে নিজেকে خَيْرَ اُمَّةٍ "সর্বোত্তম জাতি" ও اُمَّةً وَّسَطًا "মধ্যম পন্থানুসারী জাতি" বলে প্রমাণ করতে পারবে।

একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, উক্তরূপ গুণে ভূষিত একটি দলের শুধু বর্তমান থাকাই নেতৃত্ব ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটার জন্য যথেষ্ট নয়, তা এমন নয় যে, এদিকে এরূপ একটি দল অস্তিত্ব লাভ করবে, আর ওদিকে সঙ্গে সঙ্গেই আকাশ হতে কিছু সংখ্যক ফেরেশতা অবতরণ করে ফাসেক-কাফেরদেরকে নেতৃত্ব কর্তৃত্বের গদি হতে বিচ্যুত করে দিবে এবং এই দলকে তদস্থলে আসীন করবে। এরূপ অস্বাভাবিক নিয়মে মানব সমাজে কখনই কোনো পরিবর্তন সূচিত হতে পারে না। নেতৃত্বের ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন সৃষ্টি করতে হলে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে ও বিভাগে, প্রত্যেক কদমে পদক্ষেপে কাফের ও ফাসেকী শক্তির

সাথে দ্বন্দ্ব ও প্রত্যক্ষ মোকাবিলা করতে হবে এবং সত্য প্রতিষ্ঠার বন্ধুর পথে সকল প্রকার কুরবানী দিয়ে নিজের সত্যপ্রীতির ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং নিজের অপ্রতিভ যোগ্যতাও প্রমাণ করতে হবে। বস্তুত এটা এমন একটি অনিবার্য শর্ত যা নবীদের উপরও প্রযোজ্য হয়েছে। অন্য কারো এই শর্ত পূরণ না করে সমাজ নেতৃত্বে কোনরূপ পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারার তো কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।

মৌলিক মানবীয় চরিত্র ও ইসলামী নৈতিক শক্তির তারতম্য

জাগতিক জড়শক্তি এবং নৈতিক শক্তির তারতম্য সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসের গভীরতর অধ্যয়নের পর আল্লাহর এই সুন্নাত বা রীতি আমি বুঝতে পেরেছি যে, সেখানে নৈতিক শক্তি বলতে কেবল মাত্র মৌলিক মানবীয় চরিত্রই হবে, সেখানে জাগতিক উপায়-উপাদন ও জড়শক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। এমনকি, একটি বৈষয়িক জড়শক্তি যদি বিপুল পরিমাণে বর্তমান থাকে তবে সামান্য নৈতিক শক্তির সাহায্যেই সে সারাটি দুনিয়া গ্রাস করতে পারে। আর অপর দল নৈতিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠতর হয়েও কেবলমাত্র বৈষয়িক শক্তির অভাব হেতু সে পশ্চাৎপদ হয়ে থাকবে। কিন্তু যেখানে নৈতিক শক্তি বলতে ইসলামী নৈতিকতা ও মৌলিক মানবীয় চরিত্র উভয়ের প্রবল শক্তির সমন্বয় হবে, সেখানে বৈষয়িক জড়শক্তির সাংঘাতিক পরিমাণ অভাব হলেও নৈতিক শক্তিই জয়লাভ করবে এবং নিছক মৌলিক মানবীয় চরিত্র ও বৈষয়িক জড়শক্তির ভিত্তিতে যে শক্তিসমূহ মস্তক উত্তোলন করবে তা নিশ্চিতরূপেই পরাজিত হবে। সুস্পষ্টরূপে বুঝার জন্য একটি হিসেবের অবতারণা করা যেতে পারে। মৌলিক মানবীয় চরিত্রের সাথে যদি একশত ভাগ বৈষয়িক জড়শক্তি অপরিহার্য হয় তবে ইসলামী নৈতিকতা ও মৌলিক মানবীয় চরিত্রের পূর্ণ সমন্বয় হওয়ার পর মাত্র ২৫ ভাগ বৈষয়িক জড়শক্তি উদ্দেশ্য লাভের জন্য যথেষ্ট হবে। অবশিষ্ট ৭৫ ভাগ জড়শক্তির অভাব কেবল ইসলামী নৈতিকতাই পূরণ করে দেবে। উপরন্তু নবী করীমের (সা) জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা হতে জানা যায় যে, রসূলে করীম (সা) এবং তার আসহাবদের সমপরিমাণ ইসলামী নৈতিকতা হতে মাত্র শতকরা পাঁচ ভাগ জড়শক্তিই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যথেষ্ট হতে পারে। এই নিগূঢ় তত্ত্ব ও সত্য বলা হয়েছে কুরআন মজীদের নিম্নলিখিত আয়াতে :

إِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ

"তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন পরম ধৈর্যশীল লোক হয় তবে তারা দু'শ জনের উপর জয়ী হতে পারবে।"

এই শেষোক্ত কথাটিকে নিছক 'অন্ধভক্তি ভিত্তিক ধারণা' মনে করা ভুল হবে। আর আমি যে কোনো মো'জেযা বা কেরামতির কথা বলছি, তাও মনে করবেন না। বস্তুত এটা এক বাস্তব এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কথা সন্দেহ নেই। এই সত্য

তত্ত্ব কার্যকারণ পরম্পরা অনুযায়ী এই দুনিয়াতেই পরিস্ফুট হয় সকল সময় এটা পরিস্ফুট হতে পারে। এর কারণ যদি বর্তমান থাকে, তবে তা নিশ্চয়ই বাস্তবে রূপায়িত হবে।

কিন্তু ইসলামী নৈতিকতা যার মধ্যে মৌলিক মানবীয় চরিত্রও ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত রয়েছে বৈষয়িক জড়শক্তির শতকরা ৭৫ ভাগ বরং ৫০ ভাগ অভাব কিরূপে পূরণ করে ; তা একটি নিগূঢ় রহস্য বটে। কাজেই সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে এর বিশ্লেষণ হওয়া একান্ত আবশ্যক।

এই রহস্য হৃদয়ংগম করার জন্য সমসাময়িককালের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করাই যথেষ্ট। বিগত মহাযুদ্ধের সর্বাত্মক বিপর্যয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে জাপান ও জার্মানীর পরাজয় ঘটে। মৌলিক মানবীয় চরিত্রের দিক দিয়ে এই বিপর্যয়ের সংশ্লিষ্ট উভয় দলই প্রায় সমান। বরং সত্য কথা এই যে, কোনো দিক দিয়ে জার্মান ও জাপান মিত্র পক্ষের মোকাবিলায় অধিকতর মৌলিক মানবীয় চরিত্রের প্রমাণও উপস্থিত করেছে। জড়বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং এর বাস্তব প্রয়োজনের ব্যাপারেও উভয় পক্ষই সমান ছিলো। বরং সত্য কথা এই যে, এই ক্ষেত্রে জার্মানীর শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজন বিদিত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কেবল একটি ব্যাপারেই এক পক্ষ অপর পক্ষ হতে অনেকটা অগ্রসর আর তা হচ্ছে বৈষয়িক কার্যকারণের আনুকূল্য। এই জনশক্তির অপরাপর সকল পক্ষ অপেক্ষাই অনেকগুণ বেশি। বৈষয়িক জড় উপায়-উপাদান তারা সর্বাপেক্ষা অধিক রয়েছে। এর ভৌগলিক অবস্থাও গুরুত্বপূর্ণ এবং এর ঐতিহাসিক কার্যকারণ অপরাপর পক্ষের তুলনায় বহুগুণ বেশি অনুকূল পরিস্থিতির উদ্ভব করে নিয়েছিল। ঠিক এজন্য মিত্রপক্ষ বিজয় মাল্যে ভূষিত হয়। আর এজন্যই যে জাতির জনসংখ্যা অপর্যাপ্ত, বৈষয়িক জড় উপায়-উপাদান যার নিকট কম, তার পক্ষে অধিক জনসংখ্যা সমন্বিত ও বিপুল জাগতিক উপায়-উপাদান বিশিষ্ট জাতির মোকাবিলায় মস্তকোত্তলন করে দণ্ডায়মান হওয়া প্রায় অসম্ভব বলে মনে হয়। মৌলিক মানবীয় চরিত্র ও জড়বিজ্ঞান ব্যবহারের দিক দিয়ে খুব বেশি অগ্রসর হলেও এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। কারণ মৌলিক মানবীয় চরিত্র প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ভিত্তিতে উত্থিত জাতি হয় জাতীয়তাবাদী হবে এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশও অধিকার করতে প্রয়াসী হবে, নতুবা তা এক সার্বজনীন আদর্শ ও নিয়ম বিধানের সমর্থক হবে এবং তা গ্রহণ করার জন্য দুনিয়ার অন্যান্য জাতিসমূহকেও আহবান জানাবে। সে জাতির এ দু'টির যে কোনো এক অবস্থা নিশ্চয়ই হবে। প্রথম অবস্থা হলো বৈষয়িক জড়শক্তি ও জাগতিক উপায়-উপাদানের দিক দিয়ে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা তার শ্রেষ্ঠ ও অগ্রসর হওয়া ভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করার দ্বিতীয় কোনো পন্থা আদৌ থাকতে পারে না। এর কারণ এই যে, যেসব

জাতিকে সে প্রভুত্ব ও ক্ষমতা লিপ্সার অগ্নিযজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে কৃত সংকল্প হয়েছে তারা অত্যন্ত তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষী মনোভাব নিয়ে তার প্রতিরোধ করবে এবং তার পথরোধ করতে নিজেদের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করবে। কাজেই তখন আক্রমণকারী জাতির পরাজয়ের সম্ভাবনা অনেক বেশি। কিন্তু উক্ত জাতির যদি দ্বিতীয় অবস্থা হয় যদি উহা কোনো সার্বজনীন আদর্শের নিশান বরদার হয়, ও মস্তিষ্ক প্রভাবান্বিত হওয়ার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। তখন জাতিকে প্রতিবন্ধকতার পথ হতে অপসৃত করতে খুব বেশি শক্তি প্রয়োগ করার আবশ্যক হবে না। কিন্তু এখানে ভুললে চলবে না যে, মুষ্টিমেয় কয়েকটি মানোমুগ্ধকর নীতি-আদর্শই কখনো মানুষের মন ও মস্তিষ্ক প্রভাবান্বিত করতে পারে না। সে জন্য সত্যিকার সদিচ্ছা, সহানুভূতি, হিতাকাঙ্খা, সততা, সত্যবাদিতা, নিঃস্বার্থতা, উদারতা, বদান্যতা, সৌজন্য ও ভদ্রতা এবং নিরপেক্ষ সুবিচার নীতি একান্ত অপরিহার্য। শুধু তাই নয়, এই মহৎ গুণগুলোকে যুদ্ধ-সন্ধি, জয়-পরাজয়, বন্ধুতা-শত্রুতা এই সকল প্রতিকূল পরিস্থিতিতেই কঠিন পরীক্ষায় অত্যন্ত খাঁটি অকৃত্রিম ও নিষ্কলুষ প্রমাণিত হতে হবে। কিন্তু এরূপ ভাবধারার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে উন্নত চরিত্রের উচ্চতম ধাপের সাথে এবং তার স্থান মৌলিক মানবীয় চরিত্রের অনেক উর্ধে। ঠিক এ কারণেই নিছক মৌলিক মানবীয় চরিত্র ও বৈষয়িক শক্তির ভিত্তিতে উত্থিত জাতি প্রকাশ্যভাবে জাতীয়তাবাদীই হোক কি গোপন জাতীয়তাবাদের সাথে কিছুটা সার্বজনীন আদর্শের প্রচার ও সমর্থন করার ছদ্মবেশই ধারণ করুক–একান্ত ব্যক্তিগত কিংবা শ্রেণীগত অথবা জাতীয় স্বার্থ লাভ করাই হয় তার যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা ও দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য। বর্তমান সময় আমেরিকা, বৃটেন, রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতিতে ঠিক এই ভাবধারাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই ধরনের যুদ্ধ-সংগ্রামের ক্ষেত্রে অতি স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেকটি জাতি প্রতিপক্ষের সামনে এক দুর্জয় দুর্গের ন্যায় হয়ে দাঁড়ায় এবং তার প্রতিরোধে স্বীয় সমগ্র নৈতিক ও বৈষয়িক শক্তি প্রয়োগ করে। তখন আক্রমণকারী জাতির শ্রেষ্ঠতর জড়শক্তির আক্রমণে শত্রু পক্ষকে সে নিজ দেশের চতুর্সীমার মধ্যে কিছুতেই প্রবেশ করতে দিবে না।

কিন্তু এই সময় এরূপ পরিবেশের মধ্যে এমন একটা মানবগোষ্ঠী যদি বর্তমান থাকে প্রথমত তা একটি জাতির লোকদের সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকলেও কোনো দোষ নেই যদি তা একই জাতি হিসেবে না উঠে একটি আদর্শবাদী জামায়াত হিসেবে দণ্ডায়মান হয়, যা সকল প্রকার ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত ও জাতীয় স্বার্থপরতার বহু উর্ধে থেকে বিশ্বমানবতাকে আমন্ত্রণ জানাবে যার সমগ্র চেষ্টা-সাধনার চরম লক্ষ্য হবে নির্দিষ্ট কতোকগুলো আদর্শের অনুসরণের মধ্য দিয়ে বিশ্বমানবতার মুক্তিসাধন এবং সেই আদর্শ ও নীতিসমূহের ভিত্তিতে মানব

জীবনের গোটা ব্যবস্থার পুনপ্রতিষ্ঠা সাধন। ঐসব নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে এই দল যে জাতি গঠন করবে, তাতে জাতীয়, ভৌগলিক, শ্রেণীগত ও বংশীয় বা গোত্রীয় বৈষম্যের নামগন্ধও থাকবে না। সকল মানুষই তাতে সমান মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে প্রবেশ করতে পারবে এবং সকলেই সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে পারবে। এই নবপ্রতিষ্ঠিত জাতির মধ্যে নেতৃত্ব পথ নির্দেশকারী মর্যাদা কেবল সেই ব্যক্তি বা সেই মানব সমষ্টিই লাভ করতে পারবে, যারা সেই আদর্শ ও নীতির অনুসরণ করে চলার দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা অগ্রসর ও শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হবে। তখন তার বংশ মর্যাদা বা আঞ্চলিক জাতীয়তার কোনো তারতম্য বিচার হবে না এমনকি, এই নতুন সমাজে এতোদুরও হতে পারে যে, বিজিত জাতির লোক ঈমান এনে নিজেকে অন্যান্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আদর্শানুসরণে এবং যোগ্যতার প্রমাণ করতে পারলে বিজয়ী তার সকল চেষ্টা ও যুদ্ধ সংগ্রাম লব্ধ যাবতীয় 'ফল' তার পদতলে এনে ঢেলে দিবে এবং তাকে 'নেতা' রূপে স্বীকার করে নিজে 'অনুসারী' হয়ে কাজ করতে প্রস্তুত হবে।

এমন একটি আদর্শবাদী দল যখন নিজেদের আদর্শ প্রচার করতে শুরু করে, তখন এই আদর্শের বিরোধী লোকগণ তাদের প্রতিরোধ করতে উদ্যত হয়। ফলে উভয় দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। কিন্তু এই দ্বন্দ্বের তীব্রতা যতোই বৃদ্ধি পায় আদর্শবাদী দল বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবিলায় ততোই উন্নত চরিত্র ও মহান মানবিক গুণ মহাত্মের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে থাকে। সে তার কর্মনীতি দ্বারা প্রমাণ করে যে, মানব সমষ্টি তথা গোটা সৃষ্টিজগতের কল্যাণ সাধন ভিন্ন তার অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। বিরুদ্ধবাদীদের ব্যক্তি সত্ত্বা কিংবা তাদের জাতীয়তার সাথে এর কোনো শত্রুতা নেই। শত্রুতা আছে শুধু তাদের গৃহীত জীবনধারা ও চিন্তা মতবাদের সাথে। তা পরিত্যাগ করলেই তার রক্ত পিপাসু শত্রুকেও প্রাণভরা ভালবাসা দান করতে পারে বুকের সঙ্গে মিলাতে পারে। পরন্তু সে আরও প্রমাণ করবে যে, বিরুদ্ধ পক্ষের ধন-দৌলত কিংবা তাদের ব্যবসায় ও শিল্পপণ্যের প্রতিও তার কোনো লালসা নেই, তাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনই তার একমাত্র কাম্য। তা লাভ হলেই যথেষ্ট। তাদের ধন-দৌলত তাদেরই সৌভাগ্যের কারণ হবে। কঠিন কঠোরতম পরীক্ষার সময়ও এই দল কোনোরূপ মিথ্যা, প্রতারণা ও শঠতার আশ্রয় নেবে না। কুটিলতা ষড়যন্ত্রের প্রত্যুত্তরে তারা সহজ-সরল কর্মনীতিই অনুসরণ করবে। প্রতিশোধ গ্রহণের তীব্র উত্তেজনার সময়ও অত্যাচার-অবিচার, উৎপীড়নের নির্মমতায় মেতে উঠবে না। যুদ্ধের প্রবল সংঘর্ষের কঠিন মুহূর্তেও তারা নিজেদের নীতি আদর্শ পরিত্যাগ করবে না। কারণ সেই আদর্শের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যই তো তার জন্ম। এজন্য সততা, সত্যবাদিতা, প্রতিশ্রুতি পূরণ,

নির্মল আচার-ব্যবহার ও নিঃস্বার্থ কর্মনীতির উপর তারা দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকে। নিরপেক্ষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে এবং প্রথমত আদর্শ হিসেবে সততা ও ন্যায়বাদের যে মানদণ্ড বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করেছিল, নিজেকে এর কষ্টিপাথরে যাচাই করে সত্য এবং খাঁটি বলে প্রমাণ করে দেয়। শত্রু পক্ষের ব্যভিচারী, মদ্যপায়ী, জুয়াড়ী, নিষ্ঠুর ও নির্দয় সৈন্যদের সাথে এই দলের আল্লাহভীরু, পবিত্র চরিত্র, মহান আত্মা-দয়ার্দ্র হৃদয় ও উদার উন্নত মনোবৃত্তি সম্পন্ন মুজাহিদদের প্রবল মোকাবিলা হয়, তখন এই দলের প্রত্যেক ব্যক্তিরই ব্যক্তিগত মানবিক ও গুণ-গরিমা প্রতিপক্ষের পাশবিক ও বর্বরতার উপর উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হয়ে লোকচক্ষুর সামনে প্রকটিত হতে থাকে। শত্রু পক্ষের লোক আহত বা বন্দী হয়ে আসলে চতুর্দিকে ভদ্রতা, সৌজন্য, পবিত্রতা ও নির্মল মানসিক চরিত্রের রাজত্ব বিরাজমান দেখতে পায় এবং তা দেখে তাদের কলুষিত আত্মাও পবিত্র ভাবধারার সংস্পর্শে কলুষমুক্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে এই দলের লোক যদি বন্দী হয়ে শত্রু পক্ষে শিবিরে চলে যায়, সেখানকার অন্ধকারাচ্ছন্ন পূতিগন্ধময় পরিবেশে এদের মনুষ্যত্বের মহিমা আরো উজ্জ্বল ও চাকচিক্যপূর্ণ হয়ে উঠে। এরা কোনো দেশ জয় করলে বিজিত জনগণ প্রতিশোধের নির্মম আঘাতের পরিবর্তে ক্ষমা করুণা পায়, কঠোরতা নির্মমতার পরিবর্তে সহানুভূতি ; গর্ব অহংকার ও ঘৃণার পরিবর্তে পায় সহিষ্ণুতা ও বিনয় ; ভৎসনার পরিবর্তে পায় সাদর সম্ভাষণ এবং মিথ্যা প্রচারণার পরিবর্তে সত্যের মূলনীতিসমূহের বৈজ্ঞানিক প্রচার। আর এসব দেখে খুশিতে তাদের হৃদয় মন ভরে উঠে। তারা দেখতে পায় যে, বিজয়ী সৈনিকরা তাদের নিকট নারীদেহের দাবি করে না, গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে ধন-সম্পত্তি খোঁজ করে বেড়ায় না, তাদের শৈল্পিক গোপন রহস্যের সন্ধান করার জন্যও এরা উদগ্রীব নয়, তাদের অর্থনৈতিক শক্তি সম্পদকে ধ্বংস করার চিন্তাও এদের নেই। তাদের জাতীয় সংস্কৃতি ও সম্মান মর্যাদার উপরও এরা হস্তক্ষেপ করে না। বিজিত জনতা শুধু দেখতে পায়, এরা এক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন এই জন্য যে বিজিত দেশের একটি মানুষেরও সম্মান বা সতীত্ব যেনো নষ্ট না হয়, কারো ধনমাল যেনো ধ্বংস না হয়, কেউ যেনো সংগত অধিকার হতে বঞ্চিত না থেকে যায়, কোনোরূপ অসচ্চরিত্রতা তাদের মধ্যে যেনো ফুটে না উঠে এবং সামগ্রিক জুলুম-পীড়ন যেনো কোনোরূপেই অনুষ্ঠিত হতে না পারে।

পক্ষান্তরে শত্রু পক্ষ যখন কোনো দেশে প্রবেশ করে, তখন সে দেশের সমগ্র অদিবাসী তাদের অত্যাচার, নির্মমতা ও অমানুষিক ধ্বংসলীলায় আর্তনাদ করে উঠে একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যায়, এই ধরনের আদর্শবাদী জিহাদের সাথে জাতীয়তাবাদী যুদ্ধ সংগ্রামের কতো আকাশ স্পর্শী পার্থক্য হয়ে থকে। এই

ধরনের লড়াইয়ে উচ্চতর মানবিকতা নগণ্য বৈষয়িক শক্তি সামর্থ সহকারে ও শত্রুপক্ষের লৌহবর্ম রক্ষিত পাশবিকতাকে যে অতি সহজেই প্রথম আক্রমণেই পরাজিত করবে তাতে আর সন্দেহ কি? বস্তুত উন্নত নির্মল নৈতিকতার হাতিয়ার বন্দুক-কামানের গোলাগুলি অপেক্ষাও দূর পাল্লায় গিয়ে লক্ষ্যভেদ করবে। প্রচন্ড লড়াইয়ে কঠিন মুহূর্তেও শত্রুরা বন্ধুতে পরিণত হবে। দেশের পূর্বে মানুষের হৃদয়-মন বিজিত হবে, দেশের পর দেশ-জনপদের পর জনপদ বিনাযুদ্ধেই পরাজয় স্বীকার করে মুক্তির চিরন্তন স্বাদ গ্রহণ করবে। ওদিকে এই সত্যনিষ্ঠ আদর্শবাদী দল যখন নিজেদের মুষ্টিমেয় জনসংখ্যা অত্যল্প উপায়-উপাদান সহকারে গঠনমূলক কাজ শুরু করবে, তখন সেনাপতি, সৈনিক, যোদ্ধা, বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী, অস্ত্রশস্ত্র, রসদ এবং যুদ্ধের অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম সবকিছুই ধীরে ধীরে বিরোধী শিবির হতে পাওয়া যাবে, তাতে সন্দেহ নেই।

আবার এই উক্তি নিছক কল্পনা-ধারণা এবং আন্দাজ অনুমানের উপরই ভিত্তিশীল নয়, নবী করীম (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সোনালী যুগের ঐতিহাসিক উদাহরণসমূহ হতে একথা প্রমাণিত হয় যে, ইতিপূর্বেও এরূপ ঘটনা ঘটেছে এবং আজও এরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে পারে। অবশ্য সেজন্য শর্ত এই যে, এরূপ অভিজ্ঞতালাভের জন্য পরিপূর্ণ প্রস্তুতি ও সৎ সহাস নিয়ে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

আমি আশা করি, আমার উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনা হতে আমার একথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে নৈতিক শক্তিই হচ্ছে শক্তির আসল উৎস। কাজেই দুনিয়ার কোনো মানব সমষ্টি যদি মৌলিক মানবীয় চরিত্রের সঙ্গে ইসলামী নৈতিকতারও আধার হয় তখন তার বর্তমানে অন্য কোনো দলের পক্ষে দুনিয়ার নেতৃত্ব এবং কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে থাকা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে কঠিন এবং স্বভাবতই তা অসম্ভব। দ্বিতীয়ত মুসলমানদের বর্তমান অধপতনের মূলীভূত কারণ কি উপরের আলোচনা হতে তাও আশা করি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যারা না বৈষয়িক উপায়-উপাদান প্রয়োগ করবে, না মৌলিক মানবীয় চরিত্রে ভুষিত হবে, আর না সমষ্টিগতভাবে ইসলামী নৈতিকতার অস্তিত্বই তাদের মধ্যে থাকবে, তারা যে দুনিয়ার নেতৃত্বের আসনে কিছুতেই অধিষ্ঠিত থাকতে পারে না, এটা সর্বজন বিদিত সত্য। এমতাবস্থায় এমনসব কাফের লোকদেরই কর্তৃত্ব দান করা আল্লাহর স্থায়ী রীতি, যাদের ইসলামী নৈতিকতা না থাকলেও মৌলিক মানবীয় চরিত্র তো রয়েছে, আর জাগতিক জড় উপায়-উপাদান ব্যবহার এবং শাসন শৃংখলা রক্ষার দিক দিয়ে নিজেদেরকে অন্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করেছে। এই ক্ষেত্রে মুসলমানদের কোনো অভিযোগ করার থাকলে তা তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই হতে পারে, এ ব্যাপারে আল্লাহর স্থায়ী নিয়ম-বিধানের আদৌ কোনো

ক্রটি নেই। আর নিজেদের বিরুদ্ধে যদি বাস্তবিকই কোনো অভিযোগ জাগে, তাদের অনিবার্য ফলে নিজেদের যাবতীয় দোষ-ক্রটি সংশোধন করার জন্য যত্নবান হওয়া এবং যে কারণে মুসলমান নেতৃত্বের আসন হতে বিচ্যুত হয়ে অনুগত হতে বাধ্য হয়েছে সেই কারণ দূর করতে বদ্ধপরিকর হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

অতপর সুস্পষ্ট ভাষায় ইসলামী নৈতিকতার মূল ভিত্তিসমূহের পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ করা একান্ত আবশ্যক। কারণ, আমি জানি এ ব্যাপারে মুসলমানদের ধারণা নিতান্ত অবাঞ্ছিতভাবে অস্পষ্ট এবং বিশিষ্ট হয়ে রয়েছে। এই অস্পষ্টতা ও অসংঘবদ্ধতার কারণেই ইসলামী নৈতিকতা আসলে যে কি জিনিস এবং এদিক দিয়ে মানুষের চরিত্র গঠন ও পূর্ণতা সাধনের জন্য কোন্ জিনিস কোন্ শ্রেণী পরম্পরা ও ক্রমিক ধারা অনুযায়ী তার মধ্যে লালিত-পালিত করা অপরিহার্য তা খুব কম লোকই জানতে পেরেছে।

ইসলামের নৈতিকতার চার পর্যায়

ইসলামী নৈতিকতা বলতে আমরা যা বুঝে থাকি, কুরআন ও হাদিসের শিক্ষানুযায়ী এর চারটি ক্রমিক পর্যায় রয়েছে। প্রথম ঈমান, দ্বিতীয় ইসলাম, তৃতীয় তাকওয়া এবং চতুর্থ ইহসান। বস্তুত এ চারটি পর্যায় পরস্পর এমন স্বাভাবিক শ্রেণী পরম্পরা অনুযায়ী সুসংবদ্ধ হয়ে আছে যে, প্রত্যেকটি পরবর্তী পর্যায়ই পূর্ববর্তী পর্যায় হতে উদ্ভূত এবং অনিবার্যরূপে এরই উপর প্রতিষ্ঠিত। এজন্য নিম্নবর্তী পর্যায় যতোক্ষণ না দৃঢ় পরিপক্ক হবে ততোক্ষণ পর্যন্ত এর উপরের পর্যায়ের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কল্পনাও করা যায় না। এই সমগ্র ইমারতের মধ্যে ঈমান হচ্ছে প্রাথমিক ভিত্তিপ্রস্তর। এরই উপর ইসলামের স্তর রচিত হয়, তার উপর 'তাকওয়া' এবং সকল পর্যায়ের উপরে হয় 'ইহসানের' প্রতিষ্ঠা। ঈমান না হলে ইসলামে তাকওয়া কিংবা ইহসান লাভ করার কোনো সম্ভাবনাই হতে পারে না। ঈমান দুর্বল হলে তার উপর উচ্চতর পর্যায়সমূহের দুর্বহ বোঝা চাপিয়ে দিলেও তা অতিশয় কাঁচা, শিথিল ও অন্তসারশূন্য হয়ে পড়বে। এই ঈমান সংকীর্ণ হলে যতোখানি তার ব্যপ্তি হবে, ইসলাম এবং ইহসান ঠিক ততোখানি সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ হবে, তাতে সন্দেহ নেই। অতএব ঈমান যতোক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ সুদৃঢ় ও সম্প্রসারিত না হবে, দীন ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানসম্পন্ন কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিই তার উপর ইসলাম, তাকওয়া কি ইহসান প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তাও করতে পারে না। অনুরূপভাবে 'তাকওয়ার' পূর্বে 'ইসলাম' এবং ইহসানের পূর্বে 'তাকওয়া' বিশুদ্ধকরণ সুষ্ঠুতা বিধান এবং সম্প্রসারিতকরণ অপরিহার্য। কিন্তু সাধারণত আমরা এটাই দেখতে পাই যে, এই স্বাভাবিক ও নীতিগত শ্রেণী পরম্পরার প্রতি চরম উপক্ষে প্রদর্শন করা হয় এবং ঈমান ও ইসলামের পর্যায়ে পূর্ণতা সাধন ছাড়াই তাকওয়া ও ইহসানের

আলোচনা শুরু করে দেয়া হয়। এটা অপেক্ষাও দুঃখের বিষয় এই যে, সাধারণত লোকদের মনে ঈমান ইসলাম সম্পর্কে অত্যন্ত সংকীর্ণ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে। এজন্যই শুধু বাহ্যিক বেশ-ভূষা, পোশাক-পরিচ্ছদ উঠা-বসা, চলা-ফেরা, খানা-পিনা, প্রভৃতি বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানসমূহ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে করতে পারলেই 'তাকওয়ার' পূর্ণতা সাধন হয়ে গেল। আর ইবাদতের মধ্যে নফল নামায, দরূদ, অজিফা পাঠ এই ধরনের কয়েকটি বিশেষ কাজ করলেই ইহসানের উচ্চতম অধ্যায় লাভ হয় বলে ধারণা করে। অথচ এ ধরনের তাকওয়া ও ইহসানের সংগে সংগে লোকদের জীবনের এমন অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শনও পাওয়া যায় যার ভিত্তিতে অনায়াসে বলা চলে যে, তাকওয়া ও ইসলাম তো দূরের কথা, আসল ঈমানই এখন পর্যন্ত তার মধ্যে পরিপক্কতা ও সুষ্ঠুতা লাভ করেনি। এরূপ ভুল ধারণা ও ভুল দীক্ষার পদ্ধতি আমাদের মধ্যে যতোদিন বর্তমান থাকবে ততোদিন পর্যন্ত আমরা ইসলামী নৈতিকতার অপরিহার্য অধ্যায়সমূহ কখনো অতিক্রম করতে পারবো বলে আশা করা যায় না। এজন্যই ঈমান, ইসলাম, তাকওয়া, ইহসান এই চারটি অধ্যায় সম্পর্কে পূর্ণ সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা এবং সেই সংগে এদের স্বাভাবিক ও ক্রমিক শ্রেণী পরম্পরাও অনুধাবন করা একান্তই অপরিহার্য।

ঈমান

সর্বপ্রথম ঈমান সম্পর্কেই আলোচনা করা যাক। কারণ, এটা ইসলামী জিন্দেগীর প্রাথমিক ভিত্তিপ্রস্তর। তাওহীদ ও রিসালাত আল্লাহর একত্ব ও হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে রসূলরূপে স্বীকার করে নেয়াই এক ব্যক্তির ইসলামের পরিসীমায় অনুপ্রবেশ লাভের জন্য যথেষ্ট। তখন তার সাথে ঠিক একজন মুসলমানেরই ন্যায় আচরণ করা আবশ্যক তখন এরূপ আচরণ ও ব্যবহার পাবার তার অধিকারও হয়। কিন্তু সাধারণ স্বীকারোক্তি এমনি আইনগত প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য যথেষ্ট হলেও ইসলামী জিন্দেগীর সমগ্র 'ত্রিতল বিশিষ্ট উচ্চ প্রাসাদের' ভিত্তিপ্রস্তর হওয়ার জন্যও কি এটা যথেষ্ট হতে পারে? সাধারণ লোকেরা এরূপই ধারণা করে। আর এজন্য যেখানেই এই স্বীকারোক্তিটুকু পাওয়া যায়, সেখানেই বাস্তবিকভাবে ইসলাম, তাকওয়া ও ইহসানের উচ্চতলসমূহ তৈরি করার কাজ শুরু করে দেয়া হয়। ফলে সাধারণত এটা হাওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদেরই (?) অনুরূপ ক্ষণভঙ্গুর ও ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়ে। বস্তুত একটি পরিপূর্ণ ইসলামী জিন্দেগী গঠনের জন্য সুবিস্তারিত সম্প্রসারিত, ব্যাপক গভীর ও সুদৃঢ় ঈমান একান্তই অপরিহার্য। ঈমানের বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা হতে জীবনের কোনো একটি দিক বা বিভাগও যদি বাইরে পড়ে থাকে, তবে ইসলামী জিন্দেগীর সেই দিকটিই পুণর্গঠন লাভ হতে বঞ্চিত থেকে যাবে এবং তার গভীরতায় যতোটুক অভাবই

থাকবে, ইসলামী জিন্দিগীর প্রাসাদ সেখানেই দুর্বল ও শিথিল হয়ে থাকবে, এ কথায় কোনোই সন্দেহ নেই।

উদাহরণ স্বরূপ "আল্লাহর প্রতি ঈমানের" উল্লেখ করা যেতে পারে। বস্তুত আল্লাহর প্রতি ঈমান দীন ইসলামের প্রাথমিক ভিত্তিপ্রস্তর। একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যাবে যে, আল্লাহকে স্বীকার করার উক্তিটুকু সাদাসিধে পর্যায় অতিক্রম করে বিস্তারিত ও সম্প্রসারিত ক্ষেত্রে প্রবেশ করার পর এর বিভিন্ন রূপ দেখতে পাওয়া যায়। কোথাও "আল্লাহর প্রতি ঈমান" একথা বলে শেষ করা যায় যে, আল্লাহ বর্তমান আছেন। সন্দেহ নেই, পৃথিবীর তিনি সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি এক ও অদ্বিতীয়, এটাও সত্য কথা। কোথাও আরও একটু অগ্রসর হয়ে আল্লাহকে মা'বুদ স্বীকার করা হয় এবং তার উপাসনা করার প্রয়োজনীয়তাও মেনে নেয়া হয়। কোথাও আল্লাহর গুণ এবং তাঁর অধিকার ও ক্ষমতা সম্পর্কে বিস্তারিত ও ব্যাপক ধারণাও শুধু এতোটুকু হয় যে, আলেমুল গায়েব, সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রোষ্টা, প্রার্থনা শ্রবণকারী, অভাব ও প্রয়োজন পূরণকারী তিনি এবং ইবাদাতের সকল খুঁটিনাটি রূপ একমাত্র তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট করা বাঞ্ছনীয়। এখানে কেউ তার শরীক নেই। আর "ধর্মীয় ব্যাপারসমূহে" চূড়ান্ত দলীল হিসেবে আল্লাহর কিতাবকেও স্বীকার করা হয়। কিন্তু এরূপ বিভিন্ন ধারণা বিশ্বাসের পরিণামে যে একই ধরণের জীবনব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না, তা সুস্পষ্ট কথা। বরং যে ধারণা যতোখানি সীমাবদ্ধ, কর্মজীবনে ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে ইসলামী বৈশিষ্ট্য অনিবার্যরূপে ততোখানি সংকীর্ণ হওয়াই দেখা দিবে এমনকি যেখানে সাধারণ ধর্মীয় ধারণা অনুযায়ী "আল্লাহর প্রতি ঈমান" অপেক্ষাকৃতভাবে অতীব ব্যাপক ও সম্প্রসারিত হবে, সেখানেও ইসলামী জিন্দেগীর বাস্তবরূপ এই হবে যে, একদিকে আল্লাহর দুশমনদের সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা করা হবে এবং অন্যদিকে আল্লাহর "আনুগত্য" করার কাজও সেই সংগেই সম্পন্ন করা হবে কিংবা ইসলামী নেজাম ও কাফেরী নেজাম মিলিয়ে একটি জগাখিচুরী তৈরি করা হবে।

এভাবে "আল্লাহর প্রতি ঈমান" এর গভীরতার মাপকাঠিও বিভিন্ন। কেউ আল্লাহকে স্বীকার করা সত্ত্বেও সাধারণ জিনিসকেও আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয় না। কেউ আল্লাহর কোনো কোনো জিনিস অপরাপর জিনিস অপেক্ষা 'অধিক প্রিয়' বলে মনে করে। আবার অনেক জিনিসকে আল্লাহর অপেক্ষাও প্রিয়তর হিসেবে গ্রহণ করে ; কেউ নিজের জান-মাল পর্যন্ত আল্লাহর জন্য কুরবানী করতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু নিজের মনের ঝোঁক-প্রবণতা, নিজের মতবাদ ও চিন্তাধারা কিংবা নিজের খ্যাতি ও প্রসিদ্ধিকে বিন্দুমাত্র ব্যাহত করতে প্রস্তুত হয় না। ঠিক এই হার অনুসারেই ইসলামী জিন্দেগীর স্থায়িত্ব ও ভঙ্গুরতা

নির্ধারিত হয়ে থাকে। আর যেখানেই ঈমানের বুনিয়াদ দুর্বল থেকে যায়, ঠিক সেখানেই মানুষের ইসলামী নৈতিকতা নির্মমভাবে প্রতারিত হয়।

বস্তুত ইসলামী জিন্দেগীর একটি বিরাট প্রসাদ একমাত্র সেই তাওহীদ স্বীকারের উপরই স্থাপিত হতে পারে, যা মানুষের গোটা ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবনের উপর সম্প্রসারিত হবে, যার দুরুন প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজেকে এবং নিজের প্রত্যেকটি বস্তুতেই, "আল্লাহর মালিকানা" বলে মনে করবে প্রত্যেকটি মানুষ সেই এক আল্লাহকেই নিজের এবং সমগ্র পৃথিবীর একই সংগত মালিক, মাবুদ, প্রভু অনুসরণযোগ্য এবং আদেশ-নিষেধের নিরংকুশ অধিকারী বলে মেনে নিবে। মানব জীবনের জন্য অপরিহার্য জীবনব্যবস্থার উৎস একমাত্র তাঁকেই স্বীকার করবে এবং আল্লাহর আনুগত্য বিমূখতা কিংবা তাঁর জীবন বিধান উপক্ষে করা অথবা আল্লাহর নিজ সত্তা ও গুণ-গরিমা এবং অধিকার ও ক্ষমতায় অন্যের অংশীদারিত্ব যেদিক দিয়ে এবং যেরূপেই রয়েছে, তা মারাত্মক ভ্রান্তি ও গোমরাহী হবে এই নিগূঢ় সত্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। এই প্রাসাদ অত্যধিক সুদৃঢ় হওয়া ঠিক তখনই সম্ভব, যখন কোনো ব্যক্তি পরিপূর্ণ চেতনা ও ইচ্ছা সহকারে তার নিজ সত্তা, যাবতীয় ধনপ্রাণ নিঃশেষ আল্লাহর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত করবে। নিজের মনগড়া-ভালো মন্দের মানদণ্ড চুর্ণ করে সর্বোতভাবে ও সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তোষ ও অসন্তোষকেই একমাত্র মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করবে। নিজের স্বেচ্ছাচারিতা ত্যাগ করে নিজস্ব মতবাদ, চিন্তাধারা, মনোবাসনা, মানসিক ভাবধারা ও চিন্তাপদ্ধতিকে একমাত্র আল্লাহর দেয়া জ্ঞানের (কুরআনের) আদর্শে ঢেলে গঠন করবে। যেসব কাজ সুসম্পন্ন করার মারফত আল্লাহর আনুগত্য করা হয় না, বরং যাতে আল্লাহর নাফরমানী করা হয় তা সবকিছুই পরিত্যাগ করবে। নিজের হৃদয়-মনের সর্বোচ্চ স্থানে অভিষিক্ত করবে আল্লাহর প্রেম আল্লাহর ভালবাসাকে এবং মনের মণিকোঠা হতে আল্লাহ অপেক্ষা প্রিয়তর 'ভূত' যেখানে যেখানে আছে, তা আতিপাতি করে খুঁজে বের করবে এবং তাকে চূর্ণ করবে। নিজের প্রেম-ভালবাসা, নিজের বন্ধুত্ব ও শত্রুতা, নিজের আগ্রহ ও ঘৃণা, নিজের সন্ধি ও যুদ্ধ সবকিছুকেই আল্লাহর মরজীর অধীন করে দিবে ফলে মন শুধু তাই পেতে চাইবে যা আল্লাহ পছন্দ করেন, তা হতে মন দূরে পলায়ন করতে চেষ্টা করবে। বস্তুত আল্লাহর প্রতি ঈমানের এটাই হচ্ছে নিগূঢ় অর্থ। অতএব যেখানে ঈমানই এই সকল দিক দিয়ে গভীর, ব্যাপক ও সুদৃঢ় এবং পরিপক্ক না হবে, সেখানে তাকওয়া ও ইসলাম যে হতেই পারে না তা সকলেই বুঝতে পারেন। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, দাড়ির দৈর্ঘ্য এবং পোশাকের কাটছাট অথবা তসবীহ পাঠ ও তাহাজ্জুদ নামায ইত্যাদি দ্বারা ঐরূপ ঈমানের অভাব কি কখনো পূর্ণ হতে পারে ?

এই দৃষ্টিতে ঈমানের অন্যান্য দিকগুলো সম্পর্কেও চিন্তা করে দেখা যেতে পারে। মানুষ যতোক্ষণ পর্যন্ত জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রে ও ব্যাপারেই নবীকে একমাত্র নেতা ও পথপ্রদর্শকরূপে মেনে না নিবে এবং তাঁর নেতৃত্ব বিরোধী কিংবা এর প্রভাব মুক্ত যত নেতৃত্বই দুনিয়াতে প্রচলিত হবে, তার সবগুলোকেই যতোক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যাহার না করবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত রসূলের প্রতি ঈমান কিছুতেই পূর্ণ হতে পারে না। আল্লাহর কিতাব প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা ও নীতিসমূহ ছাড়া অন্য কোনো আদর্শের প্রতিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হওয়ার এক বিন্দুভাব বর্তমান থাকলে কিংবা আল্লাহর নাযিলকৃত ব্যবস্থাকে নিজের ও সমগ্র পৃথিবীর জীবন বিধানরূপে প্রতিষ্ঠিত দেখার জন্য মনের ব্যাকুলতার কিছুমাত্র অভাব পরিলক্ষিত হলে আল্লাহর কিতাবের প্রতি ঈমান আনা হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে না, সে ঈমান বাস্তবিকই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অনুরূপভাবে পরকালের প্রতি ঈমান ও পূর্ণতা লাভ করতে পারে না যতোক্ষণ না মানুষের মন অকুণ্ঠভাবে পরকালকে ইহকালের উপর প্রাধান্য ও গুরুত্ব দান করবে। পরকালীন কল্যাণের মূল্যমানকে ইহকালীন কল্যাণের মূল্যমান অপেক্ষা অধিকতর গ্রহণযোগ্য শেষোক্তটিকে প্রথমটির মোকাবিলায় প্রত্যাখ্যান যোগ্য বলে মনে করবে এবং যতোক্ষণ পর্যন্ত না পরকালে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করার বিশ্বাস তার জীবনের প্রত্যেক পদক্ষেপেই তাকে ভাবতে ও সংযত করে তুলবে। বস্তুত এই মূল ভিত্তিসমূহই যেখানে পূর্ণ হবে না, সুদৃঢ় ও ব্যাপক হবে না, সেখানে ইসলামী জিন্দেগীর বিরাট প্রাসাদ কিসের উপর দাঁড় করানো যেতে পারে, তা কি একবারও চিন্তা করে দেখেছেন? কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক যখন এই ভিত্তিসমূহের পূর্ণতা ব্যাপকতা ও পক্কতা সাধন ছাড়াই ইসলামী নৈতিকতার প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলে মনে করলো, তখন ইসলামী সমাজে মারাত্মক বিপর্যয় দেখা গেল। দেখা গেল আল্লাহর কিতাবের সম্পূর্ণ বিপরীত রায় দানকারী বিচারপতি ; শরীয়াত বিরোধী আইনের ভিত্তিতে ব্যবসায়ী ও উকিল ; কাফেরী সমাজব্যবস্থা অনুযায়ী জীবনের কাজ-কর্মসম্পন্নকারী কর্মী ; কাফেরী আদর্শের তমদ্দুন ও রাষ্ট্রব্যবস্থানুযায়ী জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টানুবর্তী নেতা ও জনতা সকলের জন্যই তাকওয়া ও ইহসানের উচ্চতম পর্যায়সমূহ হাসিল করা একেবারে সহজ হয়ে গেল। সকলেরই জন্য এর দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল। আর তাদের জীবনের বাহ্যিক বেশ-ভূষা ধরণ-ধারণ ও আচার-অনুষ্ঠানকে একটি বিশেষ ধরনে গঠণ করা এবং কিছু নফল নামায, রোযা ও জেকের-আজকারের অভ্যাস করাই সেজন্য যথেষ্ট বলে মনে করা হলো।

ইসলাম

ঈমানের উপোরক্ত ভিত্তিসমূহ যখন বাস্তবিকই পরিপূর্ণ ও দৃঢ়রূপে স্থাপিত হয়। তখনই তার উপর ইসলামের দ্বিতীয় অধ্যায় রচনা করার কাজ শুরু হয়। বস্তুত ইসলাম হচ্ছে ঈমানেরই বাস্তব অভিব্যক্তি ঈমানেরই কর্মরূপ। ঈমান ও ইসলামের পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক বীজ ও বৃক্ষের পারস্পরিক সম্পর্কের অনুরূপ। বীজের মধ্যে যা কিছু যেভাবে বর্তমান থাকে, তাই বৃক্ষের রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এমনকি, বৃক্ষের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে বীজের মধ্যে কি ছিলো, আর কি ছিলো না, তা অতি সহজেই অনুমান করা যায়। বীজ না হওয়া সত্ত্বেও বৃক্ষের অস্তিত্ব যেমন কেউ ধারণা করতে পারে না, অনুরূপভাবে এটাও ধারণা করা যায় না যে, জমি বন্ধ্যা ও অনুর্বর নয় এমন জমিতে বীজ বপন করলে বৃক্ষ অংকুরিত হবে না। প্রকৃতপক্ষে ঈমান ও ইসলামের অবস্থা ঠিক এরূপ। যেখানে বস্তুতই ঈমানের অস্তিত্ব থাকবে, সেখানে ব্যক্তির বাস্তব জীবনে, কর্মজীবনে, নৈতিকতায়, গতিবিধিতে, রুচি ও মানসিক ঝোঁক-প্রবণতায় স্বভাব-প্রকৃতিতে, দু:খ-কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকারের দিকে ও পথে, সময়, শক্তি এবং যোগ্যতার বিনিয়োগ জীবনের প্রতিটি দিকে ও বিভাগে, প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারেই এর বাস্তব অভিব্যক্তি ও বহি:প্রকাশ হবেই হবে। উল্লেখিত দিক সমূহের মধ্যে কোনো একটি দিকেও যদি ইসলামের পরিবর্তে ইসলাম বিরোধী কার্যক্রম ও ভাবধারা প্রকাশ হতে দেখা যায়, তবে নি:সন্দেহে মনে করতে হবে যে, সেই দিকটি ঈমান শূন্য অথবা তা থাকলেও একেবারে নিঃসার, নিস্তেজ ও অচেতন হয়ে রয়েছে যা থাকা বা না থাকা উভয়ই সম্পূর্ণ সমান। আর বাস্তব কর্মজীবন যদি সম্পূর্ণরূপে অমুসলিমদের ধারা-পদ্ধতিতে যাপিত হয়, তবে তার মনে ঈমানের অস্তিত্ব নেই। কিংবা থাকলেও তার ক্ষেত্র অত্যন্ত অনুর্বর ও উৎপাদন শক্তিহীন হওয়ার কারণে ঈমানের বীজই তথায় অংকুরিত হতে পারেনি বলে মনে করতে হবে। যা হোক, আমি কুরআন ও হাদিস যতোদুর বুঝতে পেরেছি তার উপরে নির্ভর করে বলতে পারি যে, মনের মধ্যে ঈমান বর্তমান থাকা এবং কর্মজীবনে ইসলামের বাস্তব প্রকাশ না হওয়া একেবারেই অসম্ভব ও অস্বাভাবিক।

(এই সময় একজন শ্রোতা দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে, ঈমান ও আমলকে কি আপনি একই জিনিস বলে মনে করেন? অথবা এই দু'টির মধ্যে আপনার দৃষ্টিতে কোনো পার্থক্য আছে? এই প্রশ্নের উত্তরে মাওলানা মওদুদী বলেন)

এ সম্পর্কে ফিকাহ শাস্তকার ও কালাম শাস্তবিদদের উত্থাপিত বির্তক অল্প সময়ের জন্য মন হতে দূরে রেখে সরাসরিভাবে কুরআন মজীদ হতে এই প্রশ্নের উত্তর পেতে চেষ্টা করুন। কুরআন হতে সুস্পষ্টরূপে জানতে পারা যায় যে,

বিশ্বাসগত ঈমান ও বাস্তব কর্মজীবনের ইসলাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে ঈমান ও সৎকাজের (আমলে সালেহ) একই সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তাঁর সকল ভালো ভালো প্রতিশ্রুতি কেবল সেই বান্দাদের জন্য যারা বিশ্বাসের দিক দিয়ে ঈমানদার এবং বাস্তব কর্মের দিক দিয়ে পূর্ণরূপে 'মুসলিম' পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালা যেসব লোককে 'মুনাফিক, বলে নির্দিষ্ট করেছেন তাদের বাস্তব কর্মের দোষ-ত্রুটির ভিত্তিতেই তাদের ঈমানের অন্তসারশূন্যতা প্রমাণ করেছেন এবং বাস্তব কর্মগত ইসলামকেই প্রকৃত ঈমানের লক্ষণ বলে নির্দিষ্ট করেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, আইনত কাউকে 'কাফের' ঘোষণা করা এবং মুসলিম জাতির সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং সে ব্যাপারে অতিশয় সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিহার্য। কিন্তু পৃথিবীতে শাস্ত্রীয় আইন প্রযুক্ত হতে পারে যে ঈমান ও ইসলামের উপর, এখানে আমি সেই ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করছি না। বরং যে ঈমান আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য এবং পরকালীন ফলাফল যার ভিত্তিতেই মীমাংসিত হবে, এখানে আমি কেবল সেই ঈমান সম্পর্কেই বলছি। আইনগত দৃষ্টিভংগী পরিত্যাগ করে প্রকৃত ব্যাপার ও নিগূঢ় সত্যটি যদি আপনি জানতে চেষ্টা করেন, তবে নিশ্চিতরূপেই দেখতে পাবেন যে, কার্যত যেখানে সামনে আত্মসমর্পণ, আত্মোৎসর্গ ও পরিপূর্ণরূপে আত্মাহুতির অভাব রয়েছে, যেখানে নিজ মনের ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার সাথে মিশে একাকার হয়ে যায়নি–পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে, যেখানে আল্লাহর আনুগত্য করে চলার সংগে সংগে কার্যত 'অন্য শক্তির' ও আনুগত্য করা হচ্ছে, যেখানে আল্লাহর দীন ইসলাম কায়েম করার উদ্দেশ্যে চেষ্টা সাধনার পরিবর্তে অন্যান্য কাজের দিকেই মনের ঝোঁক ও আন্তরিক নিষ্ঠা রয়েছে, যেখানে আল্লাহর নির্দিষ্ট পথে চেষ্টা-সাধনা এবং দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করা হচ্ছে না, বরং এ সবকিছুই হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে–ভিন্ন উদ্দেশ্যে, সেখানে যে ঈমানের মৌলিক ত্রুটি রয়েছে তাতে কোনোই সন্দেহ থাকতে পারে না। আর অসম্পূর্ণ ত্রুটিপূর্ণ ঈমানের উপর তাকওয়া ও ইহসানের অধ্যায় যে রচিত হতে পারে না তা বলাই বাহুল্য। বাহ্যিক বেশ-ভুষার তাকওয়া কিংবা ইহসানের কৃত্রিম অনুকরণের চেষ্টা করলেও এর প্রকৃত ভাবধারা লাভ করা সম্ভব নয়। বাহ্যিক বেশ-ভূষা ও কৃত্রিম আচার-অনুষ্ঠান সাধারণত অন্ত সারশূন্য হলে এবং অন্তনিহিত ভাবধারার সাথে বাহ্যিক বেশ-ভুষার সামঞ্জস্য না হলে তা একটি সুশ্রী ও সুঠাম মৃতদেহের অনুরূপ হয়ে থাকে। এর বাহ্যিক আকার-আকৃতি ও বেশ-ভূষা যতোই সুন্দর ও উত্তম হোক না কেন, তা প্রাণশূন্য বলে জনগণ তা দেখে প্রতারিত হতে পারে মাত্র। এই বাহ্যিক বেশ ভূষা ও সুঠাম দেহের প্রতি কোনো কাজের আশা করে থাকলে বাস্তব ঘটনাই তার

ব্যর্থতা প্রমাণ করবে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা হতে নি:সন্দেহে জানতে পারা যাবে যে, একটি কুৎসিত জীবিত মানুষ একটি সুশ্রী লাশ অপেক্ষা অধিক কার্যকরী হয়ে থাকে। প্রকাশ্য বেশ-ভূষার দ্বারা নিজেকে সান্ত্বনা দেয়া ও আত্মপ্রতারণা করা সহজ বা সম্ভব, কিন্তু বাস্তব পরীক্ষায় এর কোনো মূল্যই প্রমাণিত হয় না আল্লাহর নিকট এর একবিন্দু মূল্য হওয়া তো দূরের কথা। অতএব বাহ্যিক নয়, প্রকৃত ও আন্তরিক নিষ্ঠাপূর্ণ তাকওয়া ও ইহসান লাভ করতে হলে আর এটা ছাড়া দুনিয়ার বুকে আল্লাহর দীনের প্রতিষ্ঠা এবং পরকালীন কল্যাণ লাভ মাত্রই সম্ভব নয় আমার একথা মনের পৃষ্ঠায় বদ্ধমূল করে নিন যে, উপরের এ দু'টি পর্যায় কিছুতেই গড়ে উঠতে পারে না, যতোক্ষণ না ঈমানের ভিত্তিমূল সুদৃঢ় হবে। আর যতোক্ষণ পর্যন্ত কর্মগত ইসলাম কার্যত আল্লাহর আনুগত্য ও অনুসরণের ভিতর দিয়ে নি:সন্দেহে বাস্তব প্রমাণ পাওয়া না যাবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের ভিত্তি মজবুত হতে পারে না।

তাকওয়া

তাকওয়া সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার পূর্বে 'তাকওয়া' কাকে বলে তা জেনে নেয়া আবশ্যক। তাকওয়া কোনো বাহ্যিক ধরণ-ধারণ এবং বিশেষ কোনো সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের নাম নয়। তাকওয়া মূলত মানব মনের সেই অবস্থাকেই বলা হয় যা আল্লাহর গভীর ভীতি ও প্রবল দায়িত্বানুভূতির দরুন সৃষ্টি হয় এবং জীবনের প্রত্যেকটি দিকে স্বতস্ফূর্তভাবে আত্মপ্রকাশ করে। মানুষের মনে আল্লাহর ভয় হবে, নিজে আল্লাহর দাসানুদাস এই চেতনা জাগ্রত থাকবে, আল্লাহর সামনে নিজের দায়িত্ব ও জবাবদিহি করার কথা স্মরণ থাকবে এবং এই একটি পরীক্ষাগার, আল্লাহ জীবনের একটি নির্দিষ্ট আয়ুদান করে এখানে পাঠিয়েছেন, এই খেয়াল তীব্রভাবে বর্তমান থাকবে। পরকালে ভবিষ্যতের ফায়সালা এই দৃষ্টিতে হবে যে, এই নির্দিষ্ট অবসরকালের মধ্যে এই পরীক্ষাগারে নিজের শক্তি, সামর্থ্য ও যোগ্যতা কিভাবে প্রয়োগ করেছে, আল্লাহর ইচ্ছানুক্রমে যেসব দ্রব্যসামগ্রী লাভ করতে পেরেছে, তার ব্যবহার কিভাবে করেছে এবং আল্লাহর নিজস্ব বিধান অনুযায়ী জীবনকে বিভিন্ন দিক দিয়ে যেসব মানুষের সাথে বিজড়িত করেছে, তাদের সাথে কিরূপ কাজ-কর্ম ও লেন-দেন করা হয়েছে একথাটিও মনের মধ্যে জাগরুক থাকবে।

বস্তুত এরূপ অনুভূতি ও চেতনা যার মধ্যে তীব্রভাবে বর্তমান থাকবে, তার হৃদয় মন জাগ্রত হবে, তার ইসলামী চেতনা তেজস্বী হবে, আল্লাহর মর্জির বিপরীত প্রত্যেকটি বস্তুই তার মনে খটকার সৃষ্টি করবে, আল্লাহর মনোনীত প্রত্যেকটি জিনিসই তার রুচিতে অসহ্য হয়ে উঠবে, তখন সে নিজেই নিজের যাচাই করবে। তার কোন্ ধরনের ঝোঁক ও ভাবধারা লালিত-পালিত হচ্ছে নিজেই তার

জরীপ করবে। সে কোন্ সব কাজ-কর্মে নিজের সময় ও শক্তি ব্যয় করছে তার হিসেব সে নিজেই করতে শুরু করবে। তখন সুস্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ কোনো কাজ করা দূরের কথা সংশয়পূর্ণ কোনো কাজেও লিপ্ত হতে সে নিজে ইতস্তত করবে। তার অন্তর্নিহিত কর্তব্যজ্ঞানই তাকে আল্লাহর সকল নির্দেশ পূর্ণ আনুগত্যের সাথে পালন করতে বাধ্য করবে। যেখানেই আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমালংঘন হওয়ার আশংকা হবে, সেখানেই তার অন্তর্নিহিত আল্লাহভীতি তার পদযুগলে প্রবল কম্পন সৃষ্টি করবে চলৎশক্তি রহিত করে দিবে। আল্লাহর হক ও মানুষের হক রক্ষা করা স্বতর্স্ফূত রূপেই তার স্বভাবে পরিণত হবে। কোথাও সত্যের বিপরীত কোনো কথা বা কাজ তার দ্বারা না হয়ে পড়ে সেই ভয়ে তার মন সতত কম্পমান থাকবে। এরূপ অবস্থা বিশেষ কোনো ধরণে কিংবা বিশেষ কোনো পরিধির মধ্যে পরিলক্ষিত হবে না, ব্যক্তির সমগ্র চিন্তা-পদ্ধতি এবং তার সমগ্র জীবনের কর্মধারাই এর বাস্তব অভিব্যক্তি হবে। এর অনিবার্য প্রভাবে এমন এক সুসংবদ্ধ সহজ, ঋজু এবং একই ভাবধারা বিশিষ্ট ও পরম সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকৃতি গঠিত হবে, যাতে সকল দিক দিয়েই একই প্রকারের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা ফুটে উঠবে। পক্ষান্তরে কেবল বাহ্যিক আকার-আকৃতি ও কয়েকটি নির্দিষ্ট পথের অনুসরণ এবং নিজেকে কৃত্রিমভাবে কোনো পরিমাপযোগ্য ছাঁচে ঢেলে নেয়াকেই যেখানে তাকওয়া বলে ধরে নেয়া হয়েছে, সেখানে শিখিয়ে দেয়া কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ ধরণ ও পদ্ধতিতে 'তাকওয়া' পালন হতে দেখা যাবে, কিন্তু সেই সঙ্গে জীবনের অন্যান্য দিকে ও বিভাগে এমনসব চরিত্র, চিন্তা-পদ্ধতি ও কর্মনীতি পরিলক্ষিত হবে, যা 'তাকওয়া' তো দূরের কথা ঈমানের প্রাথমিক স্তরের সাথেও এর কোনো সামঞ্জস্য হবে না। এটাকেই হযরত ঈসা (আ) উদাহরণের ভাষায় বলেছেন : "এক দিকে মাছি বলে বাহির কর আর অন্যদিকে বড় বড় উট অবলীলাক্রমে গলধকরণ কর।"

প্রকৃত তাকওয়া এবং কৃত্রিম তাকওয়ার পারস্পরিক পাথর্ক্য অন্য একভাবেও বুঝতে পারা যায়। যে ব্যক্তির মধ্যে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার একটি তীব্র ও জাগ্রত রুচি অনুভূতি বর্তমান রয়েছে সে নিজেই অপবিত্রতা ও পংকিলতাকে ঘৃণা করবে তা যে আকারেই হোক না কেন এবং পবিত্রতাকে পূর্ণরূপে ও স্থায়ীভাবে গ্রহণ করবে। তার বাহ্যিক অনুষ্ঠান যথাযথভাবে প্রতিপালিত না হলেও কোনো আপত্তি থাকবে না। অপর ব্যক্তির আচরণ এর বিপরীত হবে। কারণ, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার কোনো স্বতস্ফূর্ত চেতনা তার মধ্যে নেই বরং ময়লা ও অপবিত্রতার একটি তালিকা কোথা হতে লিখে নিয়ে সবসময়ই সঙ্গে রেখে চলে, ফলে এই ব্যক্তি তার তালিকায় উল্লেখিত ময়লাগুলো হতে নিশ্চয় আত্মরক্ষা করবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও উহা অপেক্ষা অধিক জঘন্য ও ঘৃণিত বহু প্রকার পংকিলতার মধ্যে সে অজ্ঞাতসারেই লিপ্ত হয়ে পড়বে, তা নিঃসন্দেহে। কারণ,

তালিকায় অনুল্লেখিত পংকিলতা যে কোনোরূপ পংকিল বা ঘৃণিত হতে পারে এটা সে মাত্রই বুঝতে পারে না। এই পার্থক্য কেবল নীতিগত ব্যাপারেই নয়, চারদিকে যাদের তাকওয়ার একেবারে ধুম পড়ে গেছে তাদের জীবনে এই পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। তারা একদিকে শরীয়াতে খুঁটিনাটি বিষয়ে খুবই কড়াকড়ি করে থাকে, এমনকি দাড়ির দৈর্ঘ্য একটি বিষেশ পরিমাপ হতে একটু কম হলেই তাকে জাহান্নামী হওয়ার 'সুসংবাদ' শুনিয়ে দিতে সঙ্কোচবোধ করে না এবং ফিকাহর শাস্ত্রীয় মত হতে কোথাও সমাজ বিচ্যুতিকেও তারা দীন ইসলামের সীমালংঘন করার সমান মনে করে। কিন্তু অন্যদিকে ইসলামের মূলনীতি ও বুনিয়াদী আদর্শকে তারা চরমভাবে উপেক্ষা করে চলে। গোটা জীবনের ভিত্তি তারা স্থাপিত করেছে 'রোখছত' অনুমতি ও রাজনৈতিক সুবিধাবাদী নীতির উপর। আল্লাহর দীন ইসলাম কায়েম করার জন্য চেষ্টা-সাধনা ও সংগ্রাম করার দায়িত্ব এড়ানোর জন্য তারা বহু সুযোগের পথ আবিষ্কার করে নিয়েছে। কাফেরী রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে তারা ইসলামী জিন্দেগী যাপনের প্রস্তুতি করার জন্যই সকল চেষ্টা ও সাধনা নিযুক্ত করে রেখেছে। শুধু তা ই নয়, তাদেরই ভুল নেতৃত্ব মুসলমানদেরকে একথা বুঝিয়েছে যে, এক ইসলাম বিরোধী সমাজব্যবস্থার অধীন থেকে বরং এর 'খিদমত' করেও সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে ধর্মীয় জীবনযাপন করা যায় এবং তাতেই দীন ইসলামের যাবতীয় নির্দেশ প্রতিপালিত হয়ে যায় অতপর ইসলামের জন্য তাদেরকে আর কোনো চেষ্টা-সাধনা বা কষ্ট স্বীকার আদৌ করতে হবে না। এটা অপেক্ষাও অধিকতর দুঃখের কথা এই যে, তাদের সামনে দীন ইসলামের মূল দাবি যেমন পেশ করা হয় এবং দীন (ইসলামী নেজাম) কায়েম করার চেষ্টা সাধনা ও আন্দোলনের দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, তখন তারা এর প্রতি শুধু চরম উপেক্ষাই প্রদর্শন করে না, এটা হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এবং অন্যান্য মুসলমানকেও তা হতে বিরত রাখার জন্যে শত রকমের কৌশলের আশ্রয় নেয়। আর এতোসব সত্ত্বেও তাদের 'তাকওয়া' ক্ষুন্ন হয় না ; আর ধর্মীয় মনোবৃত্তি সম্পন্ন লোকদের মনে তাদের 'তাকওয়ার' অন্তসারশূন্যতা সম্পর্কে সন্দেহ মাত্র জাগ্রত হয় না। এভাবেই প্রকৃত ও নিষ্ঠাপূর্ণ 'তাকওয়া' এবং কৃত্রিম ও অন্তসারশূন্য 'তাকওয়ার' পারস্পরিক পাথর্ক্য বিভিন্নরূপে সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। কিন্তু তা অনুভব করার জন্য 'তাকওয়ার' প্রকৃত ধারণা মনের মধ্যে পূর্বেই বদ্ধমুল হওয়া অপরিহার্য।

কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদ, চলাচল, উঠাবসা ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের বাহিক্যরূপ যা হাদিস হতে প্রমাণিত হয়েছে তাকে আমি হীন ও অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করি, আমার পূর্বোক্ত আলোচনা হতে সেরূপ ধারণা করা মারাত্মক ভুল হবে সন্দেহ নেই। এরূপ কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না। বস্তুত আমি

শুধু একথাই বুঝাতে চাই যে, প্রকৃত তাকওয়াই হচ্ছে আসল গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, তার বাহ্যিক প্রকাশ মূখ্য নয়, গৌণ। আর প্রকৃত 'তাকওয়ার' মহিমা দীপ্তি যার মধ্যে স্বতস্ফূর্ত হয়ে উঠবে, তার সমগ্র জীবনই পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের সাথে খাঁটি 'ইসলামী' জীবন-রূপেই গড়ে উঠবে এবং তার চিন্তাধারায়, মতবাদে, তার হৃদয়াবেগ ও মনের ঝোঁক প্রবণতায়, তার স্বভাবগত রুচি তার সময় বন্টন ও শক্তিনিচয়ের ব্যয়-ব্যবহার তার চেষ্টা-সাধনার পথে পন্থায়, তার জীবনধারায় ও সমাজ পদ্ধতিতে, তার আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে, তার সমগ্র পার্থিব ও বৈষয়িক জীবনের প্রত্যেকটি দিকে ও বিভাগে পূর্ণ ব্যাপকতা ও সামগ্রিকতার সাথে ইসলাম রূপায়িত হতে থাকবে। কিন্তু আসল তাকওয়া অপেক্ষা তার বাহ্যিক বেশ- ভূষাকেই যদি প্রাধান্য দেয়া হয় তার উপরই যদি অযথা গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং প্রকৃত তাকওয়ার বীজ বপন ও তার পরিবর্ধনের জন্য যত্ন না নিয়ে যদি কৃত্রিম উপায়ে কয়েকটি বাহ্যিক হুকুম-আহকাম পালন করানো হয়, তবে বর্ণিত রূপেই যে এর পরিণাম ফল প্রকাশিত হবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। প্রথমোক্ত কাজ অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ, সেই জন্য অসীম ধৈর্য্যের আবশ্যক ; ক্রমবিকাশের নীতি অনুসারেই তা বিকশিত হয়ে এবং দীর্ঘ সময়ের সাধনার পরই তা সুশোভিত হয়ে থাকে ঠিক যেমন একটি বীজ হতে বৃক্ষ সৃষ্টি এবং তাতে ফুল এবং ফল ধারণে স্বভাবতই বহু সময়ের আবশ্যক হয়। এ কারণেই স্থুল ও অস্থির স্বভাবের লোক ঐরূপ তাকওয়া লাভ করার জন্য চেষ্টা করতে সাধারণত প্রস্তুত হয় না। দ্বিতীয় প্রকার তাকওয়া, তাকওয়ার বাহ্যিক বেশ ভুষা, সহজলভ্য, অল্প সময় সাপেক্ষ। যেমন একটি কাষ্ঠখণ্ডের পত্র ও ফুল ফল বেঁধে "ফল ফুলে শোভিত একটি বৃক্ষ" দাঁড় করা হয়ত বা সহজ ; কিন্তু মূলত তা কৃত্রিম, প্রতারণামূলক এবং ক্ষণস্থায়ী। এজন্যই আজ শেষোক্ত প্রকারের তাকওয়াই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কিন্তু একটি স্বাভাবিক বৃক্ষ হতে যা কিছু লাভ করার আশা করা যায় ; একটি কৃত্রিম বৃক্ষ হতে তা কিছুতেই সম্ভব নয়, এটা সর্বজনবিদিত সত্য।

ইহসান

এখন 'ইহসান' সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। পূর্বেই বলা হয়েছে, এটা ইসলামী জীবন প্রাসাদের সর্বোচ্চ মঞ্জিল সর্বোচ্চ পর্যায়। মুলত : 'ইহসান' বলা হয় : আল্লাহ তাঁর রসূল এবং তাঁর ইসলামের সাথে মনের এমন গভীরতম ভালবাসা, দুশ্ছেদ্যবন্ধন ও আত্মহারা প্রেম পাগল ভাবধারাকে, যা একজন মুসলমানকে 'ফানা ফিল ইসলাম' 'ইসলামের জন্য আত্মোৎসর্গীকৃত প্রাণ' করে দিবে। তাকওয়ার মূল কথা হচ্ছে আল্লাহর ভয়, যা আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ হতে দূরে সরে থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। আর ইহসানের মূলকথা হচ্ছে আল্লাহর প্রেম

আল্লাহর ভালবাসা। এটা মানুষকে আল্লাহর সন্তোষ লাভ করার জন্য সক্রিয় করে তোলে। এ দু'টি জিনিসের পারস্পরিক পাথর্ক্য একটি উদাহরণ হতে বুঝা যায়। সরকারি চাকুরীজীবিদের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যক লোক থাকে, যারা নিজ নিজ নির্দিষ্ট দায়িত্ব, কতর্ব্যানুভূতি ও আগ্রহ উৎসাহের সাথে যথাযথভাবে আঞ্জাম দেয়। সমগ্র নিয়ম-কানুন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে তারা চলে এবং সরকারের দৃষ্টিতে আপত্তিকর কোনো কাজই তারা কখনো করে না। এ ছাড়া আর এক ধরনের লোক থাকে, যারা ঐকান্তিক নিষ্ঠা, আন্তরিক ব্যগ্রতা ও তিতিক্ষা এবং আত্মোৎসর্গপূর্ণ ভাবধারার সাথেই সরকারের কল্যাণ কামনা করে। তাদের উপর যেসব কাজ ও দায়িত্ব অর্পিত হয়, তারা কেবল তাই সম্পন্ন করে না, যেসব কাজে রাষ্ট্রের কল্যাণ ও উন্নতি হতে পারে আন্তরিকতার সাথে সেইসব কাজও তারা আঞ্জাম দেবার জন্য যত্নবান হয় এবং এজন্য তারা আসল কর্তব্য ও দায়িত্ব অপেক্ষা অনেক বেশি কাজ করে থাকে। রাষ্ট্রের ক্ষতিকর কোনো ঘটনা ঘটে বসলেই তারা নিজেদের জানমাল ও সন্তান সবকিছুই উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত হয়। কোথাও আইন-শৃঙ্খলা লংঘিত হতে দেখলে তাদের মনে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। কোথাও রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও বিদ্রোহ ঘোষণার লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হলে তা অস্থির হয়ে পড়ে এবং তা দমন করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। নিজে সচেতনভাবে রাষ্ট্রের ক্ষতি করা তো দূরের কথা তার স্বার্থে সামান্য আঘাত লাগতে দেয়া তাদের পক্ষে সহ্যাতীত হয়ে পড়ে এবং সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি দূর করার ব্যাপারে সাধ্যানুসারে চেষ্টার বিন্দুমাত্র ত্রুটি করে না। পৃথিবীর সর্বত্র একমাত্র তাদের রাষ্ট্রের জয়জয়কার হোক এবং সর্বত্রই এরই বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়ে পত পত করতে থাকুক এটাই হয় এই শ্রেণীর সরকারি কর্মচারীদের মনের বাসনা। এই দু'য়ের মধ্যে প্রথমোক্ত কর্মচারীগণ হয় রাষ্ট্রের 'মুত্তাকী' আর শেষোক্ত কর্মচারীগণ হয় 'মুহসীন' উন্নতি এবং উচ্চপদ মুত্তাকীরাও লাভ করে থাকে, বরং যোগ্যতম কর্মচারীদের তালিকায় তাদেরই নাম বিশেষভাবে লিখিত থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'মুহসিনদের' জন্য সরকারের নিকট যে সম্মান ও মযার্দা হয়ে থাকে, তাতে অন্য কারোই অংশ থাকতে পারে না। ইসলামে 'মুত্তাকী' ও 'মুহসীনদের' পারস্পরিক পার্থক্য উক্ত উদাহরণ হতে সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারা যায়। ইসলামে মুত্তাকীদেরও যথেষ্ট সম্মান রয়েছে। তারাও শ্রদ্ধাভাজন সন্দেহ নেই কিন্তু ইসলামের আসল শক্তি হচ্ছে মুহসিনগণ। আর পৃথিবীতে ইসলামের মূল উদ্দেশ্য একমাত্র 'মুহসিনদের' দ্বারাই সুম্পন্ন হতে পারে।

ইহসান এর নিগূঢ় তত্ত্ব জেনে নেয়ার পর প্রত্যেক পাঠকই অনুমান করতে পারেন যে, যারা আল্লাহর দীন ইসলামকে কুফরের অধীন কুফর কর্তৃক প্রভাবান্বিত দেখতে পায়, যাদের সামনে আল্লাহ নির্ধারিত সীমালংঘিত পর্যুদস্তই শুধু নয় নিঃশেষে ধ্বংস করার ব্যবস্থা করা হয়, আল্লাহর বিধান কেবল কার্যতই নয়

সর্বতোভাবেই বাতিল করে দেয়া হয়, আল্লাহর পৃথিবীতে আল্লাহর পরিবর্তে আল্লাহদ্রোহীদের 'রাজত্ব' ও প্রভাব স্থাপিত হয়, কাফেরী ব্যবস্থার আধিপত্যে কেবল জনসমাজেই নৈতিক ও তামাদ্দুনিক বিপর্যয় উদ্ভূত হয় না, স্বয়ং মুসলিম জাতিও অত্যন্ত দ্রুততার সাথে নৈতিক ও বাস্তব (কর্মগত) ভুলভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে, সেখানে এসব প্রত্যক্ষ করার পরও যাদের মনে একটু ব্যাথা দুঃখ বা চিন্তা জেগে ওঠে না, এই অবস্থার পরিবর্তন সাধনের জন্য উদ্যম ও প্রয়োজনীয়তাবোধই যাদের মধ্যে জাগ্রত হয় না, বরং যারা নিজেদের মনকে এবং মুসলমান জনসাধারণকে ইসলাম বিরোধী জীবনব্যবস্থার প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠাকে নীতিগত ও কার্যত বরদাশত করার জন্য সান্ত্বনা দেয় ; এই শ্রেণীর লোকদেরকে 'মুহসিন' বলে কিরূপে মনে করা যেতে পারে, তা বুঝতে পারি না। আরো আশ্চার্যের বিষয় এই মারাত্মক অপরাধ ও গোনাহ করা সত্ত্বেও কেবল চাশত, এশরাক ও তাহাজ্জুদ প্রভৃতি নফল নামাজ পড়ার দরুন, জেকের-আজকার, মোরাকাবা-মুশাহিদা, হাদিস-কুরআনের অধ্যাপনা, খুঁটিনাটি সুন্নাত পালনের দ্বারা মানুষ ইহসানের উচ্চতর পর্যায়ে পৌছতে পারে বলে মনে করা হয়।

سر داد نداد دست در دست یزید

"মস্তক দিয়েছি, কিন্তু ইয়াজীদের হাতে হাত মিলাতে প্রস্তুত হইনি।"

এরূপ বিপ্লবী ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং আত্মোৎসর্গীভাব কোনো লোকের মধ্যেই ওঠেনি। এজন্যই بازی اکرجه بانه سکا سرتو کهوسکا

"জয়লাভ হয় তো করিনি, নিজের মস্তক তো উৎসর্গ করতে পেরেছি।" বলে নিজেকে সত্যিকারভাবে একমাত্র আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করতে পারিনি।

দুনিয়ার বৈষয়িক রাষ্ট্র এবং জাতিসমূহের মধ্যেও নিষ্ঠাবান, অনুগত এবং অবাধ্য কর্মচারীদের মধ্যে বাস্তবক্ষেত্রে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। দেশে বিদ্রোহ ঘোষিত হলে কিংবা দেশের কোনো অংশের উপর শত্রুপক্ষের আধিপত্য স্থাপিত হলে তখন যারা বিদ্রোহ ও শত্রুদের এই অন্যায় পদক্ষেপকে সংগত বলে মনে করে, অথবা এতে সন্তোষ প্রকাশ করে এবং তাদের সাথে বিজিতের ন্যায় আচরণ করতে শুরু করে, কিংবা তাদের প্রভুত্বাধীন এমন এক সমাজব্যবস্থা গঠন করে যার কর্তৃত্বের সকল চাবিকাঠি শত্রুদের নিকট থাকবে, আর কিছু ছোটখাটো ব্যাপারের আবিষ্কার ও ক্ষমতা তারা নিজেরা লাভ করবে কোনো রাষ্ট্র কিংবা জাতিই এই শ্রেণীর লোকদেরকে অনুগত বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য নাগরিকরূপে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয় না। জাতীয় পোশাক ও বাহ্যিক চালচলন কঠোরভাবে অনুসরণ করে চললেও এবং খুঁটিনাটি ব্যাপারে জাতীয় আইন দৃঢ়তার সাথে পালন করে চললেও এর কোনো মূল্যই দেয়া হয় না, বর্তমান যুগের কতো ঘটনাকেই এর উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে পেশ করা যেতে পারে।

বিগত মহাযুদ্ধের প্রথম অধ্যায়ে জার্মানী বহু দেশ দখল করেছিল এবং সেই বিজিত দেশসমূহের অধিবাসীদের মধ্যে অনেক লোকই তাদের সাথে সহযোগিতা করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এই দেশগুলো যখন জার্মান প্রভুত্ব হতে মুক্তিলাভ করলো তখন জার্মান প্রভুত্বের সাথে সহযোগিতাকারীদের প্রতি নির্মম ব্যবহার করা হয়েছিল। এসব রাষ্ট্র ও জাতির নিকট নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য যাচাই করার একটি মাত্র মাপকাঠি রয়েছে। শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ শত্রুপক্ষের প্রভুত্ব বিলুপ্তির জন্য কে কতোখানি কাজ করেছে এবং যার প্রভুত্ব সে স্বীকার করে বলে দাবী করে, তাকে পুন:প্রতিষ্ঠার জন্য কে কতোখানি চেষ্টা ও সাধনা করেছে নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য যাচাই করার এটাই হচ্ছে একমাত্র মানদণ্ড।

দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলোরই যখন এরূপ অবস্থা সকল প্রকার আনুগত্যকে এই তীব্র শাণিত মানদণ্ডে যাচাই করে নেয়াই যখন এদের রীতি দুনিয়ার কমবুদ্ধির মানুষের ন্যায় নিজের নিষ্ঠাবান আনুগত্য ও অবাধ্যতাকে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহর নিকট কি কোনো মানদণ্ড নেই? আল্লাহ তায়ালা কি শুধু শ্মশ্রুর দৈর্ঘ, লংগী-পায়জামার উর্ধস্থতা, তসবীহ পাঠ এবং দরূদ, অজীফা, নফল এবং মোরাকাবা প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ-কর্ম দেখে প্রতারিত হবেন, আর নিজেরা খাঁটি ও নিষ্ঠাবান বান্দাহ বলে মনে করবেন? আল্লাহ সম্পর্কে এতো হীন ধারণা করা কি কোনরূপেই সমীচীন হতে পারে?

ভুল ধারণার অপনোদন

উপসংহারের কয়েকটি জরুরি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। দীর্ঘকালের ভুল ধারণার কারণে সাধারণ মুসলমানের মনে খুঁটিনাটি কাজ ও বাহ্যিক অনুষ্ঠানসমূহের গুরুত্ববোধ তীব্র হয়ে রয়েছে। দীন ইসলামের মূলনীতি ও সামগ্রিক তথ্য এবং দীনদারী ও ইসলামী নৈতিকতার নিগূঢ় ভাবধারার দিকে অসংখ্যবার তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও তারা এর গুরুত্ব অনুভব করতে পারে না। লোকদের মন-মস্তিষ্কে ঘুরে-ফিরে সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ ও সামান্য সামান্য বাহ্যানুষ্ঠানের গুরুত্বই তীব্র হয়ে ওঠে। তাদের দৃষ্টি এতো ক্ষুদ্র ও গুরুত্বহীন কাজগুলোর অন্তরালে গভীর সত্য পর্যন্ত পৌছায় না, বস্তুত ছোট ছোট ও ক্ষুদ্র কাজগুলোকেই দীন ইসলামের মূলভিত্তি বলে গণ্য করা হয়েছে। জামায়াতের বহু সদস্য এবং সমর্থকদের উপরও এই ভুল ধারণার মারাত্মক প্রভাব থাকতে পারে। দীন ইসলামের মূল তত্ত্ব ও প্রকৃত নিগূঢ় সত্য কি, তাতে সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব কোন্ জিনিসের এবং কোন্‌টি মূখ্য আর কোন্‌টি গৌণ এসব কথা সঠিকরূপে বুঝাবার জন্য আমি পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করেছি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও অনেকের মধ্যে সেই বাহ্যিক অনুষ্ঠান প্রিয়তা এবং মূলনীতি অপেক্ষা খুঁটিনাটি ব্যাপারে গুরুত্বদানের সংক্রামক ব্যাধি তাদেরকে জর্জরিত করে দিয়েছে।

জামায়াতের লোকদের দাড়ির দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করার জন্য, পায়ের গিটের উপরে উঠিয়ে পায়জামা পরার জন্য এবং এই ধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে চাপ দেয়ার জন্য আমাকে বারবার বলা হচ্ছে। কোনো কোনো লোক আবার 'জামায়াতে ইসলামীতে' 'মারেফাতের' অভাব অনুভব করছেন। কিন্তু মূলত মারেফাত কি জিনিস তারা নিজেরা হয়তো তা জানেন না। এজন্যই তারা আসল লক্ষ্য ও কর্মনীতি জামায়াতে ইসলামীরই ঠিক রেখে কোনো খানকাহ হতে আত্মশুদ্ধি সাধন ও আধ্যাত্মিক দীক্ষাদানের কার্যসূচী গ্রহণ করার প্রস্তাবও করছেন। এ দৃষ্টে মনে হয়, দীন ইসলামের প্রকৃত ধারণা এদের মনে আদৌ বর্তমান নেই।

একটু পূর্বেই আমি ঈমান, ইসলাম, তাকওয়া ও ইহসানের ব্যাখ্যা করেছি। এই ব্যাপারে কুরআন-হাদিসের বিপরীত কোনো কথা যদি আমি বলে থাকি, তবে অকুণ্ঠভাবে এর প্রতি অংগুলি নির্দেশ করুন। কিন্তু আপনি যদি স্বীকার করেন যে, কুরআন ও হাদিস অনুযায়ী উক্ত চারটি জিনিসের মূলতত্ত্ব বর্ণিত রূপ ভিন্ন আর কিছু নয়, তবে যেখানে ঈমান তার যাবতীয় ব্যাপকতা ও গভীরতা সহকারে ফুটে ওঠেনি এবং যেখানে তাকওয়া ও ইহসানের মূল শিকড়ই বর্তমান নেই সেখানে কোনো প্রকারেই 'মারেফাত' (আধ্যাত্মিকতা) সন্ধান করে পাওয়া যেতে পারে না, তা আপনাদের নিজেদেরই চিন্তা করা উচিত। আর যেসব খুঁটিনাটি ও গৌণ বিষয়কে দীন ইসলামের প্রাথমিক ও মৌলিক দাবি বলে আপনারা ধরে নিয়েছেন সেগুলোর নিগূঢ় তত্ত্ব পুণরায় আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। আমি এই দিক দিয়ে আমার সমগ্র দায়িত্বই পূর্ণরূপে পালন করতে চাই।

সর্বপ্রথম শান্ত মনে এই প্রশ্নের জবাব নির্ধারণ করুন যে, আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে নবী কেন প্রেরণ করেন? দুনিয়াতে কোন্ বস্তুর অভাব রয়েছে, এখানে কোন্ ক্রটি ও দোষ রয়ে গিয়েছিল, যা দূরিভূত করার জন্য আল্লাহ নবীদের প্রেরণ করার প্রয়োজনীতা বোধ করলেন। দুনিয়ার অধিবাসীগণ দাড়ি রাখত না, তা রাখার জন্য কি আল্লাহ তায়ালা নবী পাঠিয়েছেন? কিংবা সব লোক পায়ের তালু পর্যন্ত ঝুলিয়ে পায়জামা বা লুঙ্গি পরিধান করত বলে এটা বন্ধ করার জন্য আল্লাহ তায়ালা নবী পাঠিয়েছেন? অথবা যেসব 'সুন্নাত' দেশময় প্রচলিত করার জন্য আপনারা ব্যস্ত হয়েছেন, তা যথাযথভাবে প্রতিপালিত করার জন্যই দুনিয়াতে নবীর আবির্ভাব অপরিহার্য হয়েছিল? এসব প্রশ্ন সম্পর্কে একটু গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা করলে আপনারা সকলেই স্বীকার করবেন যে, বস্তুত এটা কোনো মৌলিক দোষ-ক্রটি নয়, নবী আগমনেরও এটা মূল উদ্দেশ্য হতে পারে না। তবে কোন্ মূল দোষ-ক্রটির জন্য নবী আগমনের প্রয়োজনীয়তা হয়েছিল? এই প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তর হতে পারে এবং তা এই যে, আল্লাহর দাসত্ব বিমুখতা, ধর্মহীনতা, আল্লাহর আনুগত্য করে চলার প্রতি উপেক্ষা, নিজেদের মনগড়া

নিয়ম-বিধানের অনুসরণ এবং আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করার অনিবার্যতা সম্পর্কে অবিশ্বাস এগুলোই ছিলো দুনিয়ার মূলগত দোষ-ত্রুটি। এ কারণেই মানুষের নৈতিক চরিত্রে চরম ভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। জীবনযাপনের জন্য ভ্রান্ত রীতিনীতির প্রচলন হয়েছিল, গোটা পৃথিবী চরম ধ্বংসের মুখে চলে গিয়েছিল। বস্তুত মানুষের মধ্যে আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করে চলার অকৃত্রিম নিষ্ঠা এবং আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করার প্রতি সন্দেহাতীত বিশ্বাস সৃষ্টি করার জন্যই দুনিয়াতে আম্বিয়ায়ে কেরাম এসেছিলেন। উন্নত নৈতিক চরিত্রের বিকাশ সাধন এবং সুষ্ঠু মূলনীতির ভিত্তিতে মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা, মঙ্গল ও কল্যাণের স্বতস্ফূর্ত ফল্গুধারা প্রবাহিত করা এবং অন্যায় ও পাপের সকল উৎস বন্ধ করাই তাদের মূল লক্ষ্য ছিলো। বস্তুত দুনিয়াতে নবীদের আগমনের এটাই ছিলো একমাত্র উদ্দেশ্য এবং সর্বশেষ এই বিরাট মহান উদ্দেশ্যের জন্যই এসেছিলেন সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)।

এখন নবী করীমের (সা) কর্মনীতি ও পদ্ধতি যাচাই করে দেখতে হবে, দেখতে হবে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি কোন্ ক্রমিক ও পর্যায়মূলক নীতি গ্রহণ করেছিলেন। সকলেই জানেন সর্বপ্রথম তিনি ঈমানের দাওয়াত পেশ করেছেন। অতপর এই ঈমানের অনিবার্য দাবি ও পরিণতি অনুযায়ী ক্রমশ শিক্ষা-দীক্ষাদানের সাহায্যে ঈমানদার লোকদের মধ্যে বাস্তব আনুগত্য অনুসরণ (অর্থাৎ ইসলাম), নৈতিক পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা (অর্থাৎ তাকওয়া এবং আল্লাহর প্রতি গভীর ভালবাসা ও অকৃত্রিম নিষ্ঠা (অর্থাৎ ইহসান ইত্যাদি) গুণাবলী ফুটিয়ে তুলেছেন। এরপরই এই নিষ্ঠাবান ঈমানদার লোকদের সংগঠিত চেষ্টা ও সাধনার সাহায্যে প্রাচীন জাহেলী যুগের অস্বাভাবিক ও ক্ষয়িষ্ণু জীবন-ব্যবস্থাকে নির্মূল করে তদস্থলে আল্লাহর বিধানের নৈতিক ও তামাদ্দুনিক মূলনীতিসমূহের ভিত্তিতে এক নির্মল সুষ্ঠু ও সত্যতাপূর্ণ জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এভাবে এসব লোকই যখন নিজেদের মন, মস্তিষ্ক, নৈতিক চরিত্র, চিন্তাধারা ও কাজ-কর্ম সকল দিক দিয়েই প্রকৃত মুসলিম, মুত্তাকী ও মুহসিন হলো এবং আল্লাহ খাঁটি নিষ্ঠাবান বান্দাহদের প্রকৃতিই যে কতর্ব্য পালন করা উচিত তাতে নিযুক্ত হলো তারপরই বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান, কাটছাঁট পোশাক পরিচ্ছদ উঠাবসা, চলাফিরা এবং এভাবে অন্যান্য বাহ্যিক কাজ-কর্মসমূহের মধ্যে মুত্তাকীদের শোভাবর্ধক ভদ্রতামূলক নিয়মনীতির শিক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন। অন্য কথায় সর্বপ্রথম তিনি কাঁচা তামাকে উজ্জ্বল বিশুদ্ধ স্বর্ণে পরিণত করেছেন, তারপর তার 'আশরাফীর' (আরবিয় স্বর্ণ মুদ্রা) ছাঁচ বা নকশা অংকিত করেছেন) প্রথমে খাঁটি যোদ্ধা ও বীর সৈনিক তৈয়ার করেছেন, তারপরই তাকে পোশাক পরতে দিয়েছেন। বস্তুত কুরআন-হাদিসের গভীর ও সুক্ষ্ম অধ্যয়ন করার পর নিঃসন্দেহে

জানা যায় যে, ইসলামী আন্দোলনের এটাই একমাত্র সঠিক পন্থা এটাই হচ্ছে এ কাজের পর্যায়মূলক ক্রমিক ধারা। নবী করীম (সা) আল্লাহ তায়ালার মর্জি অনুযায়ী যে পন্থায় কাজ করেছিলেন সেই পন্থা অনুসরণকেই যদি 'সুন্নাত' পালন মনে করা হয় তবে উক্ত কর্মনীতি অনুযায়ী কাজ করাই সুন্নাত বলতে হবে এবং এ জন্যই লোকদেরকে প্রকৃত মু'মিন, মুসলিম, মুত্তাকী মুহসীন এ পরিণত না করে তাদেরকে মুত্তাকীদের বাহ্যিক পোশাক ও চাল-চলন অনুসারী এবং মুহসীনদের কতোকগুলো প্রসিদ্ধ ও সর্বজনপ্রিয় কাজের অনুকরণকারী বানাতে চেষ্টা করা কোনোক্রমেই 'সুন্নাত' হতে পারে না। শুধু তাই নয়, এটা সুন্নাতের স্পষ্ট বিরোধীতা, 'সুন্নাতের' নামে মনগড়া নীতির প্রচার ; তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এটা ঠিক সীসা ও তামা খণ্ডের উপর 'আশরাফীর' নকশা অংকিত করে বাজারে চালাবার অপচেষ্টা এবং সৈনিকতা, নিষ্ঠা, আত্মোৎসর্গীকৃত মনোভাব সৃষ্টি না করেই নিছক উর্দী পরা কৃত্রিম যোদ্ধাকে যুদ্ধের ময়দানে দাঁড় করানোর অনুরূপ নির্বুদ্ধিতামূলক কাজ। আমার মতে এটা প্রকাশ্য জাল ও প্রতারণামূলক কৃত্রিমতা ভিন্ন আর কিছুই নয়। আর বস্তুত পক্ষে এই জাল ও কৃত্রিমতার ফলেই বাজারেও যেমন এই কৃত্রিম মুদ্রার কোনোই মূল্য নেই, যুদ্ধক্ষেত্রেও এই কৃত্রিম ও প্রদর্শনীমূলক সৈনিক দ্বারা কোনো কঠিন সংগ্রাম পরিচালনা করাও সম্ভব হচ্ছে না।

আল্লাহর নিকট যে কোনো বস্তুর প্রকৃত মূল্য কি হবে তাও চিন্তা করে দেখতে হবে। মনে করুন : এক ব্যক্তির অকৃত্রিম ঈমান আছে, কর্তব্যজ্ঞান আছে, উন্নত নির্মল চরিত্রের গুণে সে গুণান্বিত, আল্লাহর নির্ধারিত সীমাসমূহ রক্ষা করে চলে, আল্লাহর আনুগত্য ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে ; কিন্তু বাহ্যিক বেশ-ভুষার দিক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ এবং বাহ্যিক সভ্যতার মানদণ্ডে পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হতে পারে না। এটাকে খুববেশি খারাপ বললেও শুধু এতোটুকু বলা যেতে পারে যে "চাকরটি আসলে ভালো, কিন্তু একটু অসভ্য এই যা।" তার এই 'অসভ্যতা'র দরুন হয়তো সে উচ্চতম মর্যাদা লাভ করতে পারবে না। কিন্তু শুধু এতোটুকু অপরাধের দরুনই কি তার সকল নিষ্ঠা ও আনুগত্য নিষ্ফল হয়ে যাবে? এবং কেবল উত্তম বেশ-ভূষায় সম্পন্ন না হওয়ার অপরাধেই তার মনিব তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে? এটাকি কোনো মতেই বিশ্বাস করা যায়? মনে করুন : অন্য এক ব্যক্তির কথা, সে সবসময়ই শরীয়তী পোশাক পরিধান করে থাকে এবং সভ্যতার আচার অনুষ্ঠান ও আদব-কায়দা যারপরনাই সতর্কতা ও দৃঢ়তার সাথে পালন করে চলে, কিন্তু তার নিষ্ঠা ও আনুগত্যের বিশেষ অভাব রয়েছে তার কর্তব্যজ্ঞান জাগ্রত নয়, তার ঈমানী মর্যাদাবোধেও তেজস্বী নয় এমতাবস্থায় তার এই আভ্যন্তরীণ দোষ-ত্রুটির বর্তমানে আল্লাহর নিকট তার বাহ্যিক বেশ-ভূষার কতোখানি মূল্য হতে পারে। বস্তুত এটা জটিল ও গভীর আইনগত ব্যাপার

নয়, যা বুঝার জন্য বড় বড় কিতাব সন্ধান করে বেড়াতে হবে। প্রত্যেকটি মানুষ নিজেই সাধারণ জ্ঞান দ্বারাই বুঝতে পারে, এ দু'টি জিনিসের মধ্যে প্রকৃত মর্যাদা কোন্‌টি হতে পারে ? দুনিয়ার কম বুদ্ধিমান লোকদের মধ্যেও একটা জ্ঞান থাকে এবং প্রকৃতপক্ষে যে জিনিসটি সন্ধান পাওয়ার যোগ্য, আর যেটির সৌন্দর্য মৌলিক নয় এই দু'টির মধ্যে তারাও পার্থক্য করতে পারে। ভারতের অধুনালুপ্ত ইংরেজ সরকার এই ব্যাপারে একটি চমৎকার উদাহরণ। এরা যে কতো বাবু ও ফেশনপ্রিয় এবং বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের জন্য এরা যে কতো প্রাণ দিয়ে থাকে তা সর্বজনবিদিত, কিন্তু তাদের নিকট প্রকৃত মূল্য ও মর্যাদা কোন জিনিসটি পেয়ে থাকে, তা ভেবে দেখেছেন কি? যে সামরিক কর্মচারী তাদের রাষ্ট্রের বিজয় পতাকা উড্ডীন রাখার জন্য নিজের মন, মস্তিষ্ক ও দেহ-প্রাণের সকল শক্তি ব্যয় করতো এবং আসল সংকট সময়ে সে জন্য কোনোরূপ আত্মদানে কুণ্ঠিত হতো না, ঠিক তাকেই তার মর্যাদা দান করতো উচ্চতম পদে তাকেই অভিষিক্ত করতো। বাহ্য দৃষ্টিতে সে শত অসভ্য গোঁয়ার, অমুন্ডিতশ্মশ্রু বিশিষ্ট, বেকায়দায় পোশাক পরিহিত পানাহারে অনিয়মিত ও কৃতকার্যে অপটু হোক না কেন, তাতে তার পদোন্নতির কোনোরূপ বাধার সৃষ্টি হতো না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বিলাসপ্রিয়, সভ্যতা এবং সমাজের সর্বজনপ্রিয় রীতিনীতিগুলোর পূর্ণমাত্রায় অনুসরণকারী কিন্তু আনুগত্য ও আত্মোৎসর্গের ব্যাপারে পশ্চাদপদ এবং আসল কাজের সময় নিজের সুযোগ-সুবিধাগুলোর প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য রাখে, ইংরেজগণ তাকে কোনো সম্মানিত পদ দেয়া তো দূরের কথা, তাকে কোর্ট মার্শাল করতেও দ্বিধাবোধ করতো না। দুনিয়ার সামান্য বুদ্ধিবিশিষ্ট লোকদের যখন এরূপ অবস্থা তখন আল্লাহ সম্পর্কে কি ধারণা করা যায়? তিনি স্বর্ণ ও তামার পার্থক্য না করে শুধু বাহ্যিক নকশা ছাঁচ দেখে এতে স্বর্ণ মুদ্রার মূল্য দান করবেন? আল্লাহ সম্পর্কে এরূপ ধারণা করা কি কোনো মতেই সমীচীন হতে পারে?

আমি আবার বলব, আমার একথা হতে মনে করবেন না যে, আমি মানুষের বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতে চাচ্ছি, কিংবা মানব জীবনের বাহ্যিক দিকসমূহের সংশোধন ও সুষ্ঠুতা বিধানের জন্য প্রবর্তিত বিধি-নিষেধসমূহ পালন করা অপ্রয়োজনীয় প্রমাণ করতে চাচ্ছি এটা মাত্রই সত্য নয়। আমি বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ ও রসূলের প্রত্যেকটি হুকুমই যথাযথ ভাবে পালন করা প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তিরই অবশ্য কতর্ব্য। আর দীন ইসলাম মানুষের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় দিককেই সুন্দর ও সুষ্ঠু করে গঠন করতে চায়, তাও আমি পূর্ণরূপে স্বীকার করি কিন্তু এটা সত্ত্বেও আমি শুধু একথাই আপনাদের বুঝাতে চেষ্টা করছি যে, মানুষের আভ্যন্তরীণ দিকই মূখ্য ও সংস্কারযোগ্য বাহ্যিক দিক সেরূপ নয়। প্রথমে মানুষের মূল সত্যের মণিমঞ্জুষা সৃষ্টি করার

চেষ্টা করতে হবে তারপর এই আভ্যন্তরীণ দিক অনুসারেই তার বাহ্যিক দিককেও গঠন করতে হবে। আল্লাহর নিকট যেসব গুণের প্রকৃত মূল্য রয়েছে এবং যে গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধন ও ক্রমবিকাশ দানই ছিলো আম্বিয়ায়ে কেরামের আগমনের একমাত্র উদ্দেশ্য, সর্বপ্রথম সেগুলোর দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে এবং সর্বাগ্রে তা অর্জন কতে হবে। পরন্তু বাহ্যিক দিকের সংস্কার প্রথমত উক্ত গুণাবলীর অনিবার্য পরিণাম স্বভাবতই সম্পন্ন হবে তার পরও কোনো অসম্পূর্ণতা থাকলে ক্রমিক অধ্যায়সমূহ অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গেই তা পূর্ণতা লাভ করবে, তাতে সন্দেহ নেই।

শারীরিক অসুস্থতা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও আমি এই দীর্ঘ বক্তৃতা আপনাদের সামনে করলাম শুধু এ জন্যই যে, প্রকৃত সত্য কথা পরিপূর্ণতা ও ব্যাপকতার সাথে আপনাদের সামনে সুস্পষ্টরূপে পেশ করে আল্লাহর নিকট আমি সকল দায়িত্ব হতে মুক্তিলাভ করতে চাই। জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নেই কার আয়ূ কখন শেষ সীমান্তে এসে পৌছবে, তা কেউ জানে না, কেউ বলতেও পারে না। এজন্য সত্যের বাণী পৌছাবার যতোখানি দায়িত্ব আমার উপর রয়েছে, আমি তা যথাযথভাবে পৌছাতে চাই। এখনো কোনো কথা অস্পষ্ট বা বিশ্লেষণ সাপেক্ষ থেকে গেলে জিজ্ঞেস করে নিন এবং সত্যের বিপরীত কোনো কথা আমি বলে থাকলে আপনারা তার প্রতিবাদ করুন। আর প্রকৃত সত্য কথা যথাযথভাবে আপনাদের নিকট যদি আমি পৌছিয়ে থাকি, তবে আপনারা তার সাক্ষ্য দিন। (সভাস্থল হতে ধ্বনি উঠলো : আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি) আমার এই দায়িত্ব পালনের আপনারাও সাক্ষী থাকুন আল্লাহও যেন সাক্ষী থাকেন। আমি দোয়া করছি। আল্লাহ আপনাদেরকেও আমাকে দীন ইসলামের নিগূঢ় সত্য হৃদয়ঙ্গম করার তওফীক দিন এবং জ্ঞান অনুযায়ী দীন ইসলামের সমগ্র দাবি পূরণের তদনুযায়ী জীবন ও যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দেয়ার ক্ষমতাও দান করুন। আমীন।

৭

ভাঙ্গা ও গড়া

[১৯৪৭ সালের ১০ই মে পূর্ব পাঞ্জাবস্থ পাঠানকোটের দারুল ইসলামে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় মাওলানা যে ভাষণ দেন, এটি তারই পুস্তিকারূপ। সম্মেলনে মুসলমান ছাড়াও বিরাট সংখ্যক হিন্দু ও শিখ উপস্থিত ছিলো। এসময় পাঞ্জাবের অবস্থা ছিলো একটি আগ্নেয়গিরির মতো, যা চরমভাবে বিস্ফোরণোম্মুখ হয়ে উঠেছিলো। এর মাত্র তিন মাস পর সেখানে দাংগা হাংগামার যে লেলিহান শিখা জ্বলে উঠে তার ধ্বংসলীলা এখনো মানব ইতিহাসে এক করুণ বেদনাবিধুর অধ্যায় হয়ে আছে।]

প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা সবই আল্লাহর জন্য। তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আমাদেরকে জ্ঞান, বুদ্ধি ও বুঝবার শক্তি এবং ভালো-মন্দের মধ্যে পাথর্ক্য করার ক্ষমতাও দিয়েছেন। আমাদের সঠিক পথ প্রদর্শন ও নেতৃত্ব দানের জন্য তিনি তাঁর সর্বোত্তম বান্দাদেরকে পাঠিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে মানবতা শিক্ষা দিয়েছেন, সৎলোকের মতো জীবন যাপন করা শিখিয়েছেন এবং মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করেছেন। যে সমস্ত নিয়ম-নীতি অনুযায়ী জীবন যাপন করলে মানুষ দুনিয়ায় সুখ-শান্তি ও পরকালে মুক্তি লাভ করতে পারে তাও তাঁরা বলে এবং দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের সবার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

সমবেত ভদ্রমন্ডলী ও মহিলাবৃন্দ!

যে আল্লাহ এই দুনিয়াকে সৃষ্টি করে পৃথিবী পৃষ্ঠকে বিছানার মতো করে তৈরি করেছেন এবং তার উপর মানুষের বসবাস করার সুব্যবস্থা করেছেন, তিনি অন্ধের মতো আন্দায অনুমানের ভিত্তিতে কোনো কাজ করেন না। কোনো কিছু না দেখে শুনে অন্ধকারে হাতড়িয়ে সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দেবার মতো বাদশাহ তিনি নন। তাঁর নিজস্ব আইন-কানুন বলিষ্ঠ নিয়ম-নীতি, সুদৃঢ় ব্যবস্থা ও সুষ্ঠু কর্মপদ্ধতি রয়েছে। তদনুযায়ী তিনি সমগ্র বিশ্ব জাহানের উপর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব করছেন। পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, পানি, বাতাস, বৃক্ষ, পশু-পাখি ইত্যাদির মতো আমরা গোটা মানব জাতিও তাঁর প্রাকৃতিক আইন ও নিয়মের অধীনে সুসংবদ্ধ। আমাদের জন্ম ও মৃত্যু, আমাদের শৈশব, আমাদের যৌবন ও বার্ধক্য, আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস, আমাদের পাকস্থলী ও রক্ত চলাচল, আমাদের সুস্থতা ও অসুস্থা ইত্যাদি সব কিছুর উপরই তাঁর চিরন্তন প্রাকৃতিক আইন ও নিয়মের কর্তৃত্ব একটানাভাবে রীতিমতো চলছে। এ ছাড়া তাঁর আর একটা আইনও

রয়েছে। সেটা তাঁর প্রাকৃতিক আইনের মতোই আমাদের ইতিহাসে উঠা-নামা, আমাদের উত্থান-পতন, আমাদের উন্নতি-অবনতী এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত- তথা দেশ ও জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের উপর কর্তৃত্ব করছে। আল্লাহর প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী নাকের বদলে চোখের সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ করা এবং পেটের বদলে হৃদয়ে খাদ্য হজম করা যদি মানুষের পক্ষে সম্ভব না হয়ে থাকে, তাহলে যে পথে চললে আল্লাহর আইন অনুযায়ী কোনো জাতির অধপতন হওয়া উচিত, সেই পথে তার উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। আগুন যেমন একজনের জন্যে গরম এবং আরেক জনের জন্য ঠান্ডা নয়, তেমনি আল্লাহর আইন অনুযায়ী যে সমস্ত কাজ খারাপ তা এক জনকে অবনত এবং আর এক জনকে উন্নত করতে পারে না। মানুষের ভালো-মন্দের জন্য আল্লাহ যে নিয়ম-নীতি নির্ধারিত করেছেন, তা কারোর চেষ্টায় পরিবর্তিত ও বাতিল হতে পারে না, তার ভেতর কারো সঙ্গে শত্রুতা এবং কারো সঙ্গে স্বজনপ্রীতিও নেই। আল্লাহর এই আইনের সর্বপ্রথম ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধারা হচ্ছে এই যে; তিনি গড়া পছন্দ করেন এবং ভাঙ্গা পছন্দ করেন না। সব কিছুর মালিক হিসেবে তিনি তাঁর দুনিয়াকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে চান। একে অতিমাত্রায় সুসজ্জিত করতে চান। তাঁর যাবতীয় উপায় উপাদান এবং শক্তি ও যোগ্যতাকে সুষ্ঠ পন্থায় ব্যবহার করতে চান। তিনি কখনও তাঁর দুনিয়ার ধ্বংস ও অনিষ্ট সাধন করেন না। বিশৃংখলা, কু-কর্ম, অত্যাচার ও অনাচার করে তাঁর দুনিয়াকে শ্রীহীন সৃষ্টিতে পরিণত করাকে তিনি কোনো দিন পছন্দ করবেন বলে আশাও করা যেতে পারে না। যে সমস্ত লোক দুনিয়া পরিচালনার ক্ষমতা লাভ করতে চায় তাদের ভেতর থেকে কেবলমাত্র তারাই আল্লাহর দৃষ্টিতে যোগ্যতাসম্পন্ন হয়, যারা এ দুনিয়াকে গড়বার যোগ্যতা অন্য সবার চেয়ে বেশি রাখে। এরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদেরকেই তিনি দুনিয়া পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করে থাকেন।

অতপর এসব ক্ষমতাসীন লোকেরা কতোটুকু ভাংগে এবং কতোটুকু গড়ে সেদিকে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা ভাঙার চেয়ে গড়তে থাকে বেশি এবং তাদের চেয়ে বেশি গড়ে ও কম ভাঙে এমন কেউ র্কমক্ষেত্রে থাকে না, ততোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাদের সমস্ত দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও দুনিয়া পরিচালনার ক্ষমতা তাদের হাতেই রাখেন। কিন্তু যখন তারা গড়ে কম এবং ভাঙ্গে বেশি, তখন আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করে অন্য লোকদেরকে ঐ একই শর্তে ক্ষমতা দিয়ে থাকেন।

এটা একটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আইন। আপনাদের বিচার বুদ্ধিও প্রমাণ করবে যে, আইনটি এমনই হওয়া উচিত। যদি আপনাদের কারোর একটি বাগান থাকে এবং তিনি একজন মালীকে তার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করেন, তাহলে আপনি নিজেই বলুন, তিনি ঐ মালীর নিকট সর্বাগ্রে কি আশা করবেন? মালী তার

বাগান খানা নষ্ট না করে তাকে পরিপাটি করে সুসজ্জিত করবে, এ ছাড়া তিনি তার কাছে আর কি কামনা করতে পারেন? তিনি অবশ্যি নিজের বাগানের ক্রমোন্নতি চাইবেন। তার শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, শোভা ও সৌন্দর্য এবং উৎপাদন বৃদ্ধিই হবে তার কাম্য। যে মালীকে তিনি দেখবেন অত্যন্ত পরিশ্রম, যোগ্যতা ও মনোযোগ সহকারে সুনিপুণভাবে বাগানের সেবা যত্ন করছে, বাগানের সাজ সজ্জার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখছে, তার চেষ্টা ও যত্নে ভালো দরকারি গাছগুলো বেশ সতেজ ও সুন্দর হচ্ছে, সে আগাছা, আবর্জনা ও বন-জঙ্গল পরিষ্কার করছে, তার সুরুচি ও শিল্প শক্তি দিয়ে উৎকৃষ্ট ও নতুন ফল-মূল ও ফুলের উৎপাদন বৃদ্ধি করছে তার উপর তিনি অবশ্য সন্তুষ্ট হবেন। তিনি তাকে ভালবাসবেন এবং উচ্চ মর্যাদা দেবেন। এমন উপযুক্ত, কর্তব্যপরায়ণ, পরিশ্রমী, অনুগত ও সুযোগ্য মালীকে তাড়িয়ে দেয়া তিনি কোনো দিনই পছন্দ করবেন না। কিন্তু এ না হয়ে যদি ঠিক এর উল্টোটাই হয় অর্থাৎ যদি তিনি দেখেন যে, মালী অযোগ্য-অপদার্থ ও ফাঁকিবাজ, সে সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে বাগানের ক্ষতি করছে, গোটা বাগানটা আবর্জনা ও বন-জঙ্গলে ভরে গিয়েছে, গাছের পাতা ও ডালগুলো ভেঙে পড়েছে, কোথাও বিনা প্রয়োজনে পানি বয়ে যাচ্ছে, আবার কোথাও পানির অভাবে মাঠ ও গাছপালা সব শুকিয়ে যাচ্ছে, আগাছা, বন-জঙ্গল ও আবর্জনা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, ভালো ভালো গাছগুলো মরে গিয়ে আগাছায় বাগান ভরে যাচ্ছে, তাহলে বলুন, বাগানের মালিক এমনতর মালীকে কি করে পছন্দ করতে পারে? কোনো সুপারিশ, কাকুতি-মিনতি, সবিনয় নিবেদন ও প্রার্থনা এবং উত্তরাধিকার ও মনগড়া অধিকারের দরুন মালিক তার বাগানের দায়িত্বভার এমন অযোগ্য মালীর উপরই ন্যস্ত রাখবে? বড় জোর এতোটুকু হতে পারে যে, সে মালীকে শাসিয়ে দিয়ে আর একবার তাকে দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেবে। কিন্তু যে মালীর কোনো শাসনেই চৈতন্য হয় না এবং ক্রমাগত বাগানের ক্ষতিই করতে থাকে, তাকে কান ধরে বের করে দিয়ে অন্য কোনো ভালো মালী নিযুক্ত করা ছাড়া মালিকের পক্ষে এ সমস্যার আর কি সমাধান হতে পারে?

যদি নিজের সামান্য একটা বাগান পরিচালনার ব্যাপারে আপনি অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করে থাকেন, তাহলে চিন্তা করে দেখুন যে, আল্লাহ তাঁর এতোবড় ভূমন্ডলটা এতো সব উপায় উপকরণসহ মানুষের কর্তৃত্বাধীনে রেখে দুনিয়া ও তার সমস্ত বস্তুর উপর তাকে এতো ক্ষমতা ও অধিকার দিয়েছেন, এ ক্ষেত্রে মানুষ তাঁর দুনিয়াকে সুন্দর করে গড়ে তুলছে, না ধ্বংস করছে, এ বিষয়টা তিনি কি করে উপেক্ষা করতে পারেন? আপনি যদি তাঁর দুনিয়াকে সুন্দর করে গড়তে থাকেন তবুও তিনি আপনাকে ক্ষমতা থেকে অযথা সরিয়ে দেবেন এমনতর হওয়ার কোনো কারণ নেই। কিন্তু যদি আপনি গঠনমূলক কোনো কিছু না করেন

এবং আল্লাহর এ বিরাট বাগানখানাকে একেবারে উজাড় ও ধ্বংস করতেই থাকেন, তাহলে আপনার দাবিকে নিজের বুদ্ধি-বিবেক অনুযায়ী যতোই জোরদার মনে করুন না কেন তিনিতো তাঁর বাগানে আপনার কোনো অধিকার স্বীকার করবেন না। প্রথমে তিনি আপনাকে শাসিয়ে হুঁশিয়ার করে দেবেন এবং সংশোধনের দু'চারটে সুযোগ দেবেন। পরিশেষে আপনাকে পরিচালকের মর্যাদা থেকে পদচ্যুত করেই ছাড়বেন।

এ ব্যাপারে একটা বাগানের মালিকের দৃষ্টিকোণ ও মালীর দৃষ্টিকোণ যেমন বিভিন্ন তেমনি আল্লাহর দৃষ্টিকোণ ও মানুষের দৃষ্টিকোণের মধ্যেও বিভিন্নতা রয়েছে। ধরুন, মালীদের এক পরিবার বংশানুক্রমে একজন লোকের বাগানে কাজ করে আসছে। তাদের পূর্ব পুরুষের কাউকে হয়তো তার যোগ্যতা ও জ্ঞান-বুদ্ধির দরুন বাগানে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তার সন্তান-সন্ততিও বাগানে কাজ সুন্দরভাবে করেছিল, তাই বাগানের মালিক চিন্তাকরে দেখলো যে অযথা এদেরকে সরিয়ে অন্য মালী নিযুক্ত করার কি দরকার? এরাও যখন ভালোভাবেই কাজ করছে, তখন এদের অধিকার অন্যের চেয়ে বেশি। এভাবে মালীদের এই বংশ স্থায়ীভাবে বাগানে কাজ করতে লাগলো। কিন্তু কিছুকাল পরে এ বংশের মালীরা একেবারে অযোগ্য, অপদার্থ, ফাঁকিবাজ, আলসে, কুঁড়ে ও অবাধ্য হয়ে পড়লো। বাগান পরিচালনার কোনো যোগ্যতাই তাদের রইলো না। এখন তারা গোটা বাগানটার সর্বনাশ করতে শুরু করেছে, তবুও তাদের দাবি এই যে, তারা তাদের বাপ-দাদার আমল থেকে পুরুষানুক্রমে এ বাগানে বাস করে আসছে, তাদের পূর্ব-পুরুষদের কারুর দ্বারা এ বাগান গড়ে উঠেছিল, কাজেই এতে তাদের জন্মগত অধিকার রয়েছে এবং তাদেরকে সরিয়ে অন্য কাউকে এ বাগানের পরিচালনার জন্য মালী নিযুক্ত করা কোনোক্রমেই সংগত হতে পারে না। এটিই ঐ অযোগ্য ও অপদার্থ মালীদের দৃষ্টিকোণ। কিন্তু বাগানের মালিকের দৃষ্টিকোণও কি অনুরূপ হতে পারে? সে কি একথাই বলবে না-আমার কাছে তো বাগানের সুন্দর ও সুষ্ঠু পরিচালনাই সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ?

আমি তো মালীদের কোনো পূর্ব-পুরুষের জন্য এ বাগান করিনি। বরং তাদের পূর্ব-পুরুষের কাউকে আমার বাগানের কাজের জন্য চাকর রেখেছিলাম। বাগানে তাদের যা কিছু অধিকার আছে তা যোগ্যতা ও কাজের শর্তাধীন। তারা বাগানকে ঠিকমতো গড়ে তুললে তাদের সমস্ত অধিকার বিবেচনা করা হবে। নিজের পুরানো মালীদের সংগে আমার এমন কি শত্রুতা থাকতে পারে যে, তারা ভালোভাবে কাজ করলেও আমি অযথা তাদেরকে তাড়িয়ে অন্য মালিদেরকে নিযুক্ত করবো? কিন্তু যে বাগানের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য তোমাদেরকে নিযুক্ত করা হয়েছিল সেটিকেই যদি তোমরা নষ্ট ও উজাড় করে ফেলো, তাহলে তোমাদের কোনো অধিকারই আমি স্বীকার করবো না। অন্য যারা এ কাজ ঠিকমত করতে চায় আমি তাদেরকে বাগান পরিচালনার দায়িত্ব ও ক্ষমতা দান

করবো এবং তাদের অধীনে তোমাদের চাকুরি করতে হবে। এতেও যদি তোমরা ঠিক না হও এবং অধীনস্ত হিসেবেও যদি তোমরা অকেজো প্রমাণিত হও বরং শুধু নষ্ট করতেই থাক, তাহলে আমি তোমাদেরকে এ বাগান থেকে তাড়িয়ে দিয়ে অন্য মালীদেরকে এখানে নিযুক্ত করবো।

দৃষ্টিকোণের এই পার্থক্য যেমন একটা বাগানের মালিক ও মালীর মধ্যে রয়েছে, তেমনি রয়েছে দুনিয়ার মালিক ও দুনিয়াবাসীদের মধ্যেও। দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন জাতি তাদের আপন আপন এলাকাকে স্বদেশ ভূমি বলে দাবি করে। বংশানুক্রমে তারা এবং তাদের পূর্ব-পুরুষগণ সেখানে বসবাস করে আসছে। তাদের দেশের উপর তাদের কর্তৃত্ব করার জন্মগত অধিকার রয়েছে বলে তারা বিশ্বাস করে। কাজেই তাদের মতে দেশ পরিচালনার ক্ষমতা একমাত্র তাদেরই প্রাপ্য। বাইরের আর কারোর সেখানে কর্তৃত্ব করার কোনো অধিকার নেই। এ হচ্ছে দুনিয়াবাসীদের দৃষ্টিকোণ। কিন্তু দুনিয়ার আসল মালিক আল্লাহর দৃষ্টিকোণ এটা নয়। তিনি কখনো এ সব জাতীয় অধিকার স্বীকার করেননি। প্রত্যেক দেশের উপর তার অধিবাসীদের জন্মগত অধিকার রয়েছে এবং সে অধিকার থেকে তাদেরকে কোনোক্রমেই বঞ্চিত করা চলবে না এমন কোনো কথা তিনি স্বীকার করেন না। তিনি তো দেখেন, কোন্ দেশে কোন্ জাতি কি কাজ করছে। যদি কোনো জাতি তার দেশে গঠনমূলক কাজে লিপ্ত থাকে, তার সমস্ত শক্তিসামর্থ দুনিয়ার সংশোধন ও উন্নতির জন্য নিয়োগ করে, সব রকমের মন্দ কাজ প্রতিরোধ করে এবং ভালো কাজের ক্ষেত্র প্রশস্ত করতে ব্যস্ত থাকে, তাহলে দুনিয়ার মালিক বলেন, অবশ্য তোমরা দেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার অধিকারী। তোমরা পূর্ব থেকেই এ দেশে বসবাস করে আসছ এবং দেশ পরিচালনারও যোগ্যতা রাখ। কাজেই অন্যান্য জাতির চেয়ে তোমাদের অধিকারই অগ্রগণ্য। কিন্তু যদি ব্যাপারটা উল্টো হয় অর্থাৎ যদি গড়ার পরিবর্তে শুধু ভাঙ্গার কাজই হতে থাকে, সৎকাজের বদলে দেশ জুড়ে কেবল অসৎ ও অবৈধ কাজই সংঘটিত হয় এবং আল্লাহ দুনিয়ায় যা সৃষ্টি করেছেন তাকে কোনো ভালো কাজে না লাগিয়ে বেপরোয়াভাবে নষ্ট করা হয় এক কথায় দেশকে গড়ার বদলে ভেঙ্গে ফেলা হয় তাহলে আল্লাহ এহেন জাতিকে প্রথমে কিছুটা হালকা এবং কিছুটা কঠিন আঘাত দেন, যাতে করে তারা সতর্ক হয়ে সঠিক পথ অবলম্বন করতে পারে। এতেও যে জাতি ঠিক না হয়, তার কাছ থেকে দেশের শাসন ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে অন্তত এর চেয়ে যোগ্যতার জাতিকে দেয়া হয়। এখানেই শেষ নয়। যদি পূর্ববর্তী জাতির লোকেরা পরাধীন হওয়ার পরও কোনো যোগ্যতা ও গুণবৈশিষ্ট্যের প্রমাণ না দেয় এবং তাদের কার্যকলাপের মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণ করে যে, বিকৃত করা ছাড়া তাদের দ্বারা আর কোনো কাজই হবে

না, তাহলে এহেন জাতিকে আল্লাহ্ নিশ্চিহ্ন করে দেন। তারপর তাদের স্থানে অন্য কোনো জাতিকে আনেন। এ ব্যাপারে সব সময়ই মালিকের যে দৃষ্টিভংগি হওয়া উচিত, আল্লাহরও তাই হয়ে থাকে। তিনি তাঁর দুনিয়া পরিচালনার ক্ষেত্রে দাবিদার ও প্রার্থীদের উত্তরাধিকার অথবা জন্মগত অধিকার দেখেননা। তিনি দেখেন কার গড়ার যোগ্যতা বেশি এবং ভাঙ্গবার দিকে ঝোঁকপ্রবণতা কম রয়েছে। একই সময়ের প্রার্থীদের মধ্যে যারা এ দিক দিয়ে যোগ্যতর বলে প্রমাণিত হয়, তাদেরকেই দেশ পরিচালনার জন্য নির্বাচন করা হয়। যতোদিন এদের ধ্বংসাত্মক কাজের চেয়ে গঠনমূলক কাজ বেশি হতে থাকে অথবা এদের তুলনায় বেশি ভালো করে গঠনমূলক কাজ করে এবং ধ্বংসাত্মক কাজও কম করে এমন কেউ এগিয়ে না আসে, ততোদিন দেশ পরিচালনার ক্ষমতা এদের হাতেই রাখা হয়।

এসব যা কিছু আমি বলছি, ইতিহাসে এর জ্বলন্ত প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহ্ চিরকালই এ নীতি অনুযায়ীই তাঁর দুনিয়া পরিচালনার ব্যবস্থা করেছেন। দূর দেশের কথা না হয় ছেড়েই দিন। নিজেদের এ দেশের ইতিহাসটাই পর্যালোচনা করুন। এ দেশে যেসব জাতি প্রথমে বাস করতো, তাদের গঠনমূলক যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা যখন শেষ হয়ে গেলো তখন আল্লাহ্ আর্য জাতিকে এ দেশ পরিচালনার সুযোগ দিলেন। সে সময় অন্যান্য জাতিগুলোর মধ্যে যোগ্যতম ছিলো আর্য জাতি। তারা এখানে এসে এক উন্নত তামাদ্দুন ও সভ্যতা গড়ে তুললো। বহু জ্ঞান ও শিল্প আবিষ্কার করলো। ভূগর্ভের গোপন সম্পদ উদ্ধার করে তাকে ভালো কাজে ব্যবহার করলো। ধ্বংসাত্মক কাজের তুলনায় গঠনমূলক কাজই তারা বেশি করেছিল। এসব যোগ্যতা যতোদিন পর্যন্ত তাদের মধ্যে ছিলো ততোদিন ইতিহাসের সমস্ত উত্থান-পতন সত্ত্বেও তারাই ছিলো এ দেশের পরিচালক। অন্যান্য জাতি ক্ষমতা দখলের জন্য বার বার এগিয়ে এসেছে কিন্তু তাদেরকে হটিয়ে দেয়া হয়েছে। কারণ আর্যদের মতো যোগ্য জাতি ক্ষমতাসীন থাকা কালে অন্য কোনো পরিচালকের প্রয়োজন ছিলো না। আর্যরা যখন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে বিপথে চলা শুরু করে, তখন তাদের উপর যেসব বৈদেশিক আক্রমণ হয়, সেগুলোকে তাদের জন্য আল্লাহর তরফ থেকে সতর্ককারী দূত স্বরূপ বলা যায়। কিন্তু তারা সতর্ক না হয়ে ধ্বংসাত্মক কাজেই লিপ্ত থাকে। গঠনমূলক কাজের তুলনায় তারা ধ্বংসাত্মক কাজ করতে থাকে অনেক বেশি। তাদের নৈতিক অধপতন এমন চরমে পৌছে যে, বামমার্গ আন্দোলনে আজো তার চিহ্ন আপনারা সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করতে পারেন। মানবতাকে বিভক্ত করে তারা নিজেদেরই সমাজকে বর্ণ ও গোত্রে খন্ডিত করলো। সমাজ জীবনকে একটি সিঁড়ির মতো করে গঠন করলো। এ সিঁড়ির প্রত্যেক ধাপের লোকেরা তাদের

উপরের ধাপের লোকদের বান্দা বা দাস এবং নীচু ধাপের লোকদের খোদা বনে বসলো। তারা আল্লাহর লাখো লাখো বান্দার উপর নির্মম যুলুম নির্যাতন চালাতে লাগলো। এ যুলুম আজো অচ্ছুত শ্রেণীর আকারে বিদ্যমান রয়েছে।

তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথ সাধারণ মানুষের জন্য বন্ধ করে দিলো। তাদের পন্ডিত ও পুরোহিতরা সাপের মতো জ্ঞান ভান্ডারের চারদিক বেষ্টন করে বসে রইলো। তাদের উপরে তলার কর্তারা দেশের জনসাধারণের উপর নিজেদের বহু অন্যায় অধিকার চাপিয়ে দিলো। এ অধিকার আদায় করা এবং আরাম-কেদারায় বসে বসে অন্যের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে বিলাসী জীবন যাপন করা ছাড়া তাদের আর কোনো কাজ রইলো না। এহেন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাদের কাছ থেকে দেশ পরিচালনার ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে মধ্য এশিয়ার কতিপয় জাতিকে এখানে পরিচালনার সুযোগ দিলেন। এ জাতিগুলো সে সময় ইসলামী আন্দোলনের সংস্পর্শে এসে জীবন যুদ্ধের উন্নততর যোগ্যতা অর্জন করেছিল।

কয়েকশো বছর তারা এ দেশ পরিচালনার দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলো। এ দেশেরও বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করে তাদের সাথে মিশে গিয়েছিল। অবশ্যি তারাও অনেক কিছু ধ্বংস করেছে। কিন্তু যে পরিমাণ ধ্বংস করেছে, তার চেয়ে বেশি সৃষ্টি করেছে। কয়েকশো বছর পর্যন্ত ভারতবর্ষে যতো গঠনমূলক কাজ হয়েছে তা সবই তাদের দ্বারা অথবা তাদের প্রভাবে সম্পাদিত হয়েছে। তারা দেশে জ্ঞানের আলো বিতরণ করেছে। চিন্তা ও ভাবধারা পরিশুদ্ধ করেছে। সমাজ, তামাদ্দুন ও সভ্যতার অনেক কিছু সংশোধন করেছে, দেশের উপায় উপাদানকে সে যুগের উপযোগী করে কল্যাণের পথে ব্যবহার করেছে। সর্বোপরি তারা শান্তি ও সুবিচারের এমন সুষ্ঠ ব্যবস্থা কায়েম করেছিল যা ইসলামের সত্যিকার শান্তি সুবিচার থেকে অনেক নিম্নমানের হলেও ইতিপূর্বেকার এবং আশে পাশের দেশগুলোর অবস্থার তুলনায় অনেকখানি উচুস্তরের ছিলো। অতপর তারাও পূর্ববর্তীদের ন্যায় পথভ্রষ্ট হতে লাগলো এবং তাদের মধ্যেও গঠনমূলক কাজের যোগ্যতা কমে যেতে লাগলো এবং ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের প্রতি ঝোঁকপ্রবণতা বেড়ে চললো। তারাও উঁচু-নীচু, বংশ মর্যাদা ও শ্রেণী বিভেদ সৃষ্টি করে নিজেদের সমাজ ও জাতিকে খন্ডবিখন্ড করে ফেললো। এজন্য চারিত্রিক, রাজনৈতিক, তামাদ্দুনিক ক্ষেত্রে সীমাহীন ক্ষতি হয়েছে। তারাও ইনসাফের তুলনায় যুলুম, নির্যাতন অনেক বেশি করতে লাগলো। রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কতর্ব্য ভুলে গিয়ে তারা শুধু তাখেকে স্বার্থসিদ্ধি এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অবৈধ স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টায় মেতে উঠলো। উন্নতি ও সংস্কারমূলক কাজ ছেড়ে দিয়ে তারাও আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ও উপায় উপাদান নষ্ট করতে এবং সেগুলোকে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে ব্যবহার করতে লাগলো। দৈহিক আরাম ও ভোগ-

লালসায় তারা এতোই মত্ত হয়ে গেলো যে, তাদের শাসনকর্তাদেরকে যখন দিল্লীর লালকেল্লা থেকে পলায়ন করতে হয়েছিল, তখন তাদের শাহজাদারা যারা গতকাল পর্যন্ত সিংহাসনের দাবিদার ছিলো নিজেদের জীবন রক্ষার জন্য পলায়ন করতে পারেননি। কেননা মাটির উপর দিয়ে চলার অভ্যাস তারা পরিত্যাগ করেছিল। মুসলমানদের সাধারণ নৈতিক চরিত্রের চরম অধপতন হয়েছিল। একেবারে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বড় বড় হোমরাচোমরা দায়িত্বশীল লোকদের পর্যন্ত নিজেদের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুর পরোয়া ছিলো না। ফলে, ধর্ম জাতি ও দেশকে অন্যের হাতে বিকিয়ে দেয়ার পথে তাদেরকে বাধা দেয়ার মতো আর কিছুই রইলো না। তাদের মধ্যে জন্ম নিলো লাখো লাখো পেশাদার সিপাই। এদের নৈতিক চরিত্র ছিলো পোষা কুকুরের মতো। যে কেউ খাবার দিয়ে এদেরকে পুষতে পারতো এবং তারপর এদের দিয়ে ইচ্ছামতো শিকার করাতে পারতো। এদের মধ্যে এ অনুভূতিই ছিলো না যে, এই ঘৃণ্য পেশার বদৌলতেই শত্রুরা তাদের সাহায্যে তাদেরই দেশ জয় করছে, এর একটি জঘন্যতম দিক আছে। গালিবের মতো কবিও এ সম্পর্কে গর্ব করে বলেছেন : "শত পুরুষ থেকে বাপ-দাদার পেশা হলো সৈনিক বৃত্তি।" এতোবড় একজন কবি এ কথা বলার সময় এতোটুকুও ভাবতে পারেননি যে, পেশাদারী সৈনিকবৃত্তি গর্বের বিষয় নয় লজ্জায় মরে যাবার জিনিস।

মুসলমানেরা যখন এহেন অবস্থায় পৌঁছলো, তখন আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং গোটা ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা আবার নতুন প্রার্থীদের হাতে যাওয়ার সুযোগ এলো। এ সময় দেশে মারাঠা, শিখ, ইংরেজ ও কতিপয় মুসলমান নেতা এই চারজন প্রার্থীকেই দেখা যাচ্ছিলো। জাতীয়তাবাদের নেশা ও স্বজাতির প্রতি অন্যায় পক্ষপাতিত্ব থেকে মন ও মগযকে মুক্ত ও পবিত্র রেখে ন্যায়ভাবে তখনকার ইতিহাস ও পরবর্তী অবস্থা পর্যালোচনা করলে আপনার বিবেক এ কথা স্বীকার করবে যে, তখন গঠনমূলক কাজের যে যোগ্যতা ইংরেজদের ছিলো তা অন্য কোনো প্রার্থীর ছিলো না এবং ইংরেজদের ভিতর যে পরিমাণ ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা ছিলো তার চেয়ে ঢের বেশি ছিলো মারাঠা, শিখ ও মুসলমান প্রার্থীর ভিতর। ইংরেজরা যা কিছু গঠনমূলক কাজ করেছে তা অন্যান্য জাতিরা করতো না । তারা যা কিছু নষ্ট করেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি অন্যেরা নষ্ট করতো। সাধারণভাবে দেখলে ইংরেজদের ভিতর বহু দিক দিয়ে অগণিত দোষ ও অন্যায় পাওয়া যাবে। কিন্তু তুলনামূলক ভাবে বিচার করলে তাদের সমকালীন প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে তাদের অন্যায় অত্যাচার অনেক কম এবং গুণ গরিমা বেশি পাওয়া যাবে। এই জন্যই তো আল্লাহর আইন আর একবার মানুষের মনগড়া নীতির মূলোচ্ছেদ করলো। মানুষ

বিনা অধিকারে এই নীতি রচনা করেছিল যে "প্রত্যেক দেশের অধিবাসীগণ সে দেশের মালিক তারা তাদের ইচ্ছামত দেশকে গড়তেও পারে, ভাঙ্গতেও পারে।" আল্লাহর আইন ইতিহাসের এই চিরন্তন ফায়সালা থেকে প্রমাণ করেছে যে-না, দেশ একমাত্র আল্লাহর এর পরিচালনার ভার কাকে দেয়া হবে এ ফায়সালা তিনিই করবেন ; এ ফায়সালা কোনো বংশ, জাতি অথবা পিতা-প্রপিতার অধিকারের ভিত্তিতে হয় না। বরং কোন্ পরিচালনায় সামগ্রিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে, সে দিকে নযর রেখেই এ ফায়সালা গৃহীত হয়।

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ز وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

বলুন, হে আল্লাহ! দেশের মালিক। তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে রাজ্য দিয়ে থাকো এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নিয়ে থাকো এবং যাকে চাও তাকে সম্মান এবং যাকে চাও তাকে লাঞ্ছনা দিয়ে থাকো। তোমারই হাতে রয়েছে সব মঙ্গল। তুমি নি:সন্দেহে সব কিছুই করার ক্ষমতা রাখো। -আলে ইমরান : ২৬

এই ভাবে হাজার হাজার মাইল দূরে থেকে একটি জাতিকে আল্লাহ এ দেশে নিয়ে এলেন। এরা এ দেশে সংখ্যায় তিন চার লাখের বেশি কোনো সময়ই ছিলো না। কিন্তু এরা এখানকার উপায় উপাদান ও মানুষ দিয়ে এ দেশের হিন্দু, মুসলমান, শিখ ইত্যাদি সমস্ত শক্তিকে পরাজিত করে দেশের শাসনক্ষমতা দখল করলো। এ দেশের কোটি কোটি অধিবাসী এ মুষ্টিমেয় ইংরেজদের অধীন হয়ে রইলো। একজন ইংরেজ একাই একটি জেলা শাসন করেছে। তাও এমন অবস্থায় যে, এ কাজে তার হাত শক্তিশালী করার মতো তার জাতির কোনো লোক এখানে ছিলো না। এ সময় এ দেশের লোকেরা যা কিছু করেছে তা সবই চাকর হিসেবে করেছে কার্যকারক হিসেবে নয়। ইংরেজদের শাসনামলে এ দেশে যেসব গঠনমূলক কাজ হয়েছে, তা তাদের দ্বারা এবং তাদের প্রভাবেই হয়েছে, এ কথা আমাদের সবাইকে স্বীকার করতে হবে। অস্বীকার করলে সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হবে। তার তুলনায় আজকের অবস্থা দেখলে এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, তাদের অনিষ্টকারিতা সত্ত্বেও অনেক গঠনমূলক ও উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। এসব কাজ এ দেশবাসীর দ্বারা সম্পন্ন হওয়ার কোনো আশাই ছিলো না। এজন্যই তো আল্লাহ আঠারশো শতাব্দীর মাঝখানে এ দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, তা মোটেই ভুল ছিলো না।

এখন দেখুন, ইংরেজরা যা কিছু গড়তে পারতো তা গড়েছে আর বিশেষ কিছু তাদের দ্বারা গড়ে উঠতে পারে না। এখন তারা যা গড়তে পারে তা অন্যের দ্বারাও সম্ভব। ওদিকে তাদের ধ্বংসকারিতার বহর খুব বেড়ে গেছে। আর যতোদিন তারা এ দেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবে, ততোদিন গড়ার চেয়ে ভাঙ্গবেই বেশি। তাদের অন্যায় ও অপরাধের ফিরিস্তি এতো দীর্ঘ হয়েছে যে, তা এক বৈঠকে বর্ণনা করা মুশকিল। আর সেগুলো বর্ণনা করার কোনো প্রয়োজনও নেই। কারণ সেসব সবার চোখের সামনেই রয়েছে। তাদেরকে এখন এ দেশের শাসনক্ষমতা থেকে বেদখল করাই আল্লাহর সিদ্ধান্ত। তারা নিজেরাই সোজাভাবে এ দেশ থেকে বিদায় নিতে প্রস্তুত হয়ে বেশ বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। সোজাভাবে না গেলে বাঁকাভাবে তাড়িয়ে দেয়া হতো। কারণ আল্লাহর চিরন্তন আইন এখন আর তাদের হাতে এ দেশের শাসনক্ষমতা রাখার পক্ষপাতি নয়।

দুনিয়ার প্রকৃত মালিক কোনো দেশে এক প্রকার পরিচালনা ব্যবস্থা খতম করে অন্য প্রকার ব্যবস্থা কায়েম করার ব্যবস্থা করলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, আমরা এখন তারই দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে আছি। এটা ইতিহাসের একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বাহ্যদৃষ্টিতে এদেশে যেভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর হতে দেখা যাচ্ছে তাতে কেউ যেন এ প্রতারণায় না পড়েন যে, দেশের শাসনক্ষমতা দেশবাসীর হাতে দেয়ার এই যে সিদ্ধান্ত হচ্ছে তা একেবারে চূড়ান্ত ও চিরন্তন। বর্তমান পরিস্থিতির একটা সহজসাধ্য রূপ হয়তো আপনারা অনায়াসেই অনুধাবন করতে পারছেন যে, বিদেশ থেকে এসে যারা এ দেশ শাসন করছিল, এখন তারা নিজ দেশে ফিরে যাচ্ছে। কাজেই এখন স্বাভাবিকভাবেই দেশের ক্ষমতা দেশবাসীর হাতে আসাই উচিত। আসলে কিন্তু তা নয়। আল্লাহর সিদ্ধান্ত এরূপ হয় না। তিনি এই বিদেশীদেরকে পূর্বেও অকারণে আনেননি, আবার এখনো বিনা কারণে সরিয়ে দিচ্ছেন না। পূর্বে যেমন তিনি আপনাদের কাছ থেকে খামখেয়ালীভাবে শাসনক্ষমতা কেড়ে নেননি, তেমনি এখনো আপনাদেরকে খামখেয়ালীভাবে এ ক্ষমতা দেবেন না। আসল ব্যাপার এই যে, বর্তমানে ভারতবাসীরা ক্ষমতার প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছে ; হিন্দু, মুসলমান, শিখ সবাই প্রার্থী। যেহেতু এরাই দেশে প্রথম থেকে বসবাস করে আসছে, কাজেই তাদেরকেই প্রথম ক্ষমতা লাভের সুযোগ দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এটা স্থায়ী নিযুক্তি নয়, বরং তাদের পরীক্ষার জন্যই এ সুযোগ দেয়া হচ্ছে। যদি তারা নিজেদের কার্যকলাপে প্রমাণ করে যে, ভাঙ্গার চেয়ে গড়ার যোগ্যতাই বেশি, তাহলে তাদেরকে এ দেশের শাসন ক্ষমতায় স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হবে। আর যদি তারা গঠনমূলক কাজের চেয়ে ধ্বংসাত্মক কাজই বেশি করে, তবে তার পরিণাম খুব শিগগিরই ভোগ করবে। এ অবস্থায় তাদের কাছ থেকে এ দেশের শাসনক্ষমতা কেড়ে নিয়ে অন্য কোনো জাতিকে এ

কাজের জন্য নির্বাচিত করা হবে। অতপর আর তারা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগই করতে পারবে না। সমগ্র দুনিয়ার সম্মুখে নিজেদের অযোগ্যতার স্পষ্ট প্রমাণ দেয়ার পর তারা কোন্ মুখে অভিযোগ করবে? নাছোড়বান্দা হয়ে অনুনয় বিনয় করলেও তা শুনবেই বা কে?

এখন আপনারা একটু পর্যালোচনা করে দেখুন যে, এ দেশের হিন্দু-মুসলমান ও শিখ এ পরীক্ষায় আল্লাহর সামনে নিজেদের এমন কি যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা, গুণ-গরিমা এবং কার্যকলাপ পেশ করেছে যে তার ফলে আল্লাহ তাঁর দেশের শাসনক্ষমতা আবার তাদের হাতে সোপর্দ করবেন বলে তারা আশা করতে পারে। হিন্দু, মুসলমান ও শিখদের অপরাধগুলো নৈতিকতার আদালতে পেশ করলে তারা সবাই দোষী সাব্যস্ত হয়ে পড়ে। আমি যদি এখন নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সুস্পষ্টভাবে সেগুলো বলে দেই, তাহলে আশা করি আপনারা খারাপ মনে করবেন না। নিজের জাতি ও স্বদেশী ভাইদের দোষ ও অপরাধের মারাত্মক পরিণাম যেন স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। তাদেরকে শিগগিরই এ পরিণামের সম্মুখীন হয়ে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হবে। এ সব দোষ ও অপরাধ তাদেরকে ধ্বংস করবে বলে আমার আশংকা হচ্ছে। আমি, আপনি কেউই এ মারাত্মক পরিণাম থেকে বাঁচতে পারবো না। এ জন্য আমি অন্তরের বেদনা নিয়ে এগুলো বিবৃত করছি। এর ফলে যার কান আছে সে শুনে সংশোধনের কিছুটা চিন্তা করতে পারবে।

আমাদের দেশবাসীর সাধারণ নৈতিক চরিত্রের অবস্থা যে রকম হয়েছে তা আপনারা নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অনুযায়ী অনুমান করে দেখুন। আমাদের ভেতর শতকরা ক'জন সত্যিকার চরিত্রবান লোক আছে। কারোর অধিকার হরণ করা, কোনো অবৈধ স্বার্থসিদ্ধি, কোনো 'লাভজনক' মিথ্যা বলা এবং কোনো 'লাভজনক' বিশ্বাস-ঘাতকতা করা নৈতিক দৃষ্টিতে খারাপ শুধু এই কারণে আমাদের ক'জন এসব কাজ করতে ইতস্তত করে থাকে? যেখানে আইনের বাঁধন নেই অথবা যেখানে আইনের আওতা থেকে বাঁচবার আশা ও পথ আছে , সেখানে শতকরা ক'জন শুধু নিজের নৈতিক অনুভূতির বলে অন্যায় ও অপরাধ থেকে বিরত থাকে? যেখানে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের আশা না থাকে, সেখানে ক'জন অন্যের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে। এরূপ ক্ষেত্রে ক'জন অপরের দুঃখে দৈন্যে মনে ব্যাথা পায় এবং স্বার্থ ত্যাগ করে? নিস্বার্থভাবে ক'জন অপরের হক আদায় করে? ক'জন ব্যবসায়ী ধোঁকা-ফাঁকি, মিথ্যা, মুনাফাখোরী, অন্যায়ভাবে উপার্জন করা থেকে বিরত থাকে, ক'জন শিল্পপতি নিজের স্বার্থের সংগে ক্রেতাদের স্বার্থ এবং নিজের জাতি ও দেশের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখে? খাদ্যশস্য মজুদ রেখে অত্যধিক চড়া দরে বিক্রি করতে গিয়ে ক'জন জমিদার

একটু ভেবে দেখে যে, তারা এই মুনাফাখোরীর দ্বারা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষকে ভূখা রেখে অসহ্য যন্ত্রণা দিচ্ছে? ক'জন ধনী ব্যক্তি ধনোপার্জনে অন্যায়, অত্যাচার, অধিকার হরণ ও বিশ্বাসঘাতকতা থেকে মুক্ত রয়েছে? আমাদের দেশের শ্রমজীবিদের মধ্যে ক'জন সঠিকভাবে কতর্ব্য পালন করে তাদের বেতন ও পারিশ্রমিক গ্রহণ করে? ক'জন সরকারি কর্মচারী ঘুষ, আমানতে খেয়ানত, অত্যাচার, উৎপীড়ন, কতর্ব্যে অবহেলা হারাম খাওয়া এবং ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকে? উকিল, চিকিৎসক, সাংবাদিক, গ্রন্থকার, প্রকাশক, জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক ও নেতৃবৃন্দের কজন নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য অসৎ ও ঘৃণা পন্থা অবলম্বন করে না? এদের ক'জন মানুষের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আর্থিক ক্ষতিসাধন করতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করে? বড় জোর দেশের শতকরা মাত্র পাঁচজন এসব নৈতিক রোগ থেকে মুক্ত রয়েছে, আমার মনে হয় এ কথা মোটেই অত্যুক্তি নয়। বাকী পঁচানব্বই জনই এই সংক্রামক রোগে আক্রান্ত। এ ব্যাপারে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতির ভেতর কোনো পাথর্ক্য নেই। সবাই সমানভাবে রোগাক্রান্ত। সবারই নৈতিক অবস্থার চরম ও ভয়াবহ অবনতি ঘটেছে। কোনো জাতির অবস্থাই অন্য জাতির চেয়ে ভালো নয়।

অধিকাংশ লোক এরূপ নৈতিক অধপতনের কবলে পড়ায় সমষ্টিগতভাবে এই নৈতিক রোগের ব্যাপক প্রসার হওয়াই স্বাভাবিক ছিলো। গত মহাযুদ্ধের কারণে যখন রেল গাড়িতে যাত্রীদের ভিড় হতে লাগলো তখন এই সম্ভাব্য তুফানের প্রথম লক্ষণ দেখা দিলো। সেখানে একই জাতির ও একই দেশের লোকেরা পরস্পরের সংগে যে স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা ও কঠোরতামূলক ব্যবহার করেছে, তা থেকেই টের পাওয়া গিয়েছিল যে, কেবল দ্রুতগতিতে আমাদের সাধারণ নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটছে। এরপর প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের অভাব ও উচ্চমূল্যের সময় মাল মওজুদ রাখা এবং চোরাবাজারী ব্যাপক ভাবে শুরু হয়। অতপর দেখা দিলো বাংলাদেশের সেই ভয়াবহ কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ। এই দুরাবস্থার সময় দেশের এক সম্প্রদায় নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের জন্য নিজেদের দেশের লাখো লাখো মানুষকে ভূখা রেখে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিয়েছে। এসব ছিলো প্রাথমিক লক্ষণ। এরপর নোংরামি, বর্বরতা, নীচতা, পশুসূলভ আচরণ ইত্যাদির অগ্নিকান্ড হঠাৎ ফেটে পড়লো। এগুলো এখানকার গভীরে বহুদিন হতে উত্তপ্ত হচ্ছিলো। বর্তমানে একটি সাম্প্রদায়িক দাংগারূপে দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সবকিছু জ্বালিয়ে ছাই করে দিচ্ছে। কলকাতার গোলযোগের পর থেকে হিন্দু, মুসলমান ও শিখদের জাতীয় বিরোধের নতুন অধ্যায় সূচিত হয়েছে। এর মাধ্যমে তিনটি জাতিই তাদের জঘন্য চরিত্রের প্রদর্শনী করে বেড়াচ্ছে।

যে সমস্ত কাজ কোনো মানুষ করতে পারে বলে ধারণাও করা যেতো না, তা আজ আমাদের দেশবাসীরা প্রকাশ্যে করে যাচ্ছে। বড় বড় অঞ্চলের প্রায় সমস্ত লোক গুন্ডায় পরিণত হয়েছে। গুন্ডারা যে কাজ করার ধারণাও কোনো দিন করেনি তাও এখন তারা করছে। দুগ্ধ-পোষ্য শিশুদের মায়ের বুকের উপর রেখে জবাই করা হয়েছে। জীবন্ত মানুষদেরকে আগুনে জ্বালানো হয়েছে। ভদ্র মহিলাদের হাজার হাজার লোকের সামনে উলঙ্গ করে তাদের উপর প্রকাশ্যে পাশবিক অত্যাচার করা হয়েছে। পিতা, ভাই ও স্বামীর সামনে তাদের মেয়ে বোন ও স্ত্রীর শ্লীলতা হানি করা হয়েছে। মসজিদ, মন্দির ও ধর্মীয় গ্রন্থরাজির উপর ক্রোধ প্রকাশ করতে গিয়ে অত্যন্ত পৈশাচিক উপায় অবলম্বন করা হয়েছে। রুগ্ন, আহত ও বৃদ্ধদেরকে অত্যান্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে। পথিক যাত্রীদেরকে চলন্ত গাড়ি থেকে নিক্ষেপ করা হয়েছে। জীবন্ত মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করা হয়েছে। নিরীহ ও অক্ষম লোকদেরকে জন্তু-জানোয়ারের মতো শিকার করা হয়েছে। প্রতিবেশী প্রতিবেশীর গৃহ লুটতরাজ করেছে। বন্ধুর প্রতি বন্ধু বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আশ্রয়দাতা আশ্রয় দিয়ে নিরাশ্রয় করেছে। শান্তি ও নিরাপত্তার রক্ষকগণ (পুলিশ, সৈন্য ও ম্যাজিস্ট্রেটগণ) প্রকাশ্যে দাংগায় অংশ গ্রহণ করেছে, এমনকি তারা নিজেরাই দাংগা করেছে এবং নিজেদের সাহায্য সহানুভূতি ও তত্ত্বাবধানে দাংগা বাঁধিয়েছে। মোট কথা অত্যাচার, অনাচার, নিষ্ঠুর ও নির্দয় ব্যবহার, বর্বরতা ও জঘণ্য কার্যকলাপ ইত্যাদি কোনো কিছু আর বাকি নেই, যা এই কয়েক মাসের ভেতর আমাদের দেশের লোকেরা সমষ্টিগতভাবে করেনি। তবুও মনের জ্বালা মেটেনি। আলামত যা দেখা যাচ্ছে মনে হয় এর চেয়ে অনেক বেশি ভয়াবহ ও বিরাট আকারে দাংগা এখন দেখা দেবে।

আপনারা কি মনে করেন, এসব কিছুই একটা আকস্মিক উত্তেজনার ফল মাত্র? এরূপ ধারণা করে থাকলে আপনারা বিরাট ভুলের মধ্যে আছেন বলতে হবে। এইমাত্র আমি আপনাদের বলেছি যে, এ দেশের শতকরা পঁচানব্বই জন নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। দেশের জনসমষ্টির এতো বিরাট অংশ যদি অসৎচরিত্রের হয়ে পড়ে তা হলে জাতির সমষ্টিগত স্বভাব-চরিত্র কেমন করে ঠিক থাকতে পারে? এই জন্যই তো হিন্দু-মুসলমান ও শিখ জাতির কাছে সত্যবাদিতা, সুবিচার ও সততার কোনো দামই এখন নেই। সত্যপন্থী, সৎ এবং ভদ্রস্বভাব বিশিষ্ট লোকেরা তাদের ভিতর কোণঠাসা ও দুর্বল হয়ে রয়েছে। মন্দ কাজে বাধা দান এবং ভালো কাজ করার জন্যে উপদেশ দেয়া তাদের সমাজে অসহনীয় অপরাধে পরিণত হয়েছে। সত্য ও ন্যায় কথা শুনতে তারা প্রস্তুত নয়। তাদের মধ্যে প্রত্যেকটি জাতিই এমন লোকদেরকে পছন্দ করে যারা তার সীমাহীন লোভ লালসা ও স্বার্থের পক্ষে ওকালতি করে এবং অন্যের বিরুদ্ধে

তাকে উত্তেজিত করে তার ন্যায় ও অন্যায় সব রকম স্বার্থোদ্ধারের জন্য সংগ্রাম করতে প্রস্তুত হয়। এ জন্যই এরা নিজেদের ভিতর থেকে বেছে বেছে সব চেয়ে দুষ্ট প্রকৃতির লোকদেরকে নিজেদের নেতা নির্বাচন করেছে। তারা নিজেদের জঘন্যতম অপরাধীদেরকে খুঁজে বের করে তাদেরকে নিজেদের নেতৃত্বপদে বরণ করে নিয়েছে। তাদের সমাজের সবচেয়ে দুশ্চরিত্র, দুর্নীতিবাজ, বিবেকহীন লোকেরা তাদের মুখপাত্র সেজে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অত্যধিক বরণীয় হয়েছে। অতপর এসব লোকেরা নিজ নিজ পথভ্রষ্ট জাতিকে নিয়ে ধ্বংসের পথে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। তারা জাতির পরস্পর বিরোধী আশা-আকাংখাকে কোনো ইনসাফের কেন্দ্রবিন্দুতে একত্রিত না করে তাকে এতোখানি বাড়িয়ে দিয়েছে যে, তা অবশেষে সংঘর্ষের সীমান্তে পৌছেছে। তারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের সংঘর্ষে ক্রোধ, ঘৃণা, শত্রুতার বিষ মিশিয়ে একে নিত্য অগ্রবর্তী করেছে। বহু বছর ধরে নিজেদের প্রভাবাধীন জাতিগুলোকে উত্তেজনামূলক বক্তৃতা ও রচনার ইনজেকশন দিয়ে এতোখানি উত্তেজিত করে তুলেছে যে, এখন উত্তেজনাবশত কুকুর ও হিংস্র পশুর মতো লড়াই করবার জন্য খড়গ উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে। জনসাধারণ ও শিক্ষিত সমাজের মনকে পৈশাচিক আবেগ ও উচ্ছাসে দুর্গন্ধময় এবং অন্ধ শত্রুতার চুল্লী বানিয়ে ফেলেছে। আপনাদের সামনে এখন যে তুফান প্রবাহিত হচ্ছে তা মোটেই সাময়িক ও আকস্মিক নয়। বহু দিন থেকে বিকৃতির যেসব বেশুমার কার্যকারণ আমাদের মধ্যে সক্রিয় রয়েছে এ হলো তারই স্বাভাবিক পরিণতি। এটা একবার দেখা দিয়েই ক্ষান্ত হবে না। বরং যতোদিন পর্যন্ত এসব কার্যকারণ সক্রিয় থাকবে, ততোদিন এ বিকৃতি ক্রমশ বাড়তে থাকবে। এটা একটা শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রের মতো। বহু বছরের বীজ বপন ও জল সেচনের পর এ ফসল খাবার উপযুক্ত হয়েছে। এখন আপনাকে এবং আপনার বংশধরদেরকে কতোদিন পর্যন্ত এ ফসল কাটতে হবে তা বলা যায় না।

ভাইসব! আল্লাহর আইন অনুযায়ী এদেশের ভাগ্যে শীঘ্রই নতুন কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব আসছে। এখন ঠান্ডা মস্তিষ্কে চিন্তা করুন যে, এ সময় আমরা দেশের আসল মালিকের সামনে নিজেদের যোগ্যতা ও উপযুক্ততার কি প্রমাণ দিচ্ছি। এখন আমাদের কার্যকলাপের দ্বারা এ কথা প্রমাণ করার সুযোগ ছিলো যে, তিনি আমাদেরকে এ দেশের শাসন ক্ষমতা দিলে আমরা একে সুষ্ঠ ও সুন্দর করে গড়ে তুলবো। এখানে আমরা ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করবো। এর সমস্ত উপায় উপাদানকে নিজেদের এবং মানবতার কল্যাণে ব্যবহার করবো।

এখানে সমস্ত ভালো কাজের উন্নতি বিধান এবং সমস্ত মন্দ কাজে বাধা দান করবো। কিন্তু আমরা তাঁর কাছে এই প্রমাণ দিচ্ছি যে, আমরা এখন ধ্বংসকারী। তিনি আমাদেরকে এ দেশের শাসন ক্ষমতা দান করলে আমরা দেশের সমস্ত বসতি উজাড় করে দেবো। মহল্লা ও গ্রাম জ্বালিয়ে দেবো। মানুষের জীবনকে মশা মাছির চেয়েও মূল্যহীন মনে করবো। মেয়েদের শ্লীলতা হানি করবো। ছোট শিশুদেরকে শিকার করবো। বুড়ো, রোগী ও আহতদের প্রতিও দয়া করবো না। মসজিদ, মন্দির ও ধর্মীয় গ্রন্থও আমাদের পৈশাচিক আচরণ থেকে নিস্তার পাবে না। যে দুনিয়াকে আল্লাহ মানুষের আবাস স্থলে পরিণত করেছেন, আমরা মানুষ মেরে এবং বাড়িঘর জ্বালিয়ে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবো।

এমতাবস্থায় আপনাদের বিবেক কি সত্যিই সাক্ষ্য দেয় যে, এহেন দেশসেবা, এরূপ গুণপনা এবং কার্যাবলীর ফিরিস্তি পেশ করে আপনারা আল্লাহর নজরে তাঁর দেশের শাসন পরিচালনার জন্য যোগ্যতম বলে প্রমাণিত হতে পারবেন? এসব কাজ দেখেই কি তিনি আপনাদেরকে বলবেন : সাবাশ! আমার পুরোনো মালীর বংশধর!! এই বাগানের পরিচালনার জন্য তোমরাই যোগ্যতম। এই বিশৃংখলা, ধ্বংস, বিকৃতি প্রলয়, অনিষ্ট সাধন এবং আবর্জনা সৃষ্টির জন্যই তো আমি এ বাগানখানা তৈরি করেছিলাম, কাজেই এটার কর্তৃত্ব গ্রহণ করে এখন তোমরা একে খুব ভালো করেই নষ্ট করো।

আপনাদেরকে ভবিষ্যত সম্পর্কে নিরাশ হয়ে যাওয়ার জন্য এসব কথা বলছিনা। আমি নিজে যেমন নিরাশ নই, তেমনি কাকেও নিরাশ করতেও চাইনা। আসলে আমার বক্তব্য এই যে, কয়েক শতাব্দির পর কোনো দেশের ভাগ্য পরিবর্তনের সময় আল্লাহ ঐ দেশবাসীকে ক্ষমতা লাভের সুযোগ দিয়ে থাকেন। কিন্তু ভারতবর্ষের লোকেরা তাদের নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতার দরুন সেই সব সুযোগ হারাতে বসেছে। এ পরিস্থিতিতে দেশবাসিকে যোগ্যতা ও গুণাবলীর প্রতিযোগিতায় প্রত্যেকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার প্রয়োজন ছিলো। এভাবে তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে দেশ পরিচালনার যোগ্য ও উপযুক্ত বলে প্রমাণিত হতে পারতো। কিন্তু আজ তাদের ভেতর এই প্রতিযোগিতা চলছে যে, কে সবচেয়ে বেশি ধ্বংসকারী, কে বড় খুনী এবং কে বড় অত্যাচারী। এভাবে তারা সবার চেয়ে বেশি খোদ অভিশাপের যোগ্য হচ্ছে। আযাদী, উন্নতি ও প্রগতির লক্ষণ এসব নয়। এতে তো আশংকা হচ্ছে যে, আবার এক দীর্ঘ কালের জন্য আমাদের ভাগ্যে দাসত্ব ও অপমানের ফায়সালা লিখিত না হয়ে যায়। কাজেই এ অবস্থার সংশোধনের জন্য বুদ্ধিমান ও হুশিয়ার লোকদের চিন্তা করা উচিত।

এ পর্যায়ে আপনাদের মনে স্বতস্ফূর্তভাবে প্রশ্ন জাগবে যে, সংশোধনের উপায় কি? আমি এর জবাব দিতে প্রস্তুত।

এই অন্ধকারে আমাদের জন্য আশার একটি মাত্র আলোক রেখা দেখা যাচ্ছে। সেটা এই যে, আমাদের দেশের সমস্ত অধিবাসীই বিকৃত স্বভাব হয়ে যায়নি। অন্তত শতকরা চার পাঁচ জন লোক বর্তমান নৈতিক অধপতন থেকে বেঁচে আছে। এই পুঁজি নিয়ে সংস্কার ও সংশোধনের কাজ শুরু করা যেতে পারে। এই সৎলোকগুলোকে খুঁজে বের করে সংঘবদ্ধ করাই হবে সংস্কারের পথে প্রথম পদক্ষেপ। আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ হলো এই যে, এখানে অসৎ বেশ সংঘবদ্ধভাবে রীতিমতো কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু সৎ সংঘবদ্ধ নয়। সৎলোক আছে নিশ্চয়ই কিন্তু তারা বিক্ষিপ্ত। তাদের ভেতর পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব নেই। কোনো সহযোগিতা ও সম্মিলিত কর্ম প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে নেই। তাদের কোনো কার্যসূচী ও সম্মিলিত আওয়াযও নেই। এ জন্যেই তারা একেবারে প্রভাবহীন ও দুর্বল হয়ে রয়েছে। সময় সময় চতুস্পার্শের দুষ্কর্ম দেখে হয়তো কোনো আল্লাহর বান্দা চিৎকার করে উঠে কিন্তু যখন কোনো দিক থেকে কোনো আওয়ায তার সমর্থনে না আসে তখন সে নিরাশ হয়ে চুপ করে বসে পড়তে বাধ্য হয়। কোনো সময় হয়তো কেউ হক ও ইনসাফের কথা প্রকাশ্যে বলে ফেলে, কিন্তু সংঘবদ্ধ অসৎ শক্তি জোর করে তার মুখ বন্ধ করে দেয় এবং সত্যপন্থি লোকেরা তাকে চুপে চুপে শুধু ধন্যবাদ দিয়ে ক্ষান্ত হয়ে যায়। কখনো হয়তো কেউ মানবতার হত্যা প্রত্যক্ষ করে ধৈর্য ধারণ করতে পারে না এবং তার প্রতিবাদ করে বসে, কিন্তু দুষ্ট লোকেরা এক জোট হয়ে তাকে দমন করে। ফলে যাদের মধ্যে এখনো কিছুটা চেতনা আছে তারা তার এহেন দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করে সাহস হারিয়ে ফেলে। এখন এ অবস্থার পরিসমাপ্তি হওয়া উচিত। আমরা যদি আমাদের দেশের উপর আল্লাহর আযাব প্রত্যাশা না করি এবং এও প্রত্যাশা করি যে, এ আযাবের মুখে দেশের সৎ ও অসৎ সমস্ত লোক নিক্ষিপ্ত হোক, তাহলে আমাদের মধ্যকার যে সমস্ত সৎলোক এখনো এ নৈতিক ব্যধি মুক্ত রয়েছে, তাদেরকে একত্রিত ও সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য। যে ক্রমবর্ধমান অন্যায় ও ফেতনা ফাসাদ আমাদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে এ সংঘবদ্ধ সম্মিলিত শক্তির সাহায্যে আমাদেরকে রুখে দাঁড়াতে হবে।

বর্তমানে এই সৎলোকগণ বাহ্যত অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক সংখ্যালঘূতে রয়েছে দেখে আপনারা ঘাবড়াবেন না। এ মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক যদি সংঘবদ্ধ হয়ে যায়, এদের নিজেদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন খাঁটি, সত্য ও সততা, ইনসাফ, আন্তরিকতা, সৎ নীতি ও নৈতিকতার উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জীবনের যাবতীয় সমস্যার একটি উৎকৃষ্ট সমাধান ও দুনিয়ার সমস্ত কাজ কারবার সঠিক পন্থায় পরিচালনা করার জন্য একটা সুষ্ঠু কর্মসূচী এরা গ্রহণ করতে পারে, তাহলে নিশ্চিত জেনে রাখুন এভাবে সৎলোকেরা সংঘবদ্ধ ও

সুশৃংখল হয়ে সংগ্রাম করতে থাকলে তাদের শক্তির সামনে সংঘবদ্ধ অসৎ শক্তি, বহু জনবল এবং পৈশাচিক অস্ত্রশস্ত্রের প্রাচুর্য সত্ত্বেও পরাজিত হতে বাধ্য হবে। মানুষের প্রকৃতি অসৎ নয়। তাকে অবশ্যি ধোঁকা দেয়া যেতে পারে এবং অনেকটা বিকৃতও করা যেতে পারে। কিন্তু তার ভেতর সততা ও কল্যাণের যে মূল্যবোধ আল্লাহ্ আমানত রেখেছেন তাকে একেবারে খতম করা সম্ভব নয়। এরূপ লোক কমই হয়ে থাকে যারা অসৎকেই পছন্দ করে এবং তার ধারক ও বাহক হয়ে দাঁড়ায়। অনুরূপভাবে সৎ ও সত্যের প্রতি গভীর প্রেম এবং তাকে কায়েম করার জন্যে সংগ্রামী প্রচেষ্টা চালাবার ক্ষমতাও কম লোকেরই থাকে। এ দুই দলের মাঝখানে সাধারণ লোকেরা সৎ ও অসৎ উভয় ধরনের মিশ্রিত মনোবৃত্তি সম্পন্ন হয়ে তারা ভালো ও মন্দ কোনটা নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় না। ভালো ও মন্দের ধারকগণ অগ্রবর্তী হয়ে তাদেরকে যে পথে টেনে নিয়ে যায় তারা সেই পথেই যায়। ভালোর ধারকগণ কর্মক্ষেত্রে না থাকলে এবং তাদের পক্ষ থেকে সাধারণ লোকদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করার প্রচেষ্টা চালানো না হলে মন্দের ধারকদের হাতেই সমস্ত কর্তৃত্ব থাকবে এবং তারা সাধারণ লোকদেরকে নিজেদের পথে টেনে নিয়ে যাবে। কিন্তু যদি ভালোর ধারকরা কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে আসে এবং সংশোধনের যথাযোগ্য চেষ্টায় ত্রুটি না করে, তাহলে সাধারণ লোকের উপর মন্দের ধারকদের প্রভাব বেশিদিন থাকতে পারে না। কারণ শেষ পর্যন্ত নৈতিক চরিত্রের ক্ষেত্রেই এ উভয় দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। সেখানে অসৎ লোকেরা সৎলোকদেরকে কখনো পরাজিত করতে পারবে না। সত্যের মুকাবিলায় পৈশাচিকতা ও সুষ্কর্ম যতোই জোরদার হোক না কেন শেষ পর্যন্ত সত্য, বিশ্বস্ততা এবং পবিত্রতার বিজয় সূচিত হয়। দুনিয়া অনুভূতিহীন নয় যে, সৎচরিত্রের মাধুর্য এবং অসৎচরিত্রের তিক্ততা আস্বাদন করার পরও পরিশেষে মাধুর্যের চেয়ে তিক্ততা ভালো বলে গ্রহণ করবে।

সংশোধনের জন্য সৎলোকদের সংগঠনের সাথে সাথে ভাঙ্গা ও গড়া সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। ভাঙ্গা কি তা আমাদেরকে ভালো করে বুঝে নিতে হবে। তাহলেই ভাঙ্গন প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা যাবে। এমনিভাবে গড়া কি তাও জানতে হবে। তা হলেই তার বাস্তবায়নের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা যাবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। অত্যন্ত সংক্ষেপে এ দুটোর পরিচয় পেশ করব।

মানবজীবনে যেসব কারণে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয় সেগুলোকে আমরা চার ভাগে ভাগ করতে পারি।

প্রথম হচ্ছে : আল্লাহকে ভয় না করা। এটাই দুনিয়ার সব রকমের অন্যায়, অবিচার, নিষ্ঠুরতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও যাবতীয় দুর্নীতির মূল।

দ্বিতীয় হচ্ছে : আল্লাহর বিধান মেনে না চলা। এটিই মানুষের জন্যে কোনো ব্যাপারেই অনুসরণযোগ্য স্থায়ী নৈতিক বিধান অবশিষ্ট রাখেনি। এরি বদৌলতে ব্যক্তি, দল ও জাতির সমস্ত কর্মধারা স্বার্থপূজা, ভোগ-বিলাস ও কামনা-লালসার দাসত্বের অধীন হয়ে গিয়েছে। এরি ফলে তারা নিজেদের উদ্দেশ্যের মধ্যে বৈধ ও অবৈধ পাথর্ক্য করে না এবং উদ্দেশ্য হাসিল করবার জন্যে যে কোনো রকমের অসদুপায় ও দুর্নীতি অবলম্বন করতে এতোটুকু দ্বিধাবোধ করে না।

তৃতীয় হচ্ছে : স্বার্থপরতা। এরি কারণে মানুষ পরস্পরের অধিকার হরণ করে। এমন কি ব্যাপকভাবে খান্দানী ও জাতীয় আভিজাত্য এবং শ্রেণী বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। এবং এথেকে নানান ফেতনা ও বিপর্যয়ের উদ্ভব হয়।

চতুর্থ হচ্ছে : জড়তা অথবা বিপথগামিতা, এর দরুন আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ও ক্ষমতা হয়তো কোনো কাজে ব্যবহারই করে না, কিংবা তার অপব্যবহার করে অথবা আল্লাহ প্রদত্ত উপায়-উপাদানকে কাজেই লাগায় না কিংবা অকাজে লাগায়। প্রথম অবস্থায় আল্লাহ এহেন অপদার্থ ও অলস লোকদেরকে বেশি দিন দুনিয়ায় ক্ষমতাসীন থাকতে দেন না বরং তাদের বদলে যারা কিছু না কিছু গঠনমূলক কাজ করে তাদেরকে ক্ষমতা দেন। এটাই আল্লাহর নিয়ম। দ্বিতীয় অবস্থায় যখন দুস্কৃতিকারী জাতির ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ তাদের গঠনমূলক কাজের চেয়ে বেশি হতে থাকে তখন তাদেরকে নিজেদেরই ধংসকারিতার দরুন ধ্বংসের মূলে ঠেলে দেয় হয়।

অপর দিকে মানুষের জীবন যেসব উপায়ে সুন্দররূপে গড়ে উঠে তাকেও চার ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথমটি হচ্ছে : আল্লাহ ভীতি। মানুষকে অসৎ পথ থেকে বিরত রাখা এবং সৎপথে চালাবার জন্য এটাই হচ্ছে একমাত্র নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার। সত্যবাদিতা, সততা, ইনসাফ, বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরায়ণতা ও আত্মসংযম ইত্যাদি সমস্ত সৎগুণাবলীই এ উৎস থেকে সৃষ্টি হয়। একটা শান্তিপূর্ণ ও উন্নত সভ্যতা ও তামাদ্দুন যেসব সৎগুণরাজির ভিত্তিতে গড়ে উঠে তা সব এই বীজ থেকেই জন্মলাভ করে। অবশ্যি অন্যান্য বিশ্বাস ও নীতির সাহায্যে এসব গুণাবলী কিছু না কিছু সৃষ্টি করা যেতে পারে যেমন করে পাশ্চাত্য জাতিগুলো নিজেদের ভিতর এসব গুণ কিছু কিছু সৃষ্টি করেছে কিন্তু এভাবে অর্জিত গুণপনা কোনো এক পর্যায়ে পৌছে আর অগ্রসর হতে পারে না এবং শেষ পর্যায় পর্যন্তও দুর্বল রয়ে যায়। অসৎ পথ থেকে বিরত রেখে সৎপথে চলার জন্য প্রয়োজনীয় বলিষ্ঠ চরিত্র একমাত্র আল্লাহভীতির ভিত্তিতেই স্থায়ীভাবে সৃষ্টি হয়। এরূপ সুগঠিত চরিত্র শুধু সীমাবদ্ধভাবেই নয়, ব্যাপকভাবেই যাবতীয় কর্মকান্ডের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

দ্বিতীয় হচ্ছে : আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করা। মানুষের ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কাজ-কারবার নৈতিকচরিত্রের চিরন্তন নিয়ম-নীতি অনুযায়ী পরিচালনা করার জন্য এটিই একমাত্র পথ। মানুষ নিজেই যখন তার নৈতিক ব্যবস্থা প্রণয়ন করে তখন বলার সময় সে যে নীতি ব্যবহার করে, কাজ করার সময় করে তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর নীতি। বই পুস্তকে সোনালী হরফে মানুষ এক প্রকার নীতি লিখে থাকে আর বাস্তব জীবনের কাজ কারবারে নিজের মতলব অনুযায়ী একেবারে স্বতন্ত্র নীতি অবলম্বন করে থাকে। অন্যের কাছে দাবি করার সময় তার নীতি এক রকমের হয়, আর নিজের কাছে অন্যের দাবি পেশ করা হলে তার নীতি অন্য রকমের। সুযোগ-সুবিধে, কামনা, প্রয়োজনের চাপে সব সময় তার নীতির পরিবর্তন হতে থাকে। "সত্যের পরিবর্তে নিজের স্বার্থকে" সে নৈতিকতার আসল কেন্দ্র হিসেবে গণ্য করে। সত্য নীতি অনুযায়ী নিজের কার্যাবলী সম্পন্ন করা কর্তব্য বলে সে স্বীকারই করে না। এর বদলে সে সত্যকে নিজের স্বার্থ অনুযায়ী ঢালাই করতে চায়। এজন্যেই মানুষের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনধারা ভুল পথে পরিচালিত হয় এবং এথেকেই দুনিয়ায় ফেতনা-ফাসাদ বিস্তার লাভ করে। পক্ষান্তরে যার সাহায্যে মানুষ শান্তি, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, কল্যাণ ও সৌভাগ্য লাভ করতে পারে, তা হচ্ছে একটা সুষ্ঠু ও সুন্দর নৈতিক ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা কারোর স্বার্থ অনুযায়ী নয় বরং সত্যের ভিত্তিতে গঠিত হতে হবে। এ ব্যবস্থাকে চিরন্তন ও অকাট্য বলে মেনে নিয়ে জীবনের সমস্ত কাজ-কারবারে তদানুযায়ী চলতে হবে। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে, জাতীয় জীবনে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে, রাজনীতিতে, যুদ্ধ ও সন্ধিতে প্রতি ক্ষেত্রেই এটা কার্যকরী করতে হলে এতে কোনো পরিবর্তন ও পরিবর্ধন না করে মানুষকে এর অনুসরণ করা আবশ্য কর্তব্য বলে মেনে নিতে হবে।

তৃতীয় হচ্ছে : মানবতার ব্যবস্থা। এতে ব্যক্তিগত, জাতীয়, বংশীয় সাম্প্রদায়িক স্বার্থপরতার পরিবর্তে সমস্ত মানুষের সমান মর্যাদা ও সমান অধিকার থাকবে। এর ভেতর অযথা বৈষম্য, উচ্চ-নীচু, অপবিত্রতার ধারণা, কৃত্রিম গোঁড়ামী ও পক্ষপাতিত্ব থাকবে না। এতে কতোক লোকের জন্য কৃত্রিম বিধিনিষেধ ও বাঁধা বিপত্তি থাকবে না। এতে সবারই উন্নতি ও প্রগতির সুযোগ সুবিধা থাকবে। দুনিয়ার সব মানুষ সমানভাবে মিলে মিশে থাকতে পারে, এমন ব্যাপক হতে হবে এ ব্যবস্থা।

চতুর্থ হচ্ছে : সৎকাজ। এর মানে হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ও উপায় উপাদানকে পূর্ণরূপে ও সঠিকভাবে কাজে লাগানো।

ভাইসব! এই চারটি বিষয়ের সমষ্টির নাম হচ্ছে গড়া ও সংশোধন। আমাদের ভেতরকার সৎলোকদের সমন্বয়ে গঠিত একটা সংগঠনের মধ্যে রয়েছে আমাদের সবার কল্যাণ। এ সংগঠন সমস্ত প্রকার ধ্বংসাত্মক কাজ ও ভাঙ্গনের পথ বন্ধ করবে এবং উল্লেখিত উপায়ে গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে অবিরাম গড়ার প্রচেষ্টা চালাবে। এ প্রচেষ্টা এ দেশবাসীকে সঠিক পথে আনতে সফল হলেও আল্লাহ দেশের শাসন ক্ষমতা অযথা দেশের অধিবাসীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অন্যকে দিয়ে দেবেন এমন অবিচারক তিনি নন। কিন্তু যদি এতে সফলকাম না হওয়া যায়, তাহলে আমাদের, আপনাদের ও সমস্ত দেশবাসীর পরিণাম কি হবে তা বলা যায় না।

৮

আল্লাহর পথে জিহাদ

[এটি মাওলানা মওদূদীর একটি ভাষণ। ১৯৩৯ সালের ১৩ই এপ্রিল 'ইকবাল দিবস' উপলক্ষে লাহোর টাউন হলে মাওলানা এ ভাষণ প্রদান করেন।]

সাধারণত ইংরেজি ভাষায় জিহাদ শব্দটির অনুবাদ holy war (পবিত্র যুদ্ধ) করে মারাত্মক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হয়। দীর্ঘকাল যাবত এই শব্দটির যেরূপ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হচ্ছে, তার ফলে ইহা এখন 'উন্মাদনা' বা 'পাগলামীর' প্রতিশব্দে পরিণত হয়েছে। এই শব্দটি শ্রুত হওয়ার সংগে সংগেই শ্রোতার কল্পনা দৃষ্টিতে এমন এক ভয়ংকর ও বিভীষিকাময় দৃশ্য ভেসে উঠে যে, ধর্মপাগলের একটি দল যেন নগ্ন তরবারি হস্তে, শ্মশ্রু উত্তোলন করে রক্ত পিপাসু চোখে 'আল্লাহ আকবার' ধ্বনি করতে করতে অগ্রসর হচ্ছে আর কাফেরদের পাওয়া মাত্র গ্রেফতার করছে এবং তাদের গর্দানে তরবারি রেখে বলছে : 'কালেমা পড়' নতুবা এক্ষুণি গর্দান দ্বিখণ্ডিত করা হবে। শঠ লেখকগণ বিশেষ চাতুর্যের সাথে আমাদের এরূপ চিত্র অংকিত করছে এবং তার সাথে এ মন্তব্যটি জুড়ে দিয়েছে "রক্তের গন্ধ আসে এ জাতির ইতিহাস হতে।"

মজার ব্যাপার এই যে, আমাদের এই চিত্র যারা অংকিত করেছে, তারা নিজেরাই বিগত কয়েক শতাব্দীকাল যাবৎ মারাত্মক অপবিত্র যুদ্ধে (unholy war) লিপ্ত রয়েছে। তাদের চরিত্র অত্যন্ত বীভৎস। তারা সম্পদ ও শক্তির লোভে সকল প্রকার অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নিতান্ত দস্যুর ন্যায় সমগ্র পৃথিবীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তারা সর্বত্র ব্যবসায়ের বাজার, কাঁচামালের সম্ভার, উপনিবেশ স্থাপনের উপযোগী অঞ্চল এবং মূল্যবান দ্রব্যের খনির সন্ধানে ব্যতিব্যস্ত রয়েছে। লালসার আগুনের ইন্ধন সংগ্রহ করে এটাকে চির প্রজ্বলিত করে রাখাই হলো তাদের লক্ষ্য। লালসা ও লোভের পংকিল পথেই তাদের সকল চেষ্টা নিয়োজিত। তাদের দৃষ্টিতে কোনো দেশে বিপুল খনিজ সম্পদ বর্তমান থাকা কিংবা প্রচুর কাঁচামাল উৎপন্ন হওয়াই তার উপর প্রচন্ড বিক্রমের সাথে তাদের আক্রমণ করার পক্ষে যথেষ্ট কারণ। এমন কি, তাদের নিজ দেশে উৎপন্ন ব্যবসায় পণ্য বিক্রয়ের উপযুক্ত বাজার সৃষ্টির সম্ভাবনা কোথাও পরিলক্ষিত হলে অথবা তাদের অতিরিক্ত জনসংখ্যা সে দেশে প্রেরণ করা সম্ভব হলে সে দেশের উপর অনায়াসেই তারা আক্রমণ চালাতে পারে। আর কিছু না হলেও তাদের অধিকৃত কিংবা অধিকার

করতে ইচ্ছুক এমন কোনো দেশে যাওয়ার পথে অপর কোনো দেশের অবস্থানও উহার আক্রান্ত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট কারণ। বলা বাহুল্য, আমরা যা কিছু করেছি তা অতীতের ইতিহাস ; কিন্তু তাদের এ কীর্তিকলাপ তো অত্যাধুনিক। সাম্প্রতিক কালের প্রত্যেকটি দিন ও রাত্রেই বিশ্ববাসীর চোখের সম্মুখেই তাদের কার্যকলাপ সংঘটিত হচ্ছে। এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা, ভূ-মণ্ডলের কোনো একটি অংশও এই লালসা পঙ্কিল যুদ্ধ লিপ্সু জাতির অপবিত্র আক্রমণের আঘাত হতে রক্ষা পাচ্ছে না। তথাপি তাদের চতুরতা বড়ই প্রশংসনীয়। কারণ তারা আমাদের চিত্র এতোখানি ভয়ানক ও বিভীষিকাপূর্ণ করে তুলে ধরেছে যে, তাদের নিজস্ব কদর্য চিত্র উহার অন্তরালে লুকিয়ে গিয়েছে।

পক্ষান্তরে আমাদের সরলতাও কম প্রশংসার যোগ্য নয়। শত্রুপক্ষ কর্তৃক অংকিত আমাদের চিত্র দেখে আমরা এতোদূর ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছি যে, উহার পশ্চাতে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে স্বয়ং চিত্র নির্মাতাদের চেহারাটি দেখার কথা পর্যন্ত একদম ভুলে বসেছি। উপরন্তু আমরা কাতর কণ্ঠে ও অনুতাপের সুরে বলতে শুরু করেছি : "হুযুর যুদ্ধ ও প্রাণ-নাশের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্কই নেই। আমরা তো বৌদ্ধ ভিক্ষু ও পাদ্রির ন্যায় শান্তিপ্রিয় ধর্ম প্রচারক মাত্র। নির্দিষ্ট কয়েকটি বিশ্বাসের প্রতিবাদ এবং তদস্থলে অপর কয়েকটি আকীদা-বিশ্বাসের প্রচার ও লোকদের তা মেনে নিতে বলাই আমাদের কাজ। তরবারির সংগে তো আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। অবশ্য আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করার অপরাধ কখনো কখনো হয়ত আমরা করে ফেলেছি। কিন্তু বর্তমানে তা হতেও তওবা করেছি ; এমনকি, হুযুরের অস্বস্তির জন্য 'তরবারির যুদ্ধকে' সরকারিভাবে বাতিল করেও দেয়া হয়েছে। এখন শুধু মুখ ও লেখনির মারফতে ধর্ম প্রচারেরই নাম হচ্ছে জিহাদ ; কামান, বন্দুক ও গোলা-বারুদ ব্যবহার করা সরকারের কাজ, মুখ ও লেখনি প্রয়োগই হচ্ছে আমাদের একমাত্র উপায়।"

জিহাদ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার কারণ

শুধু রাজনৈতিক কূটকৌশলের পরিণামেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু যেসব কারণে আল্লাহর পথে জিহাদ এর নিগূঢ় তত্ত্ব দুর্বূহ হয়ে পড়েছে, বৈজ্ঞানিক পন্থায় তা যাচাই করলে তাতে দুইটি প্রধান ও মৌলিক ভুল ধারণার সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রথম ভুল ধারণা এই যে, ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের ন্যায় সাধারণত যে অর্থে এ শব্দ ব্যবহৃত হয় তদনুযায়ী নিছক একটি ধর্ম বলে মনে করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় ভুল ধারণা এই যে, মুসলমানদেরকে অন্যান্য জাতির ন্যায় সাধারণত যে অর্থে এ শব্দ ব্যবহৃত হয় তদনুযায়ী একটি জাতিই মাত্র মনে করা হয়েছে।

এই দুইটি ভ্রান্তধারণা কেবল জিহাদের ব্যাপারটি নয় সামগ্রিকভাবে গোটা ইসলামের রূপকেই পরিবর্তিত ও বিকৃত করে দিয়েছে। এবং মুসলমানদের স্থান ও মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে ফেলেছে।

সাধারণ পরিভাষা অনুযায়ী ধর্ম বলতে কতকগুলি আকিদা-বিশ্বাস ও কয়েকটি ইবাদত-অনুষ্ঠানের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই বুঝা যায় না। এ অর্থের দিক দিয়ে ধর্ম একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার, তা নি:সন্দেহ। এমতাবস্থায় যে কোনো আকিদা মনে স্থান দেয়া, মন যার ইবাদত করতে ইচ্ছুক তারই ইবাদত করা যেভাবে ইচ্ছা তাকে ডেকে প্রভৃতি কাজের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রত্যেক ব্যক্তিই লাভ করতে পারে। সংশ্লিষ্ট ধর্মের জন্য খুব বেশি দরদ ও প্রেমবোধ করলে পৃথিবী ব্যাপী নিজ আকিদার প্রচার করা এবং অন্যান্য আকিদাপন্থীদের সাথে 'বিতর্ক ও বাহাস' করার স্বাধীনতাও তার রয়েছে। এতোটুকু কাজের জন্য তরবারি ধারণ করার কি প্রয়োজন থাকতে পারে? লোকদের মারধোর করে তো কোনো আকিদার প্রতি বিশ্বাস জন্মানো যায় না। বস্তুত ইসলামকে সাধারণ পরিভাষা অনুযায়ী একটি 'ধর্ম' হিসেবে মেনে নিলে এবং মূলত ইসলাম তা হলে প্রকৃতপক্ষে জিহাদের সমর্থনে কোনো সংগত যুক্তিই পেশ করা যেতে পারে না।

অনুরূপভাবে 'জাতি' বলতে সমপ্রকৃতি বিশিষ্ট কতগুলো লোকদের এমন একটি সমষ্টি (a homogeneous group of men) বুঝায়, যারা কয়েকটি মৌলিক ব্যাপারে অংশীদার হওয়ার কারণে একত্রিত এবং অন্যান্য সমষ্টি হতে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই অর্থের দিক দিয়ে যে মানব সমষ্টি একটি জাতির মর্যাদা পাবে মাত্র দু'টি কারণেই তাদের পক্ষে তরবারি ধারণ করা সংগত হতে পারে। এক: তাদের ন্যায়সংগত অধিকার হরণ করার জন্য কেউ তাদের উপর আক্রমন করলে। দুই: তারা নিজেরাই অপরের ন্যায়সংগত অধিকার কেড়ে নেবার জন্য আক্রমণ করতে চাইলে। প্রথম অবস্থায় তরবারি ধারণের কিছু না কিছু নৈতিক বৈধতা রয়েছে (যদিও কোনো কোনো ধর্মাত্মার দৃষ্টিতে এটাও পাপ), কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থাটিকে চরম ডিকটেটর ছাড়া অপর কেউ বৈধ বলে দাবি করতে পারে না। এমনকি ফ্রান্স ও বৃটেনের ন্যায় বিশাল সাম্রাজ্যের কূটনীতিকরাও এটাকে সংগত বলার দু:সাহস করবে না।

জিহাদের তত্ত্ব কথা

অতএব ইসলাম যদি 'ধর্ম' মাত্র হয়ে থাকে এবং মুসলমান যদি নিছক একটি 'জাতি' হয় তবে জিহাদ কিছুতেই 'সর্বোত্তম' ইবাদত হতে পারে না, বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এটার অর্থহীনতা ও অযৌক্তিকতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এটা সম্পূর্ণ বিপরীত। বস্তুত ইসলাম কোনো 'ধর্ম' এবং মুসলমান কোনো জাতির নাম নয়। ইসলাম একটি বিপ্লবী মতাদর্শ। সমগ্র পৃথিবীর সমাজ ব্যবস্থার (social order) আমূল পরিবর্তন সাধন করে তার নিজস্ব আদর্শ অনুযায়ী নতুন করে তা ঢেলে গঠন করাই ইসলামের চরম লক্ষ্য। আর 'মুসলমান' একটি আন্তর্জাতিক বিপ্লবী দল (international revolution Party) বিশেষ, ইসলামের বাঞ্ছিত কার্যসূচী বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যেই তাদের

সংঘবদ্ধ করা হয়েছে। আর এ উদ্দেশ্য লাভ করার জন্য ইসলামী দলের বিপ্লবী চেষ্টা-সাধনা ও চূড়ান্ত শক্তি (revolutionary struggle) প্রয়োগের নামই হচ্ছে 'জিহাদ'।

অন্যান্য বিপ্লবী মতাদর্শের ন্যায় ইসলামও সাধারণভাবে প্রচলিত শব্দ পরিত্যাগ করে নিজস্ব একটি পরিভাষা (terminology) ব্যবহার করেছে। ফলে তার বিপ্লবী ধারণা প্রচলিত সাধারণ ধারণা হতে বিশিষ্টতা লাভ করেছে। 'জিহাদ' শব্দটি এ বিশেষ পরিভাষার অন্যতম। 'হারব' (যুদ্ধ) বা এ অর্থবোধক অন্য কোনো আরবি শব্দই ইসলাম স্বতপ্রবৃত্ত হয়েই প্রয়োগ করেনাই, এর পরিবর্তে ব্যবহার করেছে 'জিহাদ'। ইহা struggle (সংগ্রাম) এর সমার্থবোধক, বরং এটার আধিক্যের অর্থ জ্ঞাপক। ইংরেজিতে এটার মর্মার্থ হতে পারে to exert one's utmost endeavour in promoting a cause অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লাভের জন্য সমগ্র শক্তি নিয়োগ করা।

কিন্তু পুরাতন ও সাধারণ প্রচলিত শব্দ ত্যাগ করে এ নতুন শব্দ কেন ব্যবহার করা হলো? এর একমাত্র উত্তর এই যে, ব্যক্তি কিংবা দলসমূহের পংকিল স্বার্থ উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি ও সাম্রাজ্যগুলো যেসব যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ড করেছে, 'যুদ্ধ' শব্দটি তা বুঝার জন্য চিরদিন ব্যবহৃত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এসব যুদ্ধের লক্ষ্য হয় ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধি। তাতে কোনো মতাদর্শ অথবা কোনো নিয়ম-নীতির সমর্থন ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য মোটেই থাকে না। কিন্তু ইসলামের যুদ্ধ এধরনের নয় বলে গোড়াতেই এ শব্দটি ব্যবহার করেনাই। বিশেষ কোনো জাতির লাভ বা ক্ষতি সাধন এর লক্ষ্য নয়। দেশের উপর কোন্ শাসকের শাসন চলবে সে বিষয়েও এর ভ্রুক্ষেপ নেই। এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে শুধু মানবতার কল্যাণ সাধন। এ কল্যাণের জন্য ইসলাম একটি বিশেষ আদর্শ এবং বাস্তব কর্মসূচী পেশ করেছে। এ নীতি ও মতাদর্শের বিপরীত যেখানেই যে হুকুম প্রতিষ্ঠিত রয়েছে ইসলাম সেটাকে নির্মূল করতে চায় তা যে জাতি বা দেশেই হোক না কেন। ইসলাম তার নিজস্ব আদর্শ ও কর্মসূচী অনুযায়ী নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চায় কে তার পতাকা বহন করছে, আর কার শাসন কর্তৃত্বের উপর উহার চরম আঘাত পড়ে, সেদিক দিয়ে কোনো পার্থক্যই করা হয়না। ইসলাম চায় পৃথিবী, পৃথিবীর কোনো অংশ নয়। সমগ্র ভূ-মন্ডলই ইহার লক্ষ্য। কিন্তু বিশেষ কোনো জাতি বা বহু জাতির হাত হতে ক্ষমতা কেড়ে নেয়া অন্য কোনো বিশেষ জাতির হাতে তুলে দেয়া ইসলামের লক্ষ্য নয়। এর একমাত্র লক্ষ্য এই যে, গোটা মানবতার কল্যাণ সাধনের জন্য তার যে মতাদর্শ ও কর্মসূচী রয়েছে যার নাম হচ্ছে ইসলাম সমগ্র বিশ্বমানবকে তার দ্বারা পরিতৃপ্ত ও ঐশ্বর্যমন্ডিত করে তুলতে হবে। এ মহান উদ্দেশ্যে বিপ্লব সৃষ্টির অনুকূলে ইহা সমগ্র কার্যকর শক্তিকেই প্রয়োগ করতে চায়।

এভাবে সমস্ত শক্তি প্রয়োগের সমষ্টিগত নামই হচ্ছে 'জিহাদ'। মুখের ভাষা ও লেখনির সাহায্যে মানুষের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভংগিতে পরিবর্তন করা এবং তাদের মধ্যে 'অন্তর্বিপ্লব' সৃষ্টি করাকেও জিহাদ বলা যায়। তরবারি (শক্তি) ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠিত জীবন ব্যবস্থা নির্মূল করে নবতর সুবিচারমূলক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাকেও জিহাদ বলা হয়। এপথে ধন মাল ব্যয় করা, শারীরিক শক্তি সামর্থ নিয়োগ করাও জিহাদ।

জিহাদ আল্লাহর পথে

মনে রাখতে হবে যে, ইসলামের জিহাদ শুধুমাত্র 'জিহাদই' নয়, এই জিহাদ হবে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর পথে। 'আল্লাহর পথে' কথাটি ইহার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ শব্দ দু'টি ইসলামের বিশেষ পরিভাষার সাথে সংশ্লিষ্ট। অবশ্য 'আল্লাহর পথে' কথা দ্বারা অনেক লোকের মনে এক ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। তারা মনে করে যে, মানুষকে জোরপূর্বক ইসলামের আকিদা-বিশ্বাসের অনুসারী করে তোলাই বুঝি আল্লাহর পথে জিহাদ। সংকীর্ণমনা লোকেরা 'আল্লাহর পথে' কথাটির এই বিকৃত অর্থই গ্রহণ করেছে, এতদ্ব্যতীত অন্য কোনো অর্থই তাদের মনে স্থান পায় নাই। কিন্তু ইসলামী পরিভাষায় এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। সামাজিক কল্যাণ ও মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে যে কাজই করা হবে, তার নিয়ত যদি কোনো বৈষয়িক স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করা না হয়, বরং আল্লাহর সন্তোষ লাভই যদি তার চূড়ান্ত লক্ষ্য হয়, তবে ইসলাম এ সকল কাজকে 'আল্লাহর পথে' বলে ঘোষণা করে। উদাহরণ স্বরূপ দান-খয়রাতের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কোনো বৈষয়িক কিংবা নৈতিক স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করলে তা 'আল্লাহর পথে' হবে না। কিন্তু আল্লাহর সন্তোষ লাভ করার উদ্দেশ্যে কোনো দরিদ্র ব্যক্তিকে সাহায্য করা হলে ইহা নিশ্চয়ই 'আল্লাহর পথে' হবে। অতএব পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সাথে সকল প্রকার স্বার্থবাদের উর্ধ্বে থেকে যে কোনো কাজই করা হবে এবং এই ধারণার বশবর্তী হয়ে করা হবে যে, মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করাই হচ্ছে আল্লাহর সন্তোষ লাভের একমাত্র উপায়, আর বিশ্ব-স্রষ্টার সন্তোষ লাভ ভিন্ন মানব জীবনের আর কিছু লক্ষ্যও হতে পারে না–ইহার প্রত্যেকটি কাজকেই 'আল্লাহর পথে' বলে ঘোষণা করা যাবে।

বস্তুত জিহাদের পূর্বেও 'আল্লাহর পথে' শর্তটি এ জন্যই যুক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, কোনো ব্যক্তি কিংবা দল যখন রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় বিপ্লব সাধন অথবা ইসলামী মতাদর্শ অনুযায়ী নব বিধান প্রণয়ন করতে অগ্রসর হবে, তখন তার এই প্রচেষ্টায় ও আত্মদানে ব্যক্তিগত স্বার্থলাভ তার লক্ষ্য হতে পারবে না। 'কাইজার'কে বিতাড়িত করে সে নিজেই যেন 'কাইজার' সাজবার ইচ্ছা পোষণ না করে। নিজের জন্য ধন-মাল, খ্যাতি-প্রসিদ্ধ, মান-সম্মান, কোনো কিছু লাভ করাই যেন তার চেষ্টা–শ্রমের মূল লক্ষ্য না হয়। তার সমস্ত কুরবানী ও শ্রম-

সাধনার প্রকৃত উদ্দেশ্য হবে মানবসমাজে এক সুবিচার পূর্ণ জীবন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা এবং এর বিনিময়ে আল্লাহর সন্তোষ লাভ করা। এতদ্ভিন্ন তার কোনো উদ্দেশ্যই থাকবে না। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে :

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ -

'ঈমানদার লোকেরা আল্লাহর পথে লড়াই করে, কাফেরগণ লড়াই করে তাগুতের পথে।' (সূরা আন নিসা : ৭৬)

'তাগুত' শব্দের মূল হচ্ছে 'তুগইয়ান' ইহার অর্থ সীমা লংঘন করা। নদীর পানি উচ্ছ্বসিত হয়ে যখন ইহার সীমা অতিক্রম করে, তখন বলা হয় নদীতে 'তুগইয়ানী' (প্লাবন) এসেছে। মানুষ যদি নিজের সংগত সীমা অতিক্রম করে অন্য মানুষের 'খোদা' (সার্বভৌম) হবার জন্য কিংবা অতিরিক্ত স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে নিজের শক্তি ও ক্ষমতা প্রয়োগ করে, তবে এটাকেই বলা হয় 'তাগুতের পথে সংগ্রাম'। 'আল্লাহর পথে' সংগ্রাম এটার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহার চরম লক্ষ্য হবে পৃথিবীতে আল্লাহর সুবিচারমূলক আইন প্রতিষ্ঠিত করা। সংগ্রামী ব্যক্তি নিজেও ইহা পালন করার জন্য চেষ্টা করবে এবং অন্যকেও ইহা পালন করানোর চেষ্টা করবে। কুরআনে বলা হয়েছে :

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ط وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ -

'পারলৌকিক সম্মান ও মর্যাদা তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছি, যারা পৃথিবীতে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে এবং বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে চায় না। বস্তুত পারলৌকিক সাফল্য এধরনের পরহেযগার লোকদের জন্যই নির্ধারিত রয়েছে।' (সূরা আল কাসাস : ৮৩)

হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে : "এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলো, 'আল্লাহর পথে যুদ্ধের' অর্থ কি? এক ব্যক্তি ধন সম্পদের জন্য যুদ্ধ করে অপর ব্যক্তি বীরত্বের খ্যাতি লাভ করার জন্য যুদ্ধ করে, আর তৃতীয় ব্যক্তি শত্রুতা সাধনের জন্য কিংবা জাতির গৌরব অহংকার রক্ষার জন্য যুদ্ধ করে। ইহাদের মধ্যে কার যুদ্ধ 'আল্লাহর পথে' হচ্ছে?"

হযরত (সা) উত্তরে বললেন : "এদের কারো যুদ্ধই 'আল্লাহর পথে' নয়। যে ব্যক্তি কেবল 'আল্লাহর বিধান' প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ করবে, শুধু তার যুদ্ধই 'আল্লাহর পথে' হবে।" অন্য এক হাদিসে বলা হয়েছে : "যদি কেহ যুদ্ধ করে আর উট বাঁধবার একগাছ রশি লাভ করাও তার 'নিয়ত' হয় তবে সে কোনো ফল লাভ করতে পারবেনা। যে কাজ কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্য

হবে, আল্লাহ শুধু তাই কবুল করবেন। অবশ্য যদি তার কোনো ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগত স্বার্থ লাভ উদ্দেশ্য না থাকে।"

অতএব ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদের সঙ্গে 'আল্লাহর পথে' একটি অপরিহার্য ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। নিছক যুদ্ধ তো পৃথিবীর প্রত্যেকটি জীবই করছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ উদ্দেশ্য লাভের জন্য পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে চেষ্টা করছে। কিন্তু মুসলমান একটি বিপ্লবী দলের নাম ; জীবন ও ধন-মাল প্রয়োগ করে দুনিয়ার সকল আল্লাহদ্রোহি শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং এতদুদ্দেশ্যে দেহ ও আত্মার সকল শক্তি নিযুক্ত করা ইসলামের বিপ্লবী মতাদর্শের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু তা প্রতিষ্ঠিত আল্লাহদ্রোহিদের বিচ্যুত করে নিজেই তাদের স্থান দখল করার জন্য নয়। বরং এজন্য যে, পৃথিবীর বুক হতে আল্লাহদ্রোহিতার (সীমালংঘন) মূলোৎপাটন করা এবং সর্বত্র একমাত্র আল্লাহর আইন চালু করা বিশ্বমানবতার নিরাপত্তার জন্য একান্ত অপরিহার্য।

অতপর আমি ইসলামের বিপ্লবী আহ্বানের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করতে চাই। এ আলোচনা দ্বারা জিহাদের অপরিহার্যতা এবং এর মূল লক্ষ্য (objective) সুস্পষ্ট রূপে বুঝা যাবে।

ইসলামী বিপ্লবের আহ্বান

ইসলামের বিপ্লবী আহ্বান নিম্নলিখিত আয়াতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে :

يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ

'হে মানুষ তোমাদের সেই 'রব' এর দাসত্ব কর যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা আল বাকারা : ২১)

ইসলাম এখানে মজুর, জমিদার, কৃষক কিংবা কারখানার মালিক প্রভৃতি কোনো এক বিশেষ শ্রেণীকে আহ্বান জানায়নি। বরং ইসলামের ডাক সমস্ত মানুষের প্রতি। ইসলাম মানুষকে মানুষ হিসেবেই আহ্বান জানিয়েছে। এর নির্দেশ শুধু এতোটুকু যে, তোমরা যদি আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো দাসত্ব, আনুগত্য ও অনুসরণ করতে থাকো তবে তা পরিত্যাগ কর। তোমাদের নিজেদের মধ্যে প্রভুত্ব লাভের লিপ্সা থাকলে তাও দূর কর। কারণ অন্য লোককে নিজের দাস বানাবার কিংবা কাউকেও নিজের সম্মুখে মাথা নত করতে বাধ্য করার কোনো অধিকারই তোমাদের কারো নেই। তোমাদের সকলকে একই আল্লাহর দাসত্ব কবুল করতে হবে। আল্লাহর আনুগত্য ও বন্দেগীর ব্যাপারে তোমাদের সকলকে একই স্তর ও শ্রেণীভুক্ত হতে হবে।

تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاۤءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ -

'আসো তোমরা ও আমরা এমন একটি কথায় একমত হই যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সমভাবে গ্রহণযোগ্য। তা এই যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী করবো না, প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের ব্যাপারে কাউকেও আল্লাহর অংশীদার বলে মনে করবো না। পরন্তু আমাদের মধ্যে কাউকেও আল্লাহর পরিবর্তে আদেশ-নিষেধ দানের অধিকারী বলেও মানবো না।' (সূরা আল ইমরান : ৬৪)
বস্তুত ইহা সর্বাত্মক ও নিখিল বিশ্বব্যাপী এক বিপ্লবের আহ্বান। ইসলাম উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করছেন : - إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ -

'হুকুম দেয়ার কিংবা প্রভুত্বের অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারই থাকতে পারেনা।'

কোনো মানুষ নিজেই অন্য মানুষের শাসক ও নিয়ামক হতে পারে না, নিজ ইচ্ছামত কোনো কাজের নির্দেশ দেওয়া এবং কোনো কাজ হতে নিষেধ করারও কোনো অধিকার কারও নেই। কারণ, কোনো মানুষকে সার্বভৌম প্রভু ও স্বাধীনভাবে আদেশ-নিষেধের অধিকারী মনে করার অর্থই হচ্ছে সকল বিপর্যয়ের মূল উৎস। মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা যে নির্ভেজাল প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং জীবন-যাপনের যে সহজ-সরল ব্যবস্থা দান করেছেন মানুষ তা হতে ঠিক তখনই বিচ্যুত ও বিচ্ছিন্ন হয় যখন সে আল্লাহকে ভুলে যায় এবং ফলত নিজকে, নিজের সত্তাকেও ভুলে বসে। ইহারই অনিবার্য পরিণামে মুষ্টিমেয় কতিপয় লোক কিংবা পরিবার অথবা শ্রেণী গোপনে কিংবা প্রকাশ্যভাবে খোদায়ী লাভ করবার দাবি উত্থাপন করে এবং নিজের সকল শক্তি প্রয়োগ করে অন্যায় ও অসংগত উপায়ে অন্য মানুষকে নিজেদের দাসানুদাসে পরিণত করে। অপর দিকে এই আল্লাহকে ভুলে যাওয়া ও আত্মবিস্মৃত হওয়ার ফলেই মানব সমাজের এক বিরাট অংশ সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রশক্তিগুলোর নিরংকুশ প্রভুত্ব স্বীকার করে নেয় এবং এদের প্রত্যেকটি হুকুম নত শিরে পালন করবে বলে নিশ্চয়তা দান করে। বস্তুত বিশ্বব্যাপী যাবতীয় অত্যাচার, যুলুম, বিপর্যয়, শোষণ ও দুর্নীতির মূল কারণ এটাই। এজন্যই ইসলাম সর্বপ্রথম এরই উপর আঘাত হানে এবং জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করে :

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ - الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ -

'যারা সীমালংঘন করে, পৃথিবীতে অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে এবং কোনরূপ সংস্কার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে না তাদের কোনো হুকুমই তোমরা মানিও না।' (সূরা আশ শুআরা : ১৫১-১৫২)

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا -

'যার মনকে আমার স্মরণ হতে গাফেল করে দিয়েছে, নিজের নফসের খাহেশ-লালসারই যে দাস হয়ে গিয়েছে এবং যার শাসন-কর্তৃত্ব সীমালংঘনকারী, তোমরা আদৌ তার আনুগত্য করিও না।' (সূরা আল কাহাফ : ২৮)

اَلاَ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ـ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ـ

'আল্লাহর নির্ধারিত সরল জীবন ব্যবস্থায় যারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং তাকে জটিল ও বক্র করে তুলতে চেষ্টা করে তারা যালেম এবং এ যালেমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।' (সূরা হূদ : ১৮-১৯)

ইসলাম লোকদের ডেকে জিজ্ঞাসা করে :

ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ـ

অর্থাৎ যেসব ছোট-বড় খোদার দাসত্ব করে তোমরা নিষ্পেষিত ও নির্যাতিত হচ্ছো তাদেরই দাসত্ব গ্রহণীয়, না একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহর দাসত্ব? এক আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ না করলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'খোদাদের' দাসত্ব-শৃংখল হতে মুক্তি পাওয়া কখনও সম্ভব নয়। যে কোনো প্রকারে এরা তোমাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করবে এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করতে থাকবে।

اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَّةً ۚ وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ـ

এই বাদশাগণ যখন কোনো এলাকায় প্রবেশ করে তখন সেখানকার প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলে এবং সম্মানিত ও মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে। বস্তুত ইহাই তাদের চিরন্তন স্বভাব। (সূরা আন নামল: ৩৪)

وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ـ

'এই ধরনের লোকেরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পারলে পৃথিবীতে ধ্বংস ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে, শস্যক্ষেত ও অধস্তন বংশধরদের বিনাশ করে। আল্লাহ তা'য়ালা বিপর্যয় ও ধ্বংসাত্মক কাজ-কর্ম আদৌ পছন্দ করেনা।' (সূরা আল বাকারা : ২০৫)

বিস্তারিত বর্ণনার অবকাশ এখানে নেই। সংক্ষেপে আমি একথাই বুঝাতে চাই যে, ইসলামের তাওহীদ ও 'খোদাবাদের' আহ্বান অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসের ন্যায় নিছক ধর্মীয় আমন্ত্রণই নয়। বরং ইহা এক সর্বাত্মক সমাজ-বিপ্লবের (social revolation) ডাক। সমাজে যারা ধর্মের ক্ষেত্রে পুরোহিত, রাজনীতির দিক দিয়ে বাদশাহ, নেতা, শাসক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মহাজন, জমিদার ও ইজারাদার সেজে জনগণকে নিজেদের দাস বানিয়ে নিয়েছে তাদের প্রত্যেকেরই উপর ইসলামের এই বিপ্লবী দাওয়াতের প্রত্যক্ষ ও প্রচন্ড আঘাত পড়ে। কারণ এরা কোথাও প্রকাশ্যভাবে 'খোদা' হয়ে বসেছে আর কোথাও নিজেদের জন্মগত কিংবা শ্রেণীগত অধিকারের ভিত্তিতে জনগণের আনুগত্য লাভের দাবি করছে, এরা স্পষ্ট ভাষায় বলে :

مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ (আমি ভিন্ন তোমাদের কোনো প্রভু নেই) اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى (আমি তোমাদের সর্বোচ্চ রব) اَنَا اُحْىٖ وَاُمِيْتُ (জীবন-মৃত্যুর মালিক আমিই) এবং مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً (আমার তুলনায় অধিক শক্তিশালী আর কে হতে পারে?) আবার কোথাও এরা জনগণের অজ্ঞতা ও মূর্খতা আপন স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য কৃত্রিম খোদার মূর্তি ও হাইকাল বানিয়েছে এবং এসবের অন্তরালে এরা লোকদের উপর নিজেদের খোদায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। অতএব কুফর, শির্‌ক ও মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে ইসলামের দাওয়াত এবং এক আল্লাহর বন্দেগী ও দাসত্ব স্বীকৃতির জন্য ইসলামের প্রচারমূলক কার্যক্রম সরাসরিভাবেই সমসাময়িক সরকার, সরকার সমর্থক কিংবা সরকার আশ্রিত শ্রেণীসমূহের স্বার্থের সাথে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের সৃষ্টি করে। একারণে যখনই কোনো নবী

يَاقَوْمُ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ -

'হে জাতি, একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব স্বীকার কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো প্রভু ও মাবুদ নেই বলে আহ্বান জানিয়েছেন, সমসাময়িক রাষ্ট্র সরকার তখন তার প্রবল শক্তি সহকারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে, সকল প্রকার দুর্নীতিপরায়ণ ও শোষক শ্রেণী তার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। কারণ ইহা নিছক কোনো অতি-প্রাকৃতিক ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাপারের বিশ্লেষণ (metaphysical proposition) নয়; প্রকৃতপক্ষে এটা ছিলো এক সর্বাত্মক সমাজ-বিপ্লবের উদাত্ত ঘোষণা। এ ঘোষণা কর্ণগোচর হওয়ার সংগে সংগে প্রবল রাজনৈতিক আলোড়নের আভাস পাওয়া যেতো।

ইসলামী বিপ্লবী দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ প্রেরিত সকল নবীই যে 'বিপ্লবী' নেতা ছিলেন এবং শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতা, এতে কোনোই সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু পৃথিবীর সাধারণ বিপ্লবী পুরুষ এবং এই আল্লাহ প্রেরিত বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। অপরাপর বিপ্লবী নেতা ব্যক্তিগতভাবে যতোই পূণ্যবান ও সৎ হউক না কেন সুবিচার ন্যায়বাদের নির্ভুল আসন তারা কখনই লাভ করতে পারেন না। এরা হয়তো নিজেরাই মযলুম শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেন, কিংবা মযলুমের দুঃখ মোচনের উচ্ছ্বসিত আবেগ নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ান। ফলে নিজ নিজ শ্রেণীগত দৃষ্টিভংগীর মানদণ্ডেই তারা সমস্ত ব্যাপারে যাচাই করে থাকেন। এর অনিবার্য পরিণাম তাদের দৃষ্টি কখনও নিরপেক্ষ এবং নিখুঁত মানবতাবাদী হতে পারে না; বরং এক পক্ষের প্রতি ক্রোধ ঘৃণা এবং অপর পক্ষের প্রতি সমর্থন সাহায্যের মনোভাব তীব্র ও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে। তারা অত্যাচারের প্রতিবিধান করার জন্য এমন পন্থা খুঁজে বের করেন যা

প্রকৃতপক্ষে আর একটি যুলুমে পরিণত হয়। প্রতিশোধ গ্রহণ, হিংসা-দ্বেষ ও শত্রুতামুলক বিষাক্ত ভাবধারা হতে মুক্ত হয়ে সুস্থ, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও ভারসাম্যযুক্ত এমন এক সমাজ-ব্যবস্থা নির্ধারণ করা তাদের দ্বারা সম্ভব হয় না, যাতে সমষ্টিগতভাবে গোটা মানবতা প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারে ; কিন্তু নবীদের কাজ কর্ম এর সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের হয়ে থাকে। তাঁরা যতোই নির্যাতিত, নিস্পেষিত ও নিপিড়ীত হন না কেন, তাঁদের সংগী-সাথীদের উপর যতোই অত্যাচারের ষ্টিম-রোলার চালানো হোক না কেন, তাঁদের পরিচালিত বিপ্লবী আন্দোলনে ব্যক্তিগত ভাবপ্রবণতা কখনই প্রভাব বিস্তার করতে পারে নাই। তাঁরা সরাসরিভাবে আল্লাহর নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণের অধীনে থেকে কাজ করতেন। আর আল্লাহ যেহেতু মানবীয় ভাবপ্রবণতার সম্পূর্ণ উর্ধ্বে, মানুষের কোনো শ্রেণীর সাথে তার বিশেষ কোনো সম্পর্ক বা আত্মীয়তা নেই, কোনো শ্রেণীর সাথে তাঁর কোনো শত্রুতা বা কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, এজন্য আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন নবীগণ সমস্ত ব্যাপারকে ন্যায়ানুগ ও খাঁটি মানবতাবাদী দৃষ্টিতেই দেখে থাকতেন। যে কাজে সমগ্র মানবজাতির সমষ্টিগত কল্যাণ এমন কি স্বয়ং যালেম শ্রেণীসমূহের জন্যও প্রকৃত মংগল নিহিত রয়েছে, নবীগণ তাই করতেন এবং এমন এক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা প্রাণপণে সাধনা করতেন যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের সংগত সীমার মধ্যে থাকতে পারে, ন্যায়সংগত অধিকার লাভ ও ভোগ করতে পারে, ব্যক্তিগত সম্পর্ক সম্বন্ধ রক্ষা করে চলতে পারে এবং সর্বোপরী ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক পরিপূর্ণ ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য সহকারে স্থাপিত হতে পারে। এ কারণেই নবীদের বিপ্লবী আন্দোলন কখনও শ্রেণী সংগ্রামে (class war) পরিণত হয়নি। তাঁরা এক শ্রেণীকে অপর শ্রেণীর উপর প্রতিষ্ঠিত করে সামাজিক পূনর্গঠনের কাজ (social reconstruction) শুরু করে নাই। তাঁরা এমন এক সুসামঞ্জস্য পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন যাতে সকল মানুষই বৈষয়িক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং সার্বিক কল্যাণ লাভের সুযোগ সমানভাবে পেতে পারে।

জিহাদের প্রয়োজন ও উহার লক্ষ্য

এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে ইসলাম কর্তৃক উপস্থাপিত সমাজ ব্যবস্থার বিস্তারিত আলোচনার অবতারণা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, সময়-সুযোগ হলে অন্যত্র তার চেষ্টা করা হবে। এখানে নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর মধ্যে থেকে আমি বিশেষভাবে যে কথা বলতে চাই তা এই যে, ইসলাম নিছক একটি ধর্মবিশ্বাস এবং কতকগুলো ইবাদাত অনুষ্ঠানের সমষ্টিমাত্র নয়। মূলত ইসলাম এক পরিপূর্ণ ও ব্যাপক জীবন ব্যবস্থা। বিশ্ববাসীর জীবনক্ষেত্র হতে সকল প্রকার অত্যাচার ও বিপর্যয়মূলক নিয়ম-নীতি মুলোৎপাট করে তদস্থলে এক পূর্ণাঙ্গ সংস্কারমূলক

কর্মসূচী বাস্তবায়িত করাই এর একমাত্র লক্ষ্য। কারণ মানবতার কল্যাণ ও মংগল বিধানের জন্য তার দৃষ্টিতে এটাই হচ্ছে সর্বোত্তম ব্যবস্থা।

এই ভাঙ্গাগড়া এবং বিপ্লব ও সংশোধনের জন্য ইসলাম বিশেষ কোনো জাতিকে আহবান জানায় না। ইহার ডাক হচ্ছে সমগ্র মানবতার প্রতি গোটা মানবজাতি এমন কি স্বয়ং যালেম, শোষক ও দূর্নীতিপরায়ণ জাতি ও শ্রেণীসমূহের প্রতি রাজা, বাদশাহ, সমাজপতি ও নেতৃবৃন্দকে ইসলাম এই বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের আহবান জানায় আর সকলের প্রতিই ইহার পয়গাম এই যে, সৃষ্টিকর্তার নির্ধারিত সীমার মধ্যেই জীবনযাপন ও যাবতীয় কার্য সম্পাদন কর, তোমরা সত্য ও সুবিচারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই তোমাদের জীবনে সর্বাংগীন শান্তি ও নিরাপত্তা সূচিত হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো মানুষের সাথে ইসলামের শত্রুতা নেই, শত্রুতা যুলুমের সাথে, বিপর্যয় ও বিশৃংখলার সাথে, নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপের সাথে, আর আল্লাহর নির্ধারিত স্বাভাবিক ব্যবস্থা অনুযায়ী যা একজনের প্রাপ্য নয় তা লাভ করার জন্য কেউ চেষ্টা করলে তার সাথে শত্রুতা রয়েছে।

এ আহবান যারাই গ্রহণ করবে তারা যে কোনো জাতির, বংশের, শ্রেণীর বা দেশেরই লোক হোক না কেন, তারা সকলেই সমান অধিকার ও সমান মর্যাদার ভিত্তিতে ইসলামী দল ও সমাজের সদস্যরূপে গণ্য হবে এবং এরূপে এরাই সেই আন্তর্জাতিক বিপ্লবী দলে রূপান্তরিত হংবে, যাকে কুরআন মজীদ 'আল্লাহর দল' নামে অভিহিত করেছে এবং যার অন্য নাম হচ্ছে ইসলামী দল কিংবা মুসলিম উম্মাত।

এই দলটি অস্তিত্ব লাভ করেই স্বীয় উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য জিহাদ শুরু করে দেয়। এই দলের বর্তমান থাকাই অনৈসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থা চূর্ণ করা এবং ইহার পরিবর্তে এক সুবিচারপূর্ণ ও ভারসাম্যযুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা–কুরআন যাকে 'কালেমাতুল্লাহ' বলেছে- প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা শুরু করা অপরিহার্য সাব্যস্ত করে। এই দল যদি রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা না করে, তবে এর অস্তিত্ব লাভের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। কারণ ইহার অন্য কোনো উদ্দেশ্য তো আদৌ ছিলো না। আর উহার অস্তিত্ব টিকে রাখার জন্য এই জিহাদ ভিন্ন অন্য কোনো পন্থাই থাকতে পারে না। কুরআনের ভাষায় এই দলে অস্তিত্ব লাভের একটি মাত্র উদ্দেশ্যই রয়েছে এবং তা এই :

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ -

'তোমরা সেই সর্বোত্তম জাতি, বিশ্বমানবতার কল্যাণ সাধনের জন্যই তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎ ও ন্যায় কাজের জন্যই লোকদেরকে নির্দেশ দাও। আর অন্যায়, পাপ, মিথ্যা প্রভৃতি নিষিদ্ধ কাজ হতে

তাদের বিরত রাখ এবং আল্লাহর প্রতি তোমরা আস্থা জ্ঞাপন কর।' (সূরা আলে-ইমরান : ১১০)

বস্তুত ইহা কোনো ধর্ম প্রচারক (preachers) ও সুসংবাদ বাহকের (missionaries) দল নয়। মূলত ইহা আল্লাহর সৈন্য বাহিনী মাত্র ;

لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ পৃথিবী হতে যুলুম, শোষণ, অশান্তি, চরিত্রহীনতা ও বিপর্যয় এবং সকল প্রকার আল্লাহদ্রোহিতাকে বলপূর্বক নির্মূল করাই তার কতর্ব্য أَرْبَابٌ مِّنْ دُوْنِ اللهِ আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা মানুষের রব হয়ে বসেছে, তাদের খোদায়ী প্রভুত্ব চূর্ণ করা এবং অন্যায় ও পাপ বন্ধ করে পুণ্য ও ন্যায়ের প্রচলন করা এ ইসলামী দলের দায়িত্ব। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে :

قَاتِلُوْا هُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ

'তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, যতোদিন না অশান্তি ও বিপর্যয় চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় এবং মানুষ একমাত্র আল্লাহরই আনুগত্য করার সুযোগ লাভ করে।'

إِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ

'তোমরা যদি এ দায়িত্ব পালন না করো তবে সারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে, ধ্বংস এবং ভাঙ্গন ব্যাপক ও মারাত্মক আকার ধারণ করবে।'

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ

'আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে জীবন যাপনের সঠিক পন্থা এবং সত্য অনুসরণের নির্ভুল ব্যবস্থাসহ প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি প্রচলিত সকল প্রকার আনুগত্য অনুসরণ চূর্ণ করে দিয়ে সত্য অনুসরণের এই ব্যবস্থাকে সকলের উপর জয়ী করেন। যদিও আল্লাহর কর্তৃত্বের ব্যাপারে ইহা অংশীবাদীগণ মোটেই পছন্দ করে না।'

অতএব রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করা ছাড়া এ দলের জন্য অন্য কোনো উপায় থাকতে পারে না। কারণ বিপর্যয়মূলক সমাজ ব্যবস্থা আসলে একটি ভারমাস্যহীন রাষ্ট্রব্যবস্থার সমর্থন ও সহযোগিতার ফলেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। পক্ষান্তরে কোনো সুস্থ, নির্ভুল ও কল্যাণময় সমাজ ব্যবস্থাই কায়েম হতে পারে না, যতোক্ষণ না রাষ্ট্রব্যবস্থা বিপর্যয়কারীদের হাত হতে সত্যাশ্রয়ী ও সংস্কারবাদীদের হাতে ন্যস্ত হবে।

বিশ্ব সংস্কারের কথা বাদ দিলেও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা বিপরীত আদর্শবাদীদের কুক্ষিগত থাকবে। এ দলের পক্ষে নিজের ব্যক্তিগত আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করাও আদৌ সম্ভব নয়। একটি দল যে ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো জীবন ব্যবস্থাকে সত্য ও কল্যাণকর বলে মনে করে সেই ক্ষেত্রে কোনো বিপরীত ধরণের

রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীন নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী কিছুতেই জীবন যাপন করতে পারে না। ইংল্যান্ড কিংবা আমেরিকায় থেকে কোনো কমিউনিষ্টের পক্ষে কমিউনিজমের পূর্ণ আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ রাষ্ট্রশক্তির প্রবল চাপে সেখানকার পুঁজিবাদী জীবনব্যবস্থা স্বতই তার উপর কার্যকর হবে। উহার এই দুর্নিবার চাপ হতে আত্মরক্ষা করা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না। অনুরূপভাবে একজন মুসলমানও অনৈসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে থেকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা অনুযায়ী জীবন যাপন করতে চাইলে কিছুতেই সাফল্যমন্ডিত হতে পারে না। যেসব আইন বিধানকে সে বাতিল মনে করে, যেসব কাজ-কর্মকে সে অন্যায় ও অসংগত বলে ধারণা করে, যে ধরনের আচার-আচরণ ও জীবন পদ্ধতিকে সে বিপর্যয়মূলক মনে করে, যে ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি তার দৃষ্টিতে মারাত্মক ইহার প্রত্যেকটি এবং সব ক'টিই তার নিজের ঘর-বাড়ি ও সন্তান-সন্ততির উপর প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করতে থাকবে। ইহার আক্রমণ হতে সে কিছুতেই রক্ষা পাবে না। কাজেই বিশেষ কোনো আদর্শ ও আকীদায় বিশ্বাসী লোকেরা স্বভাবত বিরোধী আদর্শের শাসন নির্মূল করে তাদের নিজেদের আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হতে বাধ্য। তা না করলে তারা নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করার কোনো সুযোগ পাবে না। এ চেষ্টা না করলে কিংবা এতে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা পরিলক্ষিত হলে নিশ্চিতরূপে মনে করতে হবে যে, মূলত কোনো আদর্শের প্রতিই তাদের বিশ্বাস নেই। বিশ্বাসের দাবি করলেও তা যে মিথ্যা তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ج لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ -لَايَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ط.........اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ -

'হে নবী! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। তুমি লোকদেরকে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে বিরত থাকার কেন অনুমতি দিলে? তোমার অনুমতি দেওয়া সমীচীন ছিলো না। জিহাদই এমন একটি মাপকাঠি যা দ্বারা তোমাদের খাঁটি ঈমানদার এবং মিথ্যা ঈমানদারদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য প্রমাণিত হতে পারে। বস্তুত যারা আল্লাহ এবং পরকাল বিশ্বাস করে, জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করার দায়িত্ব হতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তারা কখনো তোমার নিকট আবেদন করতে পারে না। .... অবশ্য যারা না আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, না পরকালের প্রতি, একমাত্র তাহারাই এই জিহাদের কতর্ব্য হতে বিরত থাকার আবেদন পেশ করতে পারে, অন্য কেহ নয়।' (সূরা আত-তাওবা : ৩৪-৩৫)

এ আয়াতে কুরআন মজীদ সুস্পষ্ট ও অকুণ্ঠ ভাষায় এই নির্দেশ দিয়েছে যে, কোনো দল যে আদর্শ ও মতবাদের প্রতি ঈমান ও আস্থা এনেছে তাকে রাষ্ট্রক্ষমতার সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জান ও মালসহ জিহাদে আত্মনিয়োগ করা হচ্ছে তাদের উহার প্রতি সত্যিকার ঈমানদার হওয়ার একমাত্র মাপকাঠি। বিরোধী আদর্শের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে যদি কেও সহ্য করে, তবে তার আদর্শে বিশ্বাস যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তাতে কোনোরূপ সন্দেহ থাকতে পারে না। এরা স্বাভাবিক পরিণতি এই যে, শেষ পর্যন্ত ইসলামী আদর্শের প্রতি নামকা ওয়াস্তে বিশ্বাসটুকুও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। প্রথম দিকে বিরোধী আদর্শের সরকার ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সে অত্যন্ত ঘৃণা সহকারেই বরদাশত করতে থাকবে। কিন্তু ধীরে ধীরে মন ইহার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। ফলে ঘৃণা শেষ পর্যন্ত ঐকান্তিক আগ্রহে পরিণত হবে ও সেই রাষ্ট্রব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং প্রতিষ্ঠিত রাখার ব্যাপারে সে সাহায্য করতে থাকবে। ইসলামী আদর্শের পরিবর্তে অনৈসলামী আদর্শের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য জান-মাল দ্বারা সে জিহাদ শুরু করবে। এভাবে মুসলমানদেরই শক্তি-ক্ষমতা ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কাজেই ব্যবহৃত হবে। আর এই চরম পর্যায়ে উপনীত হওয়ার পর এ মুসলমান এবং কাফেরদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো পার্থক্যই থাকবে না। অবশ্য তখনো হয়তো মুসলিমদের মুখে ইসলামের মুনাফেকী দাবি একটি নিকৃষ্টতম মিথ্যা ও প্রচারণার শ্লোগান হিসাবে বর্তমান থাকবে। হযরত নবী করীম (সা) এ পরিণামের কথাই স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন :

وَالَّذِى نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَتَامُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرْ وَالَتَاخُذُنَّ يَدَ الْمُسِئِ وَلَتَطْرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ اَطْرَاءَ وُلِيُضْرِ بَنَّ اللّٰهُ قُلُوْبَ بَعْضِكُمْ عَلٰى بَعْضٍ اَوْ لَيَلْعَنَكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ -

'যে আল্লাহর মুষ্টিতে আমার জীবন তাঁর শপথ করে বলছি, তোমাদেরকে সৎ ও ন্যায় কাজ করতে হবে, অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদের বিরত রাখতে হবে এবং পাপী ও অন্যায়কারীর হস্ত ধারণ করে শক্তি প্রয়োগ করে, তাকে সত্যের দিকে ফিরায়ে দিতে হবে অন্যথায় আল্লাহর স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী পাপী ও বদকারের প্রভাব তোমাদের মনের উপর এবং শেষ পর্যন্ত তোমরাও তাদের ন্যায় অভিশপ্ত হবে।'

বিশ্ব-বিপ্লব

পূর্বোক্ত আলোচনা হতে একথা সুস্পষ্ট হয় যে, অনৈসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিলোপ সাধন করে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে ইসলামী জিহাদের মূল উদ্দেশ্য (objective) বিশেষ কোনো দেশ কিংবা কয়েকটি মাত্র দেশই নয়, বরং

সমগ্র দুনিয়ায়ই ইসলাম এ বিপ্লব সৃষ্টি করতে চায়। প্রথমত মুসলিম দলের নিজ নিজ দেশেই রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিপ্লব সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য, কিন্তু সর্বাত্মক বিশ্ব-বিপ্লব (world revolution) সৃষ্টি করাই তাদের চূড়ান্ত ও সর্বশেষ লক্ষ্য। বস্তুত যে বিপ্লবী দল জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে গোটা মানবতার কল্যাণের জন্য চেষ্টা করবে তার মূল লক্ষ্য ও কার্যক্রম বিশেষ কোনো জাতি কিংবা বিশেষ কোনো দেশের চতু:সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। বরং বিপ্লবের স্বাভাবিক প্রবণতায়ই তা এক বিশ্ব বিপ্লবের রূপ ধারণ করে। সত্য কখনো ভৌগলিকসীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না।। কোনো নদী কিংবা পর্বতের এক দিকে যা সত্য অপর দিকেও তা সত্যরূপে স্বীকৃতি পাবে, এটাই সত্যের চিরন্তন দাবি। মানব জাতির কোনো একটি অংশকেও এ সত্য হতে বঞ্চিত করা যেতে পারে না। মানুষ যেখানেই যুলুম নিপীড়ন এবং কড়াকড়ি ও বাড়াড়ির পেষণে জর্জরিত হচ্ছে সেখানেই তাদের মুক্তি বিধানের জন্য উপনীত হওয়া 'সত্যের' অবশ্য কতর্ব্য। পবিত্র কুরআন একথাই নিম্নলিখিত ভাষায় পেশ করছে।

وَمَا لَكُمْ لَاتُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا -

'তোমাদের কি হয়েছে যে, এসব পুরুষ, স্ত্রীলোক এবং শিশুদের সাহায্যার্থে তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই কর না, যারা দুর্বল বলে নির্যাতিত হচ্ছে এবং যারা এই বলে প্রার্থণা করে যে, হে আল্লাহ! এই যালেম অধ্যুষিত জনপদ হতে আমাদের মুক্তি দাও।' (সূরা আন-নিসা : ৭৫)

এতদ্ব্যতীত জাতীয় আঞ্চলিক বিভাগ সত্বেও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সম্বন্ধ এতো ব্যাপক যে, এর ফলে কোনো একটি রাষ্ট্রের পক্ষে বিশেষ কোনো আদর্শ অনুযায়ী পূর্ণরূপে চলা সম্ভব হয় না, যতোক্ষণ না প্রতিবেশী দেশসমূহেও অনুরূপ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে। অতএব মানব সাধারণের পূর্ণাঙ্গ সংস্কার সাধন এবং আদর্শ ভিত্তিক আত্মরক্ষার জন্য একটি মাত্র দেশে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে ক্ষ্যান্ত না হয়, বরং শক্তি ও সামর্থ অনুসারে উক্ত রাষ্ট্রকে আরো অধিকতর সম্প্রসারণের চেষ্টা করাই একটি ইসলামী দলের প্রধানতম কর্তব্য। তারা একদিকে ইসলামের বিপ্লবী চিন্তাধারা ও মতবাদ প্রচার করবে এবং সকল দেশের অধিবাসীকে গ্রহণ করার আহ্বান জানাবে যেহেতু এটাতেই তাদের প্রকৃত ও সর্বাঙ্গীন কল্যাণ নিহিত রয়েছে এবং অপরদিকে তাদের শক্তি ও সামর্থ থাকলে অনৈসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করে উহার মূল্যোচ্ছেদ করবে এবং তার পরিবর্তে ইসলামের সর্বাত্মক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবে।

বস্তুত হযরত নবী করীম (সা) এবং তার পরে খোলাফায়ে রাশেদীন এ পন্থায় কাজ করেছেন। ইসলামী দলের অভ্যুত্থান কেন্দ্র আরব দেশকেই সর্বপ্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের প্রভাবাধীন করে নেয়া হয়। অতপর নবী করীম (সা) পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের রাষ্ট্রনায়ক ও জনগণকে ইসলামের বিপ্লবী আদর্শ ও নীতি গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। ঐসব দেশের শাসকগোষ্ঠী ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনে অস্বীকৃতি জানালে তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এজাতীয় যুদ্ধগুলোর মধ্যে তাবুকের যুদ্ধ হচ্ছে প্রথম। নবী করীম (সা)-এর পর হযরত আবু বকর (রা) মুসলমানদের নেতা নির্বাচিত হন। তিনি রোম ও ইরান এই দুই অনৈসলামী রাষ্ট্রের উপর একই সংগে আক্রমণ করেন আর হযরত উমর ফারুক (রা)-এর সময় এ আক্রমণ সাফল্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। মিসর, সিরিয়া, রোম ও ইরানের জনগণ প্রথমত ইহাকে আরবের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে মনে করেছিল। সাধারণত এক জাতি অপর জাতিকে দাসানুদাসে পরিণত করার জন্যে যেরূপ আক্রমণ করে থাকে আরবদের এ আক্রমণকেও তারা তদনুরূপ পদক্ষেপ বলে মনে করেছিল। এই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়েই তারা কাইসার ও কিসরার পতাকাতলে সমবেত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু পরে তারা মুসলিম দলের বিপ্লবী আদর্শের সাথে পরিচিত হলো। তারা নিঃসন্দেহে বুঝলো যে, তারা অত্যাচার ও নিপীড়নমূলক জাতীয়তাবাদের (aggressive nationalism) নিশানবরদার নয়, বরং তারা আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদের উর্ধ্বে এক সুবিচার ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যই অগ্রসর হয়েছে এবং কাইসার ও কিসরার বেশে অত্যাচারী শ্রেণীসমূহের প্রতিষ্ঠিত যে প্রভুত্ব জনগণকে নির্মমভাবে নিষ্পেষিত করছে এটাকে নির্মূল করাই এ আক্রমনের উদ্দেশ্য। এই তত্ত্ব অনুধাবন করার সংগে সংগে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের অধিবাসীগণের নৈতিক সমর্থন মুসলিম দলের অনুকূলে এসে পড়লো। ফলে তারা ধীরে ধীরে 'কাইসার' ও 'কিসরার' দল হতে বিচ্ছিন্ন হতে লাগলো। তাদেরকে জোরপূর্বক সৈন্য বাহিনীতে শামিল করা হলেও লড়াইয়ের ব্যাপারে তাদের আর আন্তরিকতা থাকতো না। বস্তুত একটু তলিয়ে চিন্তা করলেই বুঝা যাবে যে, প্রথম পর্যায়ে মুসলমানদের ঐতিহাসিক ও বিস্ময়কর দেশ জয়ের মূলে এটাই হচ্ছে অন্যতম প্রধান কারণ। এজন্যই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভের পর ইসলামের সমাজ ব্যবস্থাকে বাস্তবে চালু ও কার্যকর হতে দেখে তারা বিশেষভাবে মুগ্ধ হয় এবং ঐকান্তিক আগ্রহের সাথে তারা এ আন্তর্জাতিক বিপ্লবী দলের অন্তর্ভুক্ত হতে শুরু করে। আর অপরাপর দেশসমূহেও অনুরূপ বিপ্লব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তারা এই বিপ্লবী আদর্শের ধারক ও বাহকে পরিণত হয়।

আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষামূলক জিহাদের শ্রেণীবিভাগ অবান্তর

উপরের আলোচনা সম্পর্কে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে অতি সহজেই বুঝা যাবে যে, 'আক্রমণাত্মক' (aggressive) ও 'আত্মরক্ষামূলক' (defensive) প্রভৃতি আধুনিক পরিভাষা অনুযায়ী ইসলামী জিহাদকে কিছুতেই বিভক্ত করা যায় না। অবশ্য জাতীয় এবং আঞ্চলিক যুদ্ধসমূহকে এভাবে ভাগ করা যেতে পারে। কারণ পরিভাষা হিসেবে 'আক্রমণ' ও 'প্রতিরোধ' প্রভৃতি শব্দ একটি দেশে কিংবা একটি জাতি সম্পর্কেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু কোনো আন্তর্জাতিক (মর্যাদাসম্পন্ন) দল যদি একটি সর্বাত্মক ও বিশ্বব্যাপক মতাদর্শ নিয়ে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিকে মানুষ হিসেবেই তা গ্রহণ করার জন্য আহবান জানায় এবং প্রত্যেক জাতি হতে আগত লোকদেরকে সমান মর্যাদা সহকারে নিজেদের আদর্শের ভিত্তিতেই নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করে, তবে সে ক্ষেত্রে পারিভাষিক 'আক্রমণ' ও 'প্রতিরোধের' কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। উপরন্তু পরিভাষার কথা বাদ দিলেও ইসলামী জিহাদকে 'আক্রমাণাত্মক' ও 'প্রতিরোধমূলক'–এ দু'ভাগে বিভক্ত করা কোনো মতেই সংগত নয়। কারণ ইসলামী জিহাদে একই সংগে এ উভয় প্রকার কাজ সম্পন্ন হতে দেখা যায়। বিরোধী মতাদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার কারণে উহা আক্রমণাত্মক। আবার নিজ আদর্শ অনুযায়ী কাজ করার জন্য রাষ্ট্রশক্তি অর্জন করতে বাধ্য বলে তা প্রতিরোধমূলক। কিন্তু একটি দল হওয়ার কারণে, তার এমন কোনো ঘর-বাড়ি নাই যার [illegible] করতে হবে। ইহার নিকট আদর্শই হচ্ছে একমাত্র সম্পদ। এ আদর্শ রক্ষার জন্যই তার আপ্রাণ চেষ্টা এবং সাধনা। অনুরূপভাবে তারা বিরোধী দলের ঘর-বাড়ির উপরেও কখনো আক্রমণ করে না, আক্রমণ করে তার আদর্শ-নীতি ও কর্মপন্থার উপর। উপরন্তু জোরপুর্বক তার নিকট হতে আদর্শ কেড়ে নেয়াও এ আক্রমণের লক্ষ্য নয়, বরং তার আদর্শের হাত হতে রাষ্ট্রক্ষমতা কেড়ে নেয়ার জন্যই এ আক্রমণ হয়ে থাকে।

যিম্মীদের অবস্থা

ইসলামী হুকুমাতের অধীনে বিপরীত আদর্শ ও আকীদায় বিশ্বাসী এবং অনুসারীদের অবস্থা কি হয়ে থাকে প্রসংগত তাও উপরের আলোচনা দ্বারা সুস্পষ্ট হয়েছে। বস্তুত ইসলামী জিহাদ জনগণের আকীদা-বিশ্বাস এবং তাদের ধর্মীয় উপাসনা ও সামাজিক নিয়ম-নীতির উপর কখনও হস্তক্ষেপ করে না। আকীদা, ধর্মবিশ্বাস ও মতাদর্শের ব্যাপারে ইসলাম মানুষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করে। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কোনো আদর্শ ও নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার কাকেও দিতে ইসলাম প্রস্তুত নয়। উপরন্তু ইসলামের

দৃষ্টিতে সামাজিক ও সমষ্টিগত কল্যাণ বিরোধী নিয়ম-নীতি অনুযায়ী সামগ্রীক কার্য সম্পাদনের কোনো অনুমতিই ইসলামী হুকুমাতে দেয়া যেতে পারে না। ইসলামী হুকুমাত রাষ্ট্র ক্ষমতা করায়ত্ব করেই সকল প্রকার সূদী কারবার বন্ধ করে দেবে। জুয়া খেলার অনুমতি কিছুতেই দেয়া হবে না ; ক্রয়-বিক্রয় অর্থনৈতিক আদান-প্রদান যেসব নিয়ম-পন্থাকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে তা সবই বন্ধ করে দেয়া হবে। বেশ্যালয় ও অশ্লীলতার যাবতীয় কেন্দ্র চুরমার করে দেয়া হবে। এমন কি অমুসলিম নারীগণকে 'সতরে'র (অংগ আবৃত করা) নিম্নতম সীমা রক্ষা করে চলতে বাধ্য করা হবে। উলংগ ও অশ্লীল এবং প্রকাশ্যভাবে নগ্নতার সমর্থক রীতিসমূহ নির্মূল করা হবে। সিনেমা নিয়ন্ত্রিত করা হবে এবং উহার নৈতিকতা বিরোধী সকল অংশ ও ভাবধারা দূর করা হবে। সহ শিক্ষা প্রচলনের অনুমতি কাকেও দেয়া হবে না। এ ব্যাপারে ইসলামী হুকুমাতকে হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে হবে, যা অমুসলিমদের দৃষ্টিতে অসংগত না হলেও ইসলামের দৃষ্টিতে ধ্বংস ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। কেবল সামাজিক কল্যাণ ও মংগল বিধানের জন্য নয়, আদর্শের দিক দিয়ে আত্মরক্ষার (self defence) জন্যও ইহাকে এরূপ করতে হবে। এপর্যায়ে কেউ যদি ইসলামের বিরুদ্ধে অনুদারতার অভিযোগ উত্থাপন করে, তবে তাকে একটি বিষয় চিন্তা করতে বলবো : ইসলাম এর বিরোধী অন্যান্য ধর্মমতের সাথে যতোখানি উদার ব্যবহার করে দুনিয়ার কোনো বিপ্লবী ও সংস্কারবাদী আদর্শই তা করতে প্রস্তুত নয়। বরং অন্যান্য সমস্ত সমাজেই দেখা যায় বিরোধী আদর্শের অনুগামীদের জীবন নানাভাবে জর্জরিত ও দুঃসহ করে তোলা হয়েছে। এমনকি অত্যাচারের নিষ্পেষণে বিড়ম্বিত হয়ে তাদের কতো লোক যে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয় তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু ইসলাম তার বিরোধী মতাবলম্বীদেরকে পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা সহকারে সকল প্রকার উন্নতি লাভের সুযোগ দিয়ে থাকে। ইসলাম সকল শ্রেণীর অমুসলিমদের সাথে যে ধরনের উদার ব্যবহার করেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও তার তুলনা পাওয়া যায় না।

সাম্রাজ্যবাদের সন্দেহ

এপর্যন্ত পৌঁছে আমাকে আবার বলতে হচ্ছে যে, ইসলাম কেবল আল্লাহর পথে কৃত সাধনাকেই 'জিহাদ' নামে অভিহিত করে এবং এরূপ জিহাদের ফলে ইসলামী হুকুমাত কায়েম হলেও সেখানে কাইসার ও কিসরার অনুরূপ আচরণ অবলম্বন করে দ্বিতীয় খোদা হয়ে বসা মুসলমানদের পক্ষে আদৌ বৈধ নয়, ব্যক্তিগত শাসন কায়েম করার জন্য, মানুষকে নিজের দাসানুদাসে পরিণত করার উদ্দেশ্যে এবং তাদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমলব্ধ ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে লুটিয়া নিয়ে নিজের লালসাবৃত্তি চরিতার্থ করার সুযোগ লাভ করার জন্য কোনো মুসলমান যুদ্ধ

করে না, আর মুসলিম হওয়ার কারণেই এজন্য সে লড়াই করতেও পারে না। কারণ এই ধরনের জিহাদ 'আল্লাহর পথে' হয় না, হয় 'তাগুতের পথে'। এপথে কোনো সরকার কায়েম হলে ইসলামের সাথে কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। মূলত ইসলামের জিহাদ একটি নিরস ও স্বাদহীন শ্রম মাত্র। তাতে জান-মাল এবং লালসার কুরবানী ভিন্ন আর কিছুই নয়। এ জিহাদ সাফল্যমন্ডিত হলে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ত্ব হলে সত্যিকার মুসলিম শাসকদের দায়িত্বানুভূতি অত্যন্ত তীব্র হয়ে পড়ে। এমন কি, বেচারাদের রাত্রের নিদ্রা এবং দিনের বিশ্রাম পর্যন্ত শেষ হয়ে পড়ে। কিন্তু এর বিনিময়ে তারা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতালব্ধ কোনো সুযোগ-সুবিধা কিংবা আয়েশ-আরাম করতে পারে না। অথচ এসব ভোগ করার জন্যই অনেকে সাধারণত রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে চেষ্টা করে থাকে। ইসলামের শাসক প্রজা সাধারণ হতে উর্ধ্বে অবস্থানকারী কোনো বিশিষ্ট সত্তা নয়, বিশেষ ধরনের কোনো আসনেও সে বসতে পারে না, সে নিজের সম্মুখে অপর লোকদের অবনত করতে পারে না, শরীয়াতের আইনের বিপরীত নিজের ইচ্ছা মতো সামান্যতম কাজও সে করতে পারে না। নিজেকে ও নিজের আত্মীয়বর্গকে সে কোনো নিম্নতম ব্যক্তি সংগত দাবি পূরণের দায়িত্ব হতে নিস্কৃতিও দিতে পারে না। ন্যায্য পাওনা ব্যতীত সে একটি কণা পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারে না, এক বিন্দু জমিও সে নাজায়েযভাবে দখল করতে পারে না। মধ্যম 'মান' অনুযায়ী জীবন যাপনের উপযোগী বেতনের অধিক একপাই পরিমাণ অর্থও বায়তুলমাল হতে গ্রহণ করা তার পক্ষে হারাম। ইসলামী হুকুমাতের শাসনকর্তা কোনো রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করতে পারে না।

বিলাস-ব্যাসনের সরঞ্জাম গ্রহণ করাও তার পক্ষে নিষিদ্ধ। তার জীবনের যাবতীয় কাজ-কর্মের চূড়ান্ত ও পুংখানুপুংখ হিসেব নেয়া হবে এ আতংকেই বেচারা প্রতিটি মুহূর্তে কাতর হয়ে থাকে। কারণ তার সন্দেহাতীত বিশ্বাস এই যে, হারাম উপায়ে উপার্জিত একটি পয়সা, জোরপূর্বক দখলকৃত এক টুকরা জমি, একবিন্দু অহংকার ও ফিরাউনী চাল, অত্যাচার ও অবিচারের একটি ঘটনা এবং লালসা চরিতার্থের একটু ইচ্ছাও তার আমলনামায় প্রমাণিত হলে পরকালে তাকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। যদি কোনো ব্যক্তি প্রকৃতই নিজের বৈষয়িক সুবিধা লাভের জন্য লোভাতুর হয়ে ইসলামী বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের ইচ্ছা করে, তবে বলতেই হবে যে, তার তুলনায় নির্বোধ আর কেউ হতে পারে না। কারণ ইসলামী হুকুমাতের রাষ্ট্রপ্রধান অপেক্ষা বাজারে একজন সাধারণ দোকানদারের অবস্থা অনেক ভালো হয়ে থাকে। দিনের বেলা সে নিশ্চিন্তে পা মেলে ঘুমাতে পারে। কিন্তু খলিফা বেচারা না তার সমপরিমাণ

উপার্জন করতে পারে, আর না পারে রাতের বেলা পরম তৃপ্তিতে নিদ্রায় অচেতন হতে। তার অবস্থা সত্যিই সহানুভূতির উদ্রেক করে।

বস্তুত এটাই হচ্ছে ইসলামী হুকুমাত ও অনৈসলামী হুকুমাতের মৌলিক পার্থক্য। শেষোক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থায় শাসকগণ লোকদের উপর স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার করে থাকে এবং দেশের উপায়-উপাদান ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করে। পক্ষান্তরে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালকগণ শুধু খেদমত-ই করে থাকে, জনসাধারণের অপেক্ষা অধিক কিছুই সে নিজের জন্য গ্রহণ করেন না। ইসলামী রাষ্ট্রের সিভিল সার্ভিসের জন্য নির্দিষ্ট বেতনের সাথে বর্তমান কালের কিংবা সেকালের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের অনুরূপ কাজের বেতনের হারের তুলনা করলে ইসলামের বিশ্বজয় এবং সাম্রাজ্যবাদের রাজ্যগ্রাসের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। ইসলামী রাষ্ট্রে খোরাসান, ইরাক ও মিশরের শাসনকর্তাদের বেতন একালের সাধারণ পুলিশ ইন্সপেক্টরের বেতন অপেক্ষা অনেক কম ছিলো। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা) মাসিক মাত্র একশত টাকা বেতনে এতবড় রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালন করতেন। হযরত উমর ফারুক (রা)-এর বেতন মাসিক দেড়শত টাকার অধিক ছিলো না। অথচ তখন ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমাল তদানীন্তন দু'টি রাষ্ট্রের ধন সম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সম্রাজ্যবাদ দেশ জয় করে এবং ইসলামও দেশ জয় করে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে। কবির ভাষায় :

> "যদিও উভয়ে উড়ে একই শূন্যলোক
> শকুন ও বাজের রাজ্যে বহু ব্যবধান।"

বস্তুত এটাই হচ্ছে ইসলামী জিহাদের মুল কথা। অথচ এটার সম্পর্কে কতোই না বিরূপ কথাবার্তা আকাশ বাতাস মথিত করে তুলেছে। কিন্তু ইসলাম, মুসলিম দল এবং জিহাদের এ নির্মল ধারণা বর্তমান সময়ে কোথায় লুকিয়ে রয়েছে তা জিজ্ঞেস করলে এবং বর্তমান পৃথিবীর মুসলমানদের মধ্যে তার একবিন্দু পরিমাণ লক্ষণ না থাকার কারণ জানতে চাইলে, আমিই বলবো এ প্রশ্ন আমার নিকট কেন করা হচ্ছে? যারা মুসলিম জাতির দৃষ্টি তার আসল কাজ হতে ফিরায়ে তা'বীয, তুমার, মুশাহিদা ও মোরাকিবার কৃচ্ছ্রসাধনার দিকে আকৃষ্ট করেছে, যারা পারলৌকিক মুক্তি এবং ইহলৌকিক কল্যাণ ও উদ্দেশ্য লাভের অতি সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ দেখিয়েছে, এ প্রশ্ন আজ তাদেরকে জিজ্ঞেস করা উচিত। কারণ তারাই তো বলেছে যে, চেষ্টা-সাধনা ও সংগ্রাম ব্যতীত শুধু তাসবীহ পাঠ কিংবা কবরস্থ কোনো 'বড়পীর' সাহেবের অনুগ্রহ হলেই দুনিয়ার সবকিছুই করায়ত্ত হতে পারে। তারাই তো ইসলামের মূল ও বুনিয়াদী নীতি আদর্শ এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বিস্মৃতির অন্ধকারে নিক্ষেপ করেছে। সশব্দে কি নি:শব্দে 'আমীন'

বলা 'রাফয়ে ইয়াদাইন' করা এবং ইসালে সওয়াব ও যিয়ারতের ন্যায় নিতান্ত খুঁটিনাটি ও অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারে মুসলিম জাতিকে বিজড়িত করেঁছে। ফলে মুসলিম জাতি আত্মবিস্মৃত হয়েছে, বিস্মৃত হয়েছে ইসলামের মূল কথাকে, ভুলিয়েছে নিজের মূল উদ্দেশ্য-লক্ষ্যকে। তাদের দিক হতেও যদি সঠিক উত্তর না পাওয়া যায়, তবে এ প্রশ্ন দেশের তথাকথিত নেতৃবৃন্দ ও শাসনকর্তাদের নিকটেই পেশ করে দেখুন। কারণ তারা কুরআন মজীদ ও হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনার দাবি করে বটে, কিন্তু কুরআনের আইন অনুযায়ী জীবন যাপন ও রাষ্ট্র পরিচালনার কোনো কর্তব্যই তারা পালন করে না, যদিও কখনও কুরআন 'খতম' করানো ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে সভার অনুষ্ঠান করা এবং কুরআনের সাহিত্যের গুণ-গান করার কিছু না কিছু কাজ তারা নিশ্চয়ই করে। মনে হয় কুরআনের আইন ও হযরতের বিধানকে কার্যত জারি করা সম্পর্কে এদের যেনো কোনো দায়িত্ব নেই। এটার মূল কারণ এই যে, তাদের 'নফস' ইসলামের বিধি-নিষেধ মেনে চলতে এবং তার দায়িত্ব পালন করতে আদৌ প্রস্তুত নয়, বরং একান্ত সহজভাবেই মুক্তি লাভ করতে চায়।

সত্যের সাক্ষ্য

[এটিও মাওলানা মওদূদীর (র:) একটি ভাষণ। ১৯৪৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর লাহোর জামায়াতে ইসলামীর সম্মেলনে তিনি এ ভাষণ দেন। শিয়ালকোট সংলগ্ন মুরাদপুরে সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়।]

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ তাআলার, যিনি নিখিল বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা, মালিক এবং শাসক। যিনি অসীম জ্ঞান, অনুগ্রহ ও ক্ষমতা বলে এই বিশ্বজাহান পরিচালনা করছেন। যিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করে তাকে দান করেছেন জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধির ন্যায় অমূল্য শক্তি আর সমাসীন করেছেন দুনিয়ায় তাঁর খিলাফতের মর্যাদায়। যিনি মানুষের পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত যুগে যুগে নবীদের মারফত নাযিল করেছেন কিতাবসমূহ।

আল্লাহর করুণারাশি বর্ষিত হোক তাঁর সে সব সম্মানিত ও নেক বান্দাদের উপর যাঁরা দুনিয়ায় এসেছিলেন মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব শেখাতে, যাঁরা মানুষকে তার জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন করে গেছেন, আর বাতলে দিয়েছেন তার জীবন যাপনের সঠিক পদ্ধতি। আজ দুনিয়ায় যা কিছু হিদায়াতের আলো, নৈতিক পবিত্রতা, পুণ্য ও পরহিযগারীর নিদর্শন দেখা যাচ্ছে তা হচ্ছে আল্লাহর এ নেক বান্দাদেরই পথ-নির্দেশের ফল। দুনিয়ার মানুষ কখনো তাঁদের এ অনুগ্রহের কথা ভুলতে পারবে না।

প্রিয় বন্ধুগণ, আমরা আমাদের সম্মেলনগুলোকে দু'টো অংশে ভাগ করে থাকি। একাংশে আমরা পরস্পর বসে আপন কাজ-কর্ম যাচাই পর্যালোচনা করি এবং তাকে আরো সামনে এগিয়ে নেওয়ার পরামর্শ করে থাকি। আর দ্বিতীয়াংশে আমরা সম্মেলন স্থানের সাধারণ অধিবাসীদের কাছে দাওয়াত পেশ করে থাকি। আজকের এ সম্মেলন শেষোক্ত উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমরা কোন্ বস্তুর দিকে লোকদের আহ্বান জানিয়ে থাকি অথবা আমাদের দাওয়াত কি, এ কথাটুকু বলার জন্যেই আমরা আপনাদেরকে এখন কষ্ট দিচ্ছি।

আমাদের দাওয়াত

আমাদের দাওয়াত হচ্ছে, যারা প্রথমত বংশগত মুসলমান এবং দ্বিতীয়ত মুসলমান নয় এমন সব মানবগোষ্ঠীর প্রতি। এদের প্রত্যেকের জন্যই আমাদের

কাছে বিশেষ পয়গাম রয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, এখানে শেষোক্ত দলের লোকদেরকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের অতীতের ভুল ও বর্তমান অবস্থার ফলেই মানব জাতির এক বিরাট অংশ আমাদের থেকে দূরে সরে গেছে। এমতবস্থায় তাদের ও আমাদের মহান প্রভু আমাদের পথ প্রদর্শনের জন্য নবীদের মারফত যে পয়গাম পাঠিয়েছিলেন, তাকে তাদের কাছে পৌছানোর সুযোগ আমরা খুব কমই পেয়ে থাকি। যা হোক, তারা এখানে উপস্থিত নেই বলে মুসলমানদের জন্যে দাওয়াতের নির্দিষ্ট অংশকেই আমি এখানে পেশ করবো।

মুসলমানদের প্রতি আমাদের আহ্বান হচ্ছে এই যে, মুসলমান হিসেবে তাঁদের উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য ন্যস্ত হয়, তা তারা পুরোপুরি অনুধাবন ও পালন করুন।

আমরা মুসলিম, আমরা আল্লাহ ও তাঁর দীনকে মেনে নিয়েছি, কেবল এটুকু কথা বলেই আপনারা দায়িত্বমুক্ত হতে পারেন না। বরং আপনাদের এ চেতনাও থাকতে হবে যে, যে মুহূর্তে আপনারা আল্লাহকে আপন প্রভু এবং তাঁর দীনকে নিজেদের জীবন-বিধান বলে মেনে নিয়েছেন ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে আপনাদের উপর এক বিরাট দায়িত্বও এসে পড়েছে। পরন্তু সে দায়িত্ব পালনের পন্থা কি, সে সম্পর্কে আমাদেরকে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। কারণ, এতে আপনারা ব্যর্থকাম হলে আপনাদের দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই ব্যর্থ হয়ে যাবে। এর মন্দ পরিণতি থেকে আপনারা কোথাও রেহাই পাবেন না।

মুসলমানের দায়িত্ব

সে দায়িত্বটা কি? তা শুধু আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতা, তাঁর কিতাব, তাঁর রসূল ও পরকালের প্রতি আপনাদের ঈমান আনা নয় অথবা তা শুধু আপনাদের নামায পড়া, রোযা রাখা, যাকাত দেয়া এবং হজ্জ করার ব্যাপারেও নয়, কিংবা তা বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে কিছুটা ইসলামী বিধান মেনে নেয়াও নয়, বরং এ সবের উর্ধ্বে এক বিরাট দায়িত্ব আপনাদের উপর ন্যস্ত হয়ে থাকে। তা হচ্ছে এই যে, যে মহান সত্যের উপর আপনারা ঈমান এনেছেন, তার সাক্ষীরূপে সারা দুনিয়ার সামনে আপনাদেরকে দাঁড়াতে হবে।

কুরআন মজীদে 'মুসলমান' নামে আপনাদেরকে একটি স্বতন্ত্র জাতির মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, আপনারা সমস্ত মানুষের সামনে পুরোপুরি সত্যের সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবেন।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ـ

"আমি তোমাদেরকে এক মধ্যমপন্থী জাতি বানিয়েছি যাতে করে তোমরা লোকদের জন্যে সাক্ষী হও আর রসূলও যেন তোমাদের জন্যে সাক্ষী হন।" (সূরা আল বাকারা : ১৪৩)

জাতি হিসেবে এ হচ্ছে আপনাদের আবির্ভাবের একমাত্র উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে না পারলে আপনাদের জীবন বৃথাই শেষ হয়েছে বলতে হবে। এ দায়িত্ব বস্তুত আল্লাহর পক্ষ থেকেই আপনাদের উপর অর্পিত হয়েছে।
আল্লাহর হুকুম হচ্ছে:-يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ-

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর জন্যে সত্যের সাক্ষী হয়ে দাঁড়াও।" (সূরা আন্ নিসা : ১৩৫)

এ নিছক নীতিকথা নয়, বরং এ হচ্ছে কড়া নির্দেশ। আল্লাহ বলেন :
وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ -

"যার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো সাক্ষ্য বর্তমান রয়েছে, সে যদি তা গোপন রাখে, তবে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? (সূরা আল বাকারা : ১৪০)
অতঃপর এ দায়িত্ব পালন না করার ভীষণ পরিণতির কথাও আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। আপনাদের পূর্বে ইহুদী জাতিকে এ সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছিল। কিন্তু তারা সত্যের কিছুটা গোপন আর কিছুটা তার বিপরীত সাক্ষ্যদান করেছিল। এমনিভাবে তারা সামগ্রিকভাবে সত্যের পরিবর্তে বাতিলের সাক্ষীতে পরিণত হয়ে গেলো। ফলে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এক প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে সরিয়ে দিলেন এবং তাদের অবস্থা এ দাঁড়ালো যে :

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ -

"লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, অপমান, অধ:পতন ও দুরবস্থা তাদের উপর চেপে বসলো এবং তারা আল্লাহর গযবে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়লো।" (সূরা আল-বাকারা : ৬১)

সত্যের সাক্ষ্য

আপনাদের উপর এই যে সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে এর অর্থ হচ্ছে এই যে, আপনাদের কাছে যে সত্য এসেছে, যে সত্য আপনাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়েছে, তার সত্যতা ও যথার্থতা সম্পর্কে এবং তার সরল-সোজা পথ হওয়া সম্বন্ধে আপনারা দুনিয়ার সামনে সাক্ষ্য দান করবেন। এমনি সাক্ষ্য দিবেন যেন সত্যতা যথার্থরূপেই প্রতিপন্ন হয় এবং দুনিয়ার মানুষের সামনে আল্লাহর দীনের চূড়ান্ত প্রমাণও প্রকাশ হয়ে পড়ে। বস্তুত সত্যের এমনি সাক্ষ্য দানের জন্যেই যুগে যুগে নবীগণের আবির্ভাব হয়েছিল। আর এ দায়িত্ব পালন করা ছিলো তাঁদের অপরিহার্য কর্তব্য। নবীদের অবর্তমানে এ দায়িত্ব এসে পড়েছে সম্মিলিতভাবে সমগ্র মুসলিম জাতির উপর।

সাক্ষ্য দানের গুরুত্ব

এ সাক্ষ্যদানের গুরুত্ব আপনারা এ থেকে অনুধাবন করতে পারেন যে, এর ভিত্তিতেই আল্লাহ তাআলা মানুষের হিসাব-নিকাশ এবং পুরস্কার বা শাস্তিদানের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ তাআলা মহাজ্ঞানী, মেহেরবান এবং ইনসাফের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর অগাধ জ্ঞান, অসীম অনুগ্রহ ও ন্যায় বিচারের কাছ থেকে এটা আশা করা যেতে পারে না যে, মানুষ তার ধর্মীয় কথা জানতে পারবে না অথচ তার বিপরীত পথে চলার অপরাধে তিনি তাকে পাকড়াও করবেন। মানুষ সরল-সোজা পথের কথা জানবে না অথচ সে পথে না চলার দরুন তাকে ধরে তিনি শাস্তি দেবেন। বস্তুত কোন্ বস্তুটি সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে, তা মানুষের অজ্ঞাত থাকবে আর তার কাছ থেকে সে সম্পর্কেই জবাব চাওয়া হবে, এটা কিছুতেই হতে পারে না। এ জন্যেই আল্লাহ তাআলা প্রথম মানুষকেই একজন নবীরূপে সৃষ্টি করেন। অত:পর মানুষকে তাঁর মরযী ও দুনিয়ার জীবন যাপনের নির্ভুল পদ্ধতি শেখানোর জন্যে যুগে যুগে আরো অসংখ্য নবী পাঠিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে এ শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে, দেখো এ পথে তোমরা প্রকৃত মালিকের সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবে। আর এগুলো হচ্ছে বর্জনীয় এবং এসব জিনিস সম্পর্কে তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে ইত্যাদি।

চূড়ান্ত প্রচেষ্টা

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীদের দ্বারা এসব সাক্ষ্যই দান করান। পবিত্র কুরআনে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে :

رُسُلاً مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا -

অর্থাৎ “আল্লাহ তাআলা নবীদেরকে সুসংবাদ প্রদানকারী এবং পরিণতির ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে পাঠিয়েছেন, যাতে করে মানুষ তাঁর কাছে এরূপ বিতর্ক তোলার সুযোগ না পায় যে, আমরা তো বে-খবর ছিলাম। আর আল্লাহ সর্বাবস্থায়ই প্রবল পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।” (সূর আন্ নিসা : ১৬৫)

এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা মানুষকে সতর্ককরণের দায়িত্ব নবীগণের উপর অর্পণ করেন এবং তাঁরা এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের কাজে নিয়োজিত হন। আর তাঁরা যথার্থরূপে সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব পালন করলে লোকেরা নিজ নিজ কৃতকর্মের জন্যে নিজেরাই দায়ি হতে পারে। আর যদি তাঁদের পক্ষ থেকে সাক্ষ্য দানের দায়িত্ব পালনে ত্রুটি হয়, তবে সাধারণ মানুষের গোমরাহীর জন্যে তাদেরকে পাকড়াও করা যেতে পারে। অন্য কথায় বলা যায়, নবীদের উপর অতি বিরাট ও সংকটপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিলো। আর তা ছিলো এই যে,

হয় তাঁদেরকে যথার্থরূপে সত্যের সাক্ষ্য দান করে মানুষের কাছে সত্যকে চূড়ান্ত রূপে প্রকাশ করতে হতো অথবা তাঁদেরকে সাধারণ মানুষের এ অভিযোগের সম্মুখীন হতে হতো যে, আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে যে তত্ত্বজ্ঞান দান করেছিলেন আপনারা তা আমাদের কাছে সরবরাহ করেননি। জীবন যাপনের যে সঠিক পদ্ধতি তিনি আপনাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন, আমাদেরকে তা শিখিয়ে দেননি। এ কারণেই নবীগণ এ দায়িত্বের গুরুত্ব তীব্রভাবে অনুভব করতেন। আর এ কারণেই তাঁরা সত্যের সাক্ষ্য দানের দায়িত্ব পালনে এবং মানুষের কাছে সত্যকে চূড়ান্তরূপে প্রমাণ করতে প্রাণান্তকর চেষ্টা করে গেছেন।

জবাবদিহি

অত:পর নবীদের মাধ্যমে যারা জ্ঞান ও হিদায়াতের পথ পেয়েছেন, তারাই একটি উম্মত বা জাতিতে পরিণত হয়েছে। নবীদের উপর সত্যের সাক্ষ্যদানের যে দায়িত্ব অর্পিত ছিলো, তাঁদের অবর্তমানে তা উম্মতের উপর এসে পড়লো। তারাই এখন নবীদের উত্তরাধিকারীর মর্যাদায় অভিষিক্ত হলো। এখন যদি তারা সত্যের সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব যথাযথরূপে পালন করা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ সত্যপন্থী না হয়, তবুও তারা পুরস্কৃত হবে এবং সাধারণ মানুষ আল্লাহর দরবারে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। কিন্তু তারা যদি সত্যের সাক্ষ্যদানের কোনোরূপ অবহেলা প্রদর্শন করে অথবা সত্যের পরিবর্তে অসত্যের বা বাতিলের সাক্ষী হয়ে দাঁড়ায়, তবে লোকদের আগে তারাই ধরা পড়বে। তারা নিজেদের কার্যাবলী সম্পর্কে তো জিজ্ঞাসিত হবেই তদুপরি সাক্ষ্যদানে তাদের অবহেলার অথবা মিথ্যা সাক্ষ্যদান করার দরুন যারা গোমরাহী, বিপর্যয় ও ভ্রান্তির পথে চলেছে, তাদের কার্যাবলী সম্পর্কেও তাদের জবাবদিহি করতে হবে।

সাক্ষ্য দানের পদ্ধতি

ভদ্র মহোদয়গণ! সত্যের সাক্ষ্যদানের এ সংকটজনক দায়িত্বই আমার, আপনার ও যারা মুসলিম জাতি বলে পরিচয় দেয় এবং যাদের কাছে আল্লাহর কিতাব ও নবীদের হিদায়াত বর্তমান রয়েছে, তাদের উপরও ন্যস্ত হয়ে আছে। এখন এ সাক্ষ্য দানের পন্থা কি তা ভেবে দেখুন। সাক্ষ্য দু'রকমের হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে মৌখিক সাক্ষ্য, আর একটি বাস্তব সাক্ষ্য।

মৌখিক সাক্ষ্যদান

মৌখিক সাক্ষ্য বলতে বুঝায় নবীর মাধ্যমে আমাদের কাছে যে সত্য এসে পৌঁছেছে বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে দুনিয়ার সামনে তাকে তুলে ধরা। মানুষকে বুঝাবার ও তাদের মরমে প্রবেশ করানোর সম্ভাব্য সকল পন্থা অবলম্বন করে দাওয়াত ও তাবলীগ এবং প্রচার-প্রোপাগান্ডার সম্ভাব্য সকল উপায়-উপকরণ

ব্যবহার করে ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদ্ভাবিত সমস্ত মাল-মসলাকে আয়ত্তে এনে আল্লাহর মনোনীত দীনের সাথে দুনিয়ার মানুষের পরিচয় করিয়ে দেয়া। পরন্তু মানুষের চিন্তায়, বিশ্বাসে, নৈতিকতায়, তাহযীব-তামাদ্দুনে, সামাজিক রীতি-নীতিতে, রুজি-রোজগারে, লেনদেন ও আইন-আদালতে, রাজনীতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এবং মানবীয় বিষয়াদি অন্যান্য সকল দিক ও বিভাগের জন্যে এ পেশকৃত শিক্ষাকে অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে বিবৃত করা, যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা তার সত্যতার প্রমাণ করা এবং এর বিপরীত যতো মতাদর্শ বর্তমান রয়েছে যুক্তিপূর্ণ সমালোচনার মাধ্যমে তার দোষ-ত্রুটি নির্দেশ করা। কিন্তু যে পর্যন্ত না গোটা মুসলিম জাতি মানুষকে হিদায়াতের পথ দেখানোর জন্য নবীদের ন্যায় চিন্তা-ভাবনা করবে, সে পর্যন্ত এ মৌখিক সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব পুরোপুরি আদায় হতে পারে না। কর্তব্য পালন করতে হলে এ কাজটিকে আমাদের সামগ্রিক চেষ্টা, সাধনা ও জাতীয় কর্ম-চাঞ্চল্যের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যে পরিণত করতে হবে এবং সকল কাজেই এ উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। পরন্তু আমাদের মধ্য থেকে সত্যের বিপরীত সাক্ষ্য দানকারী কোনো আওয়াজকেই বরদাশত না করার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে।

বাস্তব সাক্ষ্যদান

বাস্তব সাক্ষ্যদানের অর্থ হচ্ছে এই যে, আমরা যেসব নিয়ম-নীতিকে সত্য বলে প্রচার করি আমাদের বাস্তব জীবনেও সেগুলোকে প্রতিফলিত করতে হবে। দুনিয়ার মানুষ যেন আমাদের কাছ থেকে ঐ নীতিগুলোর সত্যতা সম্বন্ধে কেবল মৌখিক চর্চাই শুনতে না পায়, বরং তারা যেন স্বচক্ষে আমাদের জীবনে ঐ সবের সৌন্দর্য ও কল্যাণকারিতা প্রত্যক্ষ করতে পারে। ঈমানের কল্যাণে মানুষ নৈতিক চরিত্র ও আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে তার রসাস্বাদন করতে পারে। এ দীনের পথ-নির্দেশে কেমন আদর্শ মানুষ তৈরি হয়, কিরূপ ন্যায়পরায়ণ সমাজ গঠিত হয়, কেমন সৎ সমাজ ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়, কতো স্বচ্ছ ও পবিত্র তামাদ্দুন গড়ে উঠে, কিরূপ সঠিক ধারায় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যের বিকাশ ঘটে, কি রকম সুবিচার ও সহানুভূতিপূর্ণ এবং আর্থিক সহযোগিতার সূচনা হয় আর ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ কেমন পরিশুদ্ধ, সুবিন্যস্ত ও কল্যাণের সম্পদে ভরপুর হয়ে উঠে, তা যেন তারা স্বচক্ষে দেখতে পারে। বস্তুত আমরা যদি ব্যক্তিগত ও জাতিগতভাবে নিজেরা দীনের মূর্তিমান সাক্ষ্যে পরিণত হতে পারি, আমাদের ব্যক্তি চরিত্র সত্যতার প্রমাণ পেশ করে, আমাদের ঘর-বাড়ি সৌরভে মাতোয়ারা হয়ে উঠে, আমাদের দোকানপাট ও কল-কারখানাগুলো তার রৌশনীতে ঝলমল করে উঠে, আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ তারই আলোকে আলোকিত হয়ে উঠে ; আমাদের শিল্প, সাহিত্য ও সাংবাদিকতা তারই সৌন্দর্য

চর্চায় নিয়োজিত হয় এবং আমাদের জাতীয় নীতি ও সম্মিলিত চেষ্টা-সাধনা তার সত্যতার উজ্জ্বল নিদর্শনে পরিণত হয়, তাহলে এ সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব যথার্থরূপে পালিত হতে পারে।

মোদ্দা কথা যে কোনো স্থানে, যে কোনো অবস্থায়, যে কোনো ব্যক্তি বা জাতির সাথেই আমাদের সাক্ষাৎ হোক না কেন, আমরা যে নীতিগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করে থাকি এবং যার বদৌলতে মানুষের জীবন বাস্তবিকই সুন্দর ও উন্নত হতে পারে, তারা যেন আমাদের ব্যক্তি ও জাতীয় চরিত্রে সে সব নীতির সত্যতার প্রকাশ প্রত্যক্ষ করতে পারে।

সাক্ষ্যদানের পূর্ণতা

প্রসংগত এ কথাও বলে রাখতে চাই যে, এসব মূলনীতির ভিত্তিতে যখন আমাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তা আল্লাহর দীনকে পুরোপুরি গ্রহণ করে তার বিচার, ইনসাফ, সংস্কারমূলক কার্যসূচী ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাদি, শান্তি-প্রিয়তা ও জনগণের কল্যাণ সাধন, শাসক শ্রেণীর সচ্চরিত্র, সুষ্ঠু আভ্যন্তরীণ রাজনীতি, ইনসাফ ভিত্তিক পররাষ্ট্র নীতি, ভদ্রতাপূর্ণ যুদ্ধ এবং আনুগত্যমূলক সন্ধির মাধ্যমে এ কথারই সাক্ষ্য দেবে যে, যে দীন বা জীবন ব্যবস্থা এ রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে তা সত্যিই মানব কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধানে সক্ষম এবং এরূপ রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ, কেবল তখনই এ সাক্ষ্যদান পূর্ণাঙ্গ হতে পারে। আর এমনি সাক্ষ্য মৌখিক সাক্ষ্যের সাথে মিলিত হলেই মুসলিম জাতি পুরোপুরি এর দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারে, আর তখনই মানব জাতির সামনে সত্য চূড়ান্তরূপে প্রকাশ পেতে পারে আর আখিরাতের আদালতে দাঁড়িয়ে রসূলুল্লাহ (স.)-এর পর আমাদের জাতি এ সাক্ষ্য দেয়ার অধিকারী হতে পারবে যে, হযরত (স.) আমাদের কাছে যা কিছু পৌঁছিয়েছিলেন আমরা তা দুনিয়ার মানুষের কাছে যথার্থরূপেই পৌঁছিয়ে দিয়েছি। এতদসত্ত্বেও যারা সত্য পথে আসেনি, তারা নিজেরাই তাদের দুর্গতির জন্য দায়ি।

ভদ্র মহোদয়গণ, মুসলিম জাতি হিসেবে আমাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে এমনি সাক্ষ্যদান করাই ছিলো কর্তব্য। কিন্তু আজ ভেবে দেখুন, বাস্তবে আমরা কেমন সাক্ষ্য দান করে চলেছি।

মৌখিক সাক্ষ্য বিশ্লেষণ

মৌখিক সাক্ষ্যের কথাই প্রথমে ধরা যাক। আজ ব্যক্তিগত ও সামগ্রিকভাবে বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে ইসলামের জন্য সাক্ষ্যদানের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে এমন খুব কম লোকই আমাদের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে। তাদের মধ্যেও আবার যথার্থরূপে এ কাজ করে যাচ্ছেন এমন লোকও খুব নগণ্য। যা হোক, এ

নগণ্য সংখ্যক লোককে যদি বাদ দেয়া হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, মুসলিম জাতির সাধারণ সাক্ষ্য ইসলামের অনুকূলে নয়, বরং তার প্রতিকূলেই চলে যাচ্ছে। আমাদের ভূ-স্বামীগণ ইসলামের উত্তরাধিকার আইনের পরিবর্তে জাহিলী রীতিকে যথার্থ বলে সাক্ষ্য দান করছেন। আমাদের উকিল, মোক্তার ও জজ-ম্যাজিস্ট্রেটগণ ইসলামের যাবতীয় আইন-কানুনকে শুধু ভুল নয়, বরং ইসলামের মৌলিক আইন শাস্ত্রকে গ্রহণের অযোগ্য এবং মানব রচিত আইনকে নির্ভুল বলে সাক্ষ্য দিচ্ছেন। আমাদের শিক্ষক, অধ্যাপক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দর্শন ও ন্যায় শাস্ত্র, ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও রাজনীতি এবং আইন শাস্ত্র ও নৈতিক বিধি-বিধান সম্পর্কে ধর্মবিমুখ পাশ্চাত্য মতবাদকে সত্য এবং ইসলামী মতবাদকে ভ্রূক্ষেপ করার ও অনুপযোগী বলে সাক্ষ্য দিচ্ছেন।

অনুরূপভাবে আমাদের সাহিত্যিকগণ সাক্ষ্য দান করছেন যে, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স ও রাশিয়ার ধর্মবিমুখ নাস্তিক সাহিত্যিকদের যা আদর্শ তাদের আদর্শও তাই এবং মুসলিম সাহিত্যিক হিসেবে তাদের সাহিত্যের কোনো স্বতন্ত্র মর্মবাণী নেই।

আমাদের পত্র-পত্রিকা ও প্রচার যন্ত্রগুলো এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, অমুসলিমদের কাছে যে সব নীতি এবং প্রচার-প্রোপাগান্ডার পদ্ধতি রয়েছে তাদেরও নীতি এবং প্রচার পদ্ধতি ঠিক তাই। এখানকার ব্যবসায়ী ও মালিকগণ সাক্ষ্য দান করছে যে, লেন-দেন সম্পর্কীয় ইসলামী পদ্ধতি অনুসরণের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। বর্তমানে শুধু অমুসলিমদের অনুসৃত পন্থায়ই কাজ-কারবার চলতে পারে। আমাদের নেতৃবৃন্দ সাক্ষ্যদান করে চলেছেন যে, অমুসলিমদের কাছে জাতীয়তা ও স্বদেশিকতার যে যিকির, জাতীয় দাবি-দাওয়া, জাতীয় সমস্যাবলী সমাধান করার যে পন্থা এবং রাজনীতি ও শাসনতন্ত্রের যে মূলনীতি বিদ্যমান রয়েছে। তাদের কাছেও ঠিক তাই রয়েছে। এসব ব্যাপারে যেন ইসলাম তাদেরকে কোনো পথের সন্ধান দেয়নি। আমাদের জনগণ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তাদের মুখে দুনিয়াবী কাজ-কারবারের চর্চা ব্যতীত অন্য কোনো আলোচ্য বিষয় নেই। তারা এমন কোনো ধর্মের সাথে সম্পর্কিত নয় যার আলোচনায় কিছু সময় ব্যয় করতে পারে। আজ শুধু ভারতের (উপমহাদেশে) নয়, বরং সমষ্টিগতভাবে সারা দুনিয়ার মুসলমান যে মৌখিক সাক্ষ্য দান করছে, এ হচ্ছে তার নমুনা।

বাস্তব সাক্ষ্য বিশ্লেষণ

এবার বাস্তব সাক্ষ্যের কিছু নমুনা দেখুন। মৌখিক সাক্ষ্যের তুলনায় এ অবস্থা আরো শোচনীয়। অবশ্য কোনো কোনো স্থানে এমন কিছু সৎ ব্যক্তিও রয়েছেন, যারা নিজেদের জীবনে ইসলামকে প্রতিফলিত করে চলেছেন। কিন্তু বেশির ভাগ লোকের অবস্থা কি? ব্যক্তিগত জীবনে মুসলিম জনসাধারণ ইসলামের যে

প্রতিনিধিত্ব করছে, তা হচ্ছে এই যে, ইসলামী পরিবেশে লালিত-পালিত ব্যক্তিগণ কোনো দিক দিয়েই কুফরী পরিবেশে লালিত-পালিত লোকদের তুলনায় উন্নত অথবা স্বতন্ত্র নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রেই তারা ওদের চেয়েও নিকৃষ্ট। তারা মিথ্যা বলতে পারে, খিয়ানত করতে পারে, অত্যাচার চালাতে পারে, ধোকা দিতে পারে, ওয়াদা খেলাফ করতে পারে, চুরি-ডাকাতি করতে পারে, দাংগা-ফাসাদ করতে পারে, তারা নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনার যাবতীয় কাজই করতে পারে। নৈতিকতা বিরোধী এসব আচরণে তারা গড়পড়তা হিসেবে কোনো কাফির জাতির তুলনায় কম নয়। পরন্তু আমাদের সামাজিক রীতি-নীতি, চাল-চলন, উঠা-বসা, রসম-রেওয়াজ, উৎসব-আনন্দ, মেলা-উরস, সভা, শোভাযাত্রা, মোদ্দা কথা সমাজ জীবনে কোনো একটি দিক ও বিভাগেও আমরা ইসলামের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করছি না। আমাদের এসব আচরণ এ কথারই বাস্তব সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ইসলামপন্থীগণ নিজেদের জন্যে ইসলামের পরিবর্তে জাহিলিয়াতকেই বেশি অনুকরণযোগ্য মনে করছে।

আমরা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললে তাতে শিক্ষা, শিক্ষা-পদ্ধতি ও শিক্ষার দর্শন সব কিছুই অমুসলিমদের কাছ থেকে গ্রহণ করে থাকি। কোনো সমিতি কায়েম করলে তার উদ্দেশ্য, গঠন-পদ্ধতি কর্মনীতি সব কিছুই অমুসলিমদের সমিতি থেকে নিয়ে থাকি। আমাদের জাতি কোনো সামগ্রিক চেষ্টা সাধনায় আত্মনিয়োগ করলে তার দাবি-দাওয়া, তার তদবীরের পন্থা, দলের গঠনতন্ত্র, নিয়ম-পদ্ধতি, তার প্রস্তাববলী, বক্তৃতা-বিবৃতি সব কিছুই অবিকল অমুসলিম জাতির অনুরূপ হয়ে থাকে। এমন কি, যেখানে আমাদের স্বাধীন অথবা আধা-স্বাধীন রাষ্ট্রীয় সরকার বর্তমান রয়েছে, সেখানেও আমরা রাষ্ট্রের ভিত্তি, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এবং যাবতীয় আইন-কানুন অমুসলিমদের কাছ থেকেই ধার করে নিয়েছি। কোনো কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামী আইন শুধু পার্সনাল-ল' হিসেবেই রয়ে গেছে। আর কোনো কোনো রাষ্ট্রে তো তাকেও পরিবর্তন না করে ছাড়েনি। অধুনা লরেন্স ব্রাউন (lawrence brown) নামক জনৈক ইংরেজ লেখক 'দি প্রসপেক্টস অব ইসলাম' (The Prospects of Islam) নামক গ্রন্থে বিদ্রূপ করে বলেছেন : "আমরা যখন ভারতে ইসলামের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনকে সেকেলে ও অকেজো মনে করে রহিত করে দিয়ে কেবল মুসলমানদের পার্সোনাল-ল' হিসেবে রেখে দিয়েছিলাম, তখন মুসলমানদের কাছে তা বড় অপছন্দনীয় বলে মনে হচ্ছিলো। কারণ এর ফলে তাদের অবস্থা এককালীন ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম যিম্মীদের অনুরূপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন আমাদের নীতি শুধু ভারতীয় মুসলমানদেরই মনঃপূত হয়নি, বরং মুসলিম রাষ্ট্রগুলোও আজ আমাদের অনুসৃত নীতিরই অনুসরণ করছে। তুরস্ক ও আলবেনিয়া তো বিবাহ,

তালাক ও উত্তরাধিকার আইন পর্যন্ত আমাদের মানদণ্ড অনুযায়ী সংশোধন করে নিয়েছে। এথেকে এ কথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, 'আইনের উৎস হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছা মাত্র'- মুসলমানদের এ ধারণাটি নিছক একটি পবিত্র কাহিনী (pious fiction) ছাড়া আর কিছুই ছিলো না।"

আজ সারা দুনিয়ার মুসলমান সম্মিলিতভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে যে বাস্তব সাক্ষ্য দান করে চলছে, এ তো হচ্ছে তার নমুনা। আমরা মুখে যাই বলি না কেন, আমাদের সামগ্রিক কার্যকলাপ এ কথারই সাক্ষ্য বহন করছে যে, এ দীন ইসলামের কোনো নিয়ম-নীতিই আমাদের মনঃপূত নয় এবং এর প্রবর্তিত কানুনের মধ্যেও আমাদের কোনো কল্যাণ ও মুক্তি নেই।

সত্য গোপনের শাস্তি

এমনি সত্য গোপন ও মিথ্যা সাক্ষ্য দানের মধ্যেই আজ আমরা লিপ্ত হয়ে আছি। আর আল্লাহ্ তাআলা এমনি গুরুতর অপরাধের জন্যে যে ভীষণ পরিণাম নির্ধারিত করে রেখেছেন, আমাদেরকে ঠিক সেই পরিণতিরই সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

যখন কোনো জাতি আল্লাহর কোনো নিয়ামতের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে আপন সৃষ্টিকর্তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তখন আল্লাহ্ তাকে ইহকাল ও পরকালে সর্বত্রই শাস্তি দিয়ে থাকেন। ইহুদী জাতির বেলায় আল্লাহ তাআলার এই শাশ্বত বিধান পুরোপুরি কার্যকরী হয়েছে। আর আজ আমরা আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছি। ইহুদীদের সংগে আল্লাহ তাআলার কোনো ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিলো না, যে তিনি শুধু তাদেরকেই অপরাধের শাস্তি দান করবেন। আর আমাদের সংগে তাঁর এমন কোনো বিশেষ সম্পর্ক নেই যে, অপরাধে লিপ্ত থেকেও আমরা তাঁর শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবো। বস্তুত আমরা সত্যের সাক্ষ্যদানে যতোটুকু ত্রুটি করে আসছি আর বাতিলের সাক্ষ্যদানে যতোখানি তৎপরতার পরিচয় দিচ্ছি, ঠিক ততোটাই আমরা অধঃপাতের দিকে নেমে যাচ্ছি। গত এক শতাব্দীর মাঝেই মরক্কো থেকে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ (ইন্দোনেশিয়া, মালয়, সিংগাপুর ইত্যাদি) পর্যন্ত একের পর এক দেশ আমাদের হস্তচ্যুত হয়ে গেছে। মুসলিম জাতিগুলো একে একে পরাজিত ও পরাধীন হয়ে পড়েছে। মুসলিম নাম আর গৌরব ও সম্মানের প্রতীকরূপে নয়-অপমান, দারিদ্র্য ও অবনতির প্রতীক স্বরূপ রয়ে গেলো। দুনিয়ায় মান-সম্মান বলতে আমাদের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকলো না। কোথাও আমাদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করা হলো, আর কোথাও আমাদেরকে ঘর-বাড়ি থেকে বিতাড়িত করা হলো, আর কোথাও শুধু চাকরি-বাকরি ও খেদমতের কাজে ব্যবহার করার জন্যে জীবিত রাখা হলো। যেখানে মুসলমানদের নিজস্ব সরকার ছিলো, সেখানেও তারা

ক্রমাগতভাবে পরাজিত হতে লাগলো। আজ তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, বিদেশী শক্তির ভয়ে তারা সদা ভীত ও সন্ত্রস্ত, অথচ তারা যদি ইসলামের মৌখিক এবং বাস্তব সাক্ষ্য দান করতো, তাহলে কুফরের ধারক ও বাহকরাই তাদের ভয়ে কম্পমান থাকতো।

এ কথাটা বুঝতে খুব বেশি দূরে যেতে হবে না। এই উপমহাদেশে নিজেদের অবস্থাটাই একটু পর্যবেক্ষণ করে দেখুন। আপনারা সত্যের সাক্ষ্যদানে যে ত্রুটি করেছেন এবং কথা ও কাজের মাধ্যমে সত্যের বিপরীত যে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তারই ফলে একের পর এক রাজ্য আপনাদের হস্তচ্যুত হয়ে গেলো। প্রথমে আপনারা মারাঠা ও শিখদের হাতে নাজেহাল হলেন। তারপর ইংরেজদের গোলামী আপনাদের ভাগ্যে জুটলো। আর এখন পূর্বের পরাজয়ের চেয়ে অধিকতর শোচনীয় পরাজয় আপনাদের সামনে আসছে। আজ আপনাদের সামনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও সংখ্যালঘিষ্ঠতার প্রশ্নই সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। আপনারা সংখ্যাগুরু হিন্দুদের অধীন হয়ে পড়ায় এবং এককালীন নমশূদ্র জাতির মতো পরিণতির সম্মুখীন হওয়ার আতংকে সদা কম্পমান রয়েছেন। কিন্তু আপনারা আল্লাহর ওয়াস্তে আমায় বলুন তো, আপনারা যদি ইসলামের যথার্থ সাক্ষী হতেন, তাহলে কি এখানকার কোনো সংখ্যাগুরু জাতি আপনাদের ভয়ের কারণ হতে পারতো? আর আজো যদি আপনারা কথা ও কাজের মাধ্যমে ইসলামের যথার্থ সাক্ষ্যদানকারী হন, তাহলে কি কয়েক বছরের মধ্যেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও সংখ্যালঘিষ্ঠতার প্রশ্নে মীমাংসা হয়ে যায় না? আরবের মাত্র প্রতি লাখে একজন সংখ্যালঘুকে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার সিদ্ধান্ত করেছিল এক বিদ্বেষ পরায়ণ ও চরম অত্যাচারী সংখ্যাগুরু জাতি। কিন্তু ইসলামের সত্যতার সাক্ষীগণ মাত্র দশ বছরের মধ্যেই সেই সংখ্যালঘুদেরকে শতকরা একশত জনের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় রূপান্তরিত করেছিল। অতঃপর ইসলামের সাক্ষ্য দানকারী এই জাতিটি যখন আরব থেকে বের হলো, তখন মাত্র ২৫ বছরের মধ্যেই তুর্কীস্তান থেকে মরক্কো পর্যন্ত একের পর এক জাতি তাঁদের সাক্ষ্যদানের উপর ঈমান আনতে লাগলো। যেসব এলাকায় শতকরা একশতজন অগ্নিপূজক ও খ্রিষ্টান বাস করতো, সেখানে শতকরা একশতজনই মুসলমান বাস করতে লাগলো। কোনো প্রকার হঠকারিতা, জাতি-বিদ্বেষ এবং ধর্মীয় সংকীর্ণতাই সত্যের এই বাস্তব ও জীবন্ত সাক্ষ্যের সামনে দৃঢ় হয়ে দাঁড়ানোর মতো মযবুত বলে প্রমাণিত হয়নি। কাজেই আজ যদি আপনারা অন্য জাতির পদানত হয়ে গিয়ে থাকেন এবং অধিকতর শোচনীয়রূপে পদানত হওয়ার আশংকায় শংকিত হয়ে পড়েন, তাহলে তা সত্য গোপন ও মিথ্যা সাক্ষ্য দানের অনিবার্য শাস্তি ছাড়া আর কি হতে পারে?

পরকালের শাস্তি

এইতো হচ্ছে এ অপরাধের জন্য দুনিয়ার জীবনে প্রাপ্য শাস্তির নমুনা। আর পরকালে এর চেয়েও কঠিনতর শাস্তির আশংকা রয়েছে। যতোক্ষণ আপনারা সত্যের সাক্ষীরূপে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন না করছেন, ততোক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়ায় যতো গোমরাহী বিস্তার লাভ করবে, যতো যুলুম-পীড়ন, ফিতনা-ফাসাদ, নাফরমানীমূলক ব্যাপার ঘটবে, যতো অনৈতিকতা ও অসচ্চরিত্রতার প্রচলন হবে, নিজ দায়িত্ব থেকে আপনারা কিছুতেই নিস্কৃতি লাভ করতে পারেন না। কারণ ঐ সকল অনাচার সৃষ্টির দায়িত্ব যদিও আপনাদের নয়, কিন্তু ঐগুলো সৃষ্টি হওয়ার কারণ জিইয়ে রাখার এবং এগুলোর বিকাশ লাভের সুযোগ দেয়ার জন্য আপনারা অবশ্যই দায়ি।

মুসলমানদের সমস্যা ও তার সমাধান

ভদ্র মহোদয়গণ! এ পর্যন্ত আমি যা কিছু আরয করলাম, তা থেকে আপনারা জানতে পেরেছেন যে, মুসলমান হিসেবে আমাদের কি কর্তব্য ছিলো আর কি করছি এবং নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে আমাদের কি দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। এদিক থেকে যদি আপনারা প্রকৃত বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করেন, তাহলে স্বভাবতই আপনাদের কাছে এ সত্যটি উদঘাটিত হবে যে, মুসলমানরা আজ ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যেসব সমস্যাকে তাদের জাতীয় জীবনের আসল সমস্যা বলে মনে করে নিয়েছে এবং যেগুলোর সমাধানের জন্য কিছুটা পরিকল্পিত আর বেশির ভাগই অন্যের কাছ থেকে ধার করে আনা পন্থায় সর্বশক্তি নিয়োগ করছে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলোর কোনোটিই তাদের সমস্যা নয়। আর সেগুলোর সমাধানের জন্যে সময়, শক্তি, শ্রম ও অর্থ ব্যয় নিছক পণ্ডশ্রম বৈ কিছুই নয়। একটি সংখ্যালঘু জাতি আর একটি সংখ্যাগুরু জাতির মাঝখান থেকে নিজেদের স্বার্থ, অস্তিত্ব ও অধিকার কি করে রক্ষা করবে, কোনো সংখ্যালঘু জাতি নিজ নিজ সীমার ভেতরে সংখ্যাগুরুর ন্যায় অধিকার কেমন করে আদায় করবে, কোনো পরাধীন জাতি একটি পরাক্রমশালী জাতির অধীনতা থেকে কেমন করে মুক্ত হবে, একটি দুর্বল জাতি একটি শক্তিশালী জাতির অন্যায় ও যুলুম থেকে কেমন করে আত্মরক্ষা করবে, একটি অনুন্নত জাতি কেমন করে একটি শক্তিশালী জাতির ন্যায় উন্নতি, সমৃদ্ধি ও শক্তি অর্জন করবে, এ ধরনের সমস্যা অমুসলিমদের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধানতম সমস্যা বিবেচিত হতে পারে এবং এগুলোর প্রতিই তাদের যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা ও মনোযোগ কেন্দ্রীভুত হতে পারে। কিন্তু আমাদের মুসলমানদের পক্ষে এগুলো কোনো স্বতন্ত্র ও স্থায়ী সমস্যাই নয়, বরং এ হচ্ছে আমাদের আসল কাজের প্রতি বিমুখতারই অনিবার্য পরিণতি। আমরা যদি সে কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন

করতাম, তাহলে আজ আর এতো জটিল ও উদ্বেগজনক সমস্যার স্তুপ জমতে পারতো না। এখনো যদি আমরা ঐ আবর্জনা পরিষ্কার করার পরিবর্তে আমাদের যাবতীয় মনোযোগ ও শক্তি–সামর্থকে সেই আসল কর্তব্য পালনে নিয়োজিত করি, তাহলে অনতিকালের মধ্যেই শুধু আমাদের নয়, সারা দুনিয়ার পক্ষে উদ্বেগজনক সমস্যার আবর্জনা স্বাভাবিকভাবেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। কারণ, দুনিয়াকে পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ রাখার দায়িত্ব আমাদের উপরই ন্যস্ত ছিলো। সে দায়িত্ব পালনে গাফলতির ফলেই আজ দুনিয়াটা সমস্যার আবর্জনায় ভরে গেছে। আর দুনিয়ার সর্বাধিক জঞ্জালময় অবস্থাটা আমাদের ভাগেই পড়েছে।

পরিতাপের বিষয় যে, মুসলমানদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এ বিষয়টি বুঝবার জন্যে আদৌ চেষ্টা করছেন না। মুসলিম জনসাধারণকে আজ সর্বত্রই এ কথা বুঝানো হচ্ছে যে, সংখ্যাগুরুর প্রশ্ন, স্বদেশের স্বাধীনতা, জাতীয় স্বার্থরক্ষা, বৈষয়িক উন্নতি ইত্যাদিই হচ্ছে তোমাদের আসল সমস্যা। পরন্তু এই ভদ্রলোকেরা এসব সমস্যার সমাধানের যে পন্থা অমুসলিমদের কাছ থেকে শিখেছেন, তাই তারা মুসলমানদের কাছে পেশ করছেন। কিন্তু আমি আল্লাহর অস্তিত্বের উপর যতোটা বিশ্বাসী ঠিক ততোখানি দৃঢ়তার সাথেই বলতে পারি যে, এদ্বারা আপনাদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করা হচ্ছে। আর এ পথে চলে আপনারা কখনো কল্যাণময় লক্ষ্যে পৌছতে পারবেন না।

আসল সমস্যা

তাই আপনাদের জীবনে প্রকৃত সমস্যা কি, এ কথা অকপটে ও পরিষ্কার ভাষায় বিবৃত না করলে আপনাদের চরম অহিতাকাঙ্ক্ষী বলেই প্রমাণিত হবে। আমার জানা মতে আপনাদের বর্তমান, ভবিষ্যত একটি বিশেষ প্রশ্নের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাঁর রসূলের মাধ্যমে আপনাদের কাছে যে হিদায়াত পাঠিয়েছেন, যার কল্যাণে আপনারা মুসলিম নামে অভিহিত হচ্ছেন এবং যার সাথে সম্পর্ক থাকার দরুন ইচ্ছায় হোক কি অনিচ্ছায় আপনারা দুনিয়ায় ইসলামের প্রতিনিধি সাব্যস্ত হয়েছেন, তার সংগে আপনারা কিরূপ আচরণ করছেন? আপনারা যদি সত্যিকারভাবে ইসলামের আনুগত্য করেন এবং কথা ও কাজের মাধ্যমে তার সত্যতার সাক্ষ্য দেন আর আপনাদের জাতীয় চরিত্রে ইসলামকে পুরোপুরি প্রতিফলিত করেন, তাহলে আপনারা দুনিয়ার উন্নতি ও সমৃদ্ধি এবং পরকালে সাফল্য ও কল্যাণের অধিকারী হবেন। আপনাদের উপর ভয়-ভীতি, অপমান–লাঞ্ছনা এবং পরাজয় ও পরাধীনতার যে মেঘ আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। সত্যের প্রতি আপনাদের আহ্বান ও সচ্চারিত্রিক মাধুর্য লোকদের মস্তিষ্ক প্রভাবিত করবে। দুনিয়াজোড়া আপনাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি কায়েম হবে।

আপনাদের কাছ থেকেই ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের প্রত্যাশা করা হবে। আপনাদের আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার উপরই লোকেরা ভরসা করবে। আপনাদের মুখনিঃসৃত বাণীই সকল মহলে প্রবল বলে স্বীকৃতি লাভ করবে। আপনারাই হবেন যাবতীয় কল্যাণের উৎস। আপনাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কুফরী নেতৃত্বের কোনো প্রভাব-প্রতিপত্তিই আর অবশিষ্ট থাকবে না। আপনাদের সততা ও ন্যায়পরায়ণতার ফলে তাদের সমুদয় দর্শন এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদগুলো মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে। তাদের শিবিরে আজ যেসব শক্তির সমাবেশ দেখা যাচ্ছে, তা ছিন্ন হয়ে ইসলামের শিবিরে এসে পড়বে।

এভাবে এমন এক দিন আসবে যখন কম্যুনিজম মস্কোতে থেকেই আত্মরক্ষার জন্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বে। পুঁজিবাদপুষ্ট গণতন্ত্র ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্কে থেকেই আত্মরক্ষার চিন্তায় কম্পমান হবে। লন্ডন ও প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে জড়বাদপুষ্ট ও নাস্তিক্যবাদের জায়গা খুঁজে পাওয়াই মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে। বংশপূজা ও জাতীয়তাবাদ স্বয়ং ব্রাহ্মণ ও জার্মানদের মাঝেও ভক্ত খুঁজে পাবে না। আর বর্তমান যুগটি এমন একটি শিক্ষামূলক কাহিনীরূপে ইতিহাসে স্থান পাবে যে, ইসলামের ন্যায় বিশ্বগ্রাসী শক্তির ধারকগণও কোনোকালে এমনি বেকুব বনে গিয়েছিল যে, হযরত মুসা (আ) এর যষ্টি বগল তলে চেপে রেখেও লাঠি ও রশি দেখে সাপের ভয়ে কাঁপছিল।

বস্তুত ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারী ও সত্যিকারের সাক্ষ্যদানকারী হলেই আমাদের ভবিষ্যত এমনি উজ্জ্বল হতে পারে। কিন্তু এর বিপরীত আপনারা যদি আল্লাহর প্রেরিত হিদায়াতের উপর জেঁকে বসে থাকেন তা থেকে না আপনারা নিজেরা উপকৃত হন, আর না অন্যকে উপকৃত হতে দেন। আপনারা নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করে ইসলামের প্রতিনিধি সেজে বসেন আর নিজেদের কথা ও কাজের মাধ্যমে শিরক, জাহিলিয়াত, দুনিয়াপূজা এবং নৈতিক উচ্ছৃংখলতার পথেই বেশির ভাগ সাক্ষ্য দান করেন। আল্লাহর কিতাব তাকের উপর রেখে পথ নির্দেশের জন্য ধাবিত হন কুফরের ধ্বজাধারী ও গোমরাহীর উৎসের দিকে। আল্লাহর বন্দেগীর দাবি করে প্রকৃত শয়তানী ও খোদাদ্রোহী শক্তিগুলোরই দাসত্ব করেন, বন্ধুত্ব ও শত্রুতা শুধু প্রবৃত্তির লালসার জন্যেই করেন, আর উভয় ক্ষেত্রেই ইসলামকে দূরে সরিয়ে রাখেন আর এভাবে নিজেদের জীবনকেও ইসলামের কল্যাণ থেকে দূরে রাখেন এবং দুনিয়াবাসীকেও ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার পরিবর্তে উল্টো আরো দূরে ঠেলে দেন, তবে এমতবস্থায় আপনাদের দুনিয়া ও আখিরাত কোনোটাই কল্যাণময় হতে পারে না। বরং আজ আপনারা যা কিছু দেখতে পাচ্ছেন, তা হচ্ছে আল্লাহর চিরাচরিত নিয়মানুসারে এরূপ কর্মনীতির পরিণতি। আর অদূর ভবিষ্যতে এর চেয়েও মন্দ পরিণতির সম্মুখীন হওয়া

মোটেই বিচিত্র নয়। ইসলামের লেবেলটা খুলে দিয়ে প্রকাশ্যে কুফরকে গ্রহণ করলে হয় তো পারসীয়ান, আমেরিকান ও বৃটেনের মতো আপনাদের দুনিয়াবী যিন্দেগীটা চাকচিক্যময় হতে পারতো কিন্তু মুসলমান হয়ে অমুসলমানদের মতো জীবন যাপন করা এবং আল্লাহর দীনের ভূয়া প্রতিনিধিত্ব করে দুনিয়ার মানুষের জন্যে হিদায়াতের দ্বার রুদ্ধ করে দেয়ার এই গুরুতর অপরাধ আপনাদের দুনিয়াবী যিন্দেগীকেও সমৃদ্ধিশালী হতে দেবে না। এ অপরাধের যে শাস্তির কথা কুরআনে লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং যার জীবন্ত উদাহরণ হিসেবে আপনাদের সামনে ইহুদী জাতি বর্তমান রয়েছে, তা কিছুতেই নড়চড় হতে পারে না। আপনারা একজাতিত্বের লঘুতর বিপদকে (أَهْوَنُ الْبَلِيَّتَيْنِ) গ্রহণ করুন কিংবা মুসলিম জাতীয়তার নামে নিজেদের স্বতন্ত্র জাতীয়তার স্বীকৃতি আদায় করে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা আদায় করে নেন, এ থেকে কোনো মতেই আপনারা রেহাই পেতে পারেন না। কারণ এ শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবার একমাত্র পথই হচ্ছে ঐ অপরাধ থেকে বিরত থাকা।

আমাদের উদ্দেশ্য

এখন আমরা কি উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হয়েছি তাই আমি আপনাদের কাছে সংক্ষেপে ব্যক্ত করবো। যারা ইসলামকে নিজেদের দীন বলে স্বীকার করে থাকেন, তাদেরকে আমরা এই আহ্বান জানাচ্ছি যে, তাঁরা যেন এই দীনকে নিজেদের প্রকৃত জীবন বিধানে পরিণত করেন। একে যেন ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের জীবনে ও সামগ্রিকভাবে নিজেদের গৃহে, খান্দানে, সমাজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, সাহিত্য ও সাংবাদিকতায়, ব্যবসায়-বাণিজ্যে, অর্থনৈতিক কাজ কারবারে, সমিতি ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানে এবং সাধারণভাবে জাতীয় নীতি নির্ধারণে কার্যত প্রতিষ্ঠিত করেন। আর কথা ও কাজের মাধ্যমে দুনিয়ার সামনে তার যথার্থ সাক্ষ্য দান করেন। আমরা তাদেরকে আরো বলছি যে, মুসলমান হিসেবে দীন ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও সত্যের সাক্ষ্যদানই আপনাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই আপনাদের যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা ও ক্রিয়া-কলাপ এই উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই সম্পাদিত হওয়া উচিত। যেসব কথা ও কাজে ইসলামের বিরোধিতা এবং ভুল প্রতিনিধিত্ব হওয়ার আশংকা রয়েছে, তা থেকে আপনাদের সর্বতোভাবে বিরত থাকা কর্তব্য। আপনাদের প্রতিটি কথা ও কাজকে ইসলামের মানদণ্ডে যাচাই করুন। দীন ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা, যথার্থরূপে তার সত্যতার সাক্ষ্য দান করা এবং চূড়ান্তরূপে সত্যকে প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে ইসলামের প্রতি দুনিয়ার মানুষকে আহ্বান জানানোর জন্যে নিজেদের যাবতীয় চেষ্টা-সাধনাকে নিয়োজিত করুন।

আমাদের কর্মপদ্ধতি

জামায়াতে ইসলামী কায়েম করার এই হচ্ছে একমাত্র উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে যে পথ আমরা বাছাই করে নিয়েছি, তা হচ্ছে এই যে, আমরা প্রথমত মুসলমানদেরকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেই। ইসলাম জিনিসটা কি, তার দাবি ও চাহিদা কি, মুসলমান হওয়ার তাৎপর্য কি, মুসলমান হওয়ার দরুন তাদের উপর কোন্ কোন্ দায়িত্ব অর্পিত হয়, এসব কথা তাদেরকে পরিষ্কার বলে দেই।

এ বিষয়টি যারা বুঝে নেন, তাদেরকে আমরা বলে দেই যে, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ইসলামের সকল দাবি পূরণ করা সম্ভব নয়। এজন্যে সামগ্রিক ও সম্মিলিত চেষ্টার প্রয়োজন। ব্যক্তি জীবনের সাথে দীনের এক ক্ষুদ্রতম অংশেরই সম্পর্ক রয়েছে মাত্র। সেটুকু আপনারা কায়েম করে ফেললেও পূর্ণ দীন কায়েম হয়ে যাবে না এবং এতে তার সত্যতার সাক্ষ্যও আদায় হবে না। বরং সমাজ জীবনের কুফরী ব্যবস্থার প্রাধান্য থাকলে ব্যক্তির জীবনেরও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ইসলামকে কায়েম করা সম্ভব হবে না। কুফরী সমাজ ব্যবস্থার প্রভাব দিন দিন ব্যক্তি জীবনে ইসলামকে সীমিত ও সংকুচিত করতে থাকবে। তাই দীনকে পূর্ণরূপে কায়েম করার এবং যথার্থরূপে তার সত্যতার সাক্ষ্য দান করার জন্যে সকল দায়িত্বসম্পন্ন মুসলমানের সংঘবদ্ধভাবে দীন ইসলামকে কার্যত প্রতিষ্ঠিত ও তার দিকে দুনিয়ার মানুষকে আহ্বান জানানো এবং সেই সংগে দীনের প্রতিষ্ঠা ও তার প্রচারের পথ থেকে সকল বাধা বিপত্তিকে হটিয়ে দেয়া কর্তব্য।

সংগঠন প্রতিষ্ঠা

এ জন্যে দীন-ইসলামে 'জামায়াত'কে অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে এবং দীনের প্রতিষ্ঠা ও তার দাওয়াত প্রচারের জন্যে এই কর্মনীতি নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, প্রথমে একটি সুসংহত দল গঠন করতে হবে এবং তার পরেই আল্লাহর পথে চেষ্টা-সাধনা চালাতে হবে, আর এ কারণেই জামায়াতবিহীন যিন্দেগীকে জাহিলী যিন্দেগী এবং জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ারই শামিল বলে অভিহিত করা হয়েছে।

এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদিসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

اَنَا اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اَللّٰهُ اَمَرَنِىْ بِهِنَّ الْجَمَاعَةُ وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَدْرَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ اِلاَّ اَنْ يُّرَاجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ

مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنْ صَامَ وَصَلَّى؟ قَالَ وَاِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ -

"আল্লাহ আমাকে যে পাঁচটি বিষয়ের হুকুম দিয়েছেন আমিও তোমাদেরকে তারই হুকুম দিচ্ছি। তা হলো-জামায়াত, নেতৃত্বের আদেশ শ্রবণ, আনুগত্য, হিজরত ও আল্লাহর পথে জিহাদ। যে ব্যক্তি ইসলামী জামায়াত ত্যাগ করে এক বিঘত পরিমাণও দূরে সরে গেছে, সে যেন নিজের গর্দান থেকে ইসলামের রজ্জু খুলে ফেলেছে। অবশ্য যদি সে জামায়াতের দিকে পুন:প্রত্যাবর্তন করে, তবে স্বতন্ত্র কথা। আর যে ব্যক্তি জাহিলিয়াতের দিকে (অর্থাৎ অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলার দিকে) আহ্বান জানাবে, সে হবে জাহান্নামী। (এতদশ্রবণে) সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রসূল, নামায-রোযা আদায় করা সত্ত্বেও কি সে জাহান্নামী হবে? রসূলুল্লাহ (সা) বললেন : (হাঁ) যদিও সে নামায-রোযা পালন করে এবং নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে (তাহলেও সে জাহান্নামী হবে)।"–আহমদ ও হাকেম।

এই হাদিস থেকে নিম্নোক্ত তিনটি কথা প্রমাণিত :

এক : দীনি কাজের সঠিক নিয়ম হচ্ছে এই যে, সর্বাগ্রে একটি সুসংহত ও সুশৃঙ্খল জামায়াত গঠিত হবে এবং তার জন্যে এমন একটি সংগঠন গড়ে তুলতে হবে যার মাধ্যমে সবাই একজন নেতার আনুগত্য করে চলবে। অতঃপর পরিস্থিতি অনুযায়ী তারা হিজরত করবে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করবে।

দুই : জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা প্রায় ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন থাকারই নামান্তর। কারণ এর অর্থ হচ্ছে এই যে, মানুষ আরবের সেই জাহিলি যুগের দিকেই পুন: প্রত্যাবর্তন করছে, যে যুগে কেউ কারো প্রতি কর্ণপাত করতো না।

তিন : ইসলামের অধিকাংশ দাবি ও তার প্রকৃত উদ্দেশ্য কেবল জামায়াত এবং সম্মিলিত চেষ্টার মাধ্যমেই পূর্ণ হতে পারে। এ জন্যেই হযরত রসূলুল্লাহ (সা) নামায-রোযার পাবন্দী এবং মুসলিম হওয়ার দাবি করা সত্ত্বেও জামায়াত ত্যাগী ব্যক্তিকে ইসলামত্যাগী বলে আখ্যা দিয়েছেন। হযরত উমর (রা)-এর নিম্নোক্ত বাণীও একথারই প্রতিধ্বনি করছে :

لَا اِسْلَامَ اِلَّا بِجَمَاعَةٍ - (جامع بيان العلم لابن عبد البر)

"জামায়াত বিহীন ইসলামের কোনো অস্তিত্ব নেই।"

কাজের তিনটি পথ

যারা জামায়াতী নিয়ম-শৃঙ্খলার পাবন্দী করতে পারবেন আমরা তাদেরকে বলে থাকি আপনাদের সামনে এখন মাত্র তিনটি পথই খোলা রয়েছে এবং তার যে কোনো একটি পথ বাছাই করে নেয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা আপনাদের রয়েছে।

প্রথমত : আপনাদের মন যদি সাক্ষ্য দেয় যে, আমাদের দাওয়াত, আকীদা-বিশ্বাস, মূল লক্ষ্য, জামায়াতী নিয়ম-শৃঙ্খলা, কর্মনীতি ইত্যাদি সব কিছুই খালিস ইসলাম সম্মত এবং কুরআন-হাদিসের দৃষ্টিতে মুসলিম জাতির যা কর্তব্য, আমরা ঠিক তা-ই সম্পাদন করছি, তাহলে আমাদের সাথে এই কাজে আপনারা শামিল হন।

দ্বিতীয়ত : যদি কোনো কারণবশত আমাদের কাজে আপনারা সন্তুষ্ট হতে না পারেন এবং অন্য কোনো দলকে ইসলামী উদ্দেশ্যে খাঁটি ইসলামী পন্থায় কাজ করতে দেখেন, তাহলে তাতেই শামিল হয়ে যান। কেননা, মাত্র দেড়খানা ইট দ্বারা মসজিদ নির্মানের শখ আমাদের নেই।

তৃতীয়ত : যদি আমাদের বা অন্য কোনো দলের উপর আপনাদের আস্থা না থাকে, তাহলে ইসলামী দায়িত্ব পালন করা তথা দীন-ইসলামকে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত করা এবং কথা ও কাজের মাধ্যমে তার সত্যতার সাক্ষ্য দান করার উদ্দেশ্যে আপনারা নিজেরাই অগ্রসর হয়ে খাঁটি ইসলামী পন্থায় একটি সুসংহত জামায়াত গঠন করুন।

এই তিনটি পথের যে কোনো একটি বাছাই করে নিলে ইন্‌শাআল্লাহ আপনারা মধ্যপন্থী বলেই গণ্য হবেন। কেবল আমাদের জামায়াতই সত্যপন্থী এবং আমাদের জামায়াতের বহির্ভূত লোকেরা সবাই বাতিলপন্থী এরূপ দাবি আমরা কোনো দিন করিনি আর সুস্থমস্তিষ্ক থাকা পর্যন্ত কোনো দিনই তা করবো না। আমরা লোকদের কখনও আমাদের জামায়াতের দিকে আহ্বান জানাইনি। বরং মুসলমান হিসেবে যে দায়িত্বটি আমাদের ও আপনাদের সবার উপরে সমানভাবে ন্যস্ত রয়েছে, আমাদের দাওয়াত হচ্ছে তার প্রতি। আপনারা যদি সে দায়িত্ব পালন করেন, তা আমাদের সাথে মিলেই করুন বা অন্য কোনো পন্থায়, আপনাদের কাজ সত্যপন্থীর কাজই হবে। কিন্তু আপনারা নিজেরাও এ কাজে অগ্রসর হবেন না এবং অন্য কারো সহযোগিতাও করবেন না, অথচ শুধু টালবাহানা করে ইসলামের প্রতিষ্ঠা এবং দুনিয়ার সামনে তার সত্যতার সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব এড়িয়ে যাবেন কিংবা আল্লাহর দীনের পরিবর্তে অন্য কোনো ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কাজে নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যের অপচয় করতে থাকবেন আর আপনাদের কথা ও কাজ ইসলামের বিপরীত বস্তুর সাক্ষ্য বহন করবে, এটা কোনো প্রকারেই সংগত হতে পারে না। ব্যাপার যদি দুনিয়ার মানুষের সাথে হতো, তাহলে না হয় টালবাহানা করে কোনো প্রকার কাজ হাসিল করা যেতো। কিন্তু এ স্থানে তো ব্যাপার হচ্ছে এমন এক মহান প্রভুর সাথে, যিনি অন্তরের অন্তঃস্থলের খবরও রাখেন। কাজেই কোনো চালবাজি দ্বারা তাঁকে প্রতারিত করা সম্ভব হবে না।

বিভিন্ন দীনি সংগঠন

এ কথা নিঃসন্দেহ যে, একই উদ্দেশ্য এবং একই কাজ করার জন্যে বিভিন্ন দল গঠিত হওয়ার ব্যাপারটা আপাতদৃষ্টিতে ভুল মনে হতে পারে এবং এতে বিভেদ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়ার আশংকা রয়েছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে যেহেতু ইসলামী জীবন ব্যবস্থাই ছিন্নভিন্ন হয়ে আছে এবং এখন শুধু ইসলামী জীবন ব্যবস্থা পরিচালনার প্রশ্ন নয় বরং নতুন করে প্রতিষ্ঠার প্রশ্নই দেখা দিয়েছে, তাই এমনি পরিস্থিতিতে গোটা উম্মতের জন্যে 'আল-জামায়াত' (একটি মাত্র দল) গঠন করা সম্ভব নয়, যাতে শামিল হওয়া সবার পক্ষে শুধু অপরিহার্য নয়, বরং যা থেকে আলাদা থাকা বা বিচ্ছিন্ন হওয়াকে জাহিলিয়াত কিংবা ইসলাম ত্যাগের সমতুল্য মনে করা যেতে পারে। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দলের কাজ করা ছাড়া উপায় নেই। এই দলগুলো যদি আত্ম-পূজা ও বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত থাকে এবং নিষ্ঠার সাথে ইসলামী উদ্দেশ্যে ইসলামী পন্থায়ই কাজ করে যায়, তাহলে শেষ পর্যন্ত এগুলো একত্রীভূত হয়ে যাবেই। কারণ সত্য পথের পথিকরা বেশিক্ষণ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না, সত্যই তাদের একসূত্রে আবদ্ধ করে ফেলে। কেননা, সত্যের প্রকৃতিই হচ্ছে ঐক্য, সংহতি ও একাত্মবোধের প্রেরণা দান করা। অনৈক্য ও বিভেদ কেবল তখনি দেখা দিতে পারে, যখন সত্যের সংগে কিছুটা অসত্যের সংমিশ্রণ ঘটে, অথবা উপরে সত্যের প্রদর্শনী থাকলেও ভিতরে অসত্যই কাজ করতে থাকে।

আমাদের দাবি

এবার যারা আমাদের জামায়াতে স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্ট চিত্তে শামিল হন, তাদের কাছে আমাদের দাবি কি ও এবং আমাদের কাছেই বা তাদের জন্যে কাজের কি প্রোগ্রাম রয়েছে তা আমি সংক্ষেপে পেশ করবো। প্রকৃতপক্ষে এক মুসলমানের কাছে ইসলাম যা দাবি করে, জামায়াতের রুকন বা সদস্যদের কাছে আমাদের দাবি তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। আমরা ইসলামের মূল দাবির ব্যাপারে না অণু পরিমাণ কিছু বাড়াতে চাই আর না তা থেকে কিছু মাত্র কমাতে চাই। আমরা কোনোরূপ কাট-ছাট না করে প্রতিটি মানুষের সামনে পূর্ণ ইসলামকেই পেশ করে থাকি এবং তাদেরকে এই মর্মে আহ্বান জানাই যে, এই দীন ইসলামকে বুঝে শুনে সচেতনভাবে গ্রহণ করুন। এর দাবিগুলো ভেবে-চিন্তে ঠিকমত আদায় করুন এবং নিজেদের চিন্তা, কল্পনা, কথা ও কাজ থেকে এর নির্দেশ ও ভাবধারা বিরোধী যাবতীয় বস্তুকে বের করে দিন ও নিজেদের সমগ্র জীবন দ্বারা ইসলামের সত্যতার সাক্ষ্য দান করুন। এই হচ্ছে আমাদের জামায়াতে ভর্তি হওয়ার ফিস এবং সদস্য হওয়ার পদ্ধতি। আমাদের গঠনতন্ত্র, জামায়াতী নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং আমাদের দাওয়াতের মূল লক্ষ্য সব কিছুই স্পষ্ট। এসব যাচাই করে যে কেউ

দেখতে পারেন যে, আমরা কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামে আদৌ কোনো কাটছাঁট বা হ্রাসবৃদ্ধি করিনি। বরং আমাদের কোনো কথা যদি কুরআন-সুন্নাহ হতে অতিরিক্ত কিছু বলে কেউ প্রমাণ করতে পারেন, তবে তা বর্জন করতে এবং কুরআন ও সুন্নাহতে বর্তমান রয়েছে অথচ আমাদের এখানে তা নেই, এমন কোনো বিষয়ের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করলে আমরা তা দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করে নিতে সদা প্রস্তুত। আমরা তো কোনোরূপ কাটছাঁট না করে পূর্ণ ইসলামকে কায়েম করা এবং তার সত্যতার সাক্ষ্যদানের জন্যেই সংঘবদ্ধ হয়েছি। এ ব্যাপারে যদি আমরা মুনাফিক বলে প্রমাণিত হই, তবে এর চেয়ে বড় যুলুম আর কি হতে পারে?

এভাবে যারা আমাদের জামায়াতে শামিল হন, তাদের কর্তব্য হচ্ছে, নিজেদের কথা ও কাজের মাধ্যমে ইসলামের সত্যতার সাক্ষ্য দান করা এবং গোটা মানব জাতির সামনে এই সাক্ষ্য আদায় করার জন্যে পরিপূর্ণরূপে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েম করার উদ্দেশ্যে সম্মিলিত চেষ্টা-সাধনায় আত্মনিয়োগ করা। মৌখিক সাক্ষ্যদান সম্পর্কে আমরা আমাদের সদস্যদেরকে এমনিভাবে ট্রেনিং দান করছি যেন তারা নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে অধিকতর যুক্তিপূর্ণভাবে ইসলামের সত্যতার সাক্ষ্যদানের জন্যে প্রস্তুত হতে পারে, পরন্তু আমরা সংঘবদ্ধভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় মানব জীবনের যাবতীয় সমস্যার ব্যাপারে ইসলামী শিক্ষা ও তার তাৎপর্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরা এবং এ উদ্দেশ্যে প্রচার-প্রপাগাণ্ডার সকল সম্ভাব্য উপায়ে সাহায্য করার উপযোগী একটি প্রতিষ্ঠান কায়েমেরও চেষ্টা করছি। আর বাস্তব সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে আমাদের চেষ্টা হচ্ছে এই যে, প্রথমত, এক একটি ব্যক্তি ইসলামের জীবন্ত সাক্ষীতে পরিণত হবে, অত:পর তাদের সমন্বয়ে সত্যিকার ইসলামী ভাবধারায় কার্যকরীরূপে লক্ষ্য করার উপযোগী একটি সুশৃঙ্খল সমাজ গড়ে উঠবে। অবশেষে এই সমাজটিই আপন চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে বাতিল জীবন ব্যবস্থার বিলুপ্তি সাধন করে সত্য জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করবে; যা দুনিয়ার সামনে পূর্ণাংগ ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করবে।

অভিযোগ এবং তার জবাব

ভদ্র মহোদয়গণ! এই হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য ও কার্যসূচী। এমন কাজ সম্পর্কে যে কোনো মুসলমান আপত্তি তুলতে পারে তা আমরা কখনো ধরণাও করিনি। কিন্তু যেদিন থেকে আমরা এ পথে পা বাড়িয়েছি, সেদিন থেকেই প্রশ্ন ও আপত্তির এক অপ্রতিরোধ্য সয়লাব আসছে। অবশ্য সব আপত্তিই ভ্রূক্ষেপযোগ্য নয় আর একই বৈঠকে সব কথার জবাব দান করা সম্ভবও নয়। তবে যেসব

আপত্তিকে আপনাদের এই শহরে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রচার করা হচ্ছে, এখানে আমি সেগুলো সম্পর্কে কিছু বলতে চাই।

নতুন ফিরকা

বলা হয় যে, আমাদের জামায়াত মুসলমানদের মধ্যে একটি নতুন ফিরকার গোড়া পত্তন করেছে। এ ধরনের কথা যারা প্রচার করে থাকেন, সম্ভবত ফিরকা সৃষ্টির মূল কারণগুলোই তাদের জানা নেই। মুসলমানদের মধ্যে যেসব কারণে ফিরকা বা উপদলের সৃষ্টি হয়, সেগুলোকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

প্রথমত : দীনের সাথে সম্পর্কহীন কোনো বস্তুকে আসল দীনের মধ্যে শামিল করে নিয়ে তাকেই কুফর ও ঈমান অথবা হিদায়াত ও গোমরাহীর মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করা।

দ্বিতীয়ত : দীনের কোনো বিশেষ মাসয়ালাকে কুরআন ও সুন্নাহর চেয়ে অধিক গুরুত্ব দিয়ে তাকেই উপদল সৃষ্টির ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা।

তৃতীয়ত : ইজতিহাদী বিষয়াদিতে বাড়াবাড়ি করা এবং ভিন্ন মত পোষণকারীদের উপর ফাসিক ও কুফরীর অপবাদ চাপিয়ে দেয়া কিংবা অন্তত তাদের সাথে স্বতন্ত্র আচার পদ্ধতি অবলম্বন করা।

চতুর্থত : নবী করীম (সা)-এর পর কোনো বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে অতিরিক্ত ধারণা পোষণ করা এবং তার সম্পর্কে এমন কোনো মর্যাদা দাবি করা যা মানা বা না মানার উপর লোকদের ঈমান কিংবা কুফর নির্ভরশীল হতে পারে অথবা কোনো বিশেষ দলে যোগদান করলেই সত্যপন্থী হওয়া যাবে এবং তার বাইরে অবস্থানকারী মুসলমানরা হবে বাতিলপন্থী এমন কোনো দাবি উত্থাপন করা। এখন আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে, উপরোক্ত চারটি ভুলের কোন্‌টি আমরা করেছি? কোনো ভদ্রলোক যদি দলিল প্রমাণসহ স্পষ্টভাবে বলে দিতে পারেন যে, আমরা অমুক ভুলটি করেছি তবে তৎক্ষণাৎ আমরা তওবা করবো এবং নিজেদের সংশোধন করে নিতে আমরা মোটেই দ্বিধাবোধ করবো না। কেননা- আমরা আল্লাহর দীন কায়েম করার উদ্দেশ্যেই সংঘবদ্ধ হয়েছি, দলাদলি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নয়। কিন্তু আমাদের কার্যকলাপ দ্বারা যদি উক্তরূপ ভুল প্রমাণিত না হয়, তবে আমাদের সম্পর্কে ফিরকা সৃষ্টির আশংকা কিভাবে করা যেতে পারে?

আমরা শুধু আসল ইসলাম এবং কোনো কাটছাঁট না করে পূর্ণ ইসলামকে নিয়েই দাঁড়িয়েছি, আর মুসলমানদের কাছে আমাদের আবেদন শুধু এই যে, আসুন আমরা সবাই মিলে একে কার্যত প্রতিষ্ঠিত করে দুনিয়ার সামনে এর সত্যতার সাক্ষ্য দান করি।

বস্তুত দীনের কোনো একটি বা কয়েকটি বিষয়কে নয় বরং পরিপূর্ণ দীন ইসলামকে আমরা সংগঠন ও সম্মিলনের বুনিয়াদ হিসেবে স্থির করে নিয়েছি।

ইজতিহাদী বিষয়ে আমাদের অভিমত

ইজতিহাদী বিষয়াদির ব্যাপারে যেসব মাযহাব ও মতবাদকে শরীয়তের নীতির ভেতরে থেকে মেনে নেয়ার অবকাশ রয়েছে, তার সবগুলোকেই আমরা সত্য বলে স্বীকার করি। আমরা প্রচলিত মাযহাব ও মতামতগুলোর মধ্যে নিজ নিজ ইচ্ছা ও অভিরুচি অনুযায়ী আমল করার ব্যাপারে সবার অধিকার স্বীকার করি এবং বিশেষ কোনো ইজতিহাদী মতের ভিত্তিতে ফিরকার সৃষ্টি করাকে অসংগত বলে মনে করি।

গোঁড়ামি পরিহার

আমরা নিজেদের জামায়াত সম্পর্কেও কোনোরূপ গোঁড়ামি করিনি অথবা কখনো এমন কথা বলিনি যে, সত্য কেবল আমাদের জামায়াতেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। আমরা পুরোপুরি দায়িত্ব সচেতন হয়েই এ কাজের জন্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছি এবং আপনাদেরকেও আপনাদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। এখন আপনারা আমাদের সাথে উঠে দাঁড়াবেন, কি নিজেরাই স্বতন্ত্রভাবে দায়িত্ব পালন করবেন কিংবা অন্য কোনো দায়িত্ব পালনকারীর সাথে মিলে কাজ করবেন, তা আপনাদেরই বিবেচ্য।

আমীরের মর্যাদা সম্পর্কেও আমরা কোনোরূপ বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হইনি। আমাদের আন্দোলন ব্যক্তি বিশেষকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেনি, এখানে কারো জন্যে বিশেষ কোনো মর্যাদার দাবি করা হয়নি, কারো কিরামাত, ইলহাম ও পবিত্রতার কাহিনী সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তির ছড়াছড়িও করা হয়নি, কারো ব্যক্তিগত আকীদা-বিশ্বাসের উপর জামায়াতের ভিত্তি স্থাপন করা হয়নি, অথবা কারো ব্যক্তিত্বের প্রতি জনসাধারণকে আহ্বান জানানও হয়নি, বরং উদ্ভট দাবি-দাওয়া, স্বপ্ন, কাশফ, কিরামাত ও ব্যক্তি বিশেষের পবিত্রতার কাহিনী প্রচার থেকে আমাদের আন্দোলন সর্বতোভাবে মুক্ত ও পবিত্র।

আদর্শবাদী আন্দোলন

এখানে কোনো ব্যক্তিবর্গের দিকে আহ্বান জানান হয় না, পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে প্রত্যেক মুসলমানের যা জীবন লক্ষ্য, যে মূলনীতিসমূহের সমষ্টিকে বলা হয় ইসলাম, আমাদের আহ্বান হচ্ছে তারই প্রতি। যারা এই উদ্দেশ্য এবং এই মূলনীতির ভিত্তিতে আমাদের সাথে মিলিত হয়ে কাজ করতে প্রস্তুত হয়, তারাই নির্বিশেষে আমাদের জামায়াতের সদস্য হয়ে থাকে।

আমীর নির্বাচন

অতঃপর এই সদস্যগণ নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর নির্বাচিত করেন। আমীরের পদে কারো ব্যক্তিগত প্রাপ্য অধিকার স্বীকৃত নয়, বরং সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হলে জামায়াতে একজন প্রধান থাকা দরকার বলেই একজনকে আমীর নির্বাচিত করা হয়। এই নির্বাচিত আমীরকে পদচ্যুত করে তদস্থলে জামায়াতের অন্য কাউকে আমীর নির্বাচিত করা যেতে পারে। পরন্তু কেবল আমাদের এই জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত লোকদেরই তাঁর আনুগত্য করতে হয়। যারা তাঁর আনুগত্যের শপথ গ্রহণ না করবে, তারা জাহিলী মৃত্যু বরণ করবে, এরূপ কোনো ধারণা আমরা কোনো দিনই পোষণ করিনি।

এবার আমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে বলুন, এমনি পদ্ধতিতে কাজ করা সত্ত্বেও আমাদের আন্দোলনের ফলে মুসলিম জাতির মাঝে কেমন করে একটি নতুন ফিরকার সৃষ্টি হতে পারে? বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, যারা নিজেরাই ফিরকাবন্দী ও উপদলীয় কোন্দলে জড়িত, যারা হামেশা স্বপ্ন, কাশফ, কিরামাতের চর্চা করে থাকেন, যাদের সমস্ত কাজ-কর্ম কোনো 'হযরত'-এর ব্যক্তিগত আকিদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে সম্পাদিত হচ্ছে, যারা ব্যক্তি বিশেষের জন্য কোনো বিশেষ মর্যাদার দাবি করে থাকেন, খুঁটিনাটি ব্যাপারে ঝগড়া-বিবাদ ও বিতর্ক-মুনাযারায় লিপ্ত হন এবং ইজতিহাদী মতামতের ভিত্তিতে দলাদলি ও শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন, আমাদের সম্পর্কে অপবাদ রটাতে তাদেরকেই দেখা যায় সর্বাধিক তৎপর। তাই কারো বিরক্তির পরোয়া না করেই আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, আমাদের সম্পর্কে এসব ভদ্রলোকগণ যেসব কথা প্রচার করেন, যে কারণে এরা আমাদের উপর বীতশ্রদ্ধ, আমাদের প্রকৃত মতাদর্শ তা নয় বরং দীন ইসলামের যে আসল কাজটি তাদের মন:পূত নয়, আমরা সেই দিকেই লোকদের আহ্বান জানাচ্ছি। আর এ কাজের জন্য যে কর্মপন্থা আমরা গ্রহণ করেছি তা দ্বারা তাদের অনুসৃত কর্মনীতির ভ্রান্তিগুলো অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এ কারণেই তারা আমাদের উপর বীতশ্রদ্ধ।

পৃথক দল গঠনের প্রয়োজন

আমাদের প্রশ্ন করা হয় যে, এ কাজ করাই যখন তোমাদের উদ্দেশ্য ছিলো তখন করতে, কিন্তু পৃথক নাম নিয়ে একটি স্থায়ী জামায়াত গঠন করলে কেন? এ দ্বারা মুসলিম জাতির মধ্যে বিভেদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে। বস্তুত এ হচ্ছে এক অভিনব প্রশ্ন। আমি ভেবে আশ্চর্য হই যে, ধর্মহীন ও ধর্মবিরোধী রাজনীতি, অনৈসলামিক শিক্ষা, মাযহাবী কোন্দল সৃষ্টি অথবা নিরেট দুনিয়াবী উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য পাশ্চাত্য গণতন্ত্র কিংবা ফ্যাসিস্ট পন্থায় যদি মুসলমানদের মধ্যে

স্বতন্ত্র নামের বিভিন্ন সমিতি ও দল-উপদল গড়ে উঠে, তবে সেগুলোকে দ্বিধাহীন চিত্তেই বরদাশত করা হয়। কিন্তু দীন ইসলামের আসল কাজের উদ্দেশ্যে যদি খালিস ইসলামী নীতির ভিত্তিতে কোনো জামায়াত গড়ে উঠে, তবে হঠাৎ মুসলিম জাতির মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দেয় এবং একটি মাত্র জামায়াতই তাদের কাছে অসহ্য হয়ে পড়ে। এ থেকে এ কথাই মনে হচ্ছে যে, প্রশ্নকর্তাগণ আসলে জামায়াত বা দল গঠনের বিরোধী নন, বরং দীনের আসল কাজের উদ্দেশ্যে দল গঠনেই তাদের যতো আপত্তি। যাই হোক, তাদের কাছে আমার নিবেদন হচ্ছে এই যে, দল গঠনের অপরাধ আমরা সাগ্রহে নয় বরং একান্ত বাধ্য হয়েই করেছি।

সবাই জানেন যে, এই জামায়াত গঠন করার পূর্বে ক্রমাগত কয়েক বছর আমি একাকী মুসলমানদেরকে এই বলে আহ্বান জানিয়েছি যে, "তোমরা এ কোন্ পথে নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য ও চেষ্টা-সাধনা নিয়োজিত করছো? তোমাদের আসল কাজ হচ্ছে এই। এর প্রতি সমগ্র চেষ্টা-সাধনা কেন্দ্রীভূত করাই তোমাদের কর্তব্য"। তখন সমস্ত মুসলমান যদি এ আহ্বান গ্রহণ করতো, তবে কিছুই বলার ছিলো না। তখন মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন জামায়াত গঠিত হওয়ার পরিবর্তে সকল মুসলমান মিলে একটি জামায়াতে পরিণত হতো। আর যে 'আল-জামায়াত' বা একমাত্র জামায়াতের বর্তমানে ভিন্ন জামায়াত গঠন করা ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী নিষিদ্ধ অন্তত পাক-ভারতে তা গঠিত হতো।

পক্ষান্তরে মুসলমানদের কোনো বিশেষ দলও যদি আমাদের সে আহ্বান কবুল করে নিতো, তবুও আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে তাতে শামিল হতাম। কিন্তু আমরা ক্রমাগত আহ্বান জানিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়া সত্ত্বেও যখন কেউ তার প্রতি কর্ণপাত করলো না, তখন এ কাজকে যারা সত্য এবং অপরিহার্য কর্তব্য বলে বিশ্বাস করতেন, তারা নিজেরাই সমবেত হয়ে সংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা-সাধনা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হন। এখন জিজ্ঞাসা এই যে, আমরা যদি এ-ও না করতাম, তাহলে আমাদের পক্ষে আর কি-ই বা করার ছিলো? আপনারা যদি এ কাজকে ফরজ বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেন তো নিজেদের দাবির সপক্ষে প্রমাণ পেশ করুন। অথবা বলুন, আপনাদের সমিতি ও দল-উপদলগুলো কি বাস্তবিকই এ দায়িত্ব পালন করে চলছে? যদি তা না হয়, তবে বলবো যে, আপনাদের অবস্থা এমনি পর্যায়ে এসে গেছে যে, যারা সচেতনভাবে দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হয়েছে আপনারা উল্টো তাদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করতে চাচ্ছেন।

আমীর বনাম নেতা

আমাদেরকে এ প্রশ্ন করা হয় যে, তোমরা আপন জামায়াতের নেতার জন্যে 'আমীর' শব্দটি বেছে নিলে কেন? 'আমীর' বা 'ইমাম' তো কেবল স্বাধীন ক্ষমতাশালী ও সার্বভৌম শক্তির অধিকারী ব্যক্তিই হতে পারেন। তারা এ কথার সমর্থনে কিছু হাদিস পেশ করে এই যুক্তি প্রদর্শন করে থাকেন যে, 'ইমামত' (নেতৃত্ব) শুধু ইলমের ইমামত, নামাযের ইমামত, কিংবা যুদ্ধ-বিগ্রহের ইমামই হতে পারে। এ ছাড়া তো আর কোনো প্রকারের ইমামত নেই। এ ধরনের প্রশ্ন যারা করেন, তারা কেবল ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অধিষ্ঠিত হওয়া এবং সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন ইমামতের প্রতিষ্ঠাকালীন ফিকাহ ও হাদিস সম্পর্কেই খোঁজ-খবর রাখেন। কিন্তু মুসলমানদের জামায়াত নেতৃত্বচ্যুত হলে, স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হলে এবং ইসলামের জামায়াতী নিয়ম-শৃঙ্খলা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, সে সম্পর্কে তারা মোটেই ওয়াকিফহাল নন। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে, এরূপ পরিস্থিতিতে কি মুসলমানরা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে এবং কোনো সার্বভৌম শক্তির অধিকারী 'ইমাম' পাঠানোর জন্যে আল্লাহর কাছে দু'আ করবে? না তাদেরকে এমনি 'ইমাম' কায়েম করার জন্যে কোনো সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টাও চালাতে হবে? তারা যদি স্বীকার করেন যে, এজন্যে সমবেত প্রচেষ্টা চালাতে হবে, তবে তারা অনুগ্রহপূর্বক বলুন, জামায়াত গঠন না করে কিভাবে সমবেত প্রচেষ্টা চালানো সম্ভব? তারা যদি জামায়াত গঠনের অপরিহার্যতা স্বীকার করেন তো বলুন কোনো নেতা, কোনো প্রধান, কোনো আদেশদাতা ছাড়া কোনো জামায়াত চলতে পারে কি? তারা যদি এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন, তবে ইসলামী কাজের উদ্দেশ্যে যে ইসলামী জামায়াত গঠিত হবে, তার নেতার জন্য ইসলামের কি পরিভাষা নির্ধারিত রয়েছে তা তারাই আমাদের বলে দিন। যে কোনো পরিভাষাই তারা বলুন না কেন, তা যদি ইসলামী হয় তবে তা-ই আমরা গ্রহণ করবো। আর যদি এ-ও তারা না পারেন তবে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিন যে, ক্ষমতা লাভের পরবর্তী অবস্থার জন্যে তো ইসলামের অনেক পথ-নির্দেশ মওজুদ রয়েছে কিন্তু ক্ষমতাহীন অবস্থায় কি করে তা অর্জন করতে হবে, সে সম্পর্কে ইসলাম কোনো পথ-নির্দেশ দেয়নি। এ কাজ যারা করবেন, তাদেরকে অনৈসলামিক পন্থায় এবং অনৈসলামিক পরিভাষা অনুযায়ী করতে হবে। তাদের অভিপ্রায় যদি এ না হয়ে থাকে, তবে সভাপতি, লীডার, নেতা, কায়েদ ইত্যাদি পরিভাষা ব্যবহারে যাদের আপত্তি নেই, তারা কেন 'আমীর'-এর পরিভাষা শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠেন, এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা আমাদের পক্ষে এক দুরূহ ব্যাপার।

সাধারণত এ ব্যাপারটি অনুধাবন করতে লোকদের কিছুটা অসুবিধা দেখা দেয়। এর কারণ এই যে, নবী করীম (সা)-এর যুগে যখন 'আমীর' বা 'ইমাম'-এর পরিভাষা ব্যবহার করা হতো, তখন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত ছিলো। আর যতোদিন পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি, ততোদিন স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সা)-ই রসূল হিসেবে দীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করেন। কাজেই 'আমীর বা 'ইমাম'-এর পরিভাষা ব্যবহারের কোনো অবকাশই তখন ছিলো না।

ইসলামের প্রকৃতি

কিন্তু ইসলামের গোটা ব্যবস্থাপনার উপর দৃষ্টিপাত করলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এই দীন-ইসলাম মুসলমানদের প্রতিটি সম্মিলিত কাজের নিয়ম-শৃঙ্খলার দাবি করে। আর এই নিয়ম-শৃঙ্খলার পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, কাজ জামায়াতবদ্ধ হয়ে করতে হবে এবং একজনকে হতে হবে তার 'আমীর'। অনুরূপভাবে নামায পড়তে হলে একজনকে 'ইমাম' নিযুক্ত করে জামায়াতের সাথে পড়তে হবে। হজ্জ করতে হলে সুশৃঙ্খল পন্থায় একজনকে আমীরে হজ্জ হতে হবে। এমন কি তিনজন লোক যদি সফরে বের হয়, তবে তাঁদের মধ্য হতে একজনকে আমীর নির্বাচিত করে সুশৃঙ্খল পন্থায়ই সফর করতে হবে।[১]

اِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِيْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا عَلَيْهِمْ اَحَدُهُمْ

ইসলামী শরীয়তের এ মূল ভাবধারাটিই হযরত উমর (রা)-এর নিম্নোক্ত বাণীতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে :

لَااِسْلَامَ اِلَّا بِجَمَاعَةٍ وَلَاجَمَاعَةَ اِلَّابِاِمَارَةٍ وَلَااِمَارَةَ اِلَّا بِطَاعَةٍ - (جامع بيان العلم لابن عبد البر)

"জামায়াতবিহীন ইসলাম, ইমারতবিহীন জামায়াত ও আনুগত্যবিহীন ইমারত বলতে কোনো জিনিস নেই।"

এ থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, দীন ইসলামের প্রতিষ্ঠা বা সত্যের সাক্ষ্যদানের চেষ্টা-সাধনার উদ্দেশ্যে যে জামায়াত গঠন করা হবে, তার নেতার জন্যে 'আমীর' বা 'ইমাম' শব্দের ব্যবহার সর্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত। কিন্তু

১.মসনাদে আহমদ-এ হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) থেকে এরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে :

لَايَحِلُّ لِثَلَاثَةٍ يَكُوْنُوْا بِفَلَاةٍ مِّنَ الْاَرْضِ اِلَّا اَمَّرُوْا عَلَيْهِمْ اَحَدَهُمْ

অর্থ : "তিনজন লোক জংগলে থাকলেও নিজেদের মধ্যে একজকে আমীর নিযুক্ত না করা জায়িয নয়।"

এ থেকে এ কথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, শুধু সফরকালেই নয়, বরং সর্বাবস্থায়ই মুসলমানদেরকে সুশৃঙ্খলভাবে জীবন যাপন করতে হবে এবং তাদের কোনো সামগ্রিক কাজই 'জামায়াত' ও 'ইমারত' ছাড়া সম্পাদিত হওয়া উচিত নয়।

ইমাম শব্দের সাথে যেহেতু বিশেষ অর্থ জড়িত হয়ে পড়েছে, কাজেই আমরা নানা ঝামেলা থেকে বাঁচার জন্যে এ শব্দটি বাদ দিয়ে 'আমীর' শব্দটি গ্রহণ করেছি।

যাকাত আদায়ের অধিকার

এখানে এসে আমি আর একটি অভিনব প্রশ্ন শুনতে পেলাম তা হলো এই যে, যে ব্যক্তি এ ধরনের জামায়াতের নেতা নির্বাচিত হবেন, যাকাত আদায় করার কোনো অধিকার তার নেই। কেননা, যাকাত শুধু ইসলামী রাষ্ট্রের আমীরই আদায় করতে পারেন। প্রশ্নকর্তাগণ সম্ভবত আমাদের যাকাত আদায়ের পন্থা সম্পর্কে মোটেই ওয়াকিফহাল নন। প্রকৃতপক্ষে আমরা সাধারণ মুসলমানদের কাছে কখনও জামায়াতের বায়তুল-মালে যাকাত জমা দেয়ার দাবি জানাইনি। অথবা কখনও এমন কোনো কথাও বলিনি যে, যারা আমাদের তহবিলে যাকাত জমা দেবেন না তাদের যাকাতই আদায় হবে না। আমরা শুধু জামায়াতের রুকনদের কাছেই নিজেদের বায়তুল-মালে যাকাত দেয়ার দাবি জানিয়ে থাকি। এ দ্বারা মুসলমানদেরকে শরীয়তের দৃষ্টিভংগি অনুসারে সম্মিলিতভাবে যাকাত দেয়া ও ব্যয় করার ব্যাপারে অভ্যস্ত করে তোলাই হচ্ছে আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এখন জিজ্ঞাসা এই যে, আমাদের এ কাজের ফলে শরীয়তের দৃষ্টিতে কি দোষটা হলো? জনসাধারণকে যদি ঘরে বসে পৃথক পৃথকভাবে নামায পড়ার চেয়ে জামায়াতের সাথে নামায পড়তে বলার অধিকার থাকে, তাহলে যাকাত ব্যক্তিগতভাবে আদায় না করে সম্মিলিতভাবে আদায় করতে বলার অধিকার কেন থাকবে না? লোকদের কাছ থেকে চাঁদা গ্রহণ কিংবা ভর্তি ও সদস্য পদের ফি গ্রহণ জায়িয কিন্তু আল্লাহ ও রসূল (সা) কর্তৃক নির্ধারিত ফরয আদায় করার আহ্বান জানানো নাজায়িয, এটা কেমন আজব কথা।

বায়তুলমাল

এখানে এর চেয়েও অভিনব একটি প্রশ্ন শোনা গেলো। তা হলো এই যে, তোমরা 'বায়তুলমাল' কেন বানিয়েছ। বস্তুত এ ধরনের প্রশ্নাবলী শুনে মনে হয় যে, ইসলামী পরিভাষাগুলোর সংগেই যেন প্রশ্নকর্তাদের কিছুটা শত্রুতা রয়ে গেছে। এ কথা সুস্পষ্ট যে, সম্মিলিত কাজে অর্থ ব্যয় করার সুবিধার্থে প্রত্যেক দল বা সংগঠনেরই একটি অর্থ তহবিল থাকে। আমরা তাকে বায়তুল মাল বলে থাকি। কেননা, এটাই হচ্ছে একমাত্র ইসলামী পরিভাষা। আমরা যদি এর নাম অর্থ ভাণ্ডার রাখতাম, তাহলে তাদের কোনো আপত্তি থাকতো না। অথবা যদি ট্রেজারী বলতাম, তাহলেও হয়ত তারা সন্তুষ্ট থাকতেন। কিন্তু আমরা একটি ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করার কারণেই তারা এটাকে বরদাশত করতে পারছেন না।

প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ প্রশ্নই এমনি নিরর্থক যে, এগুলোর জবাব দান করে শ্রোতাবৃন্দের সময় নষ্ট করার মোটেই আমার ইচ্ছা ছিলো না। কিন্তু তবু আমি নমুনা স্বরূপ কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দান করলাম এ জন্যে যে, যারা নিজেরাও দায়িত্ব পালন করতে চান না, বরং অন্যকেও তা করতে দিতে প্রস্তুত নন, তারা কি ধরনের বাহানা, কুটিল প্রশ্ন এবং সন্দেহজনক বিষয় খুঁজে খুঁজে বের করেন এবং নিজেরা যেমন আল্লাহর পথ থেকে বিরত থাকেন, তেমনি করে অন্যকেও কিভাবে বিরত রাখার চেষ্টা করেন।

বস্তুত অহেতুক ঝগড়া-বিবাদ এবং বিতর্ক-মুনাযারায় লিপ্ত হওয়া আমাদের কাজের পন্থা নয়। যদি কেউ সহজ-সরলভাবে আমাদের কথা বুঝতে চান, তো তাঁকে বুঝানোর জন্যে আমরা সদা প্রস্তুত। আর যদি কেউ যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা আমাদের ভুল-ভ্রান্তি ধরিয়ে দিতে চান তা-ও আমরা মেনে নিতে প্রস্তুত। কিন্তু কেউ বিতর্ক সৃষ্টি করলে এবং আমাদেরও তাতে জড়িত করতে চাইলে আমরা তার সম্মুখীন হতে মোটেই সম্মত নই। বিরুদ্ধবাদিগণ যতোক্ষণ ইচ্ছা এ খেল চালু রাখতে পারেন।

১০

মুসলমানদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মসূচি

[এটি মাওলানা মওদূদীর (র:) সেই ভাষণ, যা তিনি ১৯৫১ সালের ১১ ই নভেম্বর করাচীতে অনুষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামীর সাধারণ সম্মেলনে প্রদান করেছিলেন।]

এর আগে আমি আমার বক্তৃতায় মুসলমানদের সামগ্রিক অবস্থার বিস্তারিত পর্যালোচনা করে এ কথা বলেছি যে, এখন আমাদের জীবনের এক একটি বিভাগে কি কি দোষ-ত্রুটি পাওয়া যায় এবং সে সবের কারণই বা কি। আজকের বক্তৃতায় আমি এ কথা বলবো যে, আমাদের কাছে কোন্ কর্মসূচি রয়েছে যার থেকে আমরা স্বয়ং এ আশা পোষণ করতে পারি এবং আপনাদেরকেও আমি এ আশ্বাস দিতে পারি যে, সে কর্মসূচি সংস্কার-সংশোধনের ফলপ্রসূ ও কার্যকর উপায় হতে পারে।

একটি ভুল ধারণা খণ্ডন

কিন্তু এ কর্মসূচি বয়ান করার আগে আমি একটি ভুল ধারণা দূর করে দিতে চাই যা এ ব্যাপারে সৃষ্টি হতে পারে। আমি যদি বর্তমান সময়ের দোষ-ত্রুটিগুলো এবং তার বর্তমান কারণগুলো উল্লেখ করার পর নিজস্ব কর্মসূচি পেশ করি আর তার দ্বারা আপনাদেরকে সংশোধনের আশ্বাস দিই, তো এর থেকে আপনারা এ ধারণা যেন না করেন যে, এ সব লোক সম্ভবত: এ ধরনের কিছু সাময়িক ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের জন্যে একত্র হয়েছে এবং পুরাতন অট্টালিকায় এ ধরনের কিছু মেরামত কাজ করাই তাদের উদ্দেশ্য। এমন ধারণা করা ঠিক হবে না। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আমাদের একটি স্থায়ী ও বিশ্বজনীন উদ্দেশ্য রয়েছে এবং তা হলো :

এমন প্রতিটি জীবনব্যবস্থা নির্মূল করতে হবে যা খোদাদ্রোহিতা এবং আখেরাত ও নবীগণের হেদায়েতের প্রতি চরম অবহেলা-ঔদাসীন্যের ভিত্তিতে রচিত। কারণ তা মানবতার জন্যে ধ্বংসকর। উক্ত ব্যবস্থা নির্মূল করে তার স্থানে এমন

জীবন ব্যবস্থা বাস্তবে কায়েম করতে হবে যা আল্লাহর আনুগত্য, আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস এবং নবীগণের পদাঙ্ক অনুসরণের ভিত্তিতে রচিত হবে। কারণ এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে মানবতার কল্যাণ।

আমাদের যাবতীয় চেষ্টা-চরিত্রের প্রকৃত লক্ষ্য এটাই এবং আমাদের প্রতিটি কর্মসূচি তা কোনো সীমিত সময় ও স্থানের জন্যে হোক না কেন, ঐ লক্ষ্যপথের কোনো না কোনো স্তর অতিক্রম করার জন্যেই হয়ে থাকে। আমরা সর্বপ্রথম এ বিপ্লব স্বয়ং আমাদের জন্মভূমিতে আনতে চাই যেন এ দেশ দুনিয়ার সংস্কার সংশোধনের উপায় হতে পারে। আমাদের দেশ পাকিস্তানের বর্তমান দোষ ক্রটির আলোচনা আমরা এজন্যে করছি যে, তা আমাদের উদ্দেশ্যের পথে প্রতিবন্ধকস্বরূপ। অতএব আপনারা এ ধারণা করবেন না যে, এসব ক্রটি বিচ্যুতির সংশোধনই আমাদের চরম লক্ষ্য অথবা আমরা একটি বিকৃত, অধ:পতিত সমাজ ব্যবস্থার নিছক সংস্কার করতে চাই। না, তা নয়, বরঞ্চ আমি বলছি যে, যদি এ সব ক্রটি-বিচ্যুতি বিদ্যমান নাও থাকতো, তথাপিও আমরা সেই উদ্দেশ্যের জন্যেই কাজ করতাম, যা প্রথম দিন থেকেই আমাদের সামনে রয়েছে। আমাদের সে উদ্দেশ্য একটি স্থায়ী, শাশ্বত ও বিশ্বজনীন উদ্দেশ্য এবং সকল অবস্থায় তার জন্যে আমাদের কাজ করতে হবে। দুনিয়ার কোনো স্থানে সাময়িকভাবে এক ধরনের সমস্যার উদ্ভব হোক কিংবা অন্য কোনো ধরনের, আমাদের আসল উদ্দেশ্যে কাজ করে যেতেই হবে।

বিগত ইতিহাসের পর্যালোচনা

এ বিশ্লেষণের পর আমি প্রয়োজন বোধ করছি যে, যেভাবে আমাদের জাতির অনাচার ও দোষ-ক্রটির পর্যালোচনা করা হলো, সেভাবে আমাদের অতীত ইতিহাসেরও পর্যালোচনা করে দেখা যাক যাতে ভালোভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যায় যে, এ সব দোষ-ক্রটি কি হঠাৎ আকস্মিকভাবে আমাদের সমাজে আত্মপ্রকাশ করলো, না তার গভীরে কোনো মূল কারণ এবং তার পশ্চাতে কার্যকারণের কোনো দীর্ঘ ধারাবাহিকতা আছে। এ দিক দিয়ে ব্যাপারটি কোন্ ধরনের তা ভালোভাবে বুঝতে পারা না গেলে বর্তমান দোষ-ক্রটির ভীষণতা, ব্যাপকতা ও গভীরতা সুস্পষ্টরূপে ধরাও পড়বে না এবং সংস্কার সংশোধনের প্রয়োজনীয়তাও পুরোপুরি অনুভূত হবে না। আর এ কথাও বুঝতে পারা যাবে না যে, আমরা এখানে আংশিক সংস্কারের প্রচেষ্টাকে কেন অর্থহীন মনে করি এবং কিসের ভিত্তিতে আমরা এ অভিমত পোষণ করি যে, অক্লান্ত প্রচেষ্টা, একটি সার্বিক সংস্কারমূলক কর্মসূচি এবং একটি সৎ ও সুসংহত জামায়াতের মাধ্যমে যতোক্ষণ পর্যন্ত এখানে জীবন ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন সূচিত করা না যাবে, ততোক্ষণ কোনো সুফল ছোট-খাটো চেষ্টা-তদবীরের দ্বারা লাভ করা যাবে না।

আমাদের ইতিহাসের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও সিদ্ধান্তকর ঘটনা এই যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে অর্থাৎ বিগত শতাব্দীতে হাজার হাজার মাইল দূর থেকে আগত একটি অমুসলিম জাতি আমাদের দেশের উপর চেপে বসেছিল এবং মাত্র তিন-চার বছর পূর্বে তাদের গোলামী থেকে আমরা পরিত্রাণ লাভ করেছি। এ ঘটনাটি আমাদের নিকটে কয়েক দিক দিয়ে প্রণিধানযোগ্য।

প্রথম কথা এই যে, আমাদের অনুসন্ধান করে দেখতে হবে যে, এ ঘটনা কেন ঘটলো। এ কি কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিলো যে এমনি বিনা কারণে তা আমাদের উপর এসে পড়লো? বিনা দোষে প্রকৃতির পক্ষ থেকে কি আমাদের উপর জুলুম করা হয়েছে? আমরা কি সঠিক পথেই চলছিলাম, কোনো দুর্বলতা, কোনো দোষ-ত্রুটি কি আমাদের ছিলো না? অথবা প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের মধ্যে বহুকাল যাবত কিছু দুর্বলতা এবং কিছু দোষ-ত্রুটি লালন-পালন করছিলাম যার শাস্তিস্বরূপ আমাদেরকে অবশেষে একটি বিদেশি জাতির গোলামীর শিকল পরিয়ে দেয়া হলো? প্রকৃত ঘটনা যদি এই হয় যে, আমাদের মধ্যে কিছু দুর্বলতা ও কিছু দোষ-ত্রুটি ছিলো, যা আমাদের অধ:পতনের কারণ, তা হলে তা কি ছিলো? আর সে সব কি এখন আমাদের মধ্য থেকে দূরীভূত হয়েছে, না তার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন আছে?

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, বাইরে থেকে যে বিপদটি আমাদের উপর এসে পড়েছিল, তা কি শুধু একটি গোলামীর বিপদই ছিলো না নৈতিকতা, চিন্তাধারা, সভ্যতা সংস্কৃতি, ধর্ম, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতির অন্যান্য বহু বিপদও সাথে করে এনেছিল? কোন্ কোন্ দিক দিয়ে সেগুলো আমাদেরকে কতোটা প্রভাবিত করেছিল? আর তাদের বিদায় গ্রহণের পর আজ তাদের কোন্ কোন্ প্রভাব আমাদের মধ্যে বিদ্যমান?

তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, এ সব বিপদের মুকাবিলায় আমাদের প্রতিক্রিয়া কি ছিলো? একই প্রতিক্রিয়া ছিলো, না বিভিন্ন দলের প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন ছিলো? যদি বিভিন্ন থেকে থাকে, তাহলে সে সবের মধ্যে প্রত্যেকের কি কি ভালো এবং মন্দ প্রভাব আমাদের জাতীয় জীবনে দেখতে পাওয়া যায়?

আমি এ তিনটি প্রশ্নের উপর বিস্তারিত আলোকপাত করবো যাতে করে আমাদের বর্তমান দোষ-ত্রুটিগুলোর মূল উৎস আপনারা জানতে পারেন। আপনারা আরও জানতে পারেন যে, প্রতিটি দোষ-ত্রুটিগুলোর মূল কারণ কি, তার শিকড় কতোদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে এবং কোন্ কোন্ উপকরণ থেকে পুষ্টিলাভ করছে। তারপরই আপনারা সেই গোটা স্কীম উপলব্ধি করতে পারবেন, যা প্রতিকার ও সংস্কারের জন্যে আমাদের সামনে রয়েছে।

আমাদের গোলামীর কারণসমূহ

বিগত শতাব্দীতে যে গোলামী আমাদের উপর চেপে বসেছিল, তা ছিলো প্রকৃতপক্ষে আমাদের কয়েক শতাব্দীর ক্রমাগত ধর্মীয়, নৈতিক ও মানসিক অধ:পতনেরই পরিণাম ফল। বিভিন্ন দিক দিয়ে আমরা দিন দিন অধ:পতনের দিকে ছুটে চলেছিলাম। আমরা অধ:পতনের এমন এক চরম সীমায় পৌঁছেছিলাম, যেখানে আপন শক্তিবলে দাঁড়িয়ে থাকা আমাদের জন্যে সম্ভব ছিলো না। এমন অবস্থায় কোনো না কোনো প্রকারের বিপদ আমাদের উপর পতিত হওয়ারই কথা এবং প্রকৃতির বিধান অনুযায়ী সে বিপদ আমাদের উপর এসে পড়ে।

দীনি অবস্থা

এ অবস্থা জানতে হলে সর্বপ্রথম আমাদের তৎকালীন দীনি অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখা উচিত। কারণ আমাদের জন্যে আমাদের দীনের গুরুত্ব সর্বাধিক। এ দীনই আমাদের জীবনের প্রাণশক্তি। এটিই আমাদেরকে একটি জাতি ও মিল্লাতে পরিণত করেছে। তার বলেই আমরা দুনিয়ায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারি এবং দাঁড়িয়ে থাকতে পারি।

আমাদের অতীত ইতিহাস এ কথার সাক্ষী যে, এদেশে ইসলাম কোনো সংগঠিত প্রচেষ্টার ফলে প্রসার লাভ করেনি। সিন্ধু প্রদেশে ইসলামের প্রাথমিক বিজয় ও তার পরের একটি শতাব্দী আলোচনা বহির্ভূত রাখা যেতে পারে। এছাড়া পরবর্তী কালের কোনো যুগেই এমন কোনো সংগঠিত শক্তি ছিলো না, যা এখানে এক দিকে ইসলামের প্রসার ঘটাতো এবং যেখানে যেখানে ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছিল, সেখানে সেখানে তাকে সুসংহত ও সুদৃঢ় করার চেষ্টা সাথে সাথে চালাতো। একেবারে অসংগঠিত পন্থায় কোথাও কোনো ইসলামী জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি এসে পড়লেন এবং তাঁর প্রভাবে কিছু লোক মুসলমান হয়ে গেলো কোথাও কোনো ব্যবসায়ী এলেন এবং তাঁর সাথে যোগাযোগ স্থাপনের কারণে কিছু লোক কালেমা পড়ে ফেললো। কোথাও কোনো নেক ব্যক্তি ও আল্লাহ প্রেরিত বুযুর্গ আগমন করলেন এবং তাঁর উন্নত চরিত্র ও পূত-পবিত্র জীবন দেখে অনেকেই ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করলো। কিন্তু এ সব বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে এমন কোনো উপায়-উপাদান ছিলো না যে, যাদেরকে তাঁরা ইসলামে দীক্ষিত করছিলেন, সাথে সাথে তাদের শিক্ষা-দীক্ষারও ব্যবস্থা করতে থাকবেন। আর না সমসাময়িক শাসন কর্তৃপক্ষের মনে এ ধরনের কোনো চিন্তা ছিলো যে, আল্লাহর অন্যান্য বান্দাহদের প্রচেষ্টায় যেখানে ইসলাম প্রসার লাভ করছিল, সেখানে নওও মুসলিমদের শিক্ষা-দীক্ষার কোনো ব্যবস্থাপনা তারা করে দেবেন।

এ অবহেলার কারণে আমাদের জনসাধারণ সূচনা থেকেই অজ্ঞতা ও জাহেলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত রইলো। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উপকৃত হয়ে থাকলে হয়েছে মধ্যবিত্ত শ্রেণী অথবা উচ্চ শ্রেণী। জনসাধারণ ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে ছিলো বেখবর এবং তার সংস্কারমূলক সুফল থেকে বহুল পরিমাণে বঞ্চিত। তার পরিণাম আমরা এই দেখতে পাই যে, অমুসলিম জাতির মধ্য থেকে গোত্রের পর গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের মধ্যে জাহেলিয়াতের বহু প্রথাই বিদ্যমান রয়েছে, যা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাদের মধ্যে প্রচলিত দেখা যেতো। শুধু তাই নয়, বরঞ্চ তাদের চিন্তাধারা পর্যন্ত পুরোপুরি বদলে যায়নি। তাদের মধ্যে আজও বহু মুশরেকী আকীদাহ-বিশ্বাস ও মুশরেকী কুসংস্কার বিদ্যমান, যা তাদের অমুসলিম পূর্ব-পুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল। মুসলমান হওয়ার পর পার্থক্য বড়োজোর এই হয়েছিল যে, তাদের পুরাতন দেব-দেবীর স্থানে কিছু নতুন দেবতা স্বয়ং ইসলামের ইতিহাস থেকে খুঁজে বের করেছে এবং প্রাচীন মুশরেকী কর্মকাণ্ডের নাম পরিবর্তন করে ইসলামী পরিভাষার মধ্য থেকে কিছু নতুন নাম অবলম্বন করেছে। আমল যেমন তেমনই রয়ে গেছে। শুধুমাত্র বাহ্যিক রূপ পরিবর্তন হয়েছে।

এর প্রমাণ যদি আপনারা চান, তাহলে কোনো অঞ্চলে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখুন, সেখানকার জনগণের ধর্মীয় অবস্থাটা কি। তারপর ইতিহাসে তালাশ করে দেখুন, ইসলাম আগমনের পূর্বে ঐ অঞ্চলে কোন্ ধর্ম প্রচলিত ছিলো। আপনারা দেখতে পাবেন আজও সেখানে সেই পূর্ববর্তী ধর্মের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আকীদাহ-বিশ্বাস ও আমল অন্য এক রূপে প্রচলিত আছে। যেমন ধরুন, যেখানে পূর্বে বৌদ্ধ ধর্ম ছিলো, সেখানে কোনো এক সময় বৌদ্ধের নির্দশনাবলীর পূজা করা হতো। কোথাও তাঁর দাঁত সংরক্ষিত রাখা হতো, কোথাও তাঁর কোনো অস্থি রাখা হতো, কোথাও তাঁর অন্যান্য পবিত্র স্মৃতিগুলোকে আকর্ষণের কেন্দ্রস্থল করে রাখা হতো। আজ আপনারা দেখতে পাবেন সে অঞ্চলে ঐ একই আচরণ চলছে নবী করীমের (স.) কেশ মুবারক ও পদচিহ্নের সাথে এবং অন্যান্য বুযুর্গানে দীনের স্মরণীয় নিদর্শনাদির সাথে। এভাবে আপনারা প্রাচীন মুসলিম গোত্রগুলোর বর্তমান রসম রেওয়াজের পর্যালোচনা করে দেখুন। তারপর অনুসন্ধান করে দেখুন, এ সব গোত্রের অমুসলিম শাখাগুলোর মধ্যে কি কি রেওয়াজ প্রচলিত আছে। উভয়ের মধ্যে (কয়েক যুগের নওমুসলিম গোত্রগুলো এবং তাদেরই গোত্রীয় অমুসলিমগণ) আপনারা খুব কম পার্থক্যই দেখতে পাবেন। এটা এ কথারই সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, বিগত শতাব্দীগুলোতে যারা মুসলমানদের সামগ্রিক ব্যাপারে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, তারা সাধারণত আপন দায়িত্ব পালনে চরম অবহেলা করেছেন। তাঁরা ইসলাম প্রচারকারী বুযুর্গানের

সাথে কোনো প্রকার সহযোগিতা করেননি। অসংখ্য অগণিত মানুষ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে। কিন্তু যাঁরা ছিলেন ইসলামগৃহের ব্যবস্থাপক ও মুতাওয়ালী, তাঁরা এ আল্লাহর বান্দাহদের শিক্ষা-দীক্ষা, মানসিক সংস্কার-সংশোধন এবং জীবন পরিশুদ্ধ করার কোনোই ব্যবস্থা করেননি। এ কারণেই এ জাতি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের বরকত এবং তাওহীদের নিয়ামত থেকে সুফল লাভ করতে পারেনি। ফলে শিরক ও জাহেলিয়াতের অনিবার্য পরিণাম থেকে বাঁচতে পারেনি।

আবার দেখুন যে, এ বিগত শতাব্দীগুলোতে আমাদের আলেমদের কি অবস্থা ছিলো। কতিপয় মহান বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব প্রকৃতপক্ষে এ দীনের অসাধারণ খেদমত করেছেন যার প্রভাব আগেও লাভজনক ছিলো এবং এখনও লাভজনক প্রমাণিত হচ্ছে। কিন্তু সাধারণভাবে ওলামায়ে দীন যেসব কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন তা হচ্ছে এই যে, ছোটো-খাটো বিষয় নিয়ে তারা কলহ-বিগ্রহ করেছেন। তাঁরা তিলকে তাল করেছেন এবং বড়ো বড়ো গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়গুলো মুসলমানদের অগোচরে রেখেছেন। মতবিরোধকে দল-উপদল সৃষ্টির স্থায়ী বুনিয়াদ বানিয়েছেন এবং দল-উপদল গঠনকে ঝগড়া-লড়াইয়ের মল্লভূমিতে পরিণত করেছেন। তর্কশাস্ত্র শিক্ষাদানের কাজে সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু কুরআন-হাদিসের প্রতি না নিজেদের কোনো অভিরুচি ছিলো আর না লোকের মধ্যে তা সৃষ্টি করেছেন। ফেকাহ্ শাস্ত্রে কোনো অনুরাগ প্রদর্শন করে থাকলে ছোটো-খাটো বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিতর্কই করেছেন। দীন সম্পর্কে গভীর প্রজ্ঞা (تفقه فى الدين) সৃষ্টি করার প্রতি কোনো মনোযোগ দেননি। তাঁদের প্রভাব যেখানেই বিস্তার লাভ করেছে, সেখানে মানুষের চক্ষু 'অনুবীক্ষণ' যন্ত্রে পরিণত হয়েছে বটে, কিন্তু 'দূরদর্শী', 'বিশ্বদর্শী' হতে পারেনি। বংশানুক্রমিক সূত্রে প্রাপ্ত এ (ঝগড়া-বিবাদের) উত্তরাধিকার ঝগড়া-বিবাদ, তর্ক-বিতর্ক, দলাদলি এবং ক্রমবর্ধমান ফেৎনার (কোন্দল-কোলাহলের) বাড়ন্ত ফসলস্বরূপ আমাদের বংশে এসেছে।

তাসাওউফ পন্থীদের অবস্থা পর্যালোচনা করলে আপনারা জানতে পারবেন যে, কয়েকজন পুণ্যপূত ব্যক্তিত্ব অবশ্যি ইসলামের সত্যিকার তাসাওউফ স্বয়ং অনুশীলন করেছেন এবং অপরকেও তা শিক্ষা দিয়েছেন। অবশিষ্ট সকলে এমন এক তাসাওউফের শিক্ষক ও প্রচারক ছিলেন যার মধ্যে প্রাচ্য, বেদান্ত, যরথুষ্ট্র প্রভৃতি দর্শনের সংমিশ্রণ ঘটেছিল। এ তাসাওউফের মধ্যে যোগী-ঋষি, বৈরাগ্যবাদ ও পেটো দর্শনের ক্রিয়াকলাপের এমন সমাবেশ ঘটেছিল যে, ইসলামের মূল আকীদাহ-বিশ্বাস ও ক্রিয়াকলাপের সাথে তার খুব কমই সামঞ্জস্য রয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর পথ লাভ করার জন্যে মানুষ সেদিকে ধাবিত হতো এবং তাঁরা তাদেরকে অন্য পথ দেখাতেন। তারপর পরবর্তীগণ যখন

পূর্ববর্তীগণের সাজ্জাদানশীন বা স্থলাভিষিক্ত হলেন, তখন তাঁরা উত্তরাধিকারের অন্যান্য সম্পদের সাথে তাদের পীর সাহেবানের মুরীদবর্গও লাভ করলেন। অতঃপর পীর-মুরীদের মধ্যে ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষার পরিবর্তে নযর-নিয়াযের সম্পর্কই শুধু অবশিষ্ট রইলো। এসব মহলের সকল প্রচেষ্টা আগেও এই ছিলো এবং এখনও এই রয়েছে যে, যেখানেই তাদের পীরী-মুরীদীর প্রভাব পৌছেছে, সেখানে দীনের সঠিক জ্ঞান কিছুতেই পৌছেনি। কারণ তাঁরা ভালোভাবে জানতেন যে, জনগণের উপর তাঁদের খোদায়ীর জাদু ততোক্ষণ পর্যন্তই কায়েম থাকতে পারে, যতোক্ষণ তাঁরা দীন সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে।

নৈতিক অবস্থা

এ ছিলো আমাদের ধর্মীয় অবস্থা, যা আমাদেরকে উনবিংশ শতাব্দীতে গোলামীর তিলক পরিয়ে দিতে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে এবং এ স্বাধীনতার সূচনা প্রভাতে সেই অবস্থাই তার দোষ-ক্রটিসহ আমাদের সামনে রয়েছে।

এখন নৈতিক দিক দিয়ে পর্যালোচনা করলে আপনারা জানতে পারবেন সে, সাধারণত যে সময়ে জাতির মেরুদণ্ড আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্রমাগত নৈতিক অধঃপতনের কারণে ভাড়াটিয়া হয়ে রইলো। তাদের নীতি এই ছিলো যে, যেই আসুক সে তাদের কাছ থেকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ নেবে এবং যে কাজে খুশি সে কাজে লাগাবে। আমাদের লক্ষ লক্ষ লোক ভাড়াটিয়া সিপাহী হওয়ার জন্যে তৈরি ছিলো, যাদের প্রত্যেককে মনিব-চাকর হিসাবে যাদের বিরুদ্ধে চাইতো যুদ্ধ করাতে পারতো। এমন লোকও ছিলো, যাদেরকে পারিশ্রমিক দিয়ে প্রত্যেক বিজয়ী তার আইন-শৃঙ্খলার কাজ চালিয়ে নিতে পারতো। এমন কি তার রাজনৈতিক চালবাজীতেও ব্যবহার করতে পারতো। আমাদের এ নৈতিক দুর্বলতার সুযোগ আমাদের প্রত্যেক দুশমন গ্রহণ করেছে তা সে মারাঠা হোক, শিখ হোক, ফরাসী হোক বা ওলন্দাজ হোক। অবশেষে ইংরেজ এসে স্বয়ং আমাদের সিপাহীদের তরবারি দ্বারা আমাদের উপর বিজয়ী হয়েছে এবং আমাদের হস্ত ও মস্তিষ্কের সাহায্যে আমাদের উপর শাসন চালিয়েছে। আমাদের নৈতিক অনুভূতি এতোটা ভোঁতা হয়ে পড়েছিল যে, এ গর্হিত কাজ উপলব্ধি করা তো দূরের কথা, উল্টো এর জন্যে তারা গর্ববোধ করতো। আমাদের কবি এটাকে এভাবে বংশীয় গৌরব বলে গণ্য করতো।

"বিগত একশ' পুরুষ থেকে যুদ্ধ করাই আমাদের পেশা।" পেশাদার সিপাহী হওয়া এবং এ বিষয়ে কোনো সম্পর্ক রাখা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যেই লজ্জাকর ব্যাপার, গৌরবের ব্যাপার নয়। সেই বা কোন্ ধরনের মানুষ, যার মধ্যে হক ও বাতিল এবং আপন ও পরের পার্থক্য বোধ নেই। পেটের আহার এবং পরনের কাপড় কেউ দিলেই সে তার জন্যে শিকারে নামতে প্রস্তুত হয়। সে মোটেই

দেখে না যে, কার উপর সে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এ নৈতিক অবস্থা যাদের ছিলো, তাদের কারো মধ্যে বিশ্বস্ততা, আমানতদারী, কোনো স্থায়ী আনুগত্য ও নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য পাওয়া বড়ো দূরের কথা। তারা যখন আপন জাতির দুশমনের কাছে নিজেকে বিক্রি করতে পারে, তখন তাদের মধ্যে কোনো পূত-পবিত্র ও শক্তিশালী বিবেকের অস্তিত্ব থাকতেই পারে না। এ জন্যেই তারা ঘুষ ও আত্মসাৎকে, 'গায়েবী মদদ ও খোদার ফযল' নামে আখ্যায়িত করতো। তারা সুবিধাবাদী ও শক্তিপূজারী হয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যে এ গুণ সৃষ্টি হয়েছিল যে, যার কাছ থেকে তারা বেতন লাভ করতো, তার জন্যে নিজের ঈমান ও বিবেকের বিরুদ্ধে সবকিছু করতে প্রস্তুত ছিলো। এর থেকে আপনারা আন্দাজ করতে পারেন যে, আমাদের চাকুরিজীবী শ্রেণীর অধিকাংশ আজকাল যেসব গুণপনা প্রদর্শন করছে, তা কোনো আকস্মিক দুর্বলতা নয় যে, তা হঠাৎ তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। বরঞ্চ তার শিকড় আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের গভীরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। দু:খ শুধু এতোটুকু যে, আমাদের দুশমন তাদেরকে অবৈধভাবে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করতো, আর আজ তাদেরকে আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দ নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে। প্রকৃতপক্ষে তাদের হওয়া উচিত ছিলো জাতির ব্যাধির চিকিৎসক, তাদের রোগের সুযোগ গ্রহণ করা উচিত ছিলো না।

আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এসব দুর্বলতায় আমাদের আলেমগণও অংশীদার ছিলেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে যেমন মুষ্টিমেয় সংখ্যক মহান ও সুদৃঢ় চরিত্রের লোক ছিলেন, তেমনি আলেমদের মধ্যেও কতিপয় এমন মহান ব্যক্তিত্বও ছিলেন, যাঁরা তাঁদের দায়িত্ব সঠিকভাবে উপলব্ধি করেন এবং জীবনের বাজি রেখে তা পালন করেন। দুনিয়ার কোনো সম্পদ তাঁদেরকে খরিদ করতে পারেনি। কিন্তু সাধারণত যে নৈতিক অবস্থা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছিলো, তা আলেমদেরও ছিলো। তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন বেতনভুক্ত। কোনো না কোনো বাদশাহ, আমীর অথবা পরিষদের সাথে তাঁরা সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়তেন। তার বেতন ভোগ করে তার ইচ্ছামত দীন ও দীনি আইন-কানুনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা, আপন স্বার্থকে দীনের দাবির উপর অগ্রাধিকার দেয়া, আপন প্রভুর খাতিরে সত্যনিষ্ঠ আলেমদেরকে দাবিয়ে রাখার জন্যে ধর্মের অস্ত্র ব্যবহার করা ছিলো তাদের অভ্যাস। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামাতেন অথচ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উপেক্ষা করে চলতেন। প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন ও দরিদ্র লোকদের ব্যাপারে তাঁদের ধর্মীয় অনুভূতি এতো প্রখর ছিলো যে, মুস্তাহাব, মাকরূহ্ এবং ছোটখাটো বিষয়েও তারা মার্জনার যোগ্য ছিলো না। আর এসব বিষয় নিয়ে তাঁরা বিরাট ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করতেন। কিন্তু তারা সম্পদশালী ও শাসন কর্তৃপক্ষের বেলায়, তারা মুসলমান হোক অথবা কাফের একেবারে আপোসকামী

ছিলেন এবং ছোটখাটো ব্যাপার কেন, একেবারে মৌলিক বিষয়েও তাদেরকে প্রশ্রয় দিতেন।

এখন রইলেন আমাদের আমীর-ওমরা। দু'টি জিনিসের প্রতিই তাঁদের আগ্রহ-অনুরাগ কেন্দ্রীভূত ছিলো। একটি উদরপূজা ও অপরটি কামরিপু চরিতার্থকরণ। এ দু'টি বস্তু ব্যতীত তাঁদের দৃষ্টিতে অন্য কোনো কিছুর গুরুত্ব ছিলো না। সকল চেষ্টা-চরিত্র ও শ্রম-সাধনা ঐ দু'টির খেদমতের জন্যেই নিবেদিত ছিলো। এ দু'টির পরিপোষণের লক্ষ্যে জাতীয় সম্পদ দ্বারা এ পেশা ও শিল্পের উৎকর্ষ সাধন করা হতো। এ পেশা পরিত্যাগ করে কোনো আমীর যদি তার ধন-দৌলত ও শক্তিসামর্থ কোনো মহান উদ্দেশ্যে ব্যয় করতো, তাহলে অন্যান্য সকল আমীর মিলিত হয়ে থাকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করতো এবং তার বিরুদ্ধে আপন জাতির দুশমনদের সাথে চক্রান্ত করতেও দ্বিধাবোধ করতো না।

মানসিক অবস্থা

এরপর যখন আমরা মানসিক চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে আমাদের নিজস্ব ইতিহাসের পর্যালোচনা করি, তখন জানতে পারি যে, কয়েক শতাব্দী যাবত আমাদের এখানে বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধানের কাজ প্রায় বন্ধ ছিলো। আমাদের যাবতীয় শিক্ষালাভ ও শিক্ষাদান প্রাথমিক জ্ঞানচর্চা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিলো। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এ ধারণা বদ্ধমূল ছিলো যে, অতীত মনীষীগণ যে কাজ করে গেছেন, তা জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার চূড়ান্ত ফল ছিলো। তার অতিরিক্ত কিছু করা যেতে পারে না। জ্ঞানানুশীলন বড়জোর এতোটুকু হতে পারে যে, পূর্ববর্তীগণের লিখিত গ্রন্থাবলীর ব্যাখ্যা ও টিকা লেখা যেতে পারে। এসব লেখার কাজে আমাদের গ্রন্থকারগণ এবং তা পড়াবার কাজে আমাদের শিক্ষকগণ নিমগ্ন আছেন। কোনো নতুন চিন্তা, কোনো নতুন গবেষণা এবং কোনো নতুন আবিষ্কার সাম্প্রতিক শতাব্দীগুলোতে আমাদের নজরে পড়ে না। এ কারণে এক পরিপূর্ণ স্থবিরতা আমাদের মন-মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনার অঙ্গনে বিরাজ করছে।

এ কথা সত্য যে, যে জাতির এ দুরবস্থা হয়, সে বেশি দিন তার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখতে পারে না। তাকে অনিবার্যরূপে এমন এক জাতির দ্বারা পরাভূত হতে হয়, যারা কর্মতৎপর, গতিশীল ও অগ্রগামী; যারা জনসাধারণের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করতে পারে। যাদের লোকজনের মধ্যে দায়িত্ববোধ পাওয়া যায়, যা কিছুই তারা দায়িত্ব বলে মনে করুক না কেন; যারা জ্ঞানীগুণী ও সুধী ব্যক্তিগণ গবেষণায় নিয়োজিত এবং নতুন নতুন শক্তির উদ্ভাবক, যার যোগ্য ব্যবস্থাপকগণ নতুন উদ্ভাবিত শক্তিগুলোকে জীবনের বিভিন্ন কাজে প্রয়োগ করে এবং যে জাতি সভ্যতা-সংস্কৃতির বিভিন্ন বিভাগে ও দিকে ক্রমাগতভাবে উন্নতির সাথে অগ্রসর

হয়। এ ধরনের কোনো জাতির মুকাবিলায় একটি স্থবির, দুর্বল চরিত্র এবং অজ্ঞ ও পশ্চাৎপদ জাতি কতোদিন টিকে থাকতে পারে? অতএব, এ কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা ছিলো না, বরং প্রকৃতির দাবিই এই ছিলো যে, আমরা পাশ্চাত্যের জাতিসমূহের কোনো একটি গোলামে পরিণত হই।

পাশ্চাত্য সভ্যতার বুনিয়াদ

এখন আমাদের দেখা উচিত যে, যে পাশ্চাত্য জাতির দ্বারা পরাজিত ও পরাভূত হয়ে আমরা গোলামীর শিকল পরলাম, তারা কী সাথে করে এনেছিল। তাদের মতবাদ, ধর্ম ও দর্শন কী ছিলো? তাদের নীতি-নৈতিকতা কী ছিলো? তাদের সভ্যতার রূপ কী ছিলো? তাদের নীতির বুনিয়াদ কী ছিলো? তাদের এসব কিছু কিভাবে এবং কতোটা আমাদেরকে প্রভাবিত করেছিল।

ধর্ম

যে সব শতাব্দীতে আমরা ক্রমাগত অধঃপতনের দিকে ছুটেছিলাম, ঠিক ঐ শতাব্দীগুলোতেই ইউরোপ নতুন রেনেসাঁ আন্দোলনের মাধ্যমে পুনরুত্থান লাভ করছিল। এ আন্দোলনের সূচনাকালেই মধ্যযুগীয় খ্রিষ্টধর্মের সাথে তার সংঘর্ষ শুরু হয়। এ সংঘর্ষ এমন এক দুঃখজনক পরিণাম ডেকে আনে যা শুধু ইউরোপের জন্যেই নয়, বরং সারা দুনিয়ার জন্যে মারাত্মক প্রমাণিত হয়। প্রাচীন খ্রিষ্টীয় দার্শনিকগণ তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাসের এবং সৃষ্টিজগত ও মানুষ সম্পর্কে বাইবেলের ধারণার গোটা প্রাসাদ নির্মাণ করে রেখেছিল গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞানের মতবাদ, দলীল-প্রমাণ ও তথ্যাদির উপর। তাদের ধারণা এই ছিলো যে, এ বুনিয়াদগুলোর যে কোনো একটির উপর সামান্য আঘাত লাগলেই গোটা প্রাসাদ ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। আর সেই সাথে ধর্মও শেষ হয়ে যাবে। সে জন্যে তাঁরা এমন কোনো সমালোচনা-গবেষণা সহ্য করতে তৈরি ছিলেন না, যা গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞানের সর্বস্বীকৃত বিষয়গুলোর প্রতি সন্দেহ আরোপ করে। এমন কোনো দার্শনিক চিন্তাধারাও তাঁরা বরদাশত করতে পারতেন না, যা ঐ সর্বস্বীকৃত মতবাদের পরিপন্থী যার কারণে গির্জা কর্তৃপক্ষকে তাদের যুক্তি-প্রমাণ পুনর্বিবেচনা করতে হতো। তাঁরা এমন কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণার অনুমতিও দিতে পারতেন না, যার ফলে বিশ্বজগত ও মানুষ সম্পর্কে বাইবেল প্রদত্ত ও দার্শনিকগণ কর্তৃক গৃহীত মতবাদের কোনো অংশ ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। এ ধরনের প্রতিটি বিষয়কে তাঁরা ধর্মের জন্যে এবং ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত তামাদ্দুনিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্যে আশঙ্কাজনক মনে করতেন। পক্ষান্তরে যাঁরা নতুন রেনেসাঁ আন্দোলনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমালোচনা, গবেষণা এবং তথ্যানুসন্ধানের কাজ করছিলেন, তাঁরা পদে পদে ঐ দর্শন ও বিজ্ঞানের দুর্বলতা

উপলব্ধি করছিলেন, যার উপর নির্ভর করে ধর্মীয় বিশ্বাস ও যুক্তি-প্রমাণের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তাঁরা যতোই সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন গির্জা কর্তৃপক্ষ ততোই তাদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে। নীতি-নৈতিকতা কী ছিলো? তাদের সভ্যতার রূপ কী ছিলো? তারা দিন দিন অধিকতর কঠোরতার সাথে তাঁদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছিলেন। সর্বস্বীকৃত তথ্য ও তত্ত্বের বিপরীত বহু কিছু নজরে পড়ছিল। তথাপি গির্জা কর্তৃপক্ষদের জিদ ছিলো এই যে, ঐসব সর্বস্বীকৃত তথ্য ও তত্ত্ব পুনর্বিবেচনা করে দেখার পরিবর্তে সমালোচকদের চক্ষুই উৎপাটিত করা হোক। ঐসব মতবাদের মধ্যে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি নজরে পড়ছিল, যাকে পূর্বে কিছু ধর্মীয় বিশ্বাসের অকাট্য দলীল-প্রমাণ মনে করা হয়েছিল। কিন্তু গির্জা কর্তৃপক্ষ বলেন যে, ঐ সব যুক্তি-প্রমাণ বারবার চিন্তাভাবনা করার পরিবর্তে যারা এমন চিন্তা করে, তাদের মত-মস্তিষ্কই চূর্ণ করে দেয়া উচিত।

এ দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের প্রথম পরিণাম ফল এই হলো যে, নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের জাগরণের সূচনা থেকেই ধর্ম ও ধার্মিকদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ-প্রতিহিংসা সৃষ্টি হলো। অত:পর যতোই ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ কঠোরতা প্রদর্শন করতে থাকে, ততোই এ বিদ্বেষ-প্রতিহিংসা বাড়তে ও প্রসার লাভ করতে থাকে। এ প্রতিহিংসা শুধু খ্রিষ্টবাদ ও গির্জা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রইলো না, বরং স্বয়ং ধর্মই তার শিকারে পরিণত হলো। নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নতুন সভ্যতার পতাকাবাহীগণ উপলব্ধি করলেন যে, ধর্ম একটি প্রতারণা মাত্র। কোনো যুক্তিবাদিতার পরীক্ষায় তা টিকে থাকতে পারে না। এর বিশ্বাস কোনো যুক্তিতর্কের উপর নয়, বরং অন্ধ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধার্মিকদের ভয় ছিলো এই যে, জ্ঞানের আলো বিস্তার লাভ করলে তাদের গুমর ফাঁক হয়ে যাবে। অত:পর জ্ঞান-বিজ্ঞানের অঙ্গন থেকে সামনে অগ্রসর হয়ে এ সংঘাত-সংঘর্ষ যখন রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সামাজিক ব্যবস্থার বিভিন্ন অঙ্গনে ছড়িয়ে পড়লো এবং গির্জা কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত পরাজয়ের পর নতুন সভ্যতার পতাকাবাহীদের নেতৃত্বে এক নতুন জীবন ব্যবস্থার প্রাসাদ গড়ে উঠলো, তখন তার আরও দু'টি পরিণাম ফল দেখা গেলো, যা ভবিষ্যতের সমগ্র মানব ইতিহাসের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করলো।

প্রথমত: নতুন জীবন ব্যবস্থার প্রতিটি বিভাগ থেকে ধর্মকে কার্যত: উৎখাত করা হলো এবং তার পরিসীমা ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও কাজ পর্যন্ত সীমিত করে রাখা হলো। এ কথা নতুন সভ্যতার মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত করা হলো যে, রাজনীতি, অর্থনীতি, নৈতিকতা, আইন-কানুন, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা মোটকথা সামাজিক জীবনের কোনো বিভাগেই ধর্মের হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার নেই। তা নিছক মানুষের এক ব্যক্তিগত ব্যাপার। কেউ তার ব্যক্তিগত জীবনে

খোদা ও নবীকে মানতে চাইলে মানবে এবং তাদের নির্দেশ মেনে চলতে চাইলে চলবে। কিন্তু সামাজিক জীবনে সমুদয় স্কীম রচিত ও কার্যকর করা হবে এ কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেই যে, ধর্ম এ বিষয়কে কি নির্দেশনা দান করে এবং কি করে না।

দ্বিতীয়ত: এ নতুন সভ্যতার শিরা-উপশিরায় খোদাবিমুখতা ও ধর্মহীনতার মানসিকতা সন্নিবিষ্ট হয়ে গেলো। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের যা কিছু সমৃদ্ধি হলো, তার মূলে সেই বিদ্বেষই সর্বদা বিদ্যমান ছিলো, যা বৈজ্ঞানিক জাগরণের সূচনায় ধর্ম এবং তৎসংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিষয়ের বিরুদ্ধে সৃষ্টি হয়েছিল। এ চিন্তাধারা প্রসূত সভ্যতা যেখানেই পৌঁছলো, সেখানে এ ধারণা সৃষ্টি করলো যে, ধর্ম যা কিছু পেশ করে, তা খোদা, আখেরাত এবং ওহীর প্রতি বিশ্বাস হোক অথবা কোনো নৈতিক ও সাংস্কৃতিক নীতি, তা সর্বাবস্থায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। তার সত্যতার প্রমাণ পেশ করা উচিত। নতুবা তা অস্বীকার করতে হবে। পক্ষান্তরে পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানের পণ্ডিতবর্গ যা উপস্থাপিত করবেন, তাই গ্রহণযোগ্য যতোক্ষণ না তা ভ্রান্ত হওয়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ধারণা-পদ্ধতি পাশ্চাত্যের গোটা চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছিল। তা শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যকেই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ বিবর্জিত করেনি। বরঞ্চ সে চিন্তাধারার ভিত্তিতে রচিত সমাজ দর্শন ও সমাজ ব্যবস্থা খোদা ও আখেরাতের ধারণারও পরিপন্থী ছিলো।

জীবনদর্শন

এ তো ছিলো ধর্ম সম্পর্কে বহিরাগত বিজয়ী সভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গি। এখন দেখুন যে, তার জীবনদর্শন কি ছিলো। যা সে ধর্মকে অস্বীকার করে অবলম্বন করেছিল।

এ একেবারে একটি জড়বাদী দর্শন। পাশ্চাত্যের চিন্তানায়কগণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের অতীত কোনো অদৃশ্য সত্যকে বিশ্বাস করতে না প্রস্তুত ছিলো আর না যে ওহী ও ইসলামকে তারা অস্বীকার করতো, তা ব্যতীত অদৃশ্য সত্যগুলো জানবার এবং তা উপলব্ধি করার জন্য অন্য কোনো উপায় ছিলো। অত:পর বৈজ্ঞানিক মেজাজ-প্রকৃতিও এ কথা মানতে রাজি ছিলো না যে, নিছক অনুমানের ভিত্তিতে অদৃশ্য সত্যাবলী সম্পর্কে কোনো ধারণা-মতবাদের প্রাসাদ তৈরি করা হোক। এর চেষ্টা যদিও করা হয়েছিল, তথাপি বুদ্ধিবৃত্তিক সমালোচনার মুকাবিলায় তা টিকে থাকতে পারেনি। অতএব, অদৃশ্য সম্পর্কে যখন তারা সন্দেহ ও অনুপলব্ধির স্থান অতিক্রম করতে পারলো না, তখন এ ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় রইলো না যে, দুনিয়া এবং জীবন সম্পর্কে যে অভিমতই তারা কায়েম করবে, তা শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বাসের ভিত্তিতেই করবে। ফলে, তাদের গোটা জীবনদর্শন বস্তুতান্ত্রিক হয়ে পড়ে। তারা মনে করে যে, মানুষ এক প্রকারের পশু, যা এ

পৃথিবীতে পাওয়া যায়। সে না কারো অধীন আর না কারো কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। তার জীবন বিধান রচনার জন্যে উপর থেকে কোনো হেদায়াতও সে লাভ করে না। এ হেদায়াত বা পথ-নির্দেশনা নিজের থেকে গ্রহণ করতে হবে। এ হেদায়াতের কোনো উৎস থাকলে তা হচ্ছে প্রাকৃতিক আইন-কানুন ও নিয়ম-নীতি, জীব জগতের তথ্যাবলী অথবা মানবের অতীত ইতিহাসের অভিজ্ঞতা। তারা মনে করেছিল, এ দুনিয়ার জীবনই একমাত্র জীবন। তার সাফল্য ও স্বাচ্ছন্দ্যই কাম্য। তার ভালো ও মন্দের পরিণামই একমাত্র বিচার্য। তারা মনে করেছিল, মেজাজ-প্রকৃতির দাবি পূরণ এবং প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা চরিতার্থ ব্যতীত জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। তারা মনে করেছিল, পরিমাপযোগ্য বস্তুই একমাত্র সত্য এবং তারই মূল্য ও গুরুত্ব আছে। তা ছাড়া আর যা কিছু তা অবাস্তব ও মূল্যহীন। তার পেছনে লেগে থাকা সময়ের অপচয় মাত্র। আমি এখানে ঐসব দর্শনভিত্তিক জীবন ব্যবস্থার উল্লেখ করছি না, যা পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে রচিত হয়েছিল, যা বই-পুস্তকে লিখিত হয়েছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়া হতো ও পড়ানো হতো। বরং পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিশ্ব প্রকৃতি, মানুষ ও পার্থিব জীবন সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে আছে এবং সাধারণ মানুষের মনে যা বদ্ধমূল হয়ে আছে, তাই আমি এখানে উল্লেখ করছি। তার সারাংশ তাই, যা আমি আপনাদের সামনে পেশ করছি।

এ সব ছাড়াও তিনটি এমন বড়ো বড়ো দার্শনিক মতবাদ রয়েছে যা অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে আত্মপ্রকাশ করে, যখন আমরা পাশ্চাত্যের অধীন গোলামীর জীবন যাপন করছিলাম। তা খুঁটিনাটি বিষয়াদি ছাড়াই শুধু মূল ভাবধারার দিক দিয়ে গোটা সভ্যতার উপর বিস্তার লাভ করে। মানব জীবনের উপর এর এমন এক সার্বিক প্রভাব পড়ে, যা সম্ভবতঃ অন্য কিছুর পড়েনি। তাই এখানে বিশেষ করে এসবের উপরে কিছু আলোকপাত করবো।

হেগেলের ঐতিহাসিক দর্শন

এ সবের মধ্যে প্রথম মতবাদটি হচ্ছে হেগেলের, যা তিনি মানব ইতিহাসের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে উপস্থাপিত করেন। তার সারমর্ম এই যে, ইতিহাসের এক অধ্যায়ে মানবীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির যে ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে, তা তার যাবতীয় বিভাগ ও কাঠামোসহ কিছু বিশেষ চিন্তাধারার উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকে। তার ফলেই একটা সভ্য যুগের সৃষ্টি হয়। এ সভ্যতার যুগটি যখন পাকাপোক্ত হয়ে যায়, তখন তার দুর্বলতা প্রকাশ হতে থাকে এবং তার মুকাবিলায় কিছু নতুন চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটতে থাকে, যা বিরাজমান সভ্যতার সাথে দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এ সংঘাত-সংঘর্ষের ফলে এক নতুন সভ্যতা যুগের সূত্রপাত হয়। এর

মধ্যে পূর্ববর্তী সভ্যতা যুগের সদগুণাবলী রয়ে যায় এবং কিছু নতুন গুণাবলীও ঐসব চিন্তাধারার ভিতর থেকে আত্মপ্রকাশ করে যার আকস্মিক আক্রমণে পরাজিত হয়ে পূর্ববর্তী যুগের বিজয়ী চিন্তাধারা শেষ পর্যন্ত আপোস করতে বাধ্য হয়। অত:পর এ সভ্যতার যুগও পরিপক্কতা লাভ করার পর তার গর্ভ থেকেই কিছু বিপরীতমুখী চিন্তাধারার জন্ম নেয়। অতঃপর আবার দ্বন্দ্ব-সংঘাত শুরু হয় এবং উভয়ের মধ্যে এক সমঝোতার ভিত্তিতে এক তৃতীয় যুগের সূচনা হয়। এতে পূর্ববর্তী যুগের গুণাবলী নিজেদের মধ্যে ধারণ করে এবং সেই সাথে নতুন চিন্তাধারার আমদানীকৃত গুণাবলীও তার মধ্যে অভিনিবিষ্ট করা হয়।

এভাবে হেগেল মানবীয় সভ্যতার যে ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সাধারণতঃ তার দ্বারা মনের মধ্যে এ প্রভাব বদ্ধমূল হয় যে, অতীতে প্রতিটি সভ্যতার যুগ আপন আপন সময়ে নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতার কারণে শেষ হয়েছে এবং নিজেদের গুণাবলী প্রতিটি পরবর্তী যুগের জন্য ছেড়ে গেছে। অন্য কথায়, যে সভ্যতার যুগ আমরা অতিক্রম করছি তা যেন ঐসব উত্তম অংশাবলীর সারবস্তু, যা অতীত সভ্যতা যুগের মধ্যেও পাওয়া যেতো। ভবিষ্যত উন্নতির কোনো সম্ভাবনা থাকলে তা রয়েছে ঐসব নতুন চিন্তাধারায়, যা বর্তমান সভ্যতা যুগের বুনিয়াদী চিন্তাধারার সাথে দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের জন্যেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। অতীত যুগগুলোর মধ্যে এমন কিছু নেই, যার থেকে কোনো দিক-নির্দেশনা পাওয়া যেতে পারে, যার জন্যে পেছনে ফিরে দেখার কোনো প্রয়োজন আছে। কারণ তাদের যেসব অংশাবলী পরবর্তী যুগে সংশ্লিষ্ট করা হয়নি, সেগুলো পরীক্ষা করার পর ত্রুটিপূর্ণ বিবেচিত হওয়ায় পূর্বাহ্নেই তা পরিত্যক্ত হয়েছে। আমাদের ঐতিহাসিক রুচি-মানসিকতা তাদের কোনো জিনিসের যদি মর্যাদা দিতে চায় তাহলে এদিক দিয়ে দিতে পারে যে, তা আপন যুগে এক মর্যাদার বস্তু ছিলো এবং মানবীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশে সে তার স্বীয় ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু বর্তমান যুগে তা কোনো মর্যাদার যোগ্য নয় এবং ভ্রূক্ষেপযোগ্যও নয়। কারণ ইতিহাস তার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করে ফেলেছে।

এখন একটু চিন্তা করে দেখুন যে, এ প্রকৃতপক্ষে কোন্ ধরনের বিপজ্জনক দর্শন। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এ ধারণা যার মনের মধ্যে বদ্ধমূল হবে, আপনি কি আশা করতে পারেন যে, তার মনে এসব সভ্যতা যুগের প্রতি কোনো প্রকার শ্রদ্ধা বাকি থাকতে পারে, যেসব যুগে ইবরাহীম (আ.), মুসা (আ.) এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁদের জীবন অতিবাহিত করেছেন? সে কি কখনো নবী-যুগ এবং খেলাফতে রাশেদার শরণাপন্ন হবে কোনো হেদায়াত ও পথ-নির্দেশনার জন্যে? আসলে এ এমন এক যুক্তিপূর্ণ ও সুসংহত দার্শনিক মতবাদ, যা একবার

মানসপটে আঘাত হানলে সেখান থেকে দীন সম্পর্কিত চিন্তাধারার মূল উৎপাটিত হয়ে যাবে।[১]

ডারউইনের ক্রমবিকাশবাদ

উনবিংশ শতকে যে দার্শনিক মতবাদ মানুষের মন-মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, তা ছিলো ডারউইনের ক্রমবিকাশবাদ দর্শন। এখানে তার তাত্ত্বিক জীববিদ্যা সম্পর্কিত (biological) দিক আলোচনার বিষয় নয়। ডারউইনের যুক্তি-পদ্ধতি এবং তার পরিণামস্বরূপ যে সবং দার্শনিক চিন্তা-চেতনা বৃহত্তর সামাজিক চিন্তাধারার রূপ পরিগ্রহ করেছে, আমি শুধুমাত্র সেই দার্শনিক প্রভাব সম্পর্কেই কিছু আলোচনা করবো। সাধারণ মানুষের মন ডারউইনের বিবরণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিশ্ব-প্রকৃতি সম্পর্কে যে ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে তা ছিলো এই যে, এ বিশ্বজগত একটি সংগ্রামক্ষেত্র। জীবনের স্থিতিশীলতার জন্যে এখানে প্রতি মুহূর্তে চারদিকে এক চিরন্তন সংগ্রাম বিদ্যমান।

বিশ্ব-প্রকৃতির ব্যবস্থাটাই এমন এক ধরনের যে, এখানে কেউ তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চাইলে তাকে দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম ও প্রতিরোধ করতে হবে। এখানে বেঁচে থাকার জন্যে শক্তি ও ক্ষমতার প্রমাণ যে দিতে পারবে বাঁচার একমাত্র অধিকার তারই এটাই প্রকৃতির মেজাজ-প্রকৃতি হয়ে পড়েছে। এ নির্মম প্রাকৃতিক ব্যবস্থার অধীনে যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সে এই জন্যে ধ্বংস হয় যে, সে দুর্বল এবং তার ধ্বংস হওয়াই উচিত। যে টিকে থাকে, সে এ জন্যে টিকে থাকে যে, সে শক্তিমান এবং তার টিকে থাকাই উচিত। যমীন, তার পরিবেশ এবং তার জীবন যাপনের উপায়-উপাদান মোট কথা সব কিছুই শক্তিমানের অধিকারভুক্ত, যে জীবিত থাকার যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছে। এ সবের উপর দুর্বলের কোনো অধিকার নেই। শক্তিমানের জন্যে তাকে স্থান করে দিতে হবে। শক্তিমান যদি দুর্বলকে সরিয়ে অথবা নির্মূল করে তার স্থান দখল করে, তাহলে সে সত্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত বলতে হবে।

চিন্তা করুন, বিশ্ব-প্রকৃতি সম্পর্কে এরূপ ধারণা যদি হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় এবং প্রকৃতির ব্যবস্থাকে যদি সে দৃষ্টিতেই দেখা হতে থাকে, তাহলে মানুষ মানুষের জন্যে কতো ভয়াবহ হয়ে পড়বে। এ জীবনদর্শনে সহানুভূতি, ভালোবাসা অনুগ্রহ, অনুকম্পা, ত্যাগ এবং এ ধরনের অন্যান্য মহান মানবীয় ভাবধারার কোনো স্থান হতে পারে কি? এতে ইনসাফ ও সুবিচার, বিশ্বস্ততা ও

---

১. এখানে এ ইতিহাসের দর্শন খণ্ডন করার কোনো সুযোগ নেই। এর ত্রুটি-বিচ্যুতি যদি কেউ উপলব্ধি করতে চান, তাহলে তাফহীমাত ২য় খণ্ড এবং তাফহীমুল কুরআনের সূরা মায়েদার ৩৫ নং টীকা পড়ে দেখতে পারেন।

বিশ্বাসপরায়নতা, সততা ও সত্যবাদিতার কোনো অবকাশ থাকতে পারে কি? এখানে অধিকার বলতে তা বুঝায় না, যা একজন দুর্বল লাভ করতে পারে। এখানে জুলুম এ অর্থে ব্যবহৃত হয় না, যার জন্যে কখনো শক্তিধরকে অপরাধী ঠাওরানো যেতে পারে। লড়াই-ঝগড়া মানুষ অতীতেও করেছে। কিন্তু তাকে ফেৎনা-ফাসাদ মনে করা হতো। কিন্তু এখন এ একেবারে প্রকৃতির দাবিতে পরিণত হয়েছে। কারণ বিশ্ব-প্রকৃতি তো একটি রণক্ষত্র বৈ কিছু নয়। জুলুম অতীতেও দুনিয়ায় হতো। কিন্তু পূর্বে তা জুলুমই ছিলো। কিন্তু এখন তার জন্যে এ যুক্তি পাওয়া গেছে যে, এ হচ্ছে শক্তিমানের অধিকার। এ দর্শনের ফলে ইউরোপ অন্যান্য জাতির উপর যে সব জুলুম করেছে, তার জন্যে তারা এক মজবুত যুক্তি পেয়ে গেছে। তারা যদি আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের নির্মূল করে থাকে এবং দুর্বল জাতিগুলোকে তাদের গোলাম বানিয়ে থাকে, তাহলে এ যেন তাদের অধিকার ছিলো, যা তারা প্রকৃতির আইন অনুযায়ীই লাভ করেছে। যারা নির্মূল হয়েছে তারা নির্মূল হওয়ারই যোগ্য ছিলো এবং তাদের স্থান যারা অধিকার করেছে, তাদের এটা করারই অধিকার ছিলো। এ সম্পর্কে পাশ্চাত্যবাসীর মনে এ যাবত যদি কোনো দ্বিধা-সংকোচ থেকেও থাকে, ডারউইনের দর্শনের অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ তা দূর করে দিয়েছে। বিজ্ঞানে এ মতবাদটির মর্যাদা যাই হোক না কেন[১] সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতির অঙ্গনে এ মানুষকে মানুষের জন্যে হিংস্র পশুতে পরিণত করেছে।

মার্কসের বস্তুবাদী ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা

ডারউইনের সমকালে তাঁর দর্শনের অনুরূপ আর একটি দর্শন জন্মলাভ করে মার্কসের বস্তুবাদী ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার গর্ভ থেকে। তার খুঁটিনাটি বিবরণ ও যুক্তিতর্কের আলোচনা আমি এখানে করতে চাই না।[২] তার বুদ্ধিবৃত্তিক দিকেরও সমালোচনা করতে চাই না। আমি এখানে শুধু এতোটুকু বলতে চাই যে, মার্কস মানুষের মনে দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে সে ধারণাই সৃষ্টি করেছেন, যা ইত:পূর্বে হেগেল এবং ডারউইন করেছেন। হেগেল চিন্তার জগতকে একটি রণক্ষেত্র বলে পেশ করেন। ডারউইন বিশ্বজগত ও প্রকৃতির ব্যবস্থাকে যুদ্ধক্ষেত্র বানিয়ে দিয়েছেন। মার্কস স্বয়ং মানব সমাজেরই সে চিত্র বানিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। এ দৃশ্যপটে আমরা মানুষকে আবহমানকাল থেকে সংগ্রামরত দেখতে পাই। তার স্বভাব-প্রকৃতির দাবিই এই যে, সে তার আপন সুযোগ সুবিধা ও স্বার্থের জন্যেই স্বজাতির সাথে সংগ্রাম করবে। মানুষ শুধু ব্যক্তি স্বার্থের জন্যেই বিভিন্ন শ্রেণীতে

---

১. এর বুদ্ধিবৃত্তিক দিকটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে আমার তাফহীমাত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে-গ্রন্থকার।

২. এ দর্শনের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করা হয়েছে আমার তাফহীমাত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে-গ্রন্থকার।

বিভক্ত হয়ে পড়েছে। শুধু আপন স্বার্থের জন্যেই এ সব শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ চলে আসছে। মানব ইতিহাসের যাবতীয় ক্রমবিকাশ এ স্বার্থ ভিত্তিক শ্রেণী সংগ্রামের বদৌলতেই হয়েছে। জাতিগুলোর মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ তো দূরের কথা, একই জাতির বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাতের যে চিত্র আমরা পাই, তা প্রকৃতির দাবি বলেই দেখতে পাওয়া যায়। আমরা দেখতে পাই যে, মানুষের যদি কোনো সম্পর্ক থেকে থাকে, তাহলে সে সম্পর্ক স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধা ভোগের ঐক্য ব্যতীত আর কিছুই নয়। যাদের দ্বারা অর্থনৈতিক স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটবে, স্বার্থের ভিত্তিতে সমস্বার্থের লোকদের সাথে মিলিত ও একমত হয়ে তাদের সাথে লড়াই করা একেবারে ন্যায়সংগত তারা হোক না স্বজাতীয় অথবা স্বধর্মীয়। এ লড়াই করা নয়, বরঞ্চ না করাটাই প্রকৃতির পরিপন্থী।

চরিত্র

এটাই হলো সে দর্শন, আকীদা বিশ্বাস ও চিন্তাধারা, যা বিজয়ী সভ্যতার সাথে এসে আমাদের উপরে চেপে বসেছে। এখন দেখুন বহিরাগতদের সাথে নৈতিক চরিত্রের ব্যাপারে কোন্ ধরনের মতবাদ ও কর্ম পদ্ধতি আমাদের দেশে এসেছে।

আল্লাহ ও আখেরাতকে উপেক্ষা করার পর নৈতিকতার জন্যে বৈষয়িক ও পার্থিব মূল্যবোধ ব্যতীত কোনো মূল্যবোধ এবং পরীক্ষামূলক বুনিয়াদ ব্যতীত কোনো বুনিয়াদ আর বাকি থাকে না। এ ব্যাপারে যদি কেউ মনে করে যে, ধর্ম যে নৈতিক মূল্যবোধ দান করেছে, তা ধর্ম ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর ভিত্তিতে কায়েম থাকবে এবং আম্বিয়া (আ.) থেকে যে চারিত্রিক মূলনীতি মানুষ শিক্ষা লাভ করেছে তা ঈমান ব্যতিরেকে অন্য কিছুকে অবলম্বন করে মানব জীবনে চলতে থাকবে, তাহলে তা কিছুতেই সম্ভব হবে না। এ জন্যে পাশ্চাত্যবাসীদের মধ্যে যিনিই এ চেষ্টা করেছেন, তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। ধর্মহীনতা ও আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসজনিত পরিবেশে বাস্তবে যে নৈতিক দর্শন বিকাশ লাভ করেছে এবং কার্যত: পাশ্চাত্যবাসীদের জীবনে যা প্রচলিত হয়েছে, তা হচ্ছে উপযোগবাদ দর্শন (utilitarianism) তার সাথে মিশ্রিত হয়েছে ভোগবাদের (epicureanism) সরল বস্তুবাদী ভাবধারা। এর উপরেই পাশ্চাত্যের গোটা তামাদ্দুন এবং জীবনের সমগ্র কর্মকাণ্ডের ভিত্তি রচনা করা হয়েছে। বই পুস্তকে উপযোগবাদ ও ভোগবাদের যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তা যাই হোক না কেন, পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং স্বভাব চরিত্রে তার যে সারমর্ম প্রতিফলিত হয়েছে তা এই যে, যে জিনিসের দ্বারা আমার নিজের কোনো উপকার ও সুযোগ সুবিধা লাভ হবে, তাই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ অথবা আমার ব্যক্তিসত্তার ধারণাকে প্রসারিত করলেই সে সুযোগ সুবিধা আমার জাতির হবে। এখানে সুযোগ সুবিধা বলতে তা পার্থিব সুযোগ সুবিধা কোনো আরাম আয়েশ, কোনো ভোগ সম্ভোগ

অথবা কোনো বৈষয়িক উপকারিতা। যে বস্তুর সাহায্যে এ ধরনের কোনো সুযোগ সুবিধা আমার হোক অথবা আমার জাতির, তা পুণ্য কাজ, মর্যাদার যোগ্য, বাঞ্ছিত ও অভীষ্ট। তার জন্যেই সকল চেষ্টা চরিত্র নিয়োজিত করা যেতে পারে। এমনটি যা নয়, যার থেকে এ দুনিয়ায় আমার জন্যে অথবা আমার জাতির জন্যে অনুভূত ও পরিমাপযোগ্য কোনো উপকার বা মঙ্গলকারিতা লাভ করা যায় না, তা ভ্রুক্ষেপযোগ্য নয়। পক্ষান্তরে যা কিছু পার্থিব দিক দিয়ে ক্ষতিকর, অথবা যা পার্থিব সুযোগ-সুবিধা ও ভোগ-সম্ভোগ থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে, তাই অসৎ কাজ ও পাপ। তার থেকে দূরে থাকা অপরিহার্য।

এ নৈতিক দর্শনে ভালো ও মন্দের কোনো স্থায়ী মানদণ্ড নেই। স্বভাব-চরিত্র ও আচার-আচরণের সৌন্দর্য ও কদর্যতার কোনো স্থায়ী মূলনীতি নেই। প্রতিটি বস্তু আপেক্ষিক, অস্থায়ী ও সাময়িক। ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বার্থের জন্যে যে কোনো মূলনীতি প্রণয়ন করা যায় এবং ভঙ্গ করা যায়। উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে নিকৃষ্টতম পন্থা অবলম্বন করা যায়। সুযোগ-সুবিধা ও ভোগ-সম্ভোগের জন্যে যে কোনো পন্থা অবলম্বন করা যায়। আজ যা কিছু ভালো আগামীকাল তা মন্দ হতে পারে। সত্য ও মিথ্যার মানদণ্ড এক এক জনের জন্যে এক এক ধরনের। হালাল ও হারামের মধ্যে যে চিরন্তন পার্থক্য, যা মেনে চলা দরকার এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে যে স্থায়ী পার্থক্য, যার কোনো পরিবর্তন হয় না, এসব এমন ধারণা যা সেকেলে এবং অপ্রচলিত (out-dated)। উন্নতির অগ্রযাত্রা তাকে বহু পশ্চাতে ফেলে এসেছে।

রাজনীতি

যে নীতি-নৈতিকতার ধারণাসহ বিজয়ী সভ্যতা তার পরাক্রম সহকারে এদেশে আগমন করে আমাদের শাসক হয়ে বসলো, তা উল্লেখ করা হলো। এখন সে রাজনৈতিক ব্যবস্থার কথা বলবো, যা এখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং পাশ্চাত্যের প্রভুদের নির্দেশে যার উন্নতি ও বিকাশ লাভ ঘটে। তিনটি মূলনীতির উপর তার বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ তথা ধর্মহীনতা, জাতীয়তাবাদ তথা জাতিপূজা এবং গণতন্ত্র তথা জনগণের সার্বভৌমত্ব। প্রথম মূলনীতির মর্ম এই যে, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্রিয়াকর্মের সাথে ধর্ম, খোদা ও তার শিক্ষার কোনো সম্পর্ক নেই। দুনিয়াবাসী দুনিয়ার বিষয়াদি স্বয়ং নিজের বিবেক-বিবেচনা অনুযায়ী পরিচালনা করার অধিকারী। যেভাবে খুশি তা পরিচালনা করবে এবং তার জন্যে যে মুলনীতি, আইন, মতবাদ ও পদ্ধতি ভালো মনে করবে, তা বানাবে। খোদার এসব ব্যাপারে না বলার কোনো অধিকার আছে আর না আমাদের তাঁকে একথা জিজ্ঞেস করার কোনো প্রয়োজন আছে যে, তিনি কি পছন্দ করেন এবং কি পছন্দ করে না। অবশ্যি কোনো বিরাট বিপদের পাহাড়

যদি আমাদের উপর ভেঙে পড়ে, তাহলে এটা ধর্মনিরপেক্ষতার পরিপন্থী হবে না বিপদের সময় সাহায্যের জন্যে তাঁর কাছে কাকুতি-মিনতি করায়। এ অবস্থায় আমাদের সাহায্য করা আল্লাহর কর্তব্য হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় মূলনীতির মর্ম এই যে, যে স্থান থেকে খোদাকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে সেখানে জাতিকে সমাসীন করা। জাতিকেই দেবতার আসনে বসানো হয়। জাতির স্বার্থই হয়ে পড়ে ভালো ও মন্দের মানদণ্ড। জাতিরই উন্নতি এবং তার মর্যাদা ও অপরের উপরে তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠাই হয়ে পড়ে বাঞ্ছিত ও অভীষ্ট। জাতির জন্যে জনগোষ্ঠীর ত্যাগ ও কুরবানী ন্যায়সঙ্গত হয় এবং অপরিহার্যও হয়। সেই সাথে বহিরাগত প্রভুগণ জাতীয়তাবাদের যে ধারণা আমদানি করেছেন, তা ধর্মহীন ও দেশভিত্তিক জাতীয়তার ধারণা। তার সাথে মিশ্রিত হয়ে জাতীয়তাবাদ তথা জাতি-পূজার ধারণা অন্তত আমাদের জন্যে তো একবারে হলাহল স্বরূপ হয়ে পড়েছে। কারণ যে দেশের অধিবাসীর তিন-চতুর্থাংশ অমুসলিম, সেখানে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদের সুস্পষ্ট দু'টি অর্থ হতে পারে। হয় আমরা সহজভাবে নয়, বরঞ্চ এক ভাবাবেগে অমুসলমান হয়ে যাব, অথবা জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিতে কাফের তথা দেশদ্রোহী বলে অভিহিত হবো।

তৃতীয় মূলনীতির মর্ম এই যে, জাতীয় রাষ্ট্রে যে স্থান থেকে ধর্মকে বেদখল করা হয়েছে, সেখানে জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতকে তার স্থানভিত্তিক বানানো হবে। ধর্মকে পাশ কাটিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ যাকে সত্য বলবে, তাই সত্য এবং যাকে মিথ্যা বলবে, তাই মিথ্যা হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠের তৈরি মূলনীতি, আইন ও নিয়ম-পদ্ধতি জাতির দীন তথা জীবন ব্যবস্থা হয়ে পড়বে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠই শুধু এ জীবন ব্যবস্থার রদবদল করতে পারবে।

বিজয়ী সভ্যতার প্রভাব

উপরে বর্ণিত এ ছিলো রাজনীতি-নৈতিকতা, দর্শন এবং ধর্ম সম্পর্কে ধারণা, যা আমাদের ইতিহাসের এক কলঙ্কময় পর্যায়ে বাইরে থেকে আমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। সে সময়ে আমরা যে সব দুর্বলতার শিকার হয়ে পড়েছিলাম, তা আপনারা ইত:পূর্বে শুনেছেন। এসব লোক যে সভ্যতা আমদানী করেছিল তার চিত্রও আপনাদের সামনে পেশ করেছি। এ কথা পরিষ্কার যে, মুষ্টিমেয় ভ্রমণকারী অথবা পর্যটক এ সভ্যতা এখানে নিয়ে আসেনি। এ সভ্যতা ছিলো তাদের, যারা এখানে শাসকের বেশে এসেছিল। এদেশের সামগ্রিক জীবনের উপর তাদের এমন প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা ইত:পূর্বে কোনো শাসকের হয়নি। এদেশের অধিবাসীদের উপর তাদের যতোটা মানসিক

ও বৈষয়িক প্রভাব পড়েছিল, ততোটা আর কারো পড়েনি। প্রচার ও শিক্ষা বিস্তারের প্রচুর উপায়-উপাদান তাদের হাতে ছিলো। আইন-আদালতের মজবুত হাতিয়ারও তাদের হাতে ছিলো। সেই সাথে জীবিকার্জনের সকল চাবিকাঠিও তাদের শাসন-কর্তৃত্বের অধীন ছিলো। এসব কারণে তাদের সভ্যতা আমাদের উপর সার্বিক প্রভাব বিস্তার করেছিল, যার থেকে আমাদের জীবনের কোনো একটি বিভাগও মুক্ত থাকতে পারেনি।

শিক্ষার প্রভাব

তারা তাদের শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল এবং জীবিকা অর্জনের চাবিকাঠি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দরজায় লটকিয়ে দেয়া হয়েছিল। তার অর্থ এই যে, এখন জীবিকা তারাই পাবে, যারা এ শিক্ষালাভ করবে। এই চাপে পড়ে আমাদের প্রতিটি বংশধর পূর্বাপেক্ষা অধিকতর উৎসাহ-উদ্যম সহকারে এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এখানে তারা ঐ সব মতবাদ ও কর্মকাণ্ড শিক্ষা লাভ করে, যার মূল ভাবধারা ও বাহ্যিক কাঠামো আমাদের সভ্যতার একেবারে বিপরীত। যদিও তারা আমাদের লাখের মধ্যে একজনকেও প্রকাশ্যভাবে কাফের বানাতে পারেনি, কিন্তু চিন্তা, মতবাদ, রুচি ও মননশীলতা, স্বভাব-চরিত্র ও আচার-আচরণে সম্ভবত শতকরা দু'জনকেও সত্যিকার মুসলমান থাকতে দেয়নি। এ ছিলো সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি, যা তারা আমাদের করেছে। কারণ, তারা আমাদের মন-মস্তিষ্কে আমাদের সভ্যতার শিকড় বিনষ্ট করে তথায় এক বিপরীত সভ্যতার শিকড় লাগিয়ে দিয়েছে।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রভাব

তারা তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তাদের অর্থনৈতিক দর্শন ও মতবাদসহ আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। ফলে জীবন-জীবিকার দুয়ার তাদের জন্যেই উন্মুক্ত হয়েছে, যারা এ অর্থব্যবস্থার মূলনীতি মেনে নিয়েছে। এ ব্যবস্থা প্রথমে আমাদেরকে হারামখোর বানিয়েছে। অত:পর ক্রমশ আমাদের মন থেকে হালাল ও হারামের পার্থক্য মিটিয়ে দিয়েছে। তারপর অবস্থার এতোটা অবনতি ঘটিয়েছে যে, যে ইসলামের শিক্ষা পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কর্তৃক ঘোষিত হালালকে হারাম বলে, আমাদের মধ্যে থেকে বিপুল সংখ্যক লোক সে শিক্ষার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে।

আইনের প্রভাব

তারা তাদের আইন আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। এর দ্বারা তারা আমাদের তামাদ্দুনিক ও সামাজিক ব্যবস্থার রূপ-কাঠামোই শুধু পরিবর্তন করে দেয়নি, বরং আমাদের সামাজিক ধারণা, মতবাদ এবং আইন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি

বহুলাংশে পরিবর্তন করে দিয়েছে। আইন সম্পর্কে যিনি কিছুটা জ্ঞান রাখেন তিনি জানেন যে, চরিত্র ও সমাজের সাথে এর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। মানুষ যখন কোনো আইন রচনা করে, তার পশ্চাতে চরিত্র, সমাজ ও সংস্কৃতির এক বিশেষ রূপরেখা থাকে যার উপর সে মানব জীবনকে ঢেলে সাজাতে চায়। এভাবে যখন সে কোনো আইন বাতিল করে, তখন তার অর্থ এই হয় যে, সে সেই নৈতিক মতবাদ ও তামাদ্দুনিক দর্শনকেই বাতিল করে দেয়, যার উপর তার পূবের্র আইন রচিত হয়েছিল। অতএব, আমাদের ইংরেজ শাসকগণ এখানে এসে যখন এদেশের প্রচলিত সকল শরীয়তের আইন রহিত করে, সে স্থলে নিজেদের আইন প্রবর্তন করে, তখন তার অর্থ শুধু এ ছিলো না যে, একটি আইনের স্থলে অন্য আইন প্রবর্তিত হলো, বরং তার অর্থ এই যে, একটি নৈতিক ও তামাদ্দুনিক ব্যবস্থা রহিত করে সে জায়গায় অন্য একটি নৈতিক ও তামাদ্দুনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হলো। এ পরিবর্তনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে তারা এখানকার আইন কলেজগুলোতে নিজস্ব আইন শিক্ষা চালু করলো। এ শিক্ষা মনের মধ্যে এ ধারণা সৃষ্টি করলো যে, পূর্ববর্তী আইন ছিলো সেকেলে, জরাজীর্ণ এবং আধুনিক যুগ-সমাজের জন্যে মোটেই উপযোগী নয়। এ নতুন আইন-পদ্ধতি প্রণয়ন তার মূলনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে অধিকতর সঠিক এবং অধিকতর উন্নত। শুধু তাই নয়, বরং আইন প্রণয়নের অধিকার একমাত্র যে আল্লাহ তা'লার আমাদের এ বুনিয়াদী আকীদাহ-বিশ্বাসকেও তারা ভেঙে দিয়েছে। তারা লোকের মনে এ কথা বদ্ধমূল করে দেয় যে, আল্লাহর এ ব্যাপারে করার কিছু নেই এ কাজ আইনসভার। সে যাকে খুশি ফরয, ওয়াজেব অথবা হালাল নির্ধারিত করবে, এবং যাকে খুশি তাকে অপরাধ অথবা হারাম গণ্য করবে। অত:পর এসব আইন আমাদের চরিত্র ও তামাদ্দুনের উপর যে কতোটা প্রভাব বিস্তার করেছে, তা অনুমান করতে এতোটুকুই যথেষ্ট হবে যে, এসব আইনই ব্যভিচার, জুয়া, মদ এবং অনেক অবৈধ জিনিসকে হালাল করে দিয়েছে। এসব আইনের ছত্রছায়ায় আমাদের এখানে বিভিন্ন ধরনের অশ্লীল ক্রিয়া-কর্ম ও পাপাচার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আইনের সমর্থন থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে বহু সৎগুণাবলী নির্মূল হতে থাকে, যা পতনযুগ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলো। কিন্তু পরিস্থিতি আমাদের ধর্মীয় অনুভূতিকে এতোটা নিস্তেজ করে ফেলেছে যে, আমাদের বড়ো বড়ো ধার্মিক ও খোদাভীরু লোক পর্যন্ত এ আইন ব্যবস্থার অধীন ওকালতি করা এবং বিচারকের পদে চাকুরী করাকে দূষণীয় মনে করেন না। বরং অবস্থা এই হয়েছে যে, যারা এ সব আইনের মুকাবিলায় হুকুম-শাসন একমাত্র আল্লাহর এ মূলনীতি পুনর্জীবিত করতে চাইলো, তাদেরকে 'খারেজী' নামে অভিহিত করা হলো।

চরিত্র ও সমাজ ব্যবস্থার প্রভাব

শাসকগণ তাদের চারিত্রিক দোষত্রুটি এবং সামাজিক রীতি-পদ্ধতি আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়। এভাবে চাপিয়ে দেয় যে, চরিত্র ও সামাজিকতার ক্ষেত্রে তাদের সমমনা যারা ছিলো, তারাই তাদের নৈকট্য লাভের ও সম্মান-শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে পড়লো। এটাই তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি, আর্থিক সাচ্ছল্য এবং বৈষয়িক উন্নতির নিশ্চয়তা দান করলো। এজন্যে ক্রমশ আমাদের উচ্চশ্রেণী এবং তারপর মধ্যবিত্ত শ্রেণী শাসকদের রঙে নিজেদেরকে রঞ্জিত করতে লাগলো। অবশেষে ছায়াছবি, সিনেমা, রেডিও এবং নেতৃস্থানীয় লোকদের জীবন্ত দৃষ্টান্ত মারাত্মক ব্যাধির আকারে জনগণের মধ্যে বিস্তার লাভ করতে থাকলো। এরই পরিণামে এক শতাব্দীর মধ্যেই আমাদের এতোখানি অধ:পতন হলো যে, এখন সহশিক্ষার প্রচলন মেনে নেয়া হচ্ছে, সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা নাচ, গান ও মদ্যপানে লিপ্ত হচ্ছে, চিত্র-তারকা ও অভিনেত্রী সেজে এমন নির্লজ্জতা প্রদর্শন করা হচ্ছে, যা আমাদের দেশের বারাঙ্গনারা করতেও লজ্জা পেতো। হাজার হাজার লোকের সমাবেশে নিজেদের ভগ্নি ও মেয়েদের প্যারেড করতে দেখে তাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়। সে অবস্থা বেশি দূরে নয়, যখন আমাদের মধ্য থেকে পাশ্চাত্যবাসীদের মতো এ প্রশ্ন উত্থাপিত হবে যে, কুমারী মাতা এবং অবৈধ সন্তানে দোষটা কোথায়? সমাজে কেন তাদেরকে বিবাহিতা মাতার এবং বৈধ সন্তানের মর্যাদা দেয়া যাবে না? পাশ্চাত্যবাসীও একদিনে অধ:পতনের এ চরম পর্যায়ে পৌছেছিল না। যেসব পর্যায় অতিক্রম করে আমরা চলছি তারাও তাই চলছিল।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রভাব

তারা তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক মতবাদ ও প্রতিষ্ঠান আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়, যা আমাদের দীন ও দুনিয়ার জন্যে অন্যান্য বিষয় থেকে কম মারাত্মক প্রমাণিত হয়নি। তাদের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ আমাদের দীন সম্পর্কিত ধারণার শিকড় বিনষ্ট করে দিয়েছে। তাদের জাতীয়তাবাদ এবং গণতন্ত্র ক্রমাগত এক শতাব্দী যাবত আমাদেরকে এতোটা নিষ্পেষিত করেছে যে, শেষ পর্যন্ত আমাদের জাতির অধীনের নিয়মে লক্ষ লক্ষ জীবন কুরবানী করে এবং অগণিত নারীর সম্ভ্রম-সতীত্ব বিসর্জন দিয়ে তাদের স্বৈরশাসনের যাঁতাকল থেকে জাতির শুধু অর্ধাংশকে রক্ষা করার জন্যে আমাদেরকে তৈরি হতে হয়েছে। এ সব নির্মম নির্বোধেরা এক মুহূর্তের জন্যেও একথা চিন্তা করে দেখেনি যে, ভারতের মুসলমান, হিন্দু, শিখ ও অচ্ছ্যুৎ মিলে নতুন রাজনৈতিক অর্থে কি করে এক জাতি হতে পারে। যার মধ্যে গণতন্ত্রের এ মূলনীতি কার্যকর হতে পারে যে, জাতির সংখ্যাগুরু আইন প্রণেতাও শাসক হবে এবং সংখ্যালঘু জনমত গঠন করে

সংখ্যাগুরু হবার চেষ্টা করবে। তারা কখনো একথা বুঝবার চেষ্টা করেনি যে, এখানকার সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু প্রকৃতপক্ষে জাতীয় সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু, নিছক রাজনৈতিক নয়। তাদের উপর পঁয়ত্রিশ কোটি মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যতের দায়িত্ব অর্পিত হলো। কিন্তু তারা একথা উপলব্ধি করার জন্যে এক মুহূর্তও ব্যয় করেনি যে এ সব বিভিন্ন জাতির সমষ্টিকে এক জাতি মনে করে এখানে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র কায়েমের অর্থ এ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না যে, তাদের মধ্যে একটি বিপুল সংখ্যাগুরু জাতি অন্যান্য জাতির ধর্ম, সভ্যতা ও জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বলপূর্বক নির্মূল করে দেবে। তারা চোখ বন্ধ করে তাদের নিজস্ব মূলনীতি, মতবাদ ও বাস্তব কর্ম-পদ্ধতি একটি সম্পূর্ণ বিপরীত পরিবেশে চাপিয়ে দিতে থাকে। ভারতের প্রতিটি গ্রাম-গঞ্জ যুগ যুগ ধরে মজলুমের খুন এবং লোমহর্ষক সংঘাত-সংঘর্ষের জন্যে বিলাপ করে করে একথাই বলছিল যে, এ একেবারে একটি ভ্রান্ত ব্যবস্থা, যা এখানকার অধিবাসীদের মেজাজ-প্রকৃতির বিরুদ্ধে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এর প্রতি কোনো কর্ণপাত কেউ করেনি। একই প্রাচীরের দু'পাশের প্রতিবেশী একে অপরের রক্ত-পিপাসু হয়ে পড়ে। কিন্তু তারা তাদের পলিসি পুনর্বিবেচনা করার প্রয়োজনবোধ করেনি। অবশেষে অবস্থা যখন এই দাঁড়ালো যে, দেশ বিভক্তি ব্যতীত অন্য কোনো উপায় নেই, তখন তারা এমন পদ্ধতিতে বিভক্ত করে বিদায় গ্রহণ করলো, যার ফলে খুনের দরিয়া এবং মৃত লাশের পাহাড় ভারত ও পাকিস্তানের সীমান্তের রূপ ধারণ করলো। এ বিভাগের অতীতের বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসা হওয়ার পরিবর্তে নতুন নতুন বিবাদের ভিত্তি রচিত হলো। জানি না, এসব বিবাদ কতোকাল এ উপমহাদেশের লোকদেরকে পারস্পরিক শত্রুতা ও সংঘাত-সংঘর্ষে লিপ্ত রাখবে।

অবশ্যি আমি স্বীকার করি যে, এ বহিরাগত শাসকগণ কিছু ভালো কাজও করেছেন। তাদের বদৌলতে এখানে যে বৈষয়িক উন্নতি সাধিত হয়েছে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কল্যাণকর দিকগুলো থেকে আমরা যে উপকৃত হয়েছি, তার গুরুত্ব আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু তাদের শাসন-কর্তৃত্বের দরুন আমাদের যে অগণিত নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক ক্ষতি হয়েছে, তার সাথে ওসব কল্যাণের কোনো তুলনা হয় কি?

আমাদের প্রতিক্রিয়া

এখন আমাদের পর্যালোচনা করে দেখতে হবে এ বিজয়ী সভ্যতার আগ্রাসনে আমাদের মধ্যে কি কি আকারে প্রতিক্রিয়া হয় এবং আজ তার কি ভালো ও মন্দ প্রতিক্রিয়া আমাদের জাতীয় জীবনে দেখতে পাই।

সামগ্রিকভাবে আমাদের এখানে এ সভ্যতার মুকাবিলায় দু'টি বিপরীত-মুখী প্রতিক্রিয়া হয়েছে, যার গভীর প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে এবং হচ্ছে। প্রথমে আমি এ দুটোর পৃথক পৃথক পর্যালোচনা পেশ করবো এবং পরিণাম ফলও সামনে রাখবো।

অপ্রতিরোধী প্রতিক্রিয়া (passive reaction)

আমাদের মধ্যে এক শ্রেণীর প্রতিক্রিয়া এই ছিলো যে, এ শক্তিশালী ও উন্নত জাতি যেহেতু আমাদের শাসক হয়ে পড়েছে, সে জন্যে তাদের সকল প্রভাব গ্রহণ করা উচিত। তাদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে জ্ঞান লাভ করা, তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করা এবং তাদের আইন-কানুন মেনে নেয়া উচিত। তাদের উপস্থাপিত সমাজ ব্যবস্থার রঙে নিজেদের রঞ্জিত করা এবং তারা যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করছে, তাও মেনে নেয়া উচিত।

এ প্রতিক্রিয়ার মধ্যে প্রথম থেকেই ভীতি ও পরাজয়ের মনোভাব বিদ্যমান ছিলো। এর মূলে এ ধারণাই ছিলো যে, পরাজিত ও শাসনাধীন হওয়ার পর প্রতিরোধ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। তা করলে ক্ষতিরই সম্মুখীন হতে হবে। অতএব, এ ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই যে, নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন-জীবিকা ও উন্নতির যে সব সুযোগ এসেছে, তা গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু এ যুক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমাদের মধ্যে যারা এ পথে চলা শুরু করলো, তাদের প্রথম বংশধরদের মধ্যে সে সব ক্ষতি ও অকল্যাণ সুস্পষ্ট হতে থাকলো, যা একটি বিপরীতমুখী সভ্যতার মুকাবিলায় নতি স্বীকারের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে কোনো জাতির হয়ে থাকে। অত:পর পরবর্তী বংশধর পূর্ববর্তী বংশধর থেকে অধিকতর ক্ষতির সম্মুখীন হতে থাকলো। অত:পর মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোক ব্যতীত সমগ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণী এ সংক্রামক ব্যাধির শিকার হয়ে পড়লো এবং বড়দের অনুকরণে জনসাধারণের মধ্যে এ বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়লো।

ধর্ম সম্পর্কে পাশ্চাত্যবাসীদের যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো আমাদের নব্য শিক্ষিত শ্রেণীর অধিকাংশই তা হুবহু গ্রহণ করলো। তারা একথা পর্যন্ত অনুভব করলো না যে, পাশ্চাত্যবাসী ধর্মের জ্ঞান ইসলাম থেকে গ্রহণ করেনি, করেছিল খৃস্টবাদ ও গির্জার কর্তৃপক্ষদের প্রতিবাদে ধর্ম ও তৎসংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে যে চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল আমাদের নব্য শিক্ষিত দল তাই গ্রহণ করলো। তারা মনে করছিল ইসলাম ও তার প্রতিটি বস্তু সন্দেহ-সংশয়ের যোগ্য। তার জন্যে দলীল-প্রশানেরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু পাশ্চাত্যের কোনো দার্শনিক, বিজ্ঞানী অথবা দক্ষ সমাজ বিজ্ঞানী শিক্ষার নামে যা কিছু পেশ করেছেন তার জন্যে যুক্তি-প্রমাণের কোনো প্রয়োজন নেই। তারা পাশ্চাত্যের এ ধারণা বিনা দ্বিধায় মেনে নেয় যে, ধর্ম একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং সামষ্টিক সামাজিক

জীবনের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এ ধারণা তাদের মনে এমনভাবে বদ্ধমূল হয়েছে যে, আজ তারা না বুঝেই বহুল প্রচলিত "ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান" কথাটি বার বার আওড়ায়, তারাও সর্বদা তাদের কর্মপদ্ধতির দ্বারা এ কথা প্রমাণ করে যে, ইসলাম শুধু একটি ব্যক্তিগত ধর্ম– সমাজ জীবন সম্পর্কে তার কাছে পথ নির্দেশনা গ্রহণের কোনো প্রয়োজন নেই। বলতে গেলে তাদের অনেকের জন্যে ইসলাম একটি 'ব্যক্তিগত ধর্মও' আর থাকেনি। কারণ ইসলামের শুধু স্বীকৃতি এবং খাৎনা ও বিয়ে-শাদীতে ইসলামের অনুসরণ ছাড়া তাদের ব্যক্তি-জীবনে ইসলামের কোনো নৈতিক অথবা বাস্তব ক্রিয়াকলাপের কোনো চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় না। তাদের মধ্যে আবার যাদের ধর্মের প্রতি কিছু অনুরাগ রয়ে গিয়েছিল অথবা পরে সৃষ্টি হয়েছিল, তাদের অনেকেই এ পন্থা অবলম্বন করলো যে, পাশ্চাত্য এবং তার দর্শন, মতবাদ ও কর্মনীতিকে সত্যের মানদণ্ড মেনে নিয়ে ইসলাম, তার আকীদাহ-বিশ্বাস, তার জীবন-ব্যবস্থা এবং ইতিহাসকে তারা মেরামত করা শুরু করলো। সেই সাথে এ চেষ্টাও করতে থাকলো যাতে করে ইসলামের প্রতিটি জিনিসকে ঐ মানদণ্ডেই ঢেলে সাজানো যায়। যা ঢেলে সাজানো যাবে না তাকে ইসলামের রেকর্ড থেকে মুছে ফেলতে হবে। আর তাও করতে না পারলে দুনিয়ার কাছে দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চাইতে হবে।

তাদের বিপুল সংখ্যক লোক পাশ্চাত্যের জীবন-দর্শন এবং তার সভ্যতার দার্শনিক বুনিয়াদকে হুবহু গ্রহণ করেছে, তার কোনো সমালোচনা-পর্যালোচনার প্রয়োজন বোধ করেনি। যে শিক্ষা তাদেরকে প্রাথমিক পর্যায় থেকে শেষ পর্যন্ত মাদ্রাসা ও কলেজগুলোতে দেয়া হয়েছিল, এ ছিলো তারই অনিবার্য পরিণাম ফল। ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি, আইন এবং অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান তারা যে পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করেছিল, তার থেকে সেই মানসিকতাই তৈরি হতে পারতো, যা ছিলো তাদের পশ্চিমা শিক্ষকদের। দুনিয়া ও তার জীবন সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিকোণ তাই হওয়া সম্ভব ছিলো, যা ছিলো পাশ্চাত্যবাসীদের। আল্লাহ ও আখেরাতকে অবশ্যি অতি অল্প লোকই অস্বীকার করেছে। কিন্তু এ শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার পর তাদের মধ্যে এমন কতোজন আছে, যারা বস্তুবাদী মানসিকতা এবং আখেরাতের চিন্তাবিবর্জিত জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদ পোষণ করে না? কতোজন এমন আছে, যারা অদৃশ্য ও অনুভূত সত্যকে সত্য বলে মনে করে? যাদের দৃষ্টিতে বৈষয়িক মূল্যবোধ থেকে উন্নততর আধ্যাত্মিক মূল্যবোধেরও কি কোনো মর্যাদা আছে? যারা দুনিয়াটাকে ব্যক্তি-স্বার্থের একটা নির্মম সংঘাত সংঘর্ষের ক্ষেত্র মনে করে না?

নৈতিকতার ব্যাপারে এ অপ্রতিরোধী প্রতিক্রিয়ার পরিণাম অধিকতর খারাপ হলো। আমাদের পতন যুগে আমাদের চরিত্রের শিকড় তো পূর্ব থেকেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছিল।

আমাদের আমীর-ওমরা ও ধনবান শ্রেণী পূর্ব থেকেই আরামপ্রিয় ছিলো। আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রথম থেকেই ভাড়াটিয়া সৈন্য বা ভাড়া করা টাট্টুর কাজ করে আসছিল। আমাদের মধ্যে কোনো স্থায়ী এবং ঐকান্তিক বিশ্বস্ততা আগেও ছিলো না। অত:পর তার সাথে পাশ্চাত্যের নৈতিক দর্শন যোগ হওয়ার পর এখানে সেই ধরনের চরিত্রই তৈরি হতে থাকলো, যার মধ্যে পাশ্চাত্য চরিত্রের সকল দোষ-ত্রুটির সমাবেশ ঘটলো এবং তার অধিকাংশ উজ্জ্বল দিকগুলোর অভাব রয়ে গেলো। উপযোগবাদ, ভোগবাদ এবং নীতিহীনতায় আমাদের এখানকার পাশ্চাত্যমনাদের চরিত্র পাশ্চাত্যের চরিত্রের সমপর্যায়ে পৌঁছে গেছে। কিন্তু তাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আছে, যার জন্যে কঠোর পরিশ্রম ও জীবন উৎসর্গ করা হয়ে থাকে এখানে জীবনের কোনো উদ্দেশ্য আছে বলে জানা নেই। ওখানে এমন বিশ্বস্ততা আছে, যার মধ্যে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা আছে। যা বেচাকেনা করা যায় না। এখানে সব কিছুই বিক্রয়মান। এখানে প্রত্যেক জিনিসের বিনিময় অর্থ ও ব্যক্তি-স্বার্থের দ্বারা হতে পারে। ওখানে শুধু ভিন্ন জাতির মুকাবিলায় কিছু নীতিবিগর্হিত কার্যকলাপ নির্দিষ্ট আছে, যা আপন জাতির জন্যে করাটা চরম অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু এখানে মিথ্যা, প্রতারণা, ওয়াদা ভঙ্গ, স্বার্থপরতা, ষড়যন্ত্র, প্রলোভন ও ভীতি প্রদর্শন প্রভৃতির হাতিয়ার আপন লোকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে কোনো দোষ নেই। ইংল্যান্ড অথবা আমেরিকায় কেউ এ ধরনের আচরণ করলে তার বেঁচে থাকাই মুশকিল হবে। এখানে বিরাট বিরাট দল এসব চরিত্রসহ আত্মপ্রকাশ করে এবং প্রসার লাভ করে। যারা এসব কাজে দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারে নেতৃত্ব দানের ব্যাপারে তাদেরকেই উপযুক্ত মনে করা হয়।

সমাজ, অর্থনীতি ও আইন সম্পর্কে পাশ্চাত্য শাসনের যে প্রভাবের বর্ণনা আমি আপনাদের সামনে একটু আগে পেশ করলাম, তার সবই যারা মেনে নিয়েছে এবং জাতির মধ্যে তার প্রচার-প্রসার যারা করছে, তারা ঐসব লোকই যারা এ অপ্রতিরোধী প্রতিক্রিয়ার কর্মপন্থা অবলম্বন করেছে। তথাপি তার মধ্যে কোনো কিছুই এতোটা বিস্ময়কর নয়, যতোটা বিস্ময়কর ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার ব্যাপারে তাদের প্রতিক্রিয়া। এ দলের সবচেয়ে বড়ো গর্ব ছিলো তাদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা সম্পর্কে। কিন্তু এ ব্যাপারে তারা সবচেয়ে বেশি অযোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছে। যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের উপর ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থার বুনিয়াদ স্থাপন করা হয়েছে এবং যার উপর ঊনবিংশ শতাব্দির শেষার্ধ থেকে যে ব্যবস্থার ক্রমাগত ক্রমবিকাশ ঘটেছিল, তা

যদি হিন্দুগণ গ্রহণ করে থাকে, তাহলে সেটা এক স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ তার প্রতিটি অংশ তাদের জন্যে কল্যাণকর। কিন্তু মুসলমানদের জন্যে তার প্রতিটি অংশ ছিলো মারাত্মক। অতএব, এ রাজনৈতিক ব্যবস্থার বুনিয়াদী মূলনীতি তাদের পক্ষ থেকে চ্যালেঞ্জ না করাটা এ কথারই সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, তাদের নব্য শিক্ষিত লোক রাজনীতি যতোই পড়ে থাকুক না কেন, তা মোটেই বুঝতে পারেনি। তারা পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারা এতোটা ভীত-বিহ্বল যে, যা কিছুই সেখান থেকে আসতো, তাকে তারা আসমানী ওহী মনে করে মেনে নিতো এবং কোনো বিষয়কে সমালোচনার কষ্টি পাথরে যাচাই করে দেখারই সাহস তাদের ছিলো না। এ পরাজিত মানসিকতার সাথে তারা রাজনীতির পাঠ অধ্যয়ন করে। তার ফল এই হয় যে, তারা সকল দৃষ্টিভঙ্গি চোখ বন্ধ করে মেনে নিতে থাকে। তাদের এতোটুকু বুদ্ধিও ছিলো না যে, সে রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবে। আর এতোটা সাহসও তাদের ছিলো না যে, বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে ঐসব বুনিয়াদ চ্যালেঞ্জ করে প্রভুদেরকে এ কথা বলতো যে, এ মূলনীতি এ দেশে চলতে পারে না। তারা তো যুদ্ধে ঐ দিনই অর্ধেক পরাজয় বরণ করে, যে দিন তারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের ঐসব মূলনীতিকে সত্য বলে মেনে নেয়। তারপর না রাজনৈতিক ক্রমধারায় জাতি এবং দেশবাসীর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রতিরোধকল্পে তাদের পলিসি কোনো কাজে লাগলো, আর না এ পলিসি তাদের সফলকাম হলো যে, এ পরিপূর্ণ ভ্রান্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় মুসলমানগণ এমন রক্ষা কবজ লাভ করবে, যার মারাত্মক পরিণাম ফল থেকে তাদেরকে বাঁচানো যাবে। অবশেষে যখন এ রাজনৈতিক ব্যবস্থা পাকাপোক্ত হয়ে পূর্ণত্ব লাভ করলো, তখন আমাদের অগত্যা রাজি হতে হলো যে, আমাদের মধ্যে অর্ধেক কবরস্থ হবো এবং অর্ধেক বেঁচে যাবো। এর পরেও আমাদের রাজনৈতিক নেতাগণ এখনো এ কথা বুঝতে পারেননি যে, যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা আমাদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলো, তার বুনিয়াদগুলোতে কি সব ত্রুটি রয়েছে। অথচ আজো তাঁরা ঐ ব্যবস্থাকে ঐসব বুনিয়াদসহ অবিকল ঠিক রেখেছেন এবং তার পরিবর্তনের কোনো অনুভূতিই তাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। এখন একজন নির্বোধ ছাড়া কি এ কথা বিশ্বাস করতে পারে যে, রাজনীতির অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতা তাদের মধ্যে কোনো রাজনৈতিক দূরদর্শিতা সৃষ্টি করেছে।

এতে সন্দেহ নেই যে, এ নিশ্চেষ্ট প্রতিক্রিয়ার মধ্যে শুধু অকল্যাণই ছিলো না, এর মধ্যে কল্যাণের দিকও ছিলো। এতে আমাদের অতীত জড়তা ভেঙে গেছে। আধুনিক যুগের উন্নতি-অগ্রগতির সাথে আমরা পরিচিত হয়েছি। আমাদের দৃষ্টিকোণে প্রশস্ততা সৃষ্টি হয়েছে। শুধুমাত্র অমুসলিমদের আধুনিক শিক্ষা লাভ

করে এবং সরকারের আইন-শৃঙ্খলায় প্রবেশ করে যে বিরাট ক্ষতি হতো তাঁর থেকে আমরা বেঁচে গেছি। আমাদের অনেকেরই সরকারের বিভিন্ন বিভাগের অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে। এসব সুযোগ-সুবিধার কোনটিই আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু সেই সাথে এটাও বাস্তব ঘটনা যে, এর দ্বারা আমাদের দীন সম্পর্কিত ধারণার পরিবর্তন হয়েছে, নৈতিকতার ধারণারও পরিবর্তন হয়েছে। জীবন দর্শন বদলে গেছে। আমাদের মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটেছে। আমাদের ব্যক্তি-চরিত্র এবং সামগ্রিক সভ্যতার বুনিয়াদ দুর্বল হয়েছে। আমরা পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণ থেকে বেরিয়ে অপরের পথভ্রষ্ট ও চরিত্রহীন অন্ধ অনুকরণে লিপ্ত হয়ে পড়েছি, যারা আমাদের দীনের দিক দিয়েও ধ্বংস করেছে এবং পার্থিব দিক দিয়েও ধ্বংস করেছে।

নিষ্ক্রিয় প্রতিক্রিয়া

আমাদের মধ্যে একটি দ্বিতীয় দলের প্রতিক্রিয়া ছিলো এর সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রথম দল আগত প্লাবনে প্রবাহিত হয়ে গেলো এবং দ্বিতীয় দল তার সামনে নিষ্ক্রিয় পাথরের মতো বসে রইলো। এ দলটি চেষ্টা করলো যে, শিক্ষা, ধর্ম, নৈতিকতা, সামাজিকতা এবং ঐতিহ্যের যে সমগ্র উত্তরাধিকার অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক ছেড়ে গিয়েছিল এবং উনবিংশ শতাব্দীর লোক তা লাভ করেছিল, তার সঠিক ও ভ্রান্ত অংশগুলোসহ তাকে হুবহু অক্ষুণ্ন রাখতে হবে এবং বিজয়ী সভ্যতার কোনো প্রভাবই গ্রহণ করা হবে না। তা উপলব্ধি করার জন্যে সময় নষ্টও করা যাবে না। পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে প্রথম সংঘাতের মুহূর্তে এ দলের লোক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ সংরক্ষণের যে আচরণ অবলম্বন করেছিল, আজ পর্যন্ত তার কোনরূপ পরিবর্তন ও পুন:পরীক্ষা ব্যতিরেকেই তার উপর অটল আছে। তারা এক মুহূর্তের জন্যেও গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেনি যে, পূর্ববর্তীদের উত্তরাধিকার পর্যালোচনা করে দেখা যাক যে, তার কতোটুকু পরিবর্তন করা যায়। তারা এ বিষয়েও চিন্তাভাবনা করে দেখেনি যে, আগত সভ্যতা যা কিছু এনেছে তার কোন্টা গ্রহণযোগ্য এবং কোন্টা পরিত্যাজ্য। তারা একথা বুঝবারও ন্যায়সঙ্গত চেষ্টা করেনি যে, আমাদের চিন্তা ও কাজের মধ্যে এমন কি ক্রটি-বিচ্যুতি ছিলো, যা আমাদের পরাজয়ের কারণ হয় এবং হাজার হাজার মাইল দূর থেকে আগত একটি জাতির নিকটে জ্ঞান ও কর্মের কোন্ শক্তি রয়েছে, যা তাদের বিজয় সূচিত করে? এসব বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেয়ার পরিবর্তে তারা সর্বশক্তি প্রয়োগ করে পূর্বাবস্থা বহাল রাখার জন্যে এবং আজ পর্যন্ত তাদের সে চেষ্টাই চলছে। তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও পাঠ্য তালিকা তাই রয়েছে, যা উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ছিলো। তাদের কার্যকলাপ, সমস্যাদি, চিন্তার ধরন, কর্মপদ্ধতি এবং তাদের পরিবেশের বৈশিষ্ট্য আগে যা ছিলো, তাই আছে।

তার মধ্যে যা কিছু ভালো ছিলো, তা যেমন সংরক্ষিত আছে, তার মন্দগুলোও সেভাবে সংরক্ষিত আছে।

আমি অবশ্যি এ কথা স্বীকার করি যে, এ দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়ায় কল্যাণেরও একটা মূল্যবান দিক ছিলো ও আছে। তা যতোটা শ্রদ্ধার যোগ্য, তার জন্যে ততোটুকু শ্রদ্ধা আমার অন্তরে আছে। আমাদের এখানে কুরআন, হাদিস ও ফেকাহর যতোটুকু ইলম অবশিষ্ট রয়ে গেছে, তা তারই বদৌলতে। আমাদের বুযুর্গ মনীষীগণ দীন ও আখলাকের যে উত্তরাধিকার ছেড়ে গেছেন, সৌভাগ্যের বিষয় যে কিছু লোক তা অক্ষুণ্ন রেখেছেন এবং ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যে তা স্থানান্তরিত করেছেন। আমাদের সভ্যতার যেসব গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিলো, কেউ যে তা সংরক্ষণের চেষ্টা করেছেন এবং বিরুদ্ধ পরিবেশে অল্প-বিস্তর তা যে অক্ষুণ্ন রেখেছেন এ এক মুল্যবান খেদমত বটে।

আমি এ কথাও স্বীকার করি যে, যাঁরা এ প্রতিক্রিয়ার সূচনা করেন তাঁরা অপারগ ছিলেন, যে সময়ে বিরোধী সভ্যতার প্লাবন হঠাৎ এসে পড়ে, তখন সম্ভবত তাদের এ ছাড়া আর করার কিছু ছিলো না যে, গৃহের যতোটুকু সম্পদ রক্ষা করা সম্ভব, তা রক্ষা করা যাক। এ ব্যাপারে তাদের অপারগতা প্রথম প্রতিক্রিয়া ব্যক্তকারী দলের অপরাগতা থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমরা প্রথম দলের প্রাথমিক নেতাদেরকেও এ অনুমতি দেই যে, বহিরাগত শাসন কর্তৃত্বের প্লাবনের প্রথম আগ্রাসনে স্বজাতিকে পরিপূর্ণ ধ্বংস থেকে এবং নিম্নশ্রেণীর জাতিতে পরিণত করা থেকে রক্ষা করার পন্থা তারা অবলম্বন করবেন। কারণ এ ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা তারা করতে পারতেন না। এ ধরনের অনুমতি লাভের যোগ্য দ্বিতীয় দলও। তারা সংঘর্ষের সূচনায় আপন ধর্ম এবং সভ্যতার শেষ সম্বলটুকু বিনষ্ট হওয়া থেকে বাঁচার চিন্তা করেন। কিন্তু প্রকৃতির আইনে ওজর-আপত্তি ও অনুমতিতে কোনো লাভ হয় না। এতে যদি ক্ষতির কোনো উপকরণ থাকে, তা হলে ক্ষতি অবশ্যই হবে। আর বাস্তবে যে ক্ষতি হয়েছে, তাকে ক্ষতি বলে স্বীকার করতে হবে।

এর প্রথম ক্ষতি এই যে, পূর্ববর্তী অবস্থার সংরক্ষণের প্রচেষ্টা দীন ও তৎসংশ্লিষ্ট মর্যাদাসম্পন্ন বিষয়গুলোর সাথে সাথে ঐসব দুর্বলতা ও ক্রটি-বিচ্যুতিরও সংরক্ষণ করে, যা আমাদের পতন যুগের ধর্মীয়-ধারণা বিশ্বাসে ও ধর্মীয় দলগুলোর মধ্যে বিদ্যমান ছিলো। এ ভেজাল উত্তরাধিকার অবিকল আমাদের অংশে এসেছে। এখন এ একটি সঠিক ইসলামী বিপ্লবের পথে ঠিক তেমনি প্রতিবন্ধক হয়ে পড়েছে, যেমন আমাদের পাশ্চাত্য শ্রেণীর মানসিকতা প্রতিবন্ধক হয়ে পড়ছে।

এর দ্বিতীয় ক্ষতি এই যে, আমাদের দীন, আখলাক এবং সভ্যতার প্রকৃত ভাবধারার সংরক্ষণ যেমন হওয়া উচিত ছিলো, এর দ্বারা তা হতে পারেনি। বরং দিন দিন তার অবনতি ঘটেছে। এ কথা ঠিক যে, প্লাবনের মুকাবিলা প্লাবনই করতে পারে, প্রস্তর খণ্ড করতে পারে না। এখানে এমন কোনো শক্তি ছিলো না, যা পাশ্চাত্য সভ্যতার প্লাবনের মুকাবিলায় ইসলামী সভ্যতার কোনো প্লাবন আনতে পারতো, এখানে 'পুরাতনের সংরক্ষণই' যথেষ্ট মনে করা হয়েছে, এই 'পুরানের' মধ্যে সংরক্ষণযোগ্য জিনিসের সাথে এমন বহু জিনিস শামিল করা হয়েছে, যা না বেঁচে থাকার কোনো শক্তি রাখতো আর না এমন ছিলো, যার সংরক্ষণ করা যায়। এগুলোকে শামিল করে এ আশাও করা যেতো না যে, একটি বিরোধী সভ্যতার মুকাবিলায় তার দ্বারা ইসলামের কোনো মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকবে। এটাই হলো কারণ, যার জন্যে আমরা যখন বিগত ষাট-সত্তর সালের ইতিহাসের উপর দৃষ্টিপাত করি তখন আমরা দেখি এ সময়ের মধ্যে ইসলাম ও ইসলামী সভ্যতার অগ্রগতি হয়নি বরং অধোগতি হয়েছে। প্রতি বছর, প্রতি মাস ও প্রতি দিন তা দলিত ও সংকুচিত হতে থাকে। অপরদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রসার লাভ করতে থাকে। প্রতিটি দিনের আগমন এভাবে হতো যে, পাশ্চাত্যের মানসিক বিকৃতি, নৈতিক আবর্জনা এবং প্রকাশ্য ধর্মদ্রোহিতা আমাদের জীবনের কিছুটা অতিরিক্ত অঞ্চল অধিকার করে ফেলেছে এবং আমাদের দীন, আখলাক ও সভ্যতা কিছু অতিরিক্ত অঞ্চল হারিয়ে ফেলেছে। প্রাচীন পদ্ধতির সংরক্ষকগণ এক মুহূর্তের জন্যেও এ গতি রোধ করতে পারেননি।

তৃতীয় ক্ষতিটা এই হয়েছিল যে, আমাদের ধর্মীয় দলটি ইসলামী ও অনৈসলামী প্রাচীনত্বের যে যৌগিক পদার্থ সংরক্ষণ করছিল, তাতে চিন্তা ও কাজ উভয় দিক দিয়ে আমাদের বিত্তশালী ও চিন্তাশীল শ্রেণীর মধ্যে সামান্য আকর্ষণই রয়ে গিয়েছিল। বরং আকর্ষণ দিন দিন কমেই যাচ্ছিলো। একদিকে বিরোধী সভ্যতা মন-মস্তিষ্ক বশীভূতকারী, মন জয়কারী এবং চোখ ঝলসানো সাজ-সরঞ্জাম ও উপকরণসহ অগ্রসর হচ্ছিলো, অপরদিকে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে এমন সব আলোচ্য বিষয়, সমস্যা কায়কারবার ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়াদির অবতারণা করা হচ্ছিলো, যা মন-মস্তিষ্ককে নিশ্চিন্ত করতে পারতো না। মনে কোনো আবেদন সৃষ্টি করতে পারতো না এবং চোখেও ভালো লাগতো না। ফলে যারা বৈষয়িক উপায়-উপাদান ও মানসিক যোগ্যতার অধিকারী ছিলো, তারা দীনের প্রতি তাদের শেষ আকর্ষণটুকুও হারিয়ে ফেলছিল এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছিলো। অতঃপর ধর্মীয় উত্তরাধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব ক্রমশ এমন সব শ্রেণীর জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে রইলো, যারা বৈষয়িক, মানসিক ও সামাজিক দিক দিয়ে নিকৃষ্টতর ছিলো। এর ক্ষতি শুধু এতোটুকুই হলো না যে,

ধার্মিকতার ফ্রন্ট (অগ্রভাগ) ক্রমশ দুর্বল এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার ফ্রন্ট ক্রমশ শক্তিশালী হতে থাকে। বরং এর চেয়ে অধিকতর ক্ষতি এই হয়েছিল যে, জ্ঞান, বিবেক, ভাষা ও চরিত্র সব দিক দিয়েই ইসলামের প্রতিনিধিত্বের মান নিম্নগামী হতে থাকে। অবশেষে দীনদারী রক্ষা করাই কঠিন হয়ে পড়ে।

এ পলিসি অবলম্বন করার ফলে সবচেয়ে বড়ো যে ক্ষতি হয়েছিল তা এই যে, দীনদার লোক মুসলমানদের নেতৃত্ব থেকে বেদখল হয়ে পড়েন এবং শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি সকল ব্যাপারে মুসলমানদের নেতৃত্ব দানের দায়িত্ব ঐসব লোকের উপর এসে যায়, যারা না দীন সম্পর্কে কোনো জ্ঞান রাখতেন আর না দীনের আলোকে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন অনুভব করতেন। তারা সকল শিক্ষা পাশ্চাত্য ধরনেরই লাভ করেন। পাশ্চাত্যের রঙেই রঞ্জিত। পাশ্চাত্যের মূল্যবোধ ও মূলনীতির ভিত্তিতে তাদের চরিত্র তৈরি হয়। তারা পাশ্চাত্যের আইন কলেজ থেকে শরীয়ত শিক্ষালাভ করেন এবং তার উপরেই আইন ব্যবসা করেন। রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও চক্রান্ত প্রভৃতির নীতি-কৌশল তারা পাশ্চাত্য প্রভুদের থেকে শিক্ষালাভ করেন। গোমরাহীর এ উৎস থেকে তারা যে পথ-নির্দেশনা লাভ করেন, তাই অনুসরণ করে চলেন এবং গোটা জাতিকে পরিচালিত করেন। জাতিও পূর্ণ আস্থাসহ তাদের পেছনে চলে। দীনদার শ্রেণীর করার কিছু থাকলে ব্যস্ চুপচাপ শিক্ষা-দীক্ষা দান, যিকির, তাসবীহ্ প্রভৃতিতে লিপ্ত হয়ে পড়েন। অথবা জাতীয় নেতৃত্বে যারাই সমাসীন হন, তাদের জন্যে দোয়াকারীর ভূমিকা পালন করতে থাকেন। আর রাজনীতির ক্ষেত্রে এসে থাকলে কোনো নেতার পেছনে প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন তল্পিবাহক হিসাবে চলেন। কংগ্রেস অথবা মুসলিম লীগে যতোই যোগদান করেন অনুসারী হিসাবেই যোগদান করেন। কোনো পলিসি নির্ধারণে তাদের কোনো হাত ছিলো না। বিরাট গোমরাহীও তারা রুখতে পারেননি, না তার বিরুদ্ধে টু শব্দ করতে পেরেছেন। তাদের কাজ এ ছাড়া আর কিছুই ছিলো না যে, দীনবিমুখ অথবা দীনবিরোধী নেতা যে পলিসি নির্ধারণ করতেন, তার প্রতি তারা বরকত দান করতেন এবং মুসলমানদেরকে আশ্বাস দিয়ে বলতেন যে এটাইতো কুরআন-হাদিসে লেখা আছে। অন্ততপক্ষে দীনের দিক দিয়ে কোনো আশঙ্কার কারণ নেই। এ রোগ বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, ধর্মনিরপেক্ষতা পর্যন্ত আমাদের অনেক ধর্মপ্রাণ বুযুর্গের বরকত লাভ করে। এসব প্রভাবহীন লোকের দীনি অনুভূতি এতো তীব্র যে, দাড়ি দীর্ঘতায় একটু খাটো হলে সকল দীনদারী একবারে নস্যাৎ হয়ে যায় এবং কুরআন-হাদিস থেকে প্রমাণিত নয় ফেকাহর এমন কিছু খুঁটিনাটি বিষয়ে কেউ মতভেদ করলে তাকে দীন ভঙ্গকারী বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু গোটা জাতি যাদেরকে জিন্দাবাদ ধ্বনি দেয় অথবা

যারা একবার রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্টিত হন, তারা সকল প্রকার কাজের রুখসত বা সুযোগ-সুবিধার অধিকার হয়ে যান তাদের হাতে দীনের প্রাসাদ ভেঙে পড়ার উপক্রমই হোক না কেন, তাতে কোনো ক্ষতি নেই।

আমরা কি চাই

আমাদের অতীত ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থার এ হলো বিস্তারিত পর্যালোচনা। এ পর্যালোচনা কাউকে ভৎসনা করার জন্যে করা হয়নি, বরং এ জন্যে করা হয়েছে যাতে করে আপনারা বর্তমান পরিস্থিতি ও তার ঐতিহাসিক কারণগুলো চিহ্নিত করতে পারেন এবং এ অবস্থার প্রেক্ষিতে দেশের সংস্কারের জন্যে আল্লাহর উপর ভরসা করে যে কর্মসূচি আমরা গ্রহণ করেছি তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারেন। কারণ এ কর্মসূচি আমরা গ্রহণ করেছি ইসলামী রেনেসাঁর পতাকাবাহী হিসাবে।

আমার এসব কথায় আপনারা জানতে পেরেছেন যে, অনিষ্ট-অনাচারের পরিধি কত প্রশস্ত এবং তা আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিটি বিভাগে বিস্তার লাভ করে আছে। আমার এ বক্তৃতায় আপনারা এটাও জানতে পেরেছেন যে, যেসব অনাচার এখন দেখা যাচ্ছে, তার প্রতিটি কি কি কারণে বিকাশ লাভ করে ক্রমশ এ অবস্থায় পৌছেছে এবং তার শিকড় আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিক্ষা ব্যবস্থা, সংস্কৃতি ও রাজনীতির কতো গভীরে প্রোথিত রয়েছে এবং বিভিন্ন বিভাগের এ সব অনাচার কিভাবে একটি অপরটির সহায়ক হয়েছে। এর পরে আংশিক কোনো সংস্কারের কাজ যে ফলপ্রসূ হবে না, আমি মনে করি না যে, কোনো দূরদর্শী ব্যক্তি এ কথা বুঝতে কোনো ইতস্তত করবেন। আপনারা দীনি মাদ্রাসা খুলে কালেমা ও নামাযের তাবলীগ করে, অনাচার-পাপাচারের বিরুদ্ধে ওয়ায-নসীহত করে অথবা পথভ্রষ্ট দলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বড়জোর যা করতে পারেন, তা এতোটুকু যে, দীন যে গতিতে অধ:পতনের দিকে ছুটছে, সে গতিতে কিছুটা শিথিল করে দিতে পারেন এবং দীনি জীবনের শ্বাস গ্রহণে কিছু অতিরিক্ত সময় পাওয়া যাবে। কিন্তু এসব পন্থা অবলম্বনে আপনারা আশা করতে পারেন না যে, আল্লাহর কালেমা বুলন্দ হয়ে যাবে এবং তার মুকাবিলায় জাহেলিয়াতের কালেমা দমিত হয়ে থাকবে। কারণ এ যাবত যে সব উপায়-উপকরণ আল্লাহর কালেমাকে দমিত এবং জাহেলিয়াতের কালেমা সমুন্নত করে আসছে, তা যথাযথ বিদ্যমান আছে। এভাবে যদি আপনারা চান যে, বর্তমান ব্যবস্থা তো ঐসব বুনিয়াদের উপরই কায়েম থাক, কিন্তু নৈতিকতা, সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনীতি, আইন-শৃংখলা অথবা রাজনীতির বর্তমান অনাচারগুলোর মধ্যে কোনটার সংস্কার হয়ে থাক, তাহলে এটাও কোনো ক্রমে সম্ভব হবে না। কারণ এর প্রতিটি বর্তমান জীবন ব্যবস্থার বুনিয়াদী অনাচার কর্তৃক সৃষ্ট ও লালিত-

পালিত এবং প্রতিটি অনাচার অন্যটির সহায়তা লাভ করে। এমন অবস্থায় একটি সার্বিক অনাচার নির্মূল করার জন্যে একটি সার্বিক কর্মসূচি অপরিহার্য যা মূল থেকে শুরু করে শাখা-প্রশাখা পর্যন্ত পরিপূর্ণ ভারসাম্যসহ সংস্কারের কাজ অব্যাহত রাখবে।

সে কর্মসূচি কি হবে? আমাদের নিকটেই বা তা কি? এর উপরেই আমি কিছু আলোচনা করতে চাই। এ আলোচনার পূর্বে একটি প্রশ্নের জবাব প্রয়োজন। প্রশ্ন এই যে, আপনারা চান কী? সঠিকভাবে বলতে গেলে আপনাদের মধ্যে কে কী চান?

একাগ্রতার প্রয়োজন

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আমরা এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছি যে, ক্রমাগত অভিজ্ঞতায় একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলাম ও জাহেলিয়াতের এ যৌগিক পদার্থ, যা এখন পর্যন্ত আমাদের জীবন ব্যবস্থা হয়ে রয়েছে বেশি দিন চলতে পারে না। যদি চলতে থাকে, তাহলে দুনিয়াতেও তা পরিপূর্ণ ধ্বংসের কারণ এবং আখেরাতেও। এ কারণে আমরা এ অবস্থায় রয়েছি।

"ঈমান বুঝে রুকে হ্যায় তো খেঁচে হ্যায় মুঝে কুফর"। অর্থাৎ ঈমান আমাকে বাধা দিচ্ছে তো কুফর আমাকে টানছে।

না আমরা আমেরিকা, রাশিয়া ও ইংল্যান্ডের মতো একাগ্রচিত্তে দুনিয়া বানাতে পারি, কারণ যে ঈমান ও ইসলামের সাথে আমাদের সম্পর্ক, তা এ পথে গড্ডলিকা প্রবাহে চলতে দেয় না, আর না আমরা সত্যিকার মুসলমান জাতির মতো নিজেদের আখেরাত বানাতে পারি, কারণ জাহেলিয়াত আমাদেরকে এ কাজ করতে দেয় না যার অগণিত ফেৎনা আমরা আমাদের মধ্যে পোষণ করে রেখেছি। এ দু'মনা হওয়ার কারণে কোনটাই আমরা যথাযথ করতে পারছি না। না দুনিয়া-পরস্তির কাজ আর না খোদাপরস্তির কাজ। এ কারণে আমাদের প্রতিটি কাজ পার্থিব হোক অথবা পারলৌকিক হোক, দু'বিপরীতমুখী চিন্তা ও প্রবণতার রণক্ষেত্র হয়ে থাকে। তার প্রত্যেকটি অপরটির প্রতিরোধ করে এবং কোনো চিন্তা ও প্রবণতার দাবি পূরণ হয় না। এ অবস্থার শীঘ্রই অবসান হওয়া দরকার। আমরা যদি আমাদের নিজেদেরই দুশমন না হয়ে থাকি, তাহলে আমাদেরকে একাগ্রচিত্ত হতে হবে।

এ একাগ্রতা দুটো পন্থাই সম্ভব। এখন আমাদের কে কোনটা পছন্দ করেন, তাই দেখতে হবে। একটি পন্থা এই যে, আমাদের পূর্ববর্তী শাসকগণ এবং তাদের বিজয়ী সভ্যতা যে পথে এ দেশকে এনে ফেলেছিল, তাই অবলম্বন করতে হবে এবং তারপর আল্লাহ, আখেরাত, দীন, দীনি তাহযীব ও নৈতিকতা পরিহার করে এক একটি খাঁটি জড়বাদী সভ্যতার উন্নতি সাধন করতে হবে যাতে করে এ

দেশটিও একটি দ্বিতীয় রাশিয়া অথবা আমেরিকা হতে পারে। এ পথ ভ্রান্ত, সত্যের পরিপন্থী এবং ধ্বংসাত্মক এবং আমি বলব যে, পাকিস্তানে সাফল্যের কোনো সম্ভাবনা নেই। এ জন্যে যে, এখানকার মনস্তত্ত্ব ও ঐতিহ্যে ইসলামের জন্যে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা এতো গভীরে প্রোথিত যে, তার উৎপাটন করা মানুষের সাধ্যের অতীত। তথাপি যারা এ পথে চলতে চায়, তারা আমার এ ভাষণের দ্বিতীয় পুরুষ নয়। তাদের সামনে আমরা আমাদের কর্মসূচি নয়, সংগ্রামের চরমপত্রই (ultimatum) পেশ করতে চাই।

একাগ্রতার দ্বিতীয় পথ এই যে, আমরা আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে সেই পথ বেছে নেবো, যা কুরআন ও নবীর সুন্নত আমাদেরকে দেখিয়েছে। এটাই আমরা চাই এবং আমরা মনে করি দেশের লোকসংখ্যা হাজারের মধ্যে ৯৯৯ জন তাই চায়। আল্লাহ ও রসূলকে যারা মানে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের প্রতি যারা বিশ্বাস রাখে, তাদের প্রত্যেকের এটাই চাওয়া উচিত। কিন্তু যাঁরাই এ পথ পছন্দ করেন, তাঁদের ভালো করে উপলব্ধি করা উচিত যে, যে অবস্থার ভেতর দিয়ে আমরা চলে আসছি এবং বর্তমানে যে অবস্থার আমরা সম্মুখীন সে অবস্থায় একমাত্র ইসলাম এবং বিশুদ্ধ ইসলামকে পাকিস্তানের জীবনদর্শন ও বিজয়ী জীবন-বিধানরূপে প্রতিষ্ঠিত করা কোনো সহজ কাজ নয়। এর জন্যে প্রয়োজন কয়েক শতাব্দীর ঐতিহ্য ইসলাম ও জাহেলিয়াতের রক্ষণশীলতার যে ভেজাল তৈরি করে তাকে সুদৃঢ় করে রেখেছে তার বিশ্লেষণ করা এবং রক্ষণশীলতার উপাদানগুলোকে আলাদা করে বিশুদ্ধ ইসলামের সেই মূল উপাদান বা সারাংশ গ্রহণ করা, যা কুরআন ও সুন্নাহর কষ্টিপাথরে ইসলামের সারবস্তু হিসাবে প্রমাণিত হয়। এটা সুস্পষ্ট যে, এ কাজ আমাদের ঐ শ্রেণীর কঠিন প্রতিবন্ধকতা ব্যতিরেকে হতে পারে না, যারা রক্ষণশীলতার কোনো না কোনো অংশের সাথে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট।

এর জন্যে এটাও প্রয়োজন যে, আমরা পাশ্চাত্যের প্রকৃত সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতি-অগ্রগতিকে তার জীবনদর্শন এবং চিন্তা, নৈতিকতা ও সমাজ ব্যবস্থার গোমরাহী থেকে মুক্ত করবো। প্রথমটিকে গ্রহণ করবো এবং দ্বিতীয়টিকে আমাদের চিন্তা-চেতনা থেকে একেবারে দূর করে দেবো। একথা সুস্পষ্ট যে, এটাকে সেই শ্রেণী বরদাশত করবে না, যারা বিশুদ্ধ পাশ্চাত্য চিন্ত াধারাকে অথবা ইসলামের কোনো না কোনো পাশ্চাত্য সংস্করণকে নিজেদের দীন বানিয়ে রেখেছে।

এ কাজের জন্যে এমন লোকেরও প্রয়োজন, যারা ইসলামী মন মানসিকতাসহ গঠনমূলক কাজের যোগ্যতাসম্পন্ন মজবুত স্বভাব-প্রকৃতি, নিষ্কলুষ চরিত্র, দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির অধিকারী এবং সংগঠিত ও সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করবে। এটা ঠিক

যে, এ ধরনের লোক আমাদের এখানে এমনিতেই কম। তারপর এমন দুর্দান্ত সাহসী লোক সহজে পাওয়া যায় না, যারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আঘাত সহ্য করবে, ফতোয়ার গোলাবর্ষণও বরদাশত করবে এবং মিথ্যা অপবাদের চতুর্মুখী হামলারও মুকাবিলা করতে থাকবে অসীম ধৈর্য সহকারে।

এ সব শর্ত ছাড়াও প্রয়োজন এই যে, ইসলামকে একটি বিজয়ী শক্তিতে পরিণত করার আন্দোলন এক সার্বিক প্লাবনের মতো চলতে থাকবে যেভাবে এ দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতা প্লাবনের আকারে এসেছিল এবং জীবনের প্রতিটি বিভাগের উপর বিস্তার লাভ করেছিল। এ সার্বিকতা এবং প্লাবনের গতিধারা ব্যতীত এটা সম্ভব নয় যে, পাশ্চাত্য সভ্যতাকে তার প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব থেকে অপসারিত করা যাবে, আর না এটা সম্ভব যে, শিক্ষা ব্যবস্থা, আইন ব্যবস্থা, অর্থ ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তন করে বিশুদ্ধ ইসলামের বুনিয়াদের উপর একটি দ্বিতীয় সংস্কৃতি গড়ে তোলা যাবে।

আমরা তো এ সবই চাই। এ উপমহাদেশের মুসলমানদের প্রাচীন জাতীয় সভ্যতার পুনর্জীবন নয়, ইসলামী পুনর্জীবনই আমাদের লক্ষ্য। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তার দ্বারা যে উন্নতি-অগ্রগতি হয়েছে, আমরা তার বিরোধী নই। কিন্তু আমরা ঐ সভ্যতা-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছি, যা পাশ্চাত্য জীবন-দর্শন ও নৈতিক-দর্শন থেকে জন্মলাভ করেছে। আমরা দু'চার আনার চাঁদার সদস্য সংখ্যাবৃদ্ধি করে কোনো রাজনৈতিক খেলা খেলতে চাই না বরং জাতির মধ্য থেকে বেছে বেছে এমন সব লোককে সংগঠিত করতে চাই, যারা জরাজীর্ণ রক্ষণশীলতা ও নতুনত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে প্রস্তুত। আমরা জীবনের কোনো একটি অংশ অথবা কিছু অংশে কিছু ইসলামী রঙের প্রলেপ দেয়ার পক্ষপাতী নই। বরং আমাদের সংগ্রাম এ জন্যে যে, সমগ্র জীবনের উপর ইসলামের শাসন-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হোক। ব্যক্তিগত স্বভাব-চরিত্রে, পারিবারিক জীবন পদ্ধতিতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে, আইন-আদালতে, রাজনীতি ও পার্লামেন্টে আইন-শৃঙ্খলা বিভাগে এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে উৎপাদন ও বণ্টন নীতিতে ইসলামের শাসন-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হোক। ইসলামের এ সার্বিক শাসন-কর্তৃত্বের দ্বারাই এ সম্ভব হতে পারে যে, পাকিস্তান একাগ্রচিত্ত ও একমুখী হয়ে ঐসব আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবে, যা রাব্বুল আলামীন প্রদত্ত হেদায়াতের উপর চলার অনিবার্য ও স্বাভাবিক ফলশ্রুতি। অত:পর এর থেকেই আশা করা যায় যে, এ দেশটি সমগ্র মুসলিম দেশগুলোর জন্যে কল্যাণের দিকে আহ্বানের এবং সমগ্র দুনিয়ার জন্যে হেদায়াতের কেন্দ্র হয়ে পড়বে।

আমাদের কর্মসূচি

আমাদের এ উদ্দেশ্য উপলব্ধি করার পর আমাদের কর্মসূচি বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। এর চারটি বড়ো বড়ো অংশ রয়েছে, যা আমি পৃথক পৃথক আলোচনা করতে চাই।

১। এর প্রথম অংশ চিন্তার পরিশুদ্ধি ও চিন্তার গঠন। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ চিন্তার পরিশুদ্ধি ও গঠন এ উদ্দেশ্যে করতে হবে যাতে করে একদিকে জাহেলিয়াতের জরাজীর্ণ চিন্তাধারার আবর্জনা পরিষ্কার করে মূল ও প্রকৃত ইসলামের সরল সঠিক রাজপথ দৃশ্যমান করে তোলা যায় এবং অপরদিকে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলাদি এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির সমালোচনা পর্যালোচনা করে বলে দেয়া যায় যে, এর মধ্যে কি কি ভ্রান্ত ও পরিত্যাজ্য বিষয় রয়েছে এবং কি কি গ্রহণযোগ্য। অতঃপর সুস্পষ্ট করে দেখিয়ে দিতে হবে যে, ইসলামের মূলনীতি বর্তমান যুগের সমস্যাদির সাথে সুসামঞ্জস্য করে কিভাবে একটি সত্যনিষ্ঠ সংস্কৃতি গঠন করা যায় এবং এতে জীবনের একটি বিভাগের চিত্র কি হবে। এভাবে চিন্তাধারার পরিবর্তন হবে এবং তার পরিবর্তনের ফলে জীবনের এক নতুন দিক শুরু হবে এবং পুনর্গঠনের কাজে মন চিন্তার খোরাক লাভ করবে।

২। কর্মসূচির দ্বিতীয় অংশ হলো সৎ লোকের সন্ধান, সংগঠন ও তারবিয়াত। এর জন্যে প্রয়োজন যে, জনপদগুলো থেকে ঐসব নারী-পুরুষকে খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে, যারা প্রাচীন ও নতুন অনাচার থেকে মুক্ত অথবা এখন মুক্ত হওয়ার জন্যে প্রস্তুত এবং যাদের মধ্যে সংশোধনের প্রেরণা বিদ্যমান। যারা সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করে সময়, অর্থ ও শ্রম কুরবাণী করতে প্রস্তুত। তাঁরা আধুনিক অথবা প্রাচীন শিক্ষায় শিক্ষিত হোন, সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে থেকে হোন অথবা বিশিষ্ট শ্রেণীভুক্ত, দরিদ্র হোন, ধনী হোন অথবা মধ্যবিত্ত, তাতে কিছু যায় আসে না। এ ধরনের লোক যেখানেই পাওয়া যাবে, তাদেরকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল থেকে বের করে সংগ্রাম ক্ষেত্রে আনতে হবে। এভাবে আমাদের সমাজে যে কিছু সৎলোক রয়ে গেছে কিন্তু বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত থাকার কারণে অথবা আংশিক সংস্কার-সংশোধনের ইতস্তত চেষ্টা-চরিত্রের কারণে কোনো সুবিধাজনক ফল লাভ করতে পারছে না, তারা একটি কেন্দ্রে একত্র হবে এবং একটি বিজ্ঞতাপূর্ণ কর্মসূচি অনুযায়ী সংস্কার ও পুনর্গঠনের জন্যে চেষ্টা-চরিত্র চালাবে।

অত:পর এ ধরনের একটি দল গঠনই যথেষ্ট হবে না। বরং সাথে সাথে তাদের মানসিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণের কাজ করতে হবে যাতে করে তাদের চিন্তাধারা অধিকতর পরিশুদ্ধ হয়। তাদের চরিত্র অধিকতর পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন মজবুত এবং

নির্ভরযোগ্য হয়। এ সত্য আমাদের কখনো ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা শুধু কাগজের নক্‌শা এবং মৌখিক দাবির উপরে কায়েম করা যায় না। তার প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন নির্ভর করে এ বিষয়ের উপর যে তার পেছনে গঠনমূলক যোগ্যতা এবং সৎ ব্যক্তিচরিত্র বিদ্যমান আছে কি না। কাগজের নকশায় কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে আল্লাহর সাহায্যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় তা সব সময়ই দূর করতে পারে। কিন্তু যোগ্যতা ও সততার অভাব থাকলে কোনো অট্টালিকা নির্মিতই হতে পারে না এবং নির্মিত হলেও তা দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না।

৩। এর তৃতীয় অংশ হচ্ছে সমাজ সংস্কার। সমাজের সকল শ্রেণীর তাদের অবস্থার দিক দিয়ে সংস্কার এ অংশের অন্তর্ভুক্ত। এ কাজ যারা করবে, তাদের উপায়-উপকরণ যতো বেশি হবে এ কাজের পরিধি ততো বিস্তৃত হবে। এ উদ্দেশ্যে কর্মীবৃন্দকে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বণ্টন করে দেয়া উচিত। তাদের মধ্যে কেউ শহরবাসীর মধ্যে কাজ করবে, কেউ গ্রামবাসীর মধ্যে। কারো কাজ হবে কৃষকদের মধ্যে, কারো শ্রমিকদের মধ্যে। কেউ দাওয়াতী কাজ করবে উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে, কেউ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে। কেউ চাকুরিজীবীদের সংস্কারের জন্যে কাজ করবে, কেউ ব্যবসায়ী ও শিল্পকারখানায় কর্মচারীদের সংস্কারের চেষ্টা করবে। কেউ মনোযোগ দেবে প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে এবং কেউ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। কেউ স্থবিরতার দুর্গ ধ্বংস করার কাজে লেগে যাবে। কেউ নাস্তিকতার প্লাবন প্রতিরোধ করার কাজে। কেউ কাজ করবে কবিতা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে, কেউ গবেষণার ক্ষেত্রে। যদিও এ সবের কর্মক্ষেত্র পৃথক পৃথক, কিন্তু তাদের সকলের সামনে একই উদ্দেশ্য ও স্কীম থাকবে, যার দিকে জাতির সকল শ্রেণীকে পরিবেষ্টন করে আনার চেষ্টা করবে। তাদের লক্ষ্য হবে মানসিক, নৈতিক ও বাস্তব নৈরাজ্য নির্মূল করা, যা প্রাচীন রক্ষণশীল ও নতুন সক্রিয় প্রবণতার কারণে সমগ্র জাতির মধ্যে প্রসার লাভ করেছে। সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সঠিক ইসলামী চিন্তাধারা ইসলামী আচার-আচরণ এবং সত্যিকার মুসলমানের মতো বাস্তব জীবন গঠন করাও তাদের লক্ষ্য হবে। এসব কাজ শুধু ওয়ায-নসীহত, প্রচার-প্রোপাগান্ডা, ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও আলাপ-আলোচনার দ্বারাই হওয়া উচিত নয়। বরং বিভিন্ন দিকে রীতিমতো গঠনমূলক কর্মসূচি তৈরি করে সামনে অগ্রসর হতে হবে। যেমন ধরুন, এ কাজের কর্মীগণ যেখানেই কিছু লোককে দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে সমমনা বানাতে সক্ষম হবে, সেখানে তারা সকলকে মিলিয়ে একটা স্থায়ী সংগঠন কায়েম করবে। অত:পর তাদের সাহায্যে একটি কর্মসূচি বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে। সে কর্মসূচির মধ্যে থাকবে :

বস্তির মসজিদের সংস্কার, সাধারণ লোকদেরকে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা দান করা, বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। অন্তত একটি পাঠাগার কায়েম করা, জুলুম-নিপীড়ন থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্যে সম্মিলিত প্রচেষ্টা, বাসিন্দাদের সাহায্য-সহযোগিতায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যরক্ষার কাজ করা। বস্তির এতিম, বিধবা, অকর্মণ্য ও দরিদ্র ছাত্রদের তালিকা তৈরি করা এবং যেভাবে সম্ভব তাদের সাহায্য করা, সম্ভব হলে কোনো প্রাইমারী স্কুল, হাইস্কুল অথবা দীনি ইলম শিক্ষাদানের জন্যে এমন মাদ্রাসা কায়েম করা, যেখানে শিক্ষার সাথে চরিত্র গঠনেরও ব্যবস্থা থাকবে।

ঠিক এমনিভাবে যারা শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করবে, তারা তাদেরকে সমাজতন্ত্রের হলাহল থেকে রক্ষা করার জন্যে শুধু প্রচার-প্রচারণাতেই সন্তুষ্ট থাকবে না। বরং কার্যত তাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টাও করবে। তাদের এমন শ্রমিক সংগঠন কায়েম করাও উচিত, যাদের উদ্দেশ্য হবে সুবিচার কায়েম করা, উৎপাদনের উপায়-উপকরণ জাতীয় মালিকানাভুক্ত করা নয়। শ্রেণী সংগ্রামের পরিবর্তে তাদের কাজ হবে বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করা। ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের পরিবর্তে তাদের কর্মপন্থা হবে নৈতিকতার ভিত্তিতে এবং আইনসম্মত। তাদের লক্ষ্য শুধু আপন অধিকার আদায় নয়, দায়িত্ব পালনও। যে সব শ্রমিক অথবা কর্মী তাদের মধ্যে সামিল হবে, তাদের উপর এ শর্ত আরোপিত হওয়া উচিত যে, তারা ঈমানদারী সহকারে নিজের অংশের করণীয় কাজ অবশ্যই করবে। তারপর তাদের কর্মের পরিধি শুধু আপন শ্রেণীর স্বার্থেই সীমিত থাকা উচিত হবে না, বরং যে শ্রেণীর সাথেই এ সংগঠন সংশ্লিষ্ট থাকবে তার নৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্যেও চেষ্টা করতে হবে।

এ সাধারণ সংস্কার-সংশোধনের কর্মসূচির মূলনীতি এই যে, যে ব্যক্তি যে মহলে ও শ্রেণীর মধ্যে কাজ করবে সেখানে ক্রমাগত এবং সংগঠিত উপায়ে করবে এবং আপন চেষ্টা-চরিত্র ফলবতী না হওয়া পর্যন্ত কাজ ছেড়ে দেবে না। আমাদের কর্মপন্থা এ হওয়া উচিত নয় যে, আকাশের পাখি এবং ঝড়-তুফানের মতো বীজ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যেতে থাকবে। পক্ষান্তরে আমাদেরকে ঐ কৃষকের মতো কাজ করতে হবে, যে কিছু ভূমিখণ্ড নির্দিষ্ট করে নেয় তারপর জমি তৈরি করা থেকে শুরু করে ফসল কাটা পর্যন্ত ক্রমাগত কাজের দ্বারা নিজের শ্রমকে সাফল্যমণ্ডিত করে ক্ষান্ত হয়। প্রথম পন্থা অবলম্বন করলে জমিতে জঙ্গল ও আগাছা জন্মায় এবং দ্বিতীয় পন্থায় রীতিমত ফসল তৈরি হয়।

৪। এ কর্মসূচির চতুর্থ অংশ শাসন ব্যবস্থার সংস্কার। আমরা মনে করি জীবনের বর্তমান অধ:পতন দূর করার কোনো চেষ্টা-তদবীরই সফল হতে পারে না,

যতোক্ষণ পর্যন্ত সংস্কারের অন্যান্য চেষ্টার সাথে শাসন ব্যবস্থা সংস্কারের চেষ্টা করা না হয়েছে। এ জন্যে যে শিক্ষা, আইন-আদালত, আইন-শৃঙ্খলা এবং জীবিকা বণ্টন প্রভৃতি শক্তির মাধ্যমে যে অনাচার-নৈরাজ্য জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তার মুকাবিলায় শুধু ওয়াজ-নসীহত ও তাবলীগের মাধ্যমে কোনো গঠনমূলক কাজ সম্ভব নয়। অতএব, প্রকৃতপক্ষেই যদি আমরা আমাদের দেশের জীবন ব্যবস্থাকে পাপাচার ও পথ-ভ্রষ্টতার পথ থেকে সরিয়ে দীনে হকের, সিরাতুল মুস্তাকীমের উপর চালাতে চাই, তাহলে ক্ষমতার মসনদকে পাপাচারমুক্ত করে তথায় সততা, গঠনমূলক উপাদান ও ভাবধারা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা আমাদের জন্যে অপরিহার্য হবে। এ কথা ঠিক যে, কল্যাণকামী ও সংস্কারধর্মী লোক ক্ষমতা লাভ করলে, শিক্ষা, আইন-কানুন এবং আইন-শৃঙ্খলার পলিসির আমূল পরিবর্তন করে মাত্র কয়েক বছরেই তারা এমন কিছু করে ফেলতে পারবেন, যা অরাজনৈতিক চেষ্টা-তদবীরে এক শতাব্দীতে করাও সম্ভব হবে না।

এ পরিবর্তন কিভাবে হতে পারে? একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তার একটি মাত্র পথ রয়েছে এবং তা নির্বাচনের পথ। জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করতে হবে, জনগণের নির্বাচনের মান বদলাতে হবে, নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার করতে হবে। অত:পর এমন সব সৎ লোককে ক্ষমতায় বসাতে হবে, যারা দেশকে খাঁটি ইসলামী বুনিয়াদের উপর দেশের শাসন ব্যবস্থা গঠনের ইচ্ছা ও যোগ্যতা রাখে।

আমাদের মূল্যায়ন অনুযায়ী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অনিষ্টের মূল কারণ হলো নির্বাচন পদ্ধতির দোষত্রুটি। নির্বাচনের মওসুম যখন আসে, পদমর্যাদার অভিলাষী লোক তখন নির্বাচনের জন্যে উঠে পড়ে লেগে যায়। কোনো দলের মনোনয়ন লাভ করে অথবা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে কাজ করা শুরু করে। এ কাজে তারা না কোনো নৈতিক চরিত্রের আর না কোনো নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা করে। মিথ্যা, প্রতারণা, চক্রান্ত, বলপ্রয়োগ এবং অতি জঘণ্য ও অবৈধ কাজ করতেও তারা দ্বিধাবোধ করে না। প্রলোভনের মাধ্যমে কারো ভোট পাওয়া সম্ভব হলে তারা ভোটারকে প্রলুব্ধ করে এবং ভয় প্রদর্শন ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করেও ভোট সংগ্রহ করা হয়। ধোঁকা-প্রবঞ্চনার মাধ্যমে ভোট সংগ্রহ করা গেলে সে পন্থাই অবলম্বন করা হয়। কাউকে কোনো কুসংস্কার অথবা গোঁড়ামির ভিত্তিতে আকৃষ্ট করা সম্ভব হলে সেভাবেই তার ভোট প্রার্থনা করা হয়। এ নোংরা খেলার ময়দানে সমাজের কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রথমে তো নামতেই চান না। আর কখনো ভুল করে অথবা অজ্ঞতাবশত যদি নেমেও পড়েন, তবে প্রথম পদক্ষেপের পরই ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যান। তারপর প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুধু তাদের মধ্যেই হয় যাদের না আল্লাহর ভয় আছে, না কোনো লজ্জা-শরম, আর না কোনো নিকৃষ্ট ধরনের খেলা খেলতে কোনো ভয়। অত:পর তাদের মধ্যে বিজয়ী সে ব্যক্তিই হয়, যে সব মিথ্যাকে

মিথ্যার দ্বারা এবং সকল জালিয়াতিকে জালিয়াতির দ্বারা পরাজিত করে। যাদের ভোটে এ সব লোক জয়ী হয়, তারা না কোনো নীতি-নৈতিকতা, আর না কোনো কর্মসূচি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখে। তারা স্বভাব-চরিত্র এবং যোগ্যতাও দেখে না। তাদের থেকে জালিয়াতি করে যে যতো ভোট নিতে পারবে, সেই বাজিমাত করবে। এখন তো প্রকৃত ভোটের সংখ্যাধিক্যেরও কোনো মূল্য নেই। ভাড়াটিয়া জাল ভোটার এবং অসৎ ও অসাধু পোলিং অফিসার আপন হাতের কৃতিত্বে ঐসব লোককে হারিয়ে দেয়, যাদের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রকৃত ভোটারদের আস্থা থাকে। অনেক সময় নির্বাচনের কোনো সুযোগই আসে না। কখনো একজন বিবেকহীন ম্যাজিস্ট্রেট ব্যক্তিগত স্বার্থে অথবা কারো ইঙ্গিতে একজন ব্যতীত সকল নির্বাচনপ্রার্থীকে এক কলমের খোঁচায় নির্বাচনের ময়দান থেকে সরিয়ে রাখে অর্থাৎ তাদের নমিনেশন পেপার নাকচ করে দেয়। ফলে আনুকূল্যপ্রাপ্ত প্রিয় ব্যক্তিটি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গোটা নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধি হয়ে যায় সে প্রকৃত প্রতিনিধি হোক বা না হোক। যে কোনো বিবেকবান ব্যক্তি এ অবস্থা থেকে অনুমান করতে পারেন যে, যতোদিন এ নির্বাচন পদ্ধতি প্রচলিত আছে, ততোদিন জাতির কোনো সম্ভ্রান্ত, সৎ ও ঈমানদার ব্যক্তির জয়লাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। এ নির্বাচন পদ্ধতির স্বভাব-প্রকৃতিই এই যে, জাতির নিকৃষ্টতম ব্যক্তিই নির্বাচিত হতে এবং যে ধরনের চরিত্রহীনতার মাধ্যমে সে নির্বাচনে জয়লাভ করে, তার ভিত্তিতেই সে দেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করবে।

এ নির্বাচন পদ্ধতি একেবারে পরিবর্তন করতে হবে। তার স্থলে কি পদ্ধতি হতে পারে যার মাধ্যমে উৎকৃষ্ট মানের লোক নির্বাচিত হতে পারে? তার এক সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা আমি আপনাদের সামনে পেশ করছি। তারপর আপনারা বিবেচনা করে দেখুন যে, এ পদ্ধতিতে শাসন ব্যবস্থার সংস্কার-সংশোধন আশা করা যায় কিনা।

প্রথম কথা, এই নির্বাচন হবে নীতিভিত্তিক ব্যক্তি, অঞ্চল অথবা গোত্রীয় স্বার্থে হবে না।

দ্বিতীয়ত, মানুষকে এ তারবিয়ত দিতে হবে যাতে করে তারা একথা বুঝার যোগ্য হয় যে, একটি সংস্কারমূলক কর্মসূচি কার্যকর করতে হলে কোন্ ধরনের লোক উপযোগী হতে পারে এবং তাদের মধ্যে কি কি নৈতিক গুণাবলী ও মানসিক যোগ্যতা থাকা উচিত।

তৃতীয়ত, স্বয়ং প্রার্থী হওয়া এবং অর্থ ব্যয় করে ভোট সংগ্রহ করার পদ্ধতি বন্ধ করতে হবে। কারণ এভাবে শুধু স্বার্থপর ব্যক্তিই নির্বাচিত হয়ে আসবে। তার পরিবর্তে এমন কোনো পদ্ধতি হওয়া উচিত, যার দ্বারা প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকায় সম্ভ্রান্ত ও বিবেকসম্পন্ন লোক একত্রে সমবেত হয়ে কোনো উপযুক্ত লোকের সন্ধান করবে। অত:পর তাকে তাদের প্রতিনিধি হওয়ার জন্যে আবেদন জানানো

হবে। তারপর নিজেরা চেষ্টা-চরিত্র করে, অর্থ ব্যয় করে তাকে বিজয়ী করার চেষ্টা করবে। এভাবে যারা নির্বাচিত হবে, তারাই নিঃস্বার্থভাবে দেশের কল্যাণের জন্যে কাজ করবে।

চতুর্থত, এভাবে কোনো পঞ্চায়েত তাদের এলাকার প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে যার নাম প্রস্তাব করবে, তার কাছ থেকে জনসাধারণের সামনে এ শপথ নিতে হবে যে, সে পঞ্চায়েত কর্তৃক গৃহীত ঘোষণাপত্র (মেনিফেস্টো) মেনে চলবে; সংসদে গিয়ে ঐসব লোকের সাথে মিলে-মিশে কাজ করবে, যারা ঐ মেনিফেস্টো কার্যকর করার জন্যে ঐ একই পন্থায় অন্য এলাকা থেকে বিজয়ী হয়ে সংসদে এসেছে। আর যখনই পঞ্চায়েত তার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করবে, তখন সে সদস্য পদে ইস্তফা দান করবে।

পঞ্চমত, এবং শেষ কথা এই যে, যেসব কর্মী সে ব্যক্তিকে বিজয়ী করার জন্যে চেষ্টা করবে, তাদের কাছ থেকে এ শপথ নিতে হবে যে, তারা নৈতিকতা এবং নির্বাচন-বিধি পুরোপুরি মেনে চলবে। কোনো কুসংস্কার বা গোঁড়ামির নাম করে ভোটের জন্যে আবেদন জানাবে না। কারো জবাবে মিথ্যা, অপবাদ এবং জালিয়াতির আশ্রয় নেবে না। কারো ভোট পয়সা দিয়ে খরিদ করতে অথবা চাপ সৃষ্টি করে হাসিলের চেষ্টা করবে না। কোনো জাল ভোট রেকর্ড করাবে না, জয় হোক বা পরাজয় হোক। মোট কথা, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা নির্বাচনী যুদ্ধ সততা এবং বিশ্বস্ততার সাথে একেবারে নীতিসম্মত উপায়ে পরিচালনা করবে।

আমার ধারণা এই যে, যদি এদেশের নির্বাচনে পাঁচটি পদ্ধতি পরীক্ষা করে দেখা যায়, তাহলে গণতন্ত্রকে প্রায় পরিচ্ছন্ন করা যাবে। প্রথম প্রচেষ্টায় যে এর সুফল পাওয়া যাবে, তা জরুরি নয়। তবে একবার নির্বাচন যদি এ পথে পরিচালনা করা যায়, তাহলে গণতন্ত্রের স্বভাব-প্রকৃতি একেবারে পরিবর্তন করে দেয়া যেতে পারে। হয়তো এ পদ্ধতিতে শাসন ব্যবস্থার সত্যিকার পরিবর্তন সাধনে পঁচিশ-ত্রিশ বছর লাগবে অথবা তার বেশি। কিন্তু আমি মনে করি, পরিবর্তনের এটাই সুদৃঢ়পন্থা হবে।

বন্ধুগণ! আমি আমার এ ভাষণে রোগ ও রোগের কারণ ব্যাখ্যা করে আপনাদের সামনে পেশ করছি। এর প্রতিকারও বয়ান করেছি। সেই সাথে সেই উদ্দেশ্যও পেশ করেছি, যার জন্যে আমরা প্রতিকারের এ চেষ্টা করছি। এখানে আমার মতামত কতোটা গ্রহণযোগ্য, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আপনাদের কাজ।

◆◆◆

(১১)

ইসলামের জীবন পদ্ধতি

[পুস্তিকাটি মূলত কয়েকটি রেডিও বক্তৃতার সংকলন: ১. ইসলামের নৈতিক ব্যবস্থা, ৬ই জানুয়ারি ১৯৪৮ ঈসায়ী, রেডিও পাকিস্তান. লাহোর। ২. ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা, ২০শে জানুয়ারি ১৯৪৮ ঈসায়ী রেডিও পাকিস্তান, লাহোর। ৩. ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ ঈসায়ী রেডিও পাকিস্তান, লাহোর। ৪. ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ২ মার্চ ১৯৪৮ ঈসায়ী রেডিও পাকিস্তান, লাহোর। ৫. ইসলামের আধ্যাত্মিক ব্যবস্থা, ১৬ মার্চ ১৯৪৮ ঈসায়ী রেডিও পাকিস্তান, লাহোর।]

ইসলামের নৈতিক আদর্শ

মানুষের প্রকৃতিতে চরিত্রের অনুভূতি একটা স্বাভাবিক অনুভূতি। ইহা এক প্রকারের গুন ও কাজকে পছন্দ করে এবং আর এক প্রকারের গুণ ও কাজকে করে অপছন্দ। এ অনুভূতি ব্যক্তিগতভাবে মানুষের মধ্যে কমও হতে পারে, বেশিও হতে পারে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে মানবতার তীব্র চেতনা চরিত্রের কোনো কোনো গুণকে ভালো এবং কোনো কোনো গুণকে মন্দ বলে চিরদিন একইরূপে অভিহিত করেছে। সততা, সুবিচার, ওয়াদাপূর্ণ করা এবং বিশ্বাসপরায়ণতাকে চিরদিন মানব চরিত্রের প্রশংসনীয় গুণ বলে মনে করা হয়েছে। মিথ্যা, যুলুম, প্রতিশ্রুতি ভংগ করা ও বিশ্বাসঘাতকতাকে মানবেতিহাসের কোনো যুগেই পছন্দ করা হয়নি। সহানুভূতি, দয়া, দানশীলতা এবং উদারতাকে চিরদিনই সম্মান করা হয়েছে। পক্ষান্তরে স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা, কৃপণতা ও সংকীর্ণ দৃষ্টিকে কোনো দিনই মর্যাদা দান করা হয়নি। ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা ও আদর্শপরায়ণতা এবং বীরত্ব ও উচ্চ আশা চিরদিনই শ্রদ্ধা পাবার উপযুক্ত গুণ হিসেবে গণ্য হয়েছে। পক্ষান্তরে অস্থিরতা, নীচতা, খোশামোদি, হীন মনোবৃত্তি ও কাপুরুষতাকে কোনো দিনই অভিনন্দিত করা হয়নি। আত্মসংযম, আত্মসম্মান জ্ঞান, নিয়মানুবর্তিতা ও অকপট মেলামেশাকে চিরদিনই মানুষের বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং প্রবৃত্তির গোলামী, অশালীন আচরণ, সংকীর্ণতা, বে-আদবী ও কুটিল মনোবৃত্তি মানব চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের তালিকায় কোনো দিনই স্থান পায়নি। কর্তব্যপরায়ণতা, প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা, কর্মপটুতা এবং দায়িত্ববোধ চিরদিনই সম্মান পেয়ে এসেছে। কিন্তু কর্তব্য সম্পর্কে উদাসীন, দায়িত্বজ্ঞানহীন, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী ও কর্মবিমুখ মানুষকে কোনো দিনই সু-নজরে দেখা হয়নি। এভাবে সমাজ জীবনের ভালো ও মন্দ গুণাবলী সম্পর্কেও মানবতার সিদ্ধান্ত চিরকাল প্রায় একই

প্রকারের রয়েছে। পৃথিবীর দরবারে সম্মান এবং মর্যাদা চিরদিন কেবল সেই সমাজই লাভ করতে পেরেছে যাতে নিয়ম-শৃংখলা আছে, সহানুভূতি ও পারস্পরিক সহযোগিতা আছে, পারস্পরিক ভালোবাসা ও হিতাকাংখা আছে এবং সামাজিক সুবিচার ও সাম্য ব্যবস্থা আছে। দলাদলি উচ্ছৃংখলতা, ভেদ-বৈষম্য, অনিয়ম, অনৈক্য, পারস্পরিক শত্রুতা, যুলুম ও অসহযোগিতাকে দুনিয়ার ইতিহাসে কোনো দিনই সামাজিক সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গণ্য করা হয়নি। কাজ-কর্মের ভালো-মন্দ সম্পর্কেও একথা সম্পূর্ণ রূপে সত্য। চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, হত্যা, জালিয়াতি ও ঘুষখোরীকে কোনো দিনই ভালো কাজ বলে মনে করা হয়নি। কটূক্তি, নিপীড়ন, কুৎসা , চোগলখুরী, হিংসা-দ্বেষ, অকারণে দোষারোপ এবং মানব সমাজে অশান্তি ও উচ্ছৃংখলতা সৃষ্টি করাকে কোনো সময়েই পূণ্যের কাজ বলে মনে করা হয়নি। প্রতারক, ধোঁকাবাজ, অহংকারী, রিয়াকারী (শুধু পরকে দেখাবার জন্য যে পুণ্যের কাজ করে) মুনাফিক ও অন্যায় জেদপরায়ণ এবং লোভী ব্যক্তি কখনও ভালো লোকের মধ্যে পরিগণিত হয়নি। পক্ষান্তরে পিতা-মাতার খেদমত করা, আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করা, পাড়া প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করা, বন্ধু-বান্ধবের সাথে অকপট ও আন্তরিক সম্বন্ধ স্থাপন করা, ইয়াতিম, মিসকীন ও অসহায় লোকদের দেখাশুনা করা, রুগ্ন ও অসুস্থ লোকদের সেবা শুশ্রুষা করা এবং বিপদগ্রস্ত লোকদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা চিরকালই নেকীর কাজ বলে অভিহিত হয়েছে। সৎকর্মশীল, মিষ্টভাষী, কোমল স্বভাব ও হিতাকাংখী মানুষ চিরদিনই সম্মান লাভ করেছে। মানবতা চিরদিনই সেসব লোককেই শ্রেষ্ঠ ও উত্তম বলে মনে করে এসেছে যারা সত্যবাদী, সত্যের অনুসন্ধানকারী, যাদের উপর সকল কাজেই নির্ভর করা চলে, যাদের ভিতর বাহির একই প্রকার এবং যাদের কথা ও কাজে পরিপূর্ণ মিল আছে, যারা শুধু নিজেদের প্রাপ্য অংশ লাভ করে তৃপ্ত হন এবং অন্যের অধিকারকে উদার চিত্তে আদায় করে থাকেন, যারা নিজেরা শান্তিতে থাকতে অভ্যস্ত এবং মানুষকেও শান্তি দান করতে যত্নবান, যাদের নিকট হতে প্রত্যেকেই মঙ্গলময় কাজের আশা করতে পারে এবং যাদের দ্বারা কিছুমাত্র ক্ষতি-লোকসান হবার কারো আশংকা থাকে না।

এ আলোচনা হতে স্পষ্টরূপে জানা গেলো যে, মানব চরিত্র মূলত এমন এক বিশ্বব্যাপী সনাতন সত্য যা দুনিয়ার সকল মানুষই অবগত আছে। পাপ ও পূণ্য কিংবা ভালো ও মন্দ এমন কোনো গোপনীয় বস্তু নয় যে, সেটাকে অন্য কোনো স্থান হতে খুঁজে বের করে আনতে হবে। এটাতো মানুষের জ্ঞাত ও চির পরিচিত সত্য। এর চেতনা ও অনুভূতি মানব প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবে ঠিক। এ কারণেই পবিত্র কুরআন নেকীকে 'মারূফ' (জানা) এবং পাপকে 'মুনকার' (অজানা) নামে অভিহিত করেছেন। নেকী তা-ই যাকে সকল মানুষ ভালো বলে জানে এবং পাপ

তাই যাকে কোনো মানুষই ভালো বলে জানে না। এ তথ্য সম্পর্কেই পবিত্র কুরআনের ভাষায় বলা হয়েছে : فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا
"আল্লাহ তায়ালা মানব প্রকৃতিতে ভালো এবং মন্দের জ্ঞান স্বাভাবিকভাবেই দান করেছেন।" (সূরা আশ শামস : ৮)

চরিত্রের আদর্শ বিভিন্ন কেন?

কিন্তু এখন প্রশ্ন এই যে, চরিত্রের ভালো-মন্দ যখন সর্বজন জ্ঞাত ও পরিচিত এবং মানুষের এক প্রকারের গুণকে ভালো ও অন্য এক প্রকারের গুণকে মন্দ মনে করার ক্ষেত্রে সমগ্র দুনিয়া চিরদিন অভিন্ন মত পোষণ করেছে, এখন চরিত্র সম্পর্কে এরূপ বিভিন্ন আদর্শের সৃষ্টি হলো কেন? দুনিয়ার এ বিভিন্ন চরিত্র নীতির মধ্যে এরূপ পার্থক্য হবারই বা কারণ কি? চরিত্র সম্পর্কে ইসলামের আদর্শ সম্পূর্ণ আলাদা ; একথা কোনো কারণে বলা হয় এবং চরিত্রের ব্যাপারে ইসলামের এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে বলে দাবি করার মূলে এর বিশেষ অবদানই বা (contribution) কি? এ বিষয়টি বুঝার জন্য যখন আমরা দুনিয়ার বিভিন্ন চরিত্রনীতির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তখন প্রথম দৃষ্টিতেই আমরা এ পার্থক্য দেখতে পাই যে, জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রে বিভিন্ন নৈতিক গুণকে প্রযুক্ত করা এবং তাদের সীমা ও তাদের পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করার ব্যাপারে দুনিয়ার চরিত্রনীতিগুলোর একটির সাথে অন্যটির মিল নেই। আরো একটু গভীর দৃষ্টিতে দেখলে এ পার্থক্যের কারণ জানা যায় এবং তা এই যে, মূলত চরিত্রের ভালো-মন্দের মাপকাঠি নির্বাচন এবং ন্যায়-অন্যায় সংক্রান্ত জ্ঞানলাভের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করার ব্যাপারেই এদের একটির সাথে আর একটির সাদৃশ্য নেই। উপরন্তু আইনের পশ্চাতে কোনো কার্যকরী শক্তি (sanction) বর্তমান থাকবে যার চাপে এটা প্রবর্তিত হবে এবং কিসের প্রেরণায়ইবা মানুষ তা পালন করতে উদ্বুদ্ধ হবে ; এ মৌলিক প্রশ্নেও চরিত্রনীতিগুলোর মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। কিন্তু এই পার্থক্য ও গরমিলের মুল কারণ যখন আমরা খুঁজে দেখতে চেষ্টা করি, তখন শেষ পর্যন্ত এ নিগূঢ় তত্ত্ব আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, বিশ্ব প্রকৃতি, বিশ্ব প্রকৃতির অভ্যন্তরে মানুষের মর্যাদা এবং সেই দুনিয়ার মানুষের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকারের ধারণা থাকার দরুনই চরিত্রনীতিগুলো বিভিন্ন পথে পরিচালিত হয়েছে এবং ধারণার এই বিভিন্নতাই মূল হতে শুরু করে শাখা পর্যন্ত এদের মূল ভাবধারা, এদের মেযাজ ও প্রকৃতি এবং এদের রূপ কাঠামোকে পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন করে দিয়েছে। মানুষের জীবনে আসল সিদ্ধান্তমূলক প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, এ বিশ্ব প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা কেউ আছে কিনা? থাকলে তা বহু না এক? সৃষ্টিকর্তা যাকেই স্বীকার করা হবে তাঁর গুনাবলী কি? আমাদের সাথে তাঁর কিসের সম্পর্ক? তিনি আমাদের পথ-প্রদর্শনের কোনো ব্যবস্থা করেছেন কি?

আমরা তাঁর নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য হবো কি? জবাবদিহি করতে হলে কিসের জবাবদিহি করতে হবে? আমাদের জীবনের পরিণতি কি? কোনো্ উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাদেরকে কাজ করতে হবে? বস্তুত এ সকল প্রশ্নের জবাব যে ধরনের হবে তদনুযায়ীই জীবন ব্যবস্থা রচিত হবে এবং এর সাথে সংগতি রেখে চরিত্রনীতি নির্ধারিত হবে।

এ সংক্ষিপ্ত আলোচনায় দুনিয়ার বিভিন্ন জীবন পদ্ধতি পর্যালোচনা করা, উল্লেখিত প্রশ্নগুলি সম্পর্কে এদেরকে কি জবাব দিয়েছে এবং সেই জবাব তার স্বরূপ ও পথ নির্ধারণের কি প্রভাব বিস্তার করেছে, তা এখানে বিস্তারিত প্রকাশ করে বলা আমার পক্ষে কঠিন। কাজেই উল্লেখিত প্রশ্নগুলি সম্পর্কে ইসলামের জবাব এবং সেই অনুযায়ী রচিত বিশেষ ধরনের চরিত্র বিধান সম্পর্কেই আমি আলোচনা করবো।

ইসলামের জবাব

ইসলামের জবাব এই যে, এ বিশ্ব প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা আছেন এবং তিনি এক ও একক। তিনি নিখিল দুনিয়াকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি এর একচ্ছত্র মালিক, একমাত্র আইন রচয়িতা, পালনকর্তা ও প্রভু। তাঁরই আনুগত্য ও দাসত্বের ভিত্তিতে এ বিশ প্রকৃতি সু-শৃংখলার সাথে চলছে। তিনি সর্বজ্ঞ, বুদ্ধিমান ও প্রতিভাশালী। তিনি সকল শক্তির আধার। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সবকিছুই তাঁর জ্ঞাত। তিনি দোষ-ত্রুটি, দুর্বলতা ও অভাব-অভিযোগের কলংক হতে পবিত্র। নিখিল জাহানের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুর উপর তার প্রভুত্ব ও আধিপত্য নিরংকুশ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মানুষ তার জন্মগত দাস সৃষ্টিকর্তার দাসত্ব ও আনুগত্য করাই তার জীবনের একমাত্র কাজ। আল্লাহর দাসত্ব করার আদর্শ ছাড়া তার জীবন যাপনের অন্য কোনো বিশুদ্ধ পন্থা হতে পারে না। এ দাসত্ব ও আনুগত্যের পন্থা ও রীতিনীতি নির্ধারণ করা মানুষের কাজ নয়, এ সেই আল্লাহ তায়ালা যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার দাসত্ব সে কবুল করেছে। আল্লাহ তাঁর পথ দেখাবার জন্য পয়গাম্বর পাঠিয়েছেন এবং কিতাব নাযিল করেছেন। জীবন যাপনের পরিপূর্ণ বিধান সৎপথ লাভ করার পন্থা এহেন উৎস হতেই গ্রহণ করা মানুষের অবশ্য কর্তব্য। জীবনের সমগ্র কাজ-কারবারের জন্য আল্লাহ তায়ালার সামনে মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে এবং এ জবাবদিহি তাকে এ দুনিয়ায় করতে হবে না করতে হবে পরকালে জীবনে। দুনিয়ার বর্তমান জীবন মূলত একটা পরীক্ষার সময় এবং পরকালে আল্লাহ তায়ালার সামনে এ জবাবদিহির ব্যাপারে সফলতা লাভ করার উদ্দেশ্যেই মানুষের জীবনের সমস্ত চেষ্টা-সাধনাকে কেন্দ্রীভূত করা আবশ্যক। মানুষ তার সমগ্র সত্তাকে নিয়েই এ পরীক্ষার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ। এটা তার সমগ্র শক্তি এবং যোগ্যতার পরীক্ষা। জীবনের সকল দিক ও বিভাগ ব্যাপিয়াই তার এ পরীক্ষা। সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতির

বুকে মানুষকে যেসব জিনিসের সম্মুখীন হতে হয় সে তাহর সাথে কি রকম ব্যবহার করলো, তা নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে যাচাই করে দেখা আবশ্যক। এ যাচাই করার কাজ শুধু সেই শক্তিমান সত্তাই নিখুঁতরূপে করবেন যিনি পৃথিবীর প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু, বাতাস ও পানি, প্রকৃতির আবর্তন এবং স্বয়ং মানুষের মন ও মগয হাত ও পায়ের শুধু নড়াচড়া গতিবিধিরই নয়, তার চিন্তা ও আকাংখার পর্যন্ত রেকর্ড সুরক্ষিত করে রেখেছেন। ইসলাম মানব জীবনের বুনিয়াদী জিজ্ঞাসাগুলোর এ জবাবই দিয়েছে। বিশ্ব প্রকৃতিও মানব সম্পর্কে ইসলামের এ ধারণাই সেই আসল ও সর্বশেষ কল্যাণকে নির্দিষ্ট করে দেয় যা লাভ করা মানুষের সমস্ত চেষ্টা-সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সন্তোষ। ইসলামের চরিত্র বিধানে কোনো প্রকারের কার্যকলাপ ভালো নয় তা এ মাপকাঠি দ্বারাই পরিমাপ করে ঠিক করা যায়। উপরন্তু মানব জীবনের সর্বশেষ উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট হওয়ার পর মানুষের চরিত্র এমন একটা কেন্দ্রবিন্দু লাভ করতে পারে, যাকে কেন্দ্র করে সমগ্র চারিত্রিক জীবন আবর্তিত হতে পারে এবং ঠিক তখনি মানব চরিত্র এর নিজস্ব কেন্দ্রবিন্দুতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্টিত ও মজবুত হতে পারে। তখন তার অবস্থা কোনো নোঙরহীন জাহাজের মতো হতে পারে না, যা সামান্য দমকা হাওয়ায় কিংবা সমুদ্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের আঘাতে একদিক হতে অন্যদিকে চলে যায়। এভাবে মানব জীবনের উদ্দেশ্য সুনির্ধারিত হওয়ার ফলে মানুষের সামনে একটা কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য উপস্থিত হয় এবং সেই অনুসারেই মানব জীবনের চরিত্রগত সমস্ত গুণের উপযুক্ত সীমা, উপযুক্ত অবস্থান এবং উপযুক্ত কর্মপন্থা নির্ধারিত হয়। এভাবে আমরা এমন এক শাশ্বত ও চিরন্তন নৈতিক মূল্যায়ন (values) লাভ করতে পারি, যা সমস্ত পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্যেও নিজ কেন্দ্রবিন্দুতে সুদৃঢ় ও স্থায়ী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। এছাড়া সবচেয়ে বড় কথা এই যে, আল্লাহ তায়ালার সন্তোষ লাভ করাই মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নির্ধারিত হওয়ার ফলে মানব চরিত্র একটা সর্বোচ্চ লক্ষ্য লাভ করে, এর দরুন চারিত্রিক ক্রমবিকাশের সম্ভাবনা সীমাহীন হতে পারে। অতপর জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই স্বার্থপরতা ও স্বার্থ পূজার পংকিলতা মানুষকে কলংকিত করতে পারে না।

চারিত্রিক ভালো মন্দের মাপকাঠি

ইসলাম একদিকে যেমন আমাদের চরিত্রের ভালো-মন্দের মাপকাঠি দিয়েছে অন্যদিকে তেমনি তার বিশ্ব প্রকৃতি ও মানব সম্পর্কিয় ধারণার সাহায্যে নৈতিক ভালো-মন্দ সংক্রান্ত জ্ঞান লাভের একটি পূর্ণাংগ মাধ্যমও দান করেছে। এবং আমাদের ভালো মন্দ আমাদের চরিত্র সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করার জন্য শুধু মানব

বুদ্ধি কিংবা প্রবৃত্তি নিছক অভিজ্ঞতা অথবা মানুষের অর্জিত বিদ্যার উপরই একান্ত ভাবে নির্ভর করতে বলেনি। কারণ তাহলে এসবের পরিবর্তনশীল সিদ্ধান্ত অনুসারে আমাদের নৈতিক বিধি-নিষেধগুলোও চিরদিনই পরিবর্তিত হয়ে যেতো এবং কোনো একটি কেন্দ্রে স্থায়ী হয়ে দাঁড়ানো এর পক্ষে কখনই সম্ভব হতো না। বস্তুত ইসলাম আমাদের একটা সুনির্দিষ্ট উৎস দান করেছে, এটা হতে আমরা প্রত্যেক যুগেই এবং প্রত্যেক অবস্থাতেই প্রয়োজনীয় নৈতিক বিধান লাভ করতে পারি সেই উৎস হচ্ছে আল্লাহর কুরআন এবং রাসূলের হাদীস। এটা দ্বারা আমরা এমন একটা ব্যাপক বিধান লাভ করতে পারি যা মানুষের পারিবারিক জীবনের খুঁটিনাটি ব্যাপার হতে শুরু করে আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিরাট বিরাট সমস্যাসহ জীবনের প্রত্যেকটা দিক ও প্রত্যেকটা শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট নির্দেশ দিতে পারে। মানব জীবনের বিপুল কাজ-কর্মের ব্যাপারে ইসলামের এ নৈতিক বিধানকে সমাজে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করতে (widest application) দিলে কোনো অবস্থায়ই আমাদের অন্য কোনো উৎসের মুখাপেক্ষী হবার প্রয়োজন হয় না।

তাছাড়া বিশ্ব প্রকৃতি ও মানব সম্পর্কে ইসলামের এ ধারণার এমন একটা উদ্বোধক ও প্রেরণাদায়ক শক্তিও বর্তমান রয়েছে, যা চরিত্র সম্পর্কীয় আইনের পশ্চাতে বিদ্যমান থাকা একান্ত আবশ্যক। সেই শক্তি হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার ভয়, পরকালের জবাবদিহির আশংকা এবং চিরকালীন ধ্বংসের মধ্যে পড়ার ভয়াবহ আতঙ্ক। যদিও ইসলাম এমন একটা শক্তিশালী জনমতও গঠন করতে চায়, যা সমাজ জীবনে ব্যক্তি এবং দলগুলোকে চারিত্রিক নিয়ম-কানুন পালন করে চলতে বাধ্য করতে পারে এবং এমন একটা রাষ্ট্রব্যবস্থাকেও স্থাপন করতে চায়, যার ক্ষমতা দুনিয়ার চারিত্রিক আইনগুলোকে শক্তির বলে জারী করতে পারে। কিন্তু এ বাহ্যিক চাপের উপর ইসলামের প্রকৃত কোনো নির্ভরতা নেই। এর পরিপূর্ণ নির্ভরতা হচ্ছে মানুষের আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাসের অন্তর্নিহিত চাপের উপর। চরিত্রের বিধিনিষেধ জারী করার পূর্বে ইসলাম মানুষের মনে একথা বিশেষভাবে বদ্ধমূল করে দিতে চায় যে, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বত্র বিরাজমান আল্লাহর সংগেই মানুষের প্রকৃত সম্পর্ক। দুনিয়াবাসীর চোখ হতে মানুষ আত্মগোপন করতে পারে ; কিন্তু আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টি হতে সে কিছুতেই আত্মগোপন করতে পারে না। সারা দুনিয়াকে মানুষ ধোঁকা দিতে পারে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালাকে ধোঁকা দেয়ার কারো সাধ্য নেই। দুনিয়া ত্যাগ করে মানুষ অন্যত্র চলে যেতে পারে কিন্তু আল্লাহ তায়ালার কঠিন মুষ্ঠির বাইরে সে কিছুতেই যেতে পারে না। দুনিয়া দেখতে পারে শুধু বাইরের দিক ; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা মানব মনের গোপন ইচ্ছা-বাসনা পর্যন্ত জানতে পারেন। দুনিয়ার এ সংক্ষিপ্ত

জীবনে তোমরা যা ইচ্ছা করতে পারো, কিন্তু একথা মনে রেখো যে, একদিন তোমাকে অবশ্যই মরতে হবে। তখন সেখানে উকিল নিযুক্ত করা, ঘুষ দেয়া, যামিন সুপাারিশ পেশ করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, ধোঁকা দেয়া ও প্রতারণা করা কিছুই চলবে না। সেখানে তোমার ভবিষ্যত জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্ভুল ও শেষ সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। এ বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দিয়ে ইসলাম যেনো প্রত্যেকটি মানুষের মনে একটা পুলিশ বাহিনীর কড়া পাহারা নিযুক্ত করে দিয়েছে। চরিত্রের বিধি-নিষেধ পালন করার জন্য এটা মনের অভ্যন্তর হতে মানুষকে নিরন্তর বাধ্য করতে থাকে। এ আইন পালন করতে বাধ্য করার জন্য বাইরের কোনো পুলিশ, কোনো আদালত এবং কারাগার বর্তমান থাকুক আর না-ই থাকুক তাতে কিছুই আসে যায় না। ইসলামের নৈতিক আইনের পশ্চাতে এটাই হচ্ছে আসল শক্তি যা এটাকে বাস্তব ক্ষেত্রে নিরন্তর জারী করে থাকে। তারপর জনমত এবং রাষ্ট্রশক্তি এর সাহায্য ও সহযোগিতা করলে তো সোনায় সোহাগা, নতুবা শুধু এ 'ঈমান'ই মুসলমান ব্যক্তি ও জাতিকে সৎপথে পরিচালিত করার জন্য যথেষ্ট। অবশ্য সেই ঈমান এতদূর প্রবল হওয়া আবশ্যক, যেনো তা মানব হৃদয়ের গভীর মর্মমূলকে পরিব্যাপ্ত করে নিতে পারে।

সৎকাজের প্রেরণা

বিশ্ব প্রকৃতি ও মানব সম্পর্কে ইসলামের এ ধারণা মানব হৃদয়ে এমন এক দুর্নিবার আবেগ সৃষ্টি করে যা চারিত্রিক আইন-কানুন পালন করার জন্য মানুষকে নিরন্তর অনুপ্রাণিত করতে থাকে। মানুষ যখন নিজ ইচ্ছাতেই আল্লাহকে আল্লাহ বলে এবং তাঁর দাসত্ব করাকে জীবনের একমাত্র পথ বলে স্বীকার করে আর আল্লাহ তায়ালার সন্তোষ লাভ করাকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করে তখনই সে নিজে অন্তরের আবেদনেই আল্লাহ তায়ালার হুকুম-আহকাম ও বিধি-নিষেধগুলো পালন করবে। এই সঙ্গে পরকাল বিশ্বাসও একটা উদ্বোধক শক্তি, কারণ সে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে যে, যে ব্যক্তিই আল্লাহ তায়ালার হুকুম-আহকাম অনুসরণ করবে, দুনিয়ার এ অস্থায়ী জীবনে তাকে যতোই দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে এবং অভাব-অভিযোগ ও নির্যাতন নিপীড়নের সম্মুখীন হতে হোক না কেন পরকালে তার চিরস্থায়ী জীবনে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যত লাভ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এ দুনিয়ায় আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য হবে, দুনিয়ায় এ সংক্ষিপ্ত জীবনে সে যতোই আনন্দ স্ফুর্তি ও আয়েশ-আরাম লাভ করুক না কেন পরকালে তাকে চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে হবে, তাতে সন্দেহ নেই। বস্তুত এ আশা, এ ভয় এবং বিশ্বাস কোনো মানুষের মনে যদি বদ্ধমূল হতে পারে, তবে তার অন্তর্নিহিত এ বিরাট উদ্বোধক শক্তি তাকে এমন সব স্থানে পুণ্যের কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পারে যেখানে পুণ্যের পার্থিব ফল মারাত্মক

ক্ষতির কারণ হবে এবং এমন সময়ও তাকে পাপ ও অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখতে পারে, যখন এ পাপের কাজ খুবই লাভজনক ও লোভনীয় হয়ে দাঁড়াবে।

ইসলামের চারিত্রিক আদর্শের বৈশিষ্ট্য

উপরের বিস্তারিত আলোচনায় একথা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, ইসলামের বিশ্ব প্রকৃতি সংক্রান্ত ধারণা, এর ভালো মন্দের মাপকাঠি, এর চরিত্র সম্পর্কীয় জ্ঞানের উৎস এবং এর উদ্বোধক ও প্রেরণা শক্তি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন জিনিস। এদেরই সাহায্যে ইসলাম এর সুপরিচিত চরিত্রনীতির উপাদানগুলোকে নিজের মূল্যায়ন অনুসারে সজ্জিত করে মানব জীবনের সমগ্র বিভাগে পর্যায়ক্রমে জারী করে। এরই উপর ভিত্তি করে অনায়াসেই বলা যেতে পারে যে, ইসলামের চরিত্র বিধান পরিপূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বতন্ত্র জিনিস। এ বিধানের বৈশিষ্ট্য যদিও অসংখ্য কিন্তু এর মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যেগুলোকে এ বিধানের অভিনব অবদান বলা যেতে পারে।

আল্লাহ তায়ালার সন্তোষ

এর প্রথম বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা আল্লাহ তায়ালার সন্তোষ লাভকে মানব জীবনের সর্বশেষ উদ্দেশ্য নির্ধারিত করে চরিত্রের জন্য এমন একটা উন্নত মাপকাঠি ঠিক করেছে যার দরুন মানব চরিত্রের উন্নতি ও ক্রমবিকাশের সীমাহীন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। চরিত্র সম্পর্কীয় জ্ঞান লাভ করার জন্য একটি মাত্র উৎসকে নির্দিষ্ট করে দেয়ার ফলে ইসলামী চরিত্র এতোখানি স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা লাভ করেছে যে, তাতে উন্নতির সম্ভাবনা তো পুরোপুরিই বর্তমান, কিন্তু বিভিন্ন ব্যাপারে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে বহুরূপী সাজার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। আল্লাহ তায়ালার ভয় মানব হৃদয়ের এমন একটি বিরাট শক্তি, যা বাইরের কোনো চাপ ছাড়া মানুষকে চরিত্রের নিয়ম-কানুন পালন করতে ভিতর হতেই উদ্বুদ্ধ করতে থাকে এবং আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাস এমন এক শক্তি দান করে, যার দরুন মানুষ নিজের মনের আগ্রহেই চরিত্রের বিধি-নিষেধ পালন করতে প্রস্তুত হয়।

ভালো মন্দের পরিচয়

এর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা শুধু অবাস্তব কল্পনার সাহায্যে কতগুলো আশ্চর্য ধরনের চরিত্রনীতি ঠিক করেনি এবং মানুষের সর্ববাদী সমর্থিত চরিত্রনীতির এক অংশের মূল্য কম এবং অপর অংশের মূল্য বেশি দেখাবার চেষ্টাও এটা করেনি। ইসলাম এমন সব জিনিসকে চরিত্রের অন্তর্ভূক্ত করেছে, যা দুনিয়ার সকল মানুষের দ্বারাই সমর্থিত এবং এর কিছুটা অংশ নিয়েই যথেষ্ট মনে করা হয়নি বরং এর সবটুকুকেই সে নিজের নীতি বলে গ্রহণ করেছে। তারপর একটা

পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতার সাথে মানুষের জীবনে তার একটা স্থান, একটা মর্যাদা এবং একটা সুস্পষ্ট ব্যবহার ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করেছে। ইসলাম এর ব্যাপক চরিত্রনীতিকে মানব জীবনে এমন সামঞ্জস্যের সাথে প্রযুক্ত করেছে যে, ব্যক্তিগত কাজ-কারবার, পারিবারিক সম্পর্ক, নাগরিক জীবন, আভ্যন্তরীণ রাজনীতি, অর্থনৈতিক আদান-প্রদান, বাজার-বন্দর-শিক্ষাগার, আদালত ফৌজদারী, পুলিশ লাইন, সেনানিবাস, যুদ্ধের ময়দান, স্বস্তি পরিষদ মোটকথা মানব জীবনের প্রত্যেকটি দিক ও বিভাগের উপর ইসলামের ব্যাপক চরিত্রনীতির সুস্পষ্ট প্রভাব বর্তমান। মানব জীবনের প্রত্যেকটি দিক ও বিভাগের উপর ইসলাম স্বীয় চরিত্রনীতিকেই একমাত্র 'শাসক' নিযুক্ত করেছে এবং জীবনের যাবতীয় কাজ-কারবারের চাবিকাঠি প্রবৃত্তি, স্বার্থবাদ এবং সুবিধাবাদের পরিবর্তে, চরিত্রের হাতে ন্যস্ত করাই ইসলামের ঐকান্তিক চেষ্টা।

মুসলিম জাতির প্রতিষ্ঠা

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, ইসলাম মানবতার কাছে এমন এক জীবন যাপন পদ্ধতি গ্রহণ করার দাবি উপস্থিত করেছে, যা স্থাপিত হবে সর্ববাদী সমর্থিত চরিত্রনীতির উপর এবং সেই চরিত্রনীতির বিরোধী কোনো জিনিসের বিন্দুমাত্র প্রভাবও তাতে থাকবে না। তার দাওয়াত হচ্ছে এই যে, যেসব মংগলময় কাজকে মানব প্রকৃতি চিরদিনই ভালো বলে মনে করেছে এসো, আমরা তা বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করি, এর উন্নতি সাধন করি। আর যেসব পাপ ও অন্যায় কাজকে মানুষ চিরকালই খারাপ মনে করেছে, অন্যায় বলে ঘৃণা করেছে এসো আমরা সেসবকে পরাজিত করি, দুনিয়ার বুক হতে চিরতরে বিলিন করে দেই। ইসলামের এ আহবানে যারা সাড়া দিয়েছে, তাদেরকে একত্রিত করে ইসলাম এক নবজাতির প্রতিষ্ঠা করেছে, এ জাতির নামই মুসলিম। এ নবজাতির প্রতিষ্ঠা দ্বারা ইসলামের একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, তারা সমস্ত ভালো ও পুণ্যের কাজকে দুনিয়ায় জারি ও কায়েম করবে এবং সমস্ত পাপ ও অন্যায় কাজকে পৃথিবীর বুক হতে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে সাধনা করবে সংগ্রাম করবে। কিন্তু আজ যদি সেই জাতিরই হাতে সত্য ও পুণ্য পরাজিত হয় এবং পাপের নগ্ন অনুষ্ঠান নিত্য নতুন উপায়ে উৎকর্ষ লাভ করে, তবে তা বড়ই দুঃখের কথা সন্দেহ নেই। সেই দুঃখ সমগ্র মুসলিম জাতির এবং সেই দুঃখ দুনিয়ার নিখিল মানুষের।

ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা

সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি

"দুনিয়ার সমস্ত মানুষ একই বংশোদ্ভূত" এ মতের উপরই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার বুনিয়াদ স্থাপিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম একজোড়া মানুষকে

সৃষ্টি করেছেন, তারপরে সেই জোড়া হতে দুনিয়ার সকল মানুষের জন্ম হয়েছে। প্রথম দিক দিয়ে একজোড়া মানুষের সন্তানগণ দীর্ঘকাল পর্যন্ত একই দল ও একই সমাজের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাদের জীবন যাপনের পদ্ধতি একই প্রকারের ছিলো ; তাদের ভাষাও ছিলো এক। কোনো প্রকার বিরোধ-বৈষম্য তাদের মধ্যে ছিলো না। কিন্তু তাদের সংখ্যা যতোই বৃদ্ধি পেতে লাগল ততোই তারা পৃথিবীর নানাদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল এবং এ বিস্তৃতির ফলে তারা অতি স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন বংশ, জাতি ও গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়ল। তাদের ভাষা বিভিন্ন হয়ে গেলো, পোশাক-পরিচ্ছদের দিক দিয়ে অনেক বৈষম্য ও বৈচিত্র দেখা দিলো। দৈনন্দিন জীবন যাপনের রীতিনীতিও আলাদা হয়ে গেলো এবং বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন আবহাওয়ায় তাদের রং, রূপ ও আকার-আকৃতি পর্যন্ত বদলিয়ে গেলো। এসব পার্থক্য একেবারেই স্বাভাবিক, বাস্তব দুনিয়ায়ই এটা বর্তমান। কাজেই ইসলামও এসবকে ঠিক একটা বাস্তব ঘটনা হিসেবেই গ্রহণ করেছে। ইসলাম এসবকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবার পক্ষপাতি নয়, বরং এসবের দ্বারা মানব সমাজে পারস্পরিক পরিচয় লাভ করা যায় বলে ইসলাম এগুলোকে স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু পার্থক্য বৈষম্যের উপর ভিত্তি করে মানব সমাজে বর্ণ, বংশ, ভাষা, জাতীয়তা এবং স্বদেশীকতার যে হিংসা-দ্বেষ উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে, ইসলাম তা কিছুতেই সমর্থন করতে পারে না, এর দৃষ্টিতে এটা সম্পূর্ণরূপেই ভুল। মানুষ এবং মানুষের মধ্যে শুধু জন্মের ভিত্তিতে উচু-নীচ, আশারফ-আতরাফ এবং আপন পরের যে পার্থক্য করা হয়েছে, ইসলামের দৃষ্টিতে তা একেবারেই জাহেলিয়াত একেবারেই মূর্খতাব্যঞ্জক। ইসলাম সমস্ত দুনিয়ার মানুষকে সম্বোধন করে বলে যে, তোমরা সকলেই এক মাতা ও এক পিতার সন্তান, তোমরা পরস্পর ভাই ভাই এবং মানুষ হওয়ার দিক দিয়ে তোমরা সকলেই সমান।

পার্থক্য ও তার কারণ

মানুষ সম্পর্কে এ ধারণা গ্রহণ করার পর ইসলাম বলে যে, মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য যদি হতে পারে, তবে তা বংশ, বর্ণ, ভৌগলিক সীমা এবং ভাষার ভিত্তিতে নয়, তা হতে পারে মনোভাব, চরিত্র ও জীবনাদর্শের দিক দিয়ে। এক মায়ের দুই সন্তান বংশের দিক দিয়ে যতোই এক হোক না কেন, তাদের মনোভাব, চিন্তাধারা এবং চরিত্র যদি বিভিন্ন রকমের হয়, জীবনের কর্মক্ষেত্রে তাদের পথও সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুই দূর সীমান্তের অধিবাসী প্রকাশ্যে যতোই দূরবর্তী হোক না কেন, তাদের মত ও চিন্তাধারা যদি এক রকমের হয়, তাদের চরিত্র যদি এক প্রকারের হয়, তবে তাদের জীবনের পথও সম্পূর্ণ এক হবে, সন্দেহ নেই। এ মতের ভিত্তিতে

ইসলাম দুনিয়ার সমগ্র বংশ এবং আঞ্চলিক ও জাতীয়তার বুনিয়াদে গঠিত সমাজের সম্পূর্ণ বিপরীত এক অভিনব সমাজ গঠন করে, যার চিন্তাধারা, মত, চরিত্র ও আদর্শ সম্পূর্ণ আলাদা। এ সমাজে মানুষ ও মানুষের মিলনের ভিত্তি শুধু জন্মগত নয় বরং তা হচ্ছে নির্দিষ্ট একটা বিশ্বাস এবং জীবনের একটা আদর্শ। যে ব্যক্তিই আল্লাহ তায়ালাকে নিজের মালিক ও প্রভু বলে স্বীকার করবে এবং নবীর প্রচারিত বিধানকে নিজ জীবনের একমাত্র আইন বলে গ্রহণ করবে, সেই ব্যক্তিই এহেন সমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে, হোক সে আফ্রিকার অধিবাসী কিংবা আমেরিকার, আর্য হোক কিংবা অনার্য, কালো হোক কিংবা গোরা, হিন্দি ভাষাভাষি হোক কিংবা আরবি ভাষাভাষি। আর যেসব মানুষ এ সমাজে প্রবেশ করবে তাদের সকলের অধিকার ও সামাজিক মর্যাদাও সম্পূর্ণ সমান হবে। তাদের মধ্যে বংশীয়, জাতীয় অথবা শ্রেণীগত বৈষম্যের কোনো স্থানই থাকবে না। সেখানে কেউ উচু আর কেউ নীচু নয়, কোনো প্রকারের ছুৎমার্গ তাদের মধ্যে থাকবে না। কারো হাতের স্পর্শে কারো অপবিত্র হয়ে যাবার আশংখা থাকবে না। বিবাহ-শাদী, খানা-পিনা, বৈঠক মেলামেশার ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনো বাধা-বিপত্তি থাকবে না। কেউ নিজ জন্ম কিংবা পেশার দিক দিয়ে নীচ কিংবা ছোট জাত বলে পরিগনিত হবে না। কেউ নিজ জাত কিংবা পরিবারের ভিত্তিতে কোনো বিশেষ অধিকার লাভ করতে পারবে না। শুধু বংশ কিংবা ধন দৌলতের কারণে কারো শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হবে না। যার চরিত্র অধিকতর ভালো এবং অন্যান্য লোক অপেক্ষা যার মনে আল্লাহর ভয় অনেক বেশি মানব সমাজে একমাত্র তারই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হবে।

বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব

এ সমাজের বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা বংশ ও ভাষার সমস্ত বৈষ্যম্য এবং ভৌগলিক সীমারেখা চূর্ণ করে পৃথিবীর কোণে কোণে বিস্তৃত হতে পারে এবং এর ভিত্তিতে দুনিয়ার নিখিল মানুষের এক বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হতে পারে। বংশীয় এবং আঞ্চলিকতার বুনিয়াদে স্থাপিত সমাজগুলোতে শুধু সেই লোকেরাই শামিল হতে পারে, যারা নির্দিষ্ট একটি বংশে কিংবা নির্দিষ্ট কোনো এক দেশে জন্মলাভ করে, তার বাইরের লোকদের পক্ষে এ ধরনের সমাজের দুয়ার চিরতরে বন্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু ইসলামের এ চিন্তা ও আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত সমাজে এ মত ও চরিত্রনীতির সমর্থক প্রত্যেকটি মানুষই প্রবেশ লাভ করতে পারে। আর যারা সেই বিশ্বাস ও চরিত্রনীতিকে সমর্থন করে না, ইসলামী সমাজ তাদের নিজের মধ্যে শামিল করে নিতে পারে না বটে কিন্তু তাদের সাথে মানবোচিত ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে এবং তাদেরকে মানবোচিত অধিকার দান করতে এটা সর্বদা প্রস্তুত থাকে। এটা সুস্পষ্ট কথা যে, এক মায়ের দুই সন্তান যদি মত ও

চিন্তাধারার দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়, তবে অবশ্য তাদের জীবন যাপন পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন হবে। কিন্তু তার অর্থ নিশ্চয়ই এটা নয় যে, তারা একে অপরের ভাই-ই-নয়। এভাবে সমগ্র মানব বংশের দু'টি দল কিংবা এক দেশের অধিবাসী লোকদের দু'টি দলও যদি ধর্মমত এবং চরিত্রনীতির দিক দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন হয় তবে তাদের সমাজও নিশ্চয় ভিন্ন ভিন্ন হবে। কিন্তু মানবতার দিক দিয়ে তারা অবশ্যই সম্পূর্ণ এক–অভিন্ন। সম্মিলিত মানবতার ভিত্তিতে সে সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক অধিকার দেয়ার ধারণা করা যেতে পারে ইসলামী সমাজ তা সবই অমুসলিম সমাজকে দিতে প্রস্তুত।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার এ মৌলিক কথাগুলো বুঝে নেয়ার পর আমরা মানবীয় মিলন-প্রীতির বিভিন্ন ব্যাপারের জন্য ইসলাম নির্ধারিত যাবতীয় নিয়ম ও রীতিনীতির আলোচনা করব।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার বুনিয়াদ

মানব সমাজের প্রাথমিক ও বুনিয়াদী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে পরিবার। একজন পুরুষ ও একজন নারী পারস্পরিক মিলনের ফলেই হয় এ পরিবারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা। এ মিলনের ফল স্বরূপ এক নতুন বংশের সৃষ্টি হয়। তারপর সেসব সন্তানের দিক দিয়ে নতুন আত্মীয়তা, সম্পর্ক এবং ভ্রাতৃত্বের একটা স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি হয়। আর সবশেষে এ জিনিসই ছড়িয়ে বিস্তৃত হয়ে একটি বিরাট সমাজের আকারে আত্মপ্রকাশ করে। বস্তুত পরিবার এমন একটি প্রতিষ্ঠান যাকে কেন্দ্র করে একটি বংশ এর অধস্তন পুরুষকে মানব সভ্যতার বিপুল দায়িত্ব পালন করার জন্য বিশেষ স্নেহ, ত্যাগ, হৃদয়ের গভীর ভালোবাসা ও দরদ এবং হিতাকাংখা সহকারে তৈরি করতে পারে। এ প্রতিষ্ঠান মানব সভ্যতার স্থায়িত্ব এবং ক্রমোন্নতির জন্য নতুন লোকের কেবল জন্ম দিয়েই ক্ষান্ত হয় না, বরং এর কর্মচারীগণ যে মনে প্রাণে এটাই কামনা করে যে, তাদের স্থান দখল করার জন্য যে নতুন মানুষের জন্ম হচ্ছে তারা তাদের চেয়েও উপযুক্ত হোক। এ দিক দিয়ে এ তত্ত্ব কথায় কোনো সংশয় থাকে না যে, পরিবারই হচ্ছে মানব সভ্যতার মূল ভিত্তি। আর এ মূল ভিত্তির সুস্থতা ও শক্তির উপর স্বয়ং তামাদ্দুনের সুস্থতা ও শক্তি একান্তভাবে নির্ভর করে। এ জন্যেই ইসলাম সর্বপ্রথম এ পরিবার প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর শুদ্ধ ও মযবুত বুনিয়াদের উপর স্থাপন করার দিকে বিশেষ লক্ষ্য আরোপ করেছে।

দাম্পত্য জীবনের গুরুত্ব

ইসলামের দৃষ্টিতে একটি নারী ও পুরুষের মিলন তখনই বিশুদ্ধ ও সংগত হতে পারে যখন এ মিলনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতি থাকবে

এবং তার ফলে একটি নতুন পরিবার সৃষ্টি হতে পারবে। নারী-পুরুষের স্বাধীন ও দায়িত্বহীন মিলনকে ইসলাম শুধু একটি নিষ্পাপ স্ফুর্তী কিংবা একটি সাধারণ পদস্খলন মনে করেই উপেক্ষা করতে পারে না। এর দৃষ্টিতে এটা সভ্যতার মূল বুনিয়াদকেই একেবারে ধ্বংস করে দেয়। এ কারণেই ইসলাম এ ধরনের সম্পর্ককে সম্পূর্ণ হারাম ও আইনগত অপরাধ বলে মনে করে। এ ধরনের অপরাধের জন্য ইসলাম কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করেছে, যেন মানব সমাজে এরূপ সভ্যতা ধ্বংসকারী সম্পর্ক কোনো ক্রমেই প্রচলিত হতে না পারে। ইসলাম মানব সমাজকে দায়িত্বহীন সম্পর্ক স্থাপনের সমস্ত কারণ ও সুযোগের ছিদ্র পথ হতে রক্ষা করতে চায়। পর্দার হুকুম, নারী-পুরুষের অবাধ মেলা মেশায় নিষেধ, নাচগান ও ছবির উপর কঠিন নিয়ন্ত্রণ, সংগত ও নৈতিক চরিত্রের নিয়ন্ত্রণ এবং অশ্লীলতা প্রচারের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই করা হয়। আর এ বাধা-নিষেধের কেন্দ্রীয় ও মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিবার প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় করে তোলা। অন্যদিকে নারী-পুরুষের দায়িত্বপূর্ণ মিলন অর্থাৎ বিবাহকে ইসলাম শুধু সংগত বলেই ঘোষণা করেনি বরং তাকে মংগলময়, পুণ্যের কাজ এবং একটি ইবাদত বলে মনে করে। বয়ঃপ্রাপ্তির পর নারী-পুরুষের অবিবাহিত থাকা ইসলাম একেবারেই সমর্থন করে না। সমাজের প্রত্যেক যুবককে সে এ জন্য উৎসাহিত করে যে, তার মাতাপিতা তামাদ্দুনের যে দায়িত্বপূর্ণ করেছেন, তাদের পালা আসার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও সেই দায়িত্ব পালন করতে প্রস্তুত হওয়া উচিত। ইসলামে সন্ন্যাসবাদ আদৌ সমর্থীত নয়। উপরন্তু এটাকে মনে করে আল্লাহর নির্ধারিত স্বভাব-নিয়মের সম্পূর্ণ পরিপন্থী একটি বেদায়াত। যেসব 'বদ রসম' ও কুসংস্কারের দরুন বিবাহ একটা কঠিন দুরূহ কাজ হয়ে পড়ে, ইসলাম সে সবের তীব্র প্রতিবাদ করে। এর একান্ত ইচ্ছা এই যে, মানব সমাজে বিবাহ যেন অতীব সহজসাধ্য এবং ব্যভিচার যেন খুবই কঠিন কাজ হয়ে পড়ে। আর এর বিপরীতে বিবাহ কঠিন এবং ব্যভিচার খুবই সহজসাধ্য যেন কখনও হতে না পারে। এ জন্যই ইসলাম কয়েকটি বিশেষ সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ বন্ধন হারাম করে দেয়ার পর অন্যান্য সমস্ত দূর ও নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করা জায়েয করে দিয়েছে। আশরাফ-আতরাফের সমস্ত ভেদাভেদ চিরতরে চূর্ণ করে দিয়ে সমস্ত মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ-শাদীর অবাধ অনুমতি দিয়েছে। 'মোহর' ও দান যৌতুক খুবই সংক্ষিপ্ত ও সুবিধাজনক করার হুকুম দিয়েছে, যেন উভয় পক্ষই তা খুব সহজেই বহন করতে সমর্থ হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ অনুষ্ঠান উদযাপন করার জন্য কোনো কাজী, পণ্ডিত, পুরোহিত কিংবা অফিস ও রেজিষ্ট্রারের কোনোই আবশ্যকতা নেই। ইসলামী সমাজে বিবাহ খুবই সহজ,

সাদাসিদে ও অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান। যে কোনো স্থানে দু'জন সাক্ষীর সামনে বয়ঃপ্রাপ্ত নারী-পুরুষের ইজাব-কবুলের দ্বারা অনায়াসেই এ কাজ সম্পন্ন হতে পারে। কিন্তু তার জন্য এ শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, এ ইজাব-কবুল গোপনে হলে চলবে না এটা মহল্লা বা গ্রামের লোকজনকে জানিয়ে-শুনিয়ে করতে হবে।

পারিবারিক জীবনের পদ্ধতি

পারিবারিক জীবনে ইসলাম পুরুষকে পরিবারের কর্তা ও দায়িত্বশীল ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করেছে। ঘরের শৃংখলা রক্ষা করার সমস্ত দায়িত্ব পুরুষের উপর অর্পণ করা হয়েছে। স্ত্রীকে স্বামীর এবং সন্তানকে পিতামাতা উভয়েরই আনুগত্য করার জন্য আদেশ করা হয়েছে। যে পরিবারে কোনো শৃংখলা ব্যবস্থা নেই এবং ঘরের লোকদের চরিত্র ও কাজ-কারবার সুস্থ রাখার জন্য দায়িত্বশীল কেউ নেই, ইসলাম এ ধরনের শিথিল পারিবারিক ব্যবস্থা মোটেই পছন্দ করে না। শৃংখলা রক্ষা করার জন্য একজন শৃংখলাকারীর একান্ত প্রয়োজন। ইসলাম এ দায়িত্ব পালন করার জন্য পরিবারের পিতাকেই স্বাভাবিক কর্তা হিসেবে নিযুক্ত করেছে। কিন্তু তার অর্থ কখনই এটা নয় যে, পুরুষকে ঘরের একজন সেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী স্বাধীন-শাসনকর্তা করে দেয়া হয়েছে এবং নারীকে একজন অসহায় দাসী হিসেবে একেবারে নিরংকুশভাবে পুরুষের অধীন করে দেয়া হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রেম ও ভালোবাসাই হচ্ছে দাম্পত্য জীবনের মূল ভাবধারা। একদিকে স্বামীর আনুগত্য করা যেমন কর্তব্য অন্যদিকে স্বামীরও কর্তব্য এই যে, সে তার ক্ষমতা অন্যায়, যুলুম ও বেইনসাফীর কাজে প্রয়োগ না করে পারিবারিক জীবনকে সুন্দর সুশৃংখল ও শান্তিপূর্ণ করে তুলার জন্য ব্যবহার করবে। দাম্পত্য সম্পর্ককে ইসলাম ঠিক ততোক্ষণ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতে চায়, যতোক্ষণ পর্যন্ত তাতে প্রেম-ভালোবাসার মাধুর্য কিংবা অন্তত নিরবিচ্ছিন্ন মিলন-প্রীতির সম্ভাবনা বর্তমান থাকবে। কিন্তু এ সম্ভাবনা যখন একেবারেই থাকবে না, তখন স্বামীকে তালাক দেয়ার এবং স্ত্রীকে বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়ে নিবার অধিকার দেয়, আর যেসব অবস্থায় বিবাহ স্বামী-স্ত্রীর মিলন প্রেমের পরিবর্তে শুধু অশান্তিরই কারণ হয়ে পড়ে, সেখানে ইসলামী আদালতকে বিবাহ ভেঙ্গে দেবার আদেশ দিয়ে থাকে।

আত্মীয়তার সীমা

পরিবারের সংকীর্ণ পরিধির বাইরে আত্মীয়তাই হচ্ছে নিকটবর্তী সীমান্ত। এর পরিধি বহু প্রশস্ত হয়ে থাকে। যারা মা-বাপের সম্পর্ক কিংবা ভাই-ভগ্নির সম্পর্ক, অথবা বৈবাহিক সম্পর্কের দিক দিয়ে একে অন্যের আত্মীয় হবে ইসলাম তাদের পরস্পরকে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন, সাহায্যকারী ও দয়াশীল দেখতে চায়। কুরআন শরীফের বিভিন্ন জায়গায় নিকটাত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহার

করার আদেশ দেয়া হয়েছে। হাদিস শরীফে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ও এর 'হক' আদায় করার জন্য বার বার তাকীদ এসেছে এবং এটাকে একটা বড় পুণ্যের কাজ বলে গণ্য করেছে। যে ব্যক্তি নিজ আত্মীয়দের সাথে মনোমালিন্য, কপটতা ও তিক্ততাপূর্ণ ব্যবহার করবে, ইসলাম তাকে মোটেই ভালো চোখে দেখতে পারে না। কিন্তু তাই বলে আত্মীয়-স্বজনদের অনাহূত পক্ষপাতিত্ব করাও ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো সৎকাজ নয়, নিজ পরিবার ও গোত্রের লোকদের অন্যায় পক্ষপাতিত্ব করা ইসলামের দৃষ্টিতে অমার্জনীয় অপরাধ। এরূপ কোনো সরকারি অফিসার যদি জনগণের অর্থ দ্বারা নিজ লোকদের প্রতিপালন করতে শুরু করে, কিংবা কোনো বিষয়ের বিচারের বেলায় তাদের প্রতি অকারণে পক্ষপাতিত্ব করে তবে মনে রাখতে হবে যে, এটা একটি শয়তানী অপরাধ। ইসলাম যে আত্মীয়তা রক্ষা করার আদেশ দেয়, তা নিজের দিক দিয়ে এবং হক ও ইনসাফের সীমার মধ্যে থেকে হওয়া চাই।

প্রতিবেশীর অধিকার

আত্মীয়তার সম্পর্কের পর দ্বিতীয় নিকটবর্তী হচ্ছে প্রতিবেশীর সম্পর্ক। কুরআনের দৃষ্টিতে প্রতিবেশী তিন প্রকার। প্রথমত, আত্মীয় প্রতিবেশী, দ্বিতীয়, অনাত্মীয় প্রতিবেশী এবং তৃতীয়, অস্থায়ী প্রতিবেশী, অল্পকালের জন্য যার সাথে উঠা-বসা ও চলাফেরা করার সুযোগ হয়েছে, ইসলামের সমাজ বিধান অনুযায়ী এরা প্রত্যেকেই বন্ধুত্ব সহানুভূতি এবং ভালো ব্যবহার পাবার অধিকারী। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) বলেছেন, প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষা করার জন্য আমাকে এতোদূর তাকীদ দেয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতে প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকার দেয়া যেতে পারে বলে আমার ধারণা হচ্ছিলো। একটি হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেছেন : প্রতিবেশীর সাথে যে ব্যক্তি ভালো ব্যবহার করবে না, সে প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার নয়। অন্য একটি হাদিসে নবী মুস্তফা (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি পেট ভরে আহার করবে এবং তারই পাশে তার প্রতিবেশী উপবাস থাকবে, মনে করতে হবে সে ব্যক্তির ঈমান নেই। একবার হযরত (সা)-এর নিকট নিবেদন করা হয়েছিল যে, একটি মেয়েলোক খুব বেশি নফল সালাত আদায় করে, প্রায়ই সওম রেখে থাকে এবং প্রচুর পরিমাণে দান-খয়রাত করে থাকে ; কিন্তু তার কটূক্তিতে তার প্রতিবেশী ভয়ানক নাজেহাল। তিনি বললেন, সে জাহান্নামী। উপস্থিত লোকেরা নিবেদন করলো, অন্য একটি মেয়েলোক এমন আছে, যার মধ্যে এ ধরনের ভালো গুণ অবশ্য নেই ; কিন্তু প্রতিবেশীকে সে কষ্ট দেয় না। হযরত (সা) বললেন : সে বেহেশতী হবে। নবী মুস্তফা (সা) লোকদের বিশেষ তাকীদ করে বলেছেন যে, নিজের ছেলেমেয়েদের

জন্য কোনো ফল কিনে আনলে তার কিছু অংশ তোমার প্রতিবেশীর ঘরে অবশ্যই পাঠিও, নতুবা ফলের খোসা বাইরে নিক্ষেপ করো না, কারণ এটা দেখে গরীব প্রতিবেশীর মনে দু:খ জাগতে পারে। নবী মুস্তফা (সা) বলেছেন : তোমার প্রতিবেশী যদি তোমাকে ভালো বলে, তবে তুমি নিশ্চয়ই ভালো। কিন্তু তোমার সম্পর্কে তোমার প্রতিবেশীর মত যদি খারাপ হয়, তবে তুমি একজন খারাপ লোক তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। মোটকথা যারা একে অপরের প্রতিবেশী হয়ে বসবাস করছে, ইসলাম সেসব লোককে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল, সাহায্যকারী ও সুখ-দু:খের সাথী হিসেবে দেখতে চায়। ইসলাম তাদের মধ্যে এমন সম্পর্ক স্থাপন করতে চায় যে, তারা যে একজন অপরজনের উপর নির্ভর করতে পারে এবং একজন অপরজনের সাহায্যে নিজের জান-মাল ও সম্মানকে নিরাপদ বলে মনে করতে পারে। কিন্তু যেসব সমাজে একটা দেয়ালের দু'দিকে অবস্থিত দু'ঘরের অধিবাসী দু'জন মানুষ পরস্পর চিরদিন অপরিচিত থাকে এবং যে সমাজে এক গ্রামের অধিবাসীর মধ্যে পারস্পরিক কোনো সহানুভূতি, কোনো সহৃদয়তা ও নির্ভরতা নেই সেসব সমাজ কখনো ইসলামী সমাজ বলে বিবেচিত হতে পারে না।

সমাজ জীবনের প্রধান নিয়মাবলী

এসব নিকটবর্তী আত্মীয়তা ও সম্বন্ধের বাইরে সম্পর্কের যে এক বিশাল ক্ষেত্র সামনে এসে পড়ে গোটা মুসলিম সমাজই তার অন্তর্ভূক্ত। এ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে ইসলাম আমাদের সামগ্রিক জীবনকে যেসব বড় বড় নিয়ম পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত করে, সংক্ষেপে তা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

এক : নেক ও পরহেযগারীর কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর, পাপ ও অন্যায় অনুষ্ঠানে কোনো প্রকার সাহায্য করো না। (কুরআন)

দুই : তোমাদের বন্ধুতাও শত্রুতা সবই আল্লাহর উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। দান করবে এ জন্য যে, দান করা আল্লাহ তায়ালা ভালোবাসেন, আর কাউকে কিছু দেয়া বন্ধ করলে তা এ জন্য করবে যে, তাকে কিছু দেয়া আল্লাহ পছন্দ করেন না। (হাদিস)

তিন : তোমরা এক অতীব উৎকৃষ্ট জাতি, মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্যই তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পুন্যের আদেশ করা এবং অন্যায় কাজের নিষেধ করাই তোমাদের জীবনের একমাত্র কাজ। (কুরআন)

চার : পরস্পর পরস্পরের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করো না একজন অপরজনের কাজ-কারবারের খুঁত বের করতে চেষ্টা করো না। পারস্পরিক

হিংসা-দ্বেষ হতে আত্মরক্ষা করো। কারো শত্রুতা করো না। আল্লাহ তায়ালার প্রকৃত বান্দাহ এবং পরস্পর ভাই ভাই হয়ে থাকো। (হাদিস)

পাঁচ : জেনে-শুনে কোনো যালেমের সাহায্য করো না। (হাদিস)

ছয় : অন্যায় কাজে নিজ জাতির সাহায্য করার উদাহরণ এই যে, তোমার উট কূপে পড়ে যাচ্ছিলো, আর তার লেজ ধরে তুমিও তার সঙ্গে সঙ্গে কূপে পড়ে গেলে। (হাদিস)

সাত : তুমি নিজের জন্য যা পছন্দ কর, অপরের জন্যও ঠিক তাই পছন্দ করো। (হাদিস)

ইসলামের রাজনীতি

ইসলামের রাজনীতির বুনিয়াদ তিনটি মূলনীতির উপর স্থাপিত : তাওহীদ, নবুয়াত এবং খিলাফত। এ তিনটি মূলনীতিকে বিস্তৃতভাবে বুঝতে না পারলে ইসলামী রাজনীতির বিস্তারিত বিধান হৃদয়ংগম করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। কাজেই সর্বপ্রথম আমি এ তিনটি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করব।

তাওহীদ

তাওহীদের অর্থ এই যে, আল্লাহ তায়ালা এ দুনিয়া এবং দুনিয়ার মানুষ সহ সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং একমাত্র মালিক। প্রভুত্ব, শাসন এবং আইন রচনার নিরংকুশ অধিকার একমাত্র তারই। কোনো কিছু করার আদেশ দেয়া এবং কোনো কাজের নিষেধ করার ক্ষমতা শুধু তারই কাছে বর্তমান। আল্লাহ তায়ালার সাথে মানুষ কাউকে শরীক করবে না। আমরা যে সত্তার দরুন বেঁচে আছি, আমাদের যে শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও বল-শক্তি দ্বারা আমরা কাজ করি, দুনিয়ার সকল জিনিসেরই উপর আমাদের এই যে অধিকার ও ব্যবহার ক্ষমতা এবং স্বয়ং এ বিশ্ব ভূ-মণ্ডলের উপর আমরা যে আমাদের ইচ্ছা ও ক্ষমতা প্রয়োগ করি তার কোনোটাই আমাদের উপার্জিত নয়। এর সৃষ্টি ও অবদানের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কেউ শরীক নেই। আমাদের নিজেদের এ অস্তিত্বের উদ্দেশ্য এবং আমাদের ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তির সীমা নির্ধারণ করা আমাদের করণীয় কাজ নয়, আর না এতে অন্য কারোও একবিন্দু অধিকার আছে। এ সবকিছু শুধু সেই আল্লাহর করণীয় যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আমাদের এতো শক্তি ও স্বাধীনতা দান করেছেন এবং দুনিয়ার অসংখ্য জিনিসকে আমাদের ভোগ ব্যবহারের জন্য দিয়েছেন। তাদের এ ধারণা মানবীয় প্রভুত্বকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে দেয়। একজন ব্যক্তি মানুষই হোক কিংবা একটি পরিবার বা একটি শ্রেণী হোক কিংবা মানুষের একটি বড় দল, একটি জাতি কিংবা সামগ্রিকভাবে সারা দুনিয়ার মানুষ হোক, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, তাঁর আদেশই হচ্ছে মানুষের জন্য একমাত্র আইন।

নবুয়াত

আল্লাহ তায়ালার এ আইন যে উপায়ে মানুষের নিকট এসে পৌঁছেছে, তার নাম নবুয়াত। এ নবুয়াতের ভিতর দিয়ে আমরা দু'টি জিনিস লাভ করে থাকি।

এক : কিতাব যাতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজের আইন-কানুনের বিবরণ দিয়েছেন। দুই : সেই কিতাবের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা, যা রসূল (সা) আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে নিজের কথা ও কাজের ভিতর দিয়ে সুস্পষ্টরূপে পেশ করেছেন। যে মূলনীতির উপর মানুষের ধর্মীয় জীবনের ভিত্তি স্থাপিত হওয়া উচিত আল্লাহ তায়ালা সবই তাঁর কিতাবে এক এক করে বর্ণনা করেছেন এবং রসূল (সা) আল্লাহর কিতাবের সেই উদ্দেশ্য অনুসারে কার্যকরীভাবে জীবন যাপনের একটি পরিপূর্ণ ব্যবস্থা তৈরি করেছেন। আর তার আবশ্যকীয় ব্যাখ্যা বলে দিয়ে আমাদের জন্য একটি উজ্জ্বল আদর্শ রূপে উপস্থিত করেছেন। ইসলামের পরিভাষায় এ দু'টি জিনিসের সমষ্টিগত নাম হচ্ছে শরীয়াত। ইসলামী রাষ্ট্র এ বুনিয়াদী নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।

খিলাফত

এখন খিলাফতের কথা আলোচনা করা যাক। আরবি ভাষায় এ শব্দ প্রয়োগ করা হয় প্রতিনিধিত্বের অর্থ বুঝার জন্য। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ এ দুনিয়ায় আল্লাহ তায়ালার দেয়া স্বাধীনতা অনুযায়ী কাজ করবে। আপনি যখন কারো উপর আপনার জায়গা-জমির ব্যবস্থাপনার ভার অর্পণ করেন, তখন চারটি কথা আপনার মনে অবশ্যই বর্তমান থাকে। প্রথম এই যে, জমির প্রকৃত মালিক সে নয়, আপনি নিজে। দ্বিতীয়, আপনার জমিতে সে কাজ করবে আপনারই দেয়া আদেশ-উপদেশ অনুসারে। তৃতীয়, আপনি তাকে কাজকর্ম করার যে সীমা নির্দিষ্ট করে দেবেন, সেই সীমার মধ্যে থেকেই তাকে কাজ করতে হবে, আপনার দেয়া স্বাধীনতাকে সেই সীমার মধ্যেই তার ব্যবহার করতে হবে। আর চতুর্থ এই যে, আপনার জমিতে তাকে তার নিজের নয়, আপনার উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করতে হবে। এ চারটি শর্ত প্রতিনিধিত্বের ধারণার মধ্যে এমনভাবে মিলে-মিশে আছে যে, 'প্রতিনিধি' শব্দ উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই আপনা আপনিই মানুষের মনে এটা জেগে উঠে। আপনার কোনো প্রতিনিধি যদি এ চারটি শর্ত পূর্ণ না করে তবে আপনি অবশ্যই বলবেন যে, সে প্রতিনিধিত্বের সীমালংঘন করেছে এবং সে সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে, যা 'প্রতিনিধির' শব্দের অর্থেই নিহিত রয়েছে। ইসলাম মানুষকে দুনিয়ায় আল্লাহ তায়ালার 'প্রতিনিধি' বলে নির্দিষ্ট করেছে। এই খিলাফত বা প্রতিনিধিত্বের ধারণার মধ্যেই উক্ত চারটি শর্ত অনিবার্য রূপে বিদ্যমান। ইসলামী রাজনীতির এ মহান আদর্শ অনুসারে যে রাষ্ট্র

কায়েম হবে, মূলত তা হবে আল্লাহ তায়ালার নিরংকুশ প্রভুত্বের অধীন মানুষের খিলাফত। আল্লাহর এ রাজ্যে তাঁরই দেয়া আদেশ-উপদেশ অনুসারে তাঁর নির্ধারিত সীমার মধ্যে কাজ করে তাঁর উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করা হচ্ছে এ দুনিয়ায় মানুষের একমাত্র কাজ।

খিলাফতের এ ব্যাখ্যা প্রসংগে আর একটি কথা বুঝে নেয়া দরকার। তা এই যে, ইসলামের এ রাজনৈতিক মত কোনো ব্যক্তি বিশেষকে কিংবা কোনো পরিবার বা কোনো শ্রেণী বিশেষকে 'প্রতিনিধি' বলে আখ্যা দেয়নি, বরং মানুষের সেই গোটা সমাজকেই এ খিলাফতের পদে অভিষিক্ত করেছে, যারা তাওহীদ ও রেসালাতের মূলনীতিগুলোকে স্বীকার করে খিলাফতের উল্লেখিত শর্তাবলী পূর্ণ করতে প্রস্তুত হবে, এমন সমাজই সমষ্টিগতভাবে খিলাফতের অধিকারী এ খিলাফত এহেন সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের প্রাপ্য।

গণতন্ত্র

ইসলামের রাজনীতিতে এখান থেকেই শুরু হয় গণতন্ত্রের পদক্ষেপ। ইসলামী সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তিই খিলাফতের অধিকারী ও আযাদীর মালিক। এ অধিকার ও স্বাধীনতায় সমগ্র মানুষই সমান অংশের অংশীদার। এ ব্যাপারে কেউ কারো চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়, কোনো মানুষ অন্য কোনো ব্যক্তিকে তার এ অধিকার ও স্বাধীনতার স্বত্ব হতে বঞ্চিত করতে পারে না। রাষ্ট্রের শাসন শৃংখলা বিধানের জন্য যে সরকার গঠিত হবে তা এ সমাজেরই ব্যক্তিদের মত অনুযায়ী গঠন করতে হবে। এরাই নিজ নিজ খিলাফতের অধিকার হতে এক অংশ সেই সরকারকে দান করবে। রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে তাদের মতের মূল্য অনিবার্যরূপে স্বীকৃত হবে। তাদেরই পরামর্শক্রমে গভর্ণমেন্ট চলবে। তাদের আস্থা যে ব্যক্তি লাভ করতে পারবে, সে তাদের সকলের তরফ হতে খিলাফতের বিরাট কর্তব্যকে পূর্ণ করবে। আর যে তাদের আস্থা হারাবে, সে অবশ্যই খিলাফতের পদ হতে বিচ্যুত হতে বাধ্য হবে। এ দিক দিয়ে ইসলামী গণতন্ত্র একটি পরিপূর্ণ গণতন্ত্র। একটি গণতন্ত্র যতোদূর পরিপূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ ও নিখুঁত হতে পারে, এটা ঠিক ততোখানিই পরিপূর্ণ ও নিখুঁত। কিন্তু ইসলামের এ গণতন্ত্র পাশ্চাত্য গণতন্ত্র হতে মূলতই সম্পূর্ণ আলাদা। এদের মধ্যে আকাশ-পাতালের পার্থক্য বিদ্যমান। পার্থক্য এ দিক দিয়ে যে, পাশ্চাত্য রাজনীতি 'জনগণের প্রভূত্বকে' বুনিয়াদরূপে স্বীকার করে, কিন্তু ইসলাম স্বীকার করে জনগণের 'খিলাফত'কে। পাশ্চাত্য রাজনীতিতে জনগণই হচ্ছে বাদশাহ্ আর ইসলামের দৃষ্টিতে বাদশাহী একমাত্র আল্লাহর, জনগণ তাঁর প্রতিনিধি মাত্র। পাশ্চাত্য রাজনীতিতে জনগণ নিজেরাই দেশের শাসনতন্ত্র ও আইন রচনা করে, কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনগণকে

সেই শরীয়াত বা আইনের অনুসরণ করে চলতে হয়, যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। পাশ্চাত্য রাজনীতিতে গভর্ণমেন্টের কর্তব্য হচ্ছে রাজ্যের জনগণের ইচ্ছাকে পূর্ণ করা আর ইসলামী গভর্ণমেন্ট এবং তার প্রতিষ্ঠাতা জনগণ সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে দুনিয়ায় আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যকে সার্থক করা। মোটকথা, পাশ্চাত্য গণতন্ত্র হচ্ছে আযাদ, নিরংকুশ ও বল্গাহারা প্রভুত্ব, যার নিজ অধিকার ও স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচারিতার সাথে ভোগ করে। এর সম্পূর্ণ বিপরীত ইসলামী গণতন্ত্র হচ্ছে আল্লাহর দেয়া আইনের অনুসরণ করা। এখানে মানুষ তাঁর অধিকার ও স্বাধীনতাকে আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে তাঁরই নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যবহার করা।

অতপর আমি তাওহীদ, রেসালাত ও খিলাফতের ভিত্তিতে স্থাপিত ইসলামী রাষ্ট্রের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট চিত্র অংকন করব।

ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য

ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কুরআন শরীফে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, তা সেসব মংগল ও কল্যাণময় ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করবে, বিকাশ দান করবে এবং উৎকর্ষ সাধন করবে, যে সবের দ্বারা মানুষের জীবনকে আল্লাহ তায়ালা সজ্জিত ও ভূষিত দেখতে চান আর সেসব অমংগল ও পাপ অনুষ্ঠানকে বাতিল করবে, পরাজিত করবে এবং নিঃশেষে বিলীন করবে। মানুষের জীবনের যে সবের স্পর্শ মাত্রকেও আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন না ইসলামের রাজ্যের শৃংখলা সম্মলিত ইচ্ছা-বাসনা চরিতার্থ করাও এর লক্ষ্য নয়। ইসলাম রাষ্ট্রের সম্মুখে এমন এক উচ্চতম ও উন্নততর লক্ষ্য উপস্থিত করে, যা অর্জন করা একান্তভাবে কর্তব্য। তা এই যে, আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে যে কল্যাণ ও মঙ্গলের উৎকর্ষ দেখতে চান তাকে বিকশিত ও ফুলে ফলে সুশোভিত করতে হবে। আর ধ্বংস ও উচ্ছৃংখলতার এবং এমন সমস্ত উপায়ের উৎসমুখ চিরতরে বন্ধ করতে হবে যা আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে তাঁর এ রাজ্যকে ধ্বংস করতে পারে, তাঁর সৃষ্টি মানব জাতির জীবন নষ্ট করতে পারে। এ লক্ষ্য উপস্থিত করার সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম আমাদের সামনে ভালো মন্দ উভয়ের একটি সুস্পষ্ট চিত্র পেশ করেছে। তাতে বাঞ্ছিত কল্যাণ ও মংগলকে এবং অকল্যাণগুলোকে একেবারে পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে। এ চিত্র সামনে রেখে ইসলামী রাষ্ট্র প্রত্যেক যুগে এবং সকল প্রকার পারিপার্শ্বিকতার মধ্যেই তার নিজ সংশোধনী প্রোগ্রাম রচনা করতে পারে।

শাসনতন্ত্র

মানব জীবনে প্রত্যেকটি শাখা-প্রশাখায়ই চারিত্রিক রীতিনীতিগুলোকে পরিপূর্ণরূপে পালন করা ইসলামের চিরন্তন দাবি। এ কারণে এটা নিজ রাষ্ট্রের

জন্য এ সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, এর রাষ্ট্রনীতি নিরপেক্ষ, সুবিচার, সততা এবং খাঁটি ঈমানদারীর উপর স্থাপিত হবে। এটা স্বাদেশিক, প্রশাসনিক বা জাতীয় স্বার্থ রক্ষার খাতিরে মিথ্যা, প্রতারণা এবং অবিচারের প্রশ্রয় দিতে কোনো অবস্থাতেই প্রস্তুত নয়। দেশের অভ্যন্তরে শাসক ও শাসিতদের মধ্যস্থিত সম্পর্কই হোক, আর দেশের বাইরে অন্যান্য জাতির সাথে সম্পর্কই হোক উভয় ক্ষেত্রেই ইসলাম সত্যতা, বিশ্বাসপরায়নতা এবং সুবিচারের জন্য সমস্ত প্রকারের স্বার্থ কুরবানী করতে প্রস্তুত। মুসলিম ব্যক্তিদের মতো মুসলিম রাষ্ট্রকেও এটা এ জন্য বাধ্য করে যে, প্রতিশ্রুতি দিলে তা পূর্ণ করতে হবে, লেন-দেন ঠিক রাখতে হবে এবং যা বলবে তা করতে হবে, নিজের প্রাপ্য আদায় করার সঙ্গে সঙ্গে নিজের কর্তব্যকে স্মরণ করতে হবে, যা করবে তা বলবে এবং অন্যের দ্বারা তার কর্তব্য আদায় করার প্রাপ্য (হক) ভুলে যেতে পারবে না। শক্তিকে যুলুমের কাজে ব্যবহার করার পরিবর্তে তাকে সুবিচার কায়েম করার উপায় হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। পরের ন্যায্য অধিকারকে সবসময়ই হক বলে মনে করতে এবং তা আদায় করতে হবে। শক্তিকে মনে করতে হবে আল্লাহ তায়ালার আমানত এবং এ দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে তাকে প্রয়োগ করতে হবে যে, এ আমানতের পুরাপুরি হিসেব তাকে আল্লাহ তায়ালার দরবারে অবশ্যই দিতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্র পৃথিবীর বিশেষ একটা অঞ্চলে স্থাপিত হয়ে থাকলেও মানবীয় অধিকারগুলোকে সে কোনো ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ করেনা নাগরিকত্বের অধিকারেও নয়। শুধুমাত্র মানবতার দিক দিয়েই ইসলাম মানুষের জন্যে কয়েকটি মৌলিক অধিকার স্বীকার করে এবং সকল সময়ই সেগুলোকে পূর্ণরূপে রক্ষা করার আদেশ দেয়। সেই মানুষ ইসলামী রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে বাস করুক কিংবা এর বাইরে বাস করুক, সে মিত্রই হোক কিংবা শত্রু তার সাথে সন্ধি থাকুক কিংবা যুদ্ধই চলতে থাকুক। মানুষের রক্ত সকল সময়ই সম্মান পাবার যোগ্য, বিনা কারণে কিছুতেই মানুষের রক্তপাত করা যেতে পারে না। নারী, শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্ন এবং আহত লোকদের উপর কোনোক্রমেই আক্রমণ করা যেতে পারে না। নারীর সতীত্ব চিরদিনই সম্মানিত ও সুরক্ষণীয়, কোনো কারণেই তা নষ্ট করা যেতে পারে না। ক্ষুধার্তের জন্য অন্নের, বস্ত্রহীনদের জন্য বস্ত্রের এবং আহত কিংবা রুগ্ন ব্যক্তিদের জন্য চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রুষার ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে সে ব্যক্তি শত্রুপক্ষেরই হোক না কেন। এ কয়টি এবং এ ধরনের আরো কয়েকটি অধিকার ইসলাম মানুষকে শুধু মানুষ হিসেবেই দান করেছে। ইসলামী রাষ্ট্রের মূল শাসনতন্ত্রে এ সকলকে মৌলিক অধিকার বলে স্বীকার করা হয়েছে। তারপর নাগরিক অধিকারকে ইসলাম কেবল মাত্র সেসব লোকের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়নি, যারা রাষ্ট্রের

সীমার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে বরং প্রত্যেক মুসলমান দুনিয়ার যে কোনো অংশেই তার জন্ম হোক না কেন ইসলামী রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে প্রবেশ করা মাত্রই এর নাগরিক হয়ে যায় এবং সেই দেশের জন্মগত নাগরিকদের সমতুল্য অধিকার তাকে দান করা হয়। দুনিয়ায় ইসলামী রাষ্ট্র যতো সংখ্যকই হোক না কেন এদের সব কয়টির মধ্যে নাগরিক অধিকার হবে সর্বসম্মিলিত। কোনো ইসলামী রাষ্ট্রে প্রবেশ করতে হলে মুসলিম ব্যক্তির 'পাসপোর্ট' অনুমতি পত্রের আবশ্যক হবে না। কোনো বংশীয়, জাতীয় কিংবা শ্রেণীগত বৈষম্য ছাড়াই প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যেকটি ইসলামী রাষ্ট্রের বড় বড় দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হতে পারবে।

যিম্মিদের অধিকার

ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে যেসব অমুসলিম বাস করে, তাদের জন্য ইসলাম কতোগুলো অধিকার নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে তা অবশ্য বিধিবদ্ধ থাকবে (যিম্মীর শাব্দিক অর্থ যার যিম্মা বা দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়)। ইসলামী রাষ্ট্র অমুসলিমদের জান-মাল রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে বলেই তারা যিম্মী নামে অভিহিত হয়। ইসলামের পরিভাষায় এরূপ অমুসলিমদেরকে বলা হয় যিম্মী। যিম্মীর জান-মাল ও মান-সম্মান সবই একজন মুসলিম নাগরিকের জান-মাল ও মান-সম্মানের মতোই মর্যাদা পাবে। ফৌজদারী এবং দেওয়ানী আইনের বেলায় মুসলিম ও যিম্মীর মধ্যে কোনোই পার্থক্য নেই। যিম্মীদের 'পার্সনাল-ল' অর্থাৎ ব্যক্তি স্বাধীনতায় ইসলামী রাষ্ট্র কখনও হস্তক্ষেপ করবে না। যিম্মীদের মন, ধর্মমত ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং পূজা, উপাসনার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। যিম্মী তার ধর্ম প্রচারই শুধু নয়, আইনের গণ্ডির মধ্যে থেকে ইসলামের সমালোচনাও করতে পারবে।[১]

ইসলামী শাসনতন্ত্রে অমুসলিম প্রজাদেরকে এগুলো এবং এ ধরনের আরো অনেকগুলো অধিকার দান করা হয়েছে। এ অধিকারগুলো চিরস্থায়ী। ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বের মধ্যে তারা যতোদিন থাকবে ততোদিন তাদের এ অধিকার কিছুতেই হরণ করা যেতে পারে না। অন্য কোনো অমুসলিম রাষ্ট্র এর অধীনে মুসলিম প্রজাদের উপর যতোই যুলুম করুক না কেন, তার প্রতিশোধ হিসেবে

---

১. এ সম্পর্কে 'ইসলামের মোরতাদের শাস্তি' বইতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে এতোটুকু বুঝলেই যথেষ্ট হবে যে, ইসলামী বিধানে অমুসলিমকে অনুকূল বা প্রতিকূল আলোচনা সমালোচনার যতোটা অধিকার দেয়া হয়েছে, তা কিছুমাত্র সীমাবদ্ধ নয়। তবে রাষ্ট্রীয় আইনের গণ্ডির মধ্যে থেকেই তাদের এই আলোচনার কাজ করতে হবে। মোটকথা, একজন যিম্মীর এ অধিকার ইসলাম অবশ্য স্বীকার করে যে, সে যুক্তিসংগতভাবে স্বীয় ধর্মের সৌন্দর্য বর্ণনা বা প্রচার করতে পারে যদিও সে ইসলামকে স্বীয় ধর্ম বলে স্বীকার করতে আদৌ প্রস্তুত নয়।

একটা ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে এর অধীন অমুসলিম প্রজাদের উপর শরীয়াতের খেলাফ বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ করা বৈধ্য নয়। এমনকি আমাদের সমীন্তের বাইরে সমস্ত মুসলমানকে যদি হত্যাও করে ফেলা হয়, তবুও আমরা আমাদের সীমার মধ্যে একজন যিম্মীর অকারণে রক্তপাত করতে পারি না।

রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব

ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার সমস্ত দায়িত্ব একজন আমীর বা রাষ্ট্র প্রধানের উপর অর্পণ করা হয়। এ আমীরকে 'সদরে জমহুরিয়া' বা রাষ্ট্র পরিষদের সভাপতির সমান মনে করা যেতে পারে। আমীর নির্বাচনের ব্যাপারে এমন সমস্ত বয়ঃপ্রাপ্ত স্ত্রী-পুরুষের ভোট দেবার অধিকার থাকে যারা শাসনতন্ত্রের মূলনীতিগুলোকে স্বীকার করে। আমীর (রাষ্ট্র প্রধান) নির্বাচনের মূলনীতি এই যে, ইসলামের মূল ভাবধারার অভিজ্ঞতা, ইসলামী স্বভাব-প্রকৃতি আল্লাহর ভয় এবং রাজনৈতিক প্রতিভার দিক দিয়ে যে ব্যক্তি সমাজের অধিকাংশ লোকের আস্থাভাজন হবে। এমন ব্যক্তিকেই আমীর নির্বাচন করতে হবে তারপর সেই আমীরের সাহায্যের জন্য একটি 'মজলিশে শুরা' বা পার্লামেন্ট গঠন করতে হবে। 'মজলিশে শুরার' পরামর্শ নিয়ে রাজ্যের সমস্ত শৃংখলা রক্ষা করা আমীরের কর্তব্য হবে। আমীরের প্রতি যতোদিন পর্যন্ত জনগণের আস্থা থাকবে ততোদিনই সে আমীর থাকতে পারবে। আস্থা হারিয়ে ফেললে তাকে অবশ্যই পদত্যাগ করতে হবে। আর যতোদিন তার প্রতি লোকদের আস্থা থাকবে, গভর্ণমেন্টের অধিকার ও কর্তৃত্ব তার হাতে থাকবে। আমীর এবং তাঁর সরকারের প্রকাশ্য সমালোচনা করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে।

ইসলামী রাষ্ট্র আইন রচনা করা হবে শরীয়াতের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে। আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূলের সুস্পষ্ট নির্দেশ শুধু অনুসরণ ও প্রতিপালনের জন্যই। কোনো আইন পরিষদ তাতে বিন্দুমাত্র রদবদল করতে পারে না কিন্তু আল্লাহ এবং রসূলের যেসব হুকুমের একাধিক অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা হবে, তাতে শরীয়াতের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা শুধু সেসব লোকের কাজ, যারা শরীয়াতের জ্ঞানে পরিপূর্ণ দক্ষতা সম্পন্ন। কাজেই এ ধরনের কাজ 'মজলিশে শূরা' হতে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত সাব-কমিটির নিকট সোপর্দ করতে হবে। তারপর মানুষের দৈনন্দিন কাজ কারবারের এমন অনেক ক্ষেত্রও থাকে, যে সম্পর্কে শরীয়াত নির্দিষ্ট কোনো হুকুম দেয়নি। কাজেই এ ব্যাপারে 'মজলিশে শুরা' দীন ইসলামের নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকে আইন রচনা করতে পারে।

আদালত

ইসলামী আদালত শাসন কর্তৃপক্ষের অধীন নয়; বরং তা সরাসরিভাবে আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধির মর্যাদায় অভিষিক্ত এবং একে আল্লাহ তায়ালারই সামনে সে জন্য জবাবদিহি করতে হবে। আদালতের বিচারকদের যদিও শাসন কর্তৃপক্ষ নিযুক্ত করে; কিন্তু এক ব্যক্তি যখন আদালতে বিচারকের পদে বসবে, তখন সে আল্লাহ তায়ালার আইন অনুসারে জনগণের মধ্যে নিরপেক্ষ ইনসাফ করবে। তার ইনসাফের হাত হতে স্বয়ং রাষ্ট্রপতিও বাঁচতে পারে না। এমন কি, হুকুমাতের প্রধান নেতাকেও আসামী কিংবা ফরিয়াদী হয়ে বিচারকের সামনে এমনভাবে দাঁড়াতে হবে যেমন করে দাঁড়াতে হয় রাষ্ট্রের একজন সাধারণ নাগরিককে।

ইসলামের অর্থনীতি

মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে সত্য ও সুবিচারের বুনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইসলাম কয়েকটি নিয়ম এবং সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, যেন সেই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই যাবতীয় সম্পদ উৎপাদন এবং তা ব্যয়-ব্যবহার ও আবর্তন হতে পারে। সম্পদ উৎপাদনের এবং একে সমাজের মধ্যে আবর্তিত করার কার্যকরী পন্থা কি হবে, সে সম্পর্কে ইসলাম কোনোই আলোচনা করে না। কারণ তা সভ্যতার উন্নতি ও ক্রমবিকাশ এবং অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে গড়ে, আবার বদলে যায়। উৎপাদন-উপায় নির্ধারণ মানুষের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে আপনা-আপনিই হয়ে থাকে। তবে ইসলামের ঐকান্তিক দাবি এই যে, সর্বকালে এবং সকল অবস্থাতেই মানুষের অর্থনৈতিক কাজ-কর্ম যে আকারই ধারণ করুক না কেন ইসলামের নিয়মগুলোকে মযবুত বুনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং এর নির্দিষ্ট সীমা অবশ্যই রক্ষা করে কাজ করতে হবে।

জীবিকা অর্জনের অধিকার

ইসলামের দৃষ্টিতে পৃথিবী এবং এর অন্তর্গত সমস্ত জিনিসই আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এ জন্য পৃথিবীর ভূমি হতে নিজের জীবিকা উৎপাদনের জন্য চেষ্টা করাও প্রত্যেকটি মানুষেরই জন্মগত অধিকার। দুনিয়ার সমস্ত মানুষই এ অধিকারের ব্যাপারে সমান। কাউকে এ অধিকার হতে বঞ্চিত করা যেতে পারে না। আর এ ব্যাপারে এক শ্রেণীর লোককে অন্য শ্রেণীর উপর কোনো প্রাধান্য বা অগ্রাধিকারও দেয়া যেতে পারে না। শরীয়াত অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি বা বংশ কিংবা কোনো শ্রেণীকে জীবিকা অর্জনের বিশেষ কোনো উপায় গ্রহণের অধিকার হতে বঞ্চিত করা, কিংবা কোনো কোনো পেশার দুয়ার তাদের জন্য বন্ধ করে দেয়া কিছুতেই জায়েয হতে পারে না। এরূপে শরীয়াতের দৃষ্টিতে এমন কোনো বৈষম্যও সৃষ্টি করা যেতে পারে না যার দরুন জীবিকা অর্জনে

কোনো বিশেষ উপায় বা পন্থার উপর বিশেষ কোনো শ্রেণীর বা বংশের কিংবা গোত্রের একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপিত হতে পারে। আল্লাহর সৃষ্ট এ পৃথিবীতে তাঁরই নির্দিষ্ট জীবিকা অর্জনের উপায়গুলো দ্বারা নিজের ন্যায্য অংশ আদায়ের চেষ্টা করার অধিকার সকল মানুষেরই সমানভাবে বর্তমান এবং এ চেষ্টার দ্বার নির্বিবাদে সকল মানুষের জন্য উন্মুক্ত থাকা আবশ্যক।

মালিকহীন সম্পদ

প্রকৃতির যেসব সম্পদ সৃষ্টি করা কিংবা ব্যবহার উপযোগী করার ব্যাপারে কোনো মানুষের শ্রম বা যোগ্যতা ব্যয় করতে হয়নি, তা নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের ভোগ করার সাধারণ অনুমতি রয়েছে। নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী তা হতে উপকৃত হওয়ার প্রত্যেকের অধিকার আছে। নদী ও পুকুরের পানি, জংগলের কাঠ, প্রাকৃতিক গাছ-পালার ফল, প্রাকৃতিক ঘাস ও পরগাছা, বায়ু, পানি, বন্য পশু, ভূগর্ভস্থ খনি প্রভৃতি সম্পদে কারো একচ্ছত্র ইজারাদারী স্থাপিত হতে পারে না এবং তার উপর এমন কোনো বিধি-নিষেধও আরোপ করা যেতে পারে না, যার দরুন দুনিয়ার মানুষের পক্ষে তা হতে বিনামূল্যে উপকৃত হবার পথে বাঁধা জন্মিতে পারে। তবে যারা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে প্রকৃতির ধনভান্ডার হতে অধিক পরিমাণ সম্পদ ব্যবহার করতে চাবে, তাদের কর ধার্য করা যেতে পারে।

ব্যবহার করার নিয়ম

আল্লাহ তায়ালা মানুষের উপকারের জন্য যেসব জিনিস সৃষ্টি করেছেন, তা বিনা কাজে ফেলে রাখা কিছুতেই সংগত নয়। 'হয় নিজে তা ব্যবহার কর, নতুবা অন্য লোককে তা হতে উপকৃত হবার সুযোগ দাও' ঠিক এ নিয়মের ভিত্তিতে ইসলামী আইন এ ফয়সালা করেছে যে, মানুষ নিজের জমি তিন বছরের অধিককাল অনাবাদী অবস্থায় ফেলে রাখতে পারে না। সে যদি তার জমি চাষাবাদ না করে, কিংবা তার উপর কোনো দালান কোঠা নির্মাণ না করে তবে এমন কি কোনো কাজেই যদি তা ব্যবহার না করে তবে তিন বছর কাল অতিবাহিত হওয়ার পর ঐ জমি পরিত্যক্ত সম্পত্তি বলে মনে করা হবে। অন্য কোনো মানুষ যদি একে কোনো কাজে ব্যবহার করে, তবে তার বিরুদ্ধে মকদ্দমা দায়ের করা যাবে না এবং সেই জমি অন্য একজনকে ব্যবহার করার জন্য দেয়ার অধিকার ইসলামী হুকুমাতের অবশ্যই থাকবে।

মালিকানার ভিত্তি

প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডার হতে যদি কেউ নিজেই কোনো জিনিস গ্রহণ করে এবং নিজের শ্রম ও যোগ্যতার দ্বারা তা ব্যবহার উপযোগী করে নেয়, তবে সেই

ব্যক্তিই হবে সেই জিনিসের মালিক। যেমন কোনো পতিত জমি যার উপর এখনো কারো মালিকানা স্বত্ব স্থাপিত হয়নি যদি কোনো ব্যক্তি এতে নিজের অধিকার স্থাপন করে এবং কোনো কল্যাণকর কাজে ব্যবহার করতে শুরু করে, তবে তাকে কিছুতেই বে-দখল করা যেতে পারে না। ইসলামের অর্থনীতি অনুসারে দুনিয়ায় সমস্ত মালিকানা স্বত্বের সূত্রপাত এমনি করেই হয়েছে। প্রথমে যখন পৃথিবীতে মানুষের বসবাস শুরু হয়েছিল, তখন এখানকার সমস্ত কিছুই সব মানুষের সমান অধিকারের বস্তু ছিলো। পরে যে ব্যক্তি যে জিনিসকে দখল করে কোনো প্রকারে কার্যোপযোগী করে তুলেছে সে-ই এর মালিক হয়ে বসেছে ; অর্থাৎ কেবলমাত্র নিজের কাজেই তা ব্যবহার করার সংগত অধিকার লাভ করেছে, অন্য কোনো লোক যদি সেই জিনিস ব্যবহার করতে চায়, তবে তার নিকট হতে সে ভাড়া নিতে পারবে। এটা মানুষের সমস্ত অর্থনৈতিক কাজ-কর্মের স্বাভাবিক বুনিয়াদ এ বুনিয়াদকে নিজ স্থানে প্রতিষ্ঠিত রাখাই কর্তব্য।

মালিকানার সংরক্ষণ

শরীয়াত সংগত উপায়ে দুনিয়ার কোনো মানুষ যদি কিছুর মালিকানা অধিকার লাভ করে থাকে তবে অবশ্যই তা রক্ষা করতে হবে। কারো এ মালিকানা স্বত্ব শরীয়াতের দৃষ্টিতে সংগত কিনা কেবল এ দিক দিয়েই এর চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে। বস্তুত শরীয়াতের দৃষ্টিতে যে সকল স্বত্ব অসংগত প্রমাণিত হবে, তাকে অবশ্য খতম করতে হবে। কিন্তু যেসব মালিকানা শরীয়াত অনুযায়ী জায়েজ হবে, তাকে নষ্ট করার কিংবা তার মালিকদের সংগত অধিকারে কিছুমাত্র হস্ত ক্ষেপ করার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা কোনো গভর্ণমেন্টের বা কোনো আইন পরিষদের নেই। সমষ্টিগত কল্যাণ সাধনের শ্লোগান দিয়ে এমন কোনো অর্থব্যবস্থা কিছুতেই কায়েম করা যেতে পারে না, যা শরীয়াত প্রদত্ত সংগত অধিকার নষ্ট করবে। সমাজের স্বাভাবিক স্বার্থ রক্ষার জন্য স্বতন্ত্রভাবে ব্যক্তিদের মালিকানার উপর স্বয়ং শরীয়াত যেসব বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে, তা হ্রাস করা যতো বড় যুলুম, তাতে বৃদ্ধি করাও ঠিক ততোখানিই যুলুম সন্দেহ নেই। বস্তুত স্বতন্ত্রভাবে ব্যক্তিদের শরীয়াত সংগত মালিকানার হেফাযত এবং তাদের নিকট শরীয়াতের নির্ধারিত 'সামাজিক স্বার্থকে' আদায় করাও ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য।

অবাধ প্রতিযোগিতার অধিকার

আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজের নিয়ামত বন্টন করার ব্যাপারে সমতা রক্ষা করেননি। উপরন্তু এক শ্রেণীর লোকদের উপর এ দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। দৈহিক সৌন্দর্য, মিষ্ট কণ্ঠস্বর, স্বাস্থ্য, শারীরিক শক্তি-সামর্থ, মস্তিস্কের বুদ্ধি-প্রতিভা, জন্মগত পারিপার্শ্বিকতা এবং এ ধরনের অন্যান্য জিনিসও দুনিয়ার

সকল মানুষ সমানভাবে পায়নি। জীবিকার ব্যাপারেও ঠিক এরূপ স্বাভাবিক পার্থক্য বিদ্যমান আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত প্রাকৃতিক নিয়ম ধন-সম্পদের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে পার্থক্য করতে চায়। অতএব মানুষের মধ্যে একটা কৃত্রিম আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য যতোই তদবীর করা হোক না কেন, ইসলামের দৃষ্টিতে উদ্দেশ্য ও নীতির দিক দিয়ে তা সবই ভুল। ইসলাম যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তা হচ্ছে ধন-সম্পদ উপার্জনের জন্য সংগ্রাম করার সুযোগ-সুবিধার সাম্য। ইসলামের দাবি এই যে, সমাজের আইন ও প্রচলিত প্রথায় এমন কোনো প্রতিবন্ধকতা কিছুতেই থাকতে দেয়া হবে না, যার দরুন মানুষ নিজ শক্তি ও যোগ্যতা অনুসারে অর্থোপার্জনের জন্য সংগ্রাম করতে বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে এবং এমনসব বিরোধ বৈষম্যকেও উৎপাটিত করতে হবে, যাতে কোনো শ্রেণী বংশ এবং পরিবারের জন্মগত সৌভাগ্যকে আইনের জোরে চিরস্থায়ী করে রাখা হয়? এ দু'টি পন্থায় স্বাভাবিক অসাম্যের স্থানে জবরদস্তী একটা কৃত্রিম সমতা স্থাপন করে। এ জন্যই ইসলাম সমাজের অর্থব্যবস্থাকে এমন এক স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসতে চায়, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি শক্তি পরীক্ষা করার অবাধ সুযোগ লাভ করতে পারে। কিন্তু যারা অর্থোপার্জনের চেষ্টা এবং তার পরিমাপের ব্যাপারে সমস্ত মানুষকে জোর করে সমান করে দিতে চায়, ইসলাম তাদের সাথে একমত নয়। কারণ তারা স্বাভাবিক অসাম্যকে কৃত্রিম সাম্যে পরিণত করতেই সচেষ্ট। যে অর্থব্যবস্থায় প্রত্যেকটা মানুষই অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে ঠিক সেই-স্থান হতেই যাত্রা শুরু করতে পারে যে স্থানে আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তাই হতে পারে একমাত্র স্বাভাবিক অর্থব্যবস্থা। মোটর নিয়ে যার জন্ম হয়েছে, সে মোটর নিয়ে যাত্রা করবে। যে শুধু দু'পা নিয়ে এসেছে, সে পদাতিক হয়েই চলবে এবং পংগু অবস্থায় যার জন্ম হয়েছে, সে অবস্থায়ই সে চলতে শুরু করবে। যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মোটরের উপর মোটর ওয়ালার স্থায়ী ইজারা স্থাপিত করে এবং পংগু ব্যক্তির পক্ষে মোটর অর্জন করা অসম্ভব করে দেয়, মানব সমাজে তা সমর্থনীয় নয়। পক্ষান্তরে যে আইন এ বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে জবরদস্তী করে একই স্থান হতে এবং একই অবস্থা হতে যাত্রা শুরু করতে বাধ্য করে, আর একজনের সাথে অপরজনকে চিরদিনের জন্য অবশ্যম্ভাবী রূপে বেঁধে রাখে তাও স্বাভাবিক ও কল্যাণকর অর্থব্যবস্থা নয়। এর ঠিক বিপরীত, স্বাভাবিক ও কল্যাণকর অর্থব্যবস্থা তাই হতে পারে, যাতে উপর্জনের জন্য প্রতিযোগিতা করার সকল মানুষেরই অবাধ সুযোগ থাকবে। যে পংগু অবস্থায় যাত্রা শুরু করেছে সে যেন নিজ শ্রম ও যোগ্যতার বলে মোটর লাভ করতে পারে এবং যে প্রথমে মোটর নিয়ে চলেছিল, পরবর্তীকালে সে যদি নিজের অযোগ্যতার দরুন পংগু হয়ে বসে তবে সে যেন পংগুই হয়ে থাকে।

সংঘর্ষের বদলে সহযোগিতা

ইসলাম সমাজ জীবনে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতাকে শুধু অবাধ ও নিরংকুশ করতে চায় না ; বরং এ ক্ষেত্রের প্রতিযোগীদেরকে পরস্পরের প্রতি নির্দয় ও কঠোর হওয়ার পরিবর্তে সহানুভূতিশীল ও সাহায্যকারী করে তুলতেও বদ্ধপরিকর। এ জন্য একদিকে এর নৈতিক শিক্ষা দীক্ষা দ্বারা মানুষের মনে তাদের অক্ষম ও জীবন সংগ্রামে পরাজিত ভাইদের জন্য নির্ভরযোগ্য আশ্রয় দেয়ার অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টিত, অপর দিকে সে সমাজে এমন একটা মযবুত সংগঠন বর্তমান রাখার দাবি করে, যার উপর অসমর্থ ও উপায়হীন লোকদের সকল অভাব-অভিযোগ দূর করার দায়িত্ব অর্পিত থাকবে। অর্থোপার্জনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার যোগ্যতা যাদের নেই, তারা সেই প্রতিষ্ঠান হতে নিজ নিজ জীবিকা গ্রহণ করবে। যারা কালের দুর্ঘটনার আঘাতে বিপন্ন হয়ে এ প্রতিযোগিতায় ক্লান্ত হয়ে পড়বে এ প্রতিষ্ঠান তাদেরকে উঠিয়ে পুনরায় যোগ্য করে দেবে। আর এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য যাদের সাহায্যের দরকার হবে তারা এ প্রতিষ্ঠানের সাহায্য অনায়াসেই লাভ করতে পারবে। এ উদ্দেশ্যে ইসলাম আইনত এ সিদ্ধান্ত করেছে যে, দেশের সমস্ত উদ্বৃত্ত সম্পদ হতেও শতকরা আড়াই টাকা বাৎসরিক এবং এরূপ সমস্ত পণ্যদ্রব্য হতেও শতকরা আড়াই টাকা বাৎসরিক যাকাত অবশ্যই আদায় করতে হবে। ওশর (ফসলের এক-দশমাংশ) ফরজ হতে পারে এমন সমস্ত জমির উৎপন্ন ফসলের দশভাগের একভাগ কিংবা বিশভাগের একভাগ আদায় করতে হবে। গৃহপালিত পশুর বিশেষ একটা সংখ্যা বিশেষ সামঞ্জস্যের সাথে যাকাত হিসেবে আদায় করা হবে আর এ সমস্ত সম্পদ গরীব-ইয়াতীম এবং অভাবগ্রস্ত লোকদের সাহাযার্থে ব্যয় করা হবে। এটা এমন একটা সামাজিক বীমা-বিশেষ, যা বর্তমান থাকতে ইসলামী সমাজের কোনো ব্যক্তিই জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজন হতে বঞ্চিত হতে পারে না। কোনো শ্রমজীবী ব্যক্তি উপবাস থাকার ভয়ে কারখানার মালিক কিংবা জমিদারের শোষণমূলক ও অসম্ভব শর্ত কবুল করতে কখনও বাধ্য হবে না। আর অর্থ উপার্জনের প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার জন্য যে শক্তি-সামর্থের আবশ্যক, কোনো ব্যক্তিরই শক্তি তদপেক্ষা কম হতে পারে না।

ব্যক্তি ও সমাজের সামঞ্জস্য

ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে ইসলাম এমন সামঞ্জস্য স্থাপন করতে চায় যাতে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র, অস্তিত্ব এবং তার আযাদী সঠিকভাবে বর্তমান থাকতে পারে এবং সমাজের স্বার্থের জন্যও যেন তার আযাদী কোনো প্রকার প্রতিবন্ধক না হয়ে বরং উপকারীই হয়। যে ধরনের রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক সংগঠন ব্যক্তিকে

সমাজের মধ্যে একেবারে বিলীন করে দেয় এবং তার ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য অপরিহার্য আযাদীও অবশিষ্ট্য রাখে না ইসলাম তা আদৌ সমর্থন করে না। কোনো দেশের সকল উৎপাদন উপায়কে জাতীয়করণের নিশ্চিত অর্থে দেশের সমগ্র ব্যক্তিকে সমাজ স্বার্থের কঠোর বন্ধনে নির্মমভাবে আবদ্ধ করে দেয়া ইসলামে মোটেই সমর্থনীয় নয়। এমতাবস্থায় ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র বহাল থাকা তার বিকাশ লাভ করা বড়ই কঠিন এবং অসম্ভব ব্যাপার। ব্যক্তিত্ব রক্ষার জন্য যেমন রাজনৈতিক সামাজিক আযাদী আবশ্যক তেমনি অর্থনৈতিক আযাদীও খুব বেশি পরিমাণে জরুরী। আমরা যদি মনুষ্যত্বের মূলোৎপাটন করতে না চাই, তবে সমাজ জীবনে লোকদের এতোদূর সুযোগ-সুবিধা অবশ্যই দিতে হবে যাতে আল্লাহর এক বান্দা তার নিজের রুযি-রোযগার উপার্জন করে নিজের মনের স্বাতন্ত্র রক্ষা করতে পারে এবং তার নিজের মানসিক ও নৈতিক শক্তি নিচয়কে নিজের রুচির ও ঝোঁক প্রবণতা অনুসারে বিকাশ করতে পারে। কন্ট্রোলের যে খাদ্যের মাপকাঠি থাকবে অন্য লোকদের হাতে তা যতো প্রচুর হোক না কেন, সুখাদ্য ও সুখদায়ক কখনও হতে পারে না। কারণ তাতে মানব মনের সুষ্ঠু আযাদী ও ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশ যে পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়, মেদবহুল দেহের বিরাটত্ব তার কিছুমাত্র পূরণ করতে পারে না।

ব্যক্তি স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ

ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুণ্নকারী কোনো সমাজ ব্যবস্থা যেমন ইসলাম সমর্থন করে না, অনুরূপভাবে ইসলাম এমন সমাজ ব্যবস্থাও পছন্দ করে না যা ব্যক্তিকে সমাজ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে নিরংকুশ আযাদী দান করে এবং তাদের নিজ নিজ প্রবৃত্তিগত স্বার্থ রক্ষার খাতিরে সমাজকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করার অবাধ সুযোগ দেয়। এ দু'সীমান্তের মাঝামাঝি যে পথ ইসলাম অবলম্বন করেছে, তা এই যে, প্রথমত সামাজিক স্বার্থের জন্য ব্যক্তিকে কয়েকটি দায়িত্ব পালন করতে ও নির্দিষ্ট সীমারেখা বহাল রাখতে বাধ্য করা হবে। পরে অবশ্য তার নিজের কাজ-কারবারে তাকে আযাদ করে দেয়া হবে। এ সীমা ও দায়িত্বগুলো বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার স্থান এটা নয়। আমি এখানে শুধু এর একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করব।

উপার্জনের সীমা

প্রথমে জীবিকা উপার্জনের কথাই ধরা হোক। অর্থোপার্জনের উপায় অবলম্বন করার ব্যাপারে ইসলাম যতো সূক্ষ্ম দৃষ্টির সাথে জায়েয নাজায়েযের পার্থক্য করেছে, দুনিয়ার অন্য কোনো আইন তা করেনি। যে সমস্ত উপায়ে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির কিংবা সমষ্টিগতভাবে গোটা সমাজের নৈতিক অথবা বাস্তব ক্ষতিসাধন করে নিজের জীবিকা ও উপার্জন করতে পারে ইসলাম তা চিরতরে

হারাম করে দিয়েছে। শরাব ও মাদক দ্রব্য প্রস্তুত করা তা বিক্রয় করা, বেশ্যাবৃত্তি, নৃত্য ও গান-বাজনার পেশা, জুয়া, দালালী, সুদ, ধোঁকা ও এমন ব্যবসায় যাতে এক পক্ষের লাভ নিশ্চিত এবং অপর পক্ষের লাভ অনিশ্চিত, প্রয়োজনীয় জিনিস মজুদ করে তার মুল্য বৃদ্ধি করা প্রভৃতি ধরনের সামাজিক অনিষ্ট ও ক্ষতিকর কারবার ইসলামী আইনে চিরতরে হারাম করে দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে ইসলামী অর্থনীতি যাচাই করে দেখলে হারাম পন্থাগুলোর একটি দীর্ঘ ফিরিস্তি সামনে উপস্থিত হবে। তার মধ্যে এমন সব পন্থাও রয়েছে, যা প্রয়োগ করে বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ কোটিপতি হতে পারে ইসলাম আইন করেই এ পন্থা হারাম করে দিয়েছে এবং মানুষকে শুধু এমন সব উপায়ে অর্থোপার্জন করার আযাদী দান করেছে যা দ্বারা সে মানুষের জন্য কোনো প্রকৃত ও কল্যাণময় খেদমত করে ইনসাফের সাথে তার পারিশ্রমিক লাভ করতে পারে।

ব্যয় সংকোচ

হালাল উপায়ে অর্জিত ধন-সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্ব ইসলাম সমর্থন করে বটে, কিন্তু তা মোটেই সীমাহীন নয়। ইসলাম মানুষকে হালাল উপায়ে অর্জিত অর্থ-সম্পদকে ঠিক বৈধ পন্থায় ব্যয় করতে বাধ্য করে। ব্যয় সম্পর্কে ইসলাম এমন কতোগুলো শর্ত লাগিয়ে দিয়েছে, যার দরুন মানুষ সাদাসিদে ও পবিত্র জীবন যাপন করার সুযোগ পূর্ণরূপে পেলেও বিলাসিতায় মোটেই অর্থ উড়াতে পারে না। কোনোরূপ সীমাহীন শান-শওকত দেখাতে এবং একজন মানুষ অন্য মানুষের উপর নিজের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব কায়েম করতে পারে না। কয়েক প্রকারের বাজে খরচকে ইসলামী আইনে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য প্রকারের বাজে খরচগুলোকে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করা না হলেও অন্যায়ভাবে টাকা খরচ করার কাজ হতে মানুষকে বিরত রাখার ক্ষমতা ইসলামী হুকুমাতকে দেয়া হয়েছে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে সমাজের অধিকার

জায়েয উপায়ে অর্থোপার্জন ও জায়েয পথে ব্যয় করার পর মানুষের নিকট যে অর্থ-সম্পদ উদ্বৃত্ত থাকে তা সে সঞ্চয় করতে পারে এবং আরো বেশি উপার্জনের কাজে তা নিয়োগও করতে পারে। কিন্তু এ দু'টি অধিকারের উপর কয়েকটি বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। সঞ্চয় করলে 'নেসাব' পরিমাণের অতিরিক্ত অর্থের শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত দিতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে টাকা লাগাতে হলে শুধু হালাল কারবারেই নিয়োগ করতে পারে। জায়েয কারবার নিজেও করতে পারে, নিজের মূলধন টাকা, জমি, যন্ত্র যাই হোক না কেন অপরকে দিয়ে তার লাভ-লোকসানের অংশীদারও হতে পারে। এ উভয় পন্থাই সংগত। এ

সীমার মধ্যে থেকে কোনো মানুষ যদি কোটিপতি হয় তবে ইসলামের দৃষ্টিতে তা আপত্তিকর কিছুই নয়, বরং তাকে আল্লাহর দানই মনে করে। কিন্তু সমাজ স্বার্থের জন্য তার উপর দু'টি শর্ত আরোপ করেছে। প্রথম, তার ব্যবসা পণ্যের যাকাত কিংবা কৃষিজাত দ্রব্যাদির এক-দশমাংশ আদায় করতে হবে। দ্বিতীয় এই যে, মানুষ তার ব্যবসায় কিংবা শিল্প অথবা কৃষিকার্যের ব্যাপারে যাদের সাথে শরীকদার হিসেবে কিংবা মজুরী দেয়া নেয়ার নিয়মে কাজ করবে, তাদের সাথে অবশ্যই ইনসাফ করতে হবে। এ ইনসাফ সে নিজে না করলে ইসলামী হুকুমাত তাকে এ জন্য বাধ্য করবে।

সম্পত্তি বন্টনের নিয়ম

উল্লেখিত সংগত সীমার মধ্যে থেকে উপার্জন ও ব্যয় করার পর যে সম্পত্তি সঞ্চিত হবে, ইসলামে তাকেও খুব বেশি দিন পর্যন্ত সঞ্চিত অবস্থায় থাকতে দেয় না, বরং তার উত্তরাধিকার নিয়মের সাহায্যে বংশ পরম্পরায় তা বন্টন করে দেয়। এ ব্যাপারে ইসলামী আইনের লক্ষ্য দুনিয়ার অন্যান্য সমগ্র আইনের লক্ষ্য হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অন্যান্য আইন অর্জিত সম্পত্তি একেবারে পুরুষানুক্রমে চিরদিন সঞ্চিত করে রাখতে চায়। কিন্তু ইসলাম তার বিপরীত যে আইন রচনা করছে, তাতে এক ব্যক্তির সঞ্চিত সম্পত্তি তার মৃত্যুর পরই তার নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়। নিকটাত্মীয় কেউ না থাকলে দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়গণই তাদের নির্দিষ্ট অংশ অনুপাতে অংশীদার হবে। আর দূরেরও কোনো আত্মীয় না থাকলে সমগ্রভাবে সমস্ত মুসলিম সমাজই তার মালিক হবে। ইসলামের এ আইন কোনো বড় পুঁজি কিংবা বিপুল জমির মালিকানাকেই স্থায়ী অথবা অক্ষত থাকতে দেয় না। এ সমস্ত বিধি-নিষেধের পরেও যদি কারো সম্পত্তি হয় এবং তা সমাজের পক্ষে কোনোরূপ ক্ষতির কারণ হয়, তবে এই শেষ আঘাতেই তাকে চূর্ণ করে দিতে যথেষ্ট।

*ইসলামী অর্থনীতি আর একটি জ্ঞাতব্য বিষয় নিম্নে প্রদত্ত হলো : ইমাম আবু ইউসুফ (র) স্বীয় গ্রন্থ 'কিতাবুল খারাজ'-এর 'তাউসী' হতে উদ্বৃত্ত করে এ হাদিস লিপিবদ্ধ করেছেন :

"পতিত জমি (যার কোনো মালিক নেই) আল্লাহ পাক ও তদীয় রসূলের তারপর তা তোমাদেরই। কাজেই ঐ পতিত জমির আবাদ করবে তোমরাই। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বীয় জমি অনাবাদী ও বেকারভাবে ফেলে রাখবে, তিন বছর পরে তাতে তার কোনো অধিকার থাকবে না।" এ প্রসংগে ইমাম সাহেব হযরত সালেম

---

* এটা অনুবাদ কর্তৃক সংযোজিত।

ইবনে আবদুল্লাহ ও ইমাম জাহবীর হাদিস উল্লেখ করে বলেন : হযরত ফারুকে আযম (রা) স্বীয় খিলাফতকালে মিম্বারে দণ্ডায়মান হয়ে উপরের উদ্ধৃতিটি ঘোষণা করেন।

উপরের বর্ণিত হাদিসকে ভিত্তি করে আবু ইউসুফ (র) বলেন : "আমাদের (হানাফী মতাবলম্বীদের) নিকট ভূমি সংক্রান্ত অন্যতম বিধান এই যে, যে পতিত জমিতে পূর্ব হতে কারো মালিকানা স্বত্ব নেই, যদি কোনো ব্যক্তি এটাকে কর্ষণযোগ্য ও আবাদ করে তবে তারই মালিকানা স্বত্ব বর্তাবে। অতএব যে তাকে নিজে কর্ষণ করতে পারে, অপরকে দিয়েও চাষাবাদ করিয়ে নিতে পারে অথবা স্বীয় অর্থ বিনিয়োগ করে আবাদ করে নিতে পারে। আর সে জমির উৎকর্ষতা সাধন হেতু পানি সেচ ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কার্যও করতে পারে।"

[কিতাবুল খারাজ, ইমাম আবু ইউসুফ (র)]

ইসলামের আধ্যাত্মবাদ

ইসলামের আত্মিক নীতি কি? জীবনের পরিপূর্ণ ব্যবস্থার সংগেই বা তার সম্পর্ক কি? এ বিষয়টি ভালো করে বুঝার জন্য আধ্যাত্মবাদ সম্পর্কে ইসলামের ধারণা এবং অন্যান্য ধর্মীয় ও দার্শনিক ধারণার পারস্পরিক পার্থক্য সর্বপ্রথম বুঝে নিতে হবে। এ পার্থক্য ভালো করে না বুঝার দরুন ইসলামের আধ্যাত্মবাদ সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে মানুষের মগযে অনিচ্ছাকৃতভাবে এমন সব ধারণা ঘুরপাক খেতে থাকে যা সাধারণত এ 'আধ্যাত্ম' শব্দটির সংগে যুক্ত হয়ে গিয়েছে। এ সমস্যায় পড়ে মানুষ ইসলামের সঠিক আধ্যাত্মবাদকে খুব সহজে বুঝে উঠতে পারে না যা 'আত্মার' জানা শুনা পরিসীমাকে অতিক্রম করে জড় এবং দেহের রাজ্যেও আধিপত্য বিস্তার করে, শুধু আধিপত্য বিস্তারই নয় তার উপর প্রভুত্বও করতে চায়।

পার্থিব জীবন ও আধ্যাত্মবাদের দ্বৈততা

দর্শন ও ধর্ম জগতে সাধারণ প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী আত্মা এবং দেহ দু'টি পরস্পর বিরোধী জিনিস, উভয়ের ক্ষেত্র ও পরিবেশ আলাদা, উভয়ের দাবি বিভিন্ন বরং পরস্পর বিরোধী এবং এই উভয় ক্ষেত্রেই একই সংগে উন্নতি লাভ কখনো সম্ভব নয়। দেহ এবং বস্তুজগত 'আত্মার' কারাগার বিশেষ, পার্থিব জীবনের সম্পর্ক-সম্বন্ধ এবং মনের ইচ্ছা-বাসনার হাতকড়ীতে আত্মা বন্দী হয়ে পড়ে। দুনিয়ার কাজ-কারবার ও লেন-দেনের লৌহনিগড়ে আবদ্ধ হয়ে 'আত্মার উন্নতি' শেষ হয়ে যায়। এ ধারণার অবশ্যম্ভাবী ফলে আধ্যাত্মবাদ এবং পার্থিব জীবনের পথ সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন হয়ে গিয়েছে। যারা পার্থিব জীবন অবলম্বন করলো, তারা প্রথম পদক্ষেপেই নিরাশ হয়ে পড়লো এবং মনে করতে লাগলো

যে, এখানে আধ্যাত্মবাদ তাদের সংগে কোনোক্রমেই চলতে পারবে না। হতাশাই তাদেরকে শেষ পর্যন্ত জড়বাদের পংকিল আবর্তে নিমজ্জিত করেছে। সমাজ, তামাদ্দুন, রাজনীতি, অর্থনীতি মানুষের জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগ আধ্যাত্মবাদের নির্মল আলোক জ্যোতি হতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়ে গেলো। আর সর্বশেষে বিশাল পৃথিবী যুলুম-নিপীড়নের সয়লাব শ্রোতের রসাতলে চলে গেলো। অন্যদিকে যারা আধ্যাত্মিকতার অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করলো, তারা নিজ নিজ 'আত্মার' উন্নতির জন্য এমন সব পথ খুঁজে বের করলো, এ দুনিয়ার সঙ্গে যার কোনোই সম্পর্ক নেই। কারণ তাদের দৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক উন্নতির এমন কোনো পথ নেই, যা দুনিয়ার মাঝখান দিয়ে চলে গিয়েছে। তাদের মতে আত্মার উন্নতি সাধনের জন্য দেহের নিপীড়ন বা নির্যাতন অত্যন্ত জরুরী। এ কারণেই তারা এমন সব অত্যধিক কৃচ্ছ্রসাধনের নিয়ম উদ্ভাবন করলো, যা 'নফসকে' নিঃসন্দেহে ধ্বংস করে দেয় এবং দেহকে করে দেয় অবশ ও পংগু। আধ্যাত্মিক দীক্ষার জন্য নিবিড় অরণ্য, পর্বত গুহা এবং এ ধরনের নির্জন কুটির প্রাঙ্গণকেই উপযুক্ত স্থান বলে মনে করলো, যেন সমাজের কর্ম-কোলাহল তাদের এ ধ্যান-তপস্যার গভীর একাগ্রতায় বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে না পারে। আত্মার ক্রমবিকাশ সাধনের জন্য তাঁরা দুনিয়া ও দুনিয়ার এ বিপুল কর্মমুখরতা হতে একেবারে মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং পার্থিব জগতের সংস্পর্শে আসার সমস্ত সম্পর্ক ও সম্বন্ধকে সম্পূর্ণ ছিন্ন করে ফেললো। আত্মার উন্নতির জন্য এটা ভিন্ন অন্য কোনো পথই তারা সম্ভব বলে মনে করলো না।

পূর্ণতার দু'টি মত

দেহ ও আত্মার এ দ্বৈততা এবং ভিন্নতা মানুষের পূর্ণতা লাভের দু'টি ভিন্ন মত ও লক্ষ্য সৃষ্টি করেছে। একদিকে হচ্ছে পার্থিব জীবনের পূর্ণতা ও সার্থকতা অর্থাৎ শুধু জড় ও বাস্তব সম্পদে পরিপূর্ণ হওয়া। মানুষ যখন একটা উত্তম পাখি, একটা উৎকৃষ্ট কুমির, একটা ভালো ঘোড়া এবং একটা সার্থক শৃগাল হতে পারবে, তখনই সে পূর্ণতার একেবারে চরমতম স্তরে উন্নীত হয়েছে বলে মনে করতে হবে। অন্যদিকে হচ্ছে আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপূর্ণতা। মানুষ কিছু অতি মানবিক ও অস্বাভাবিক শক্তির মালিক হলেই তা লাভ হলো বলে মনে করা হয়। আর মানুষের একটা ভালো রেডিও সেট, একটা শক্তিমান দূরবীণ এবং একটা সূক্ষ্মদর্শী যন্ত্রে পরিণত হওয়া কিংবা তার দৃষ্টি এবং তার কণ্ঠ নিঃসৃত শব্দের একটা পরিপূর্ণ ঔষধালয়ের কাজ দিতে শুরু করাই হয়েছে এ পথে পূর্ণতা লাভের একেবারে সর্বশেষ স্তর।

মানব সম্পর্কে ইসলামের ধারণা

এ ব্যাপারে ইসলামের আদর্শ দুনিয়ার অন্যান্য সমগ্র ধর্মীয় ও দার্শনিক নীতি হতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। ইসলাম বলে যে, আল্লাহ তায়ালা মানবাত্মাকে এ পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন। কিছু ইখতিয়ার ও স্বাধীনতা, কিছু কর্তব্য, কিছু দায়িত্ব তার উপর অর্পন করেছেন এবং এসব পালন করার জন্য সর্বোত্তম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি দেহও তাকে দান করেছেন। এ দেহ তাকে দেয়া হয়েছে এ উদ্দেশ্যে যে, তার স্বাধীনতার প্রয়োগ এবং তার সমস্ত দায়িত্ব পালন করার জন্য তার দেহকে ব্যবহার করবে। অতএব এ দেহ তার আত্মার কারবার নয়, এটা তার কারখানা। এ আত্মার কোনো উন্নতি যদি সম্ভবই নয়, তবে তার এ কারখানার যন্ত্রপাতি ও শক্তিগুলোকে ব্যবহার করে নিজের যোগ্যতার বাস্তব পরিচয় দেয়ার ভিতর দিয়েই সম্ভব হতে পারে। এ ছাড়া এ দুনিয়া কোনো শক্তির ক্ষেত্রও নয় মানবাত্মা এখানে কোনো রকমে বন্দী হয়ে পড়েছে এরূপ মনে করা যেতে পারে না। বরং এটা একটি কর্মক্ষেত্র, কাজ করার জন্যই আল্লাহ তায়ালা তাকে এখানে পাঠিয়েছেন। এখানকার অসংখ্য জিনিস তার অধীন করে দেয়া হয়েছে। এখানে আরো অনেক মানুষকে এ খিলাফতের বিরাট দায়িত্ব পালন করার জন্য তার সঙ্গে সৃষ্টি করা হয়েছে। এখানে প্রকৃতির সাধারণ দাবি অনুযায়ী তামাদ্দুন, সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতি এবং জীবনের অন্যান্য শাখা-প্রশাখাকে তারই জন্য তৈরি করা হয়েছে। এখানে কোনো আধ্যাত্মিক উন্নতি যদি সম্ভব হয় তবে তা দুনিয়ার এ বিপুল কর্মক্ষেত্র হতে মুখ ফিরিয়ে ঘরের কোণে বসে থাকলে হবে না, বরং এ কর্মক্ষেত্রে কাজ করে মানুষ তার অন্তর্নিহিত যোগ্যতার পরিচয় দিলেই তা সম্ভব। এটা তার জন্য একটা পরীক্ষাগার। জীবনের প্রত্যেকটা দিক ও প্রত্যেকটা বিভাগ সেই পরীক্ষার এক একটা 'প্রশ্নপত্র' বিশেষ। ঘর, মহল্লা, হাট-বাজার, অফিস, কারখানা, শিক্ষাগার, থানা, আদালত, সৈন্য শিবির, পার্লামেন্ট, সন্ধি সম্মেলন এবং যুদ্ধ ক্ষেত্র সবকিছুই ভিন্ন বিষয়ের প্রশ্নপত্র। এটা পূর্ণরূপে লিখে দেবার জন্যই তাকে দেয়া হয়েছে। কিন্তু মানুষ যদি এদের মধ্যে কোনো বিষয়ে পূর্ণ সময় তার এবং তার উত্তর না দেয় কিংবা অধিকাংশ প্রশ্নপত্রের কোনো উত্তরই যদি সে না লিখে তবে তার ফলে শূন্য ছাড়া সে আর কি-ইবা পেতে পারে ? সে যদি তার সমস্ত লক্ষ্যকেই এ পরীক্ষা দেয়ার কাজে নিযুক্ত করে আর যতো প্রশ্নপত্রই তাকে দেয়া হয়েছে, তার প্রত্যেকটার সে কিছু না কিছু উত্তর লিখে দেয়, তবেই যে সফলতা এবং উন্নতি লাভ করতে পারে, অন্যথায় তা কিছুতেই সম্ভব নয়।

বৈরাগ্যবাদের প্রতিবাদ

ইসলাম এভাবে জীবনের বৈরাগ্যবাদী ধারণাকে বাতিল করে দিয়েছে এবং মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ দুনিয়ার বাহির হতে নয়, এর মধ্যে হতেই বের করেছে। আত্মার ক্রমবিকাশ ও উৎকর্ষ এবং সাফল্য ও সার্থকতা লাভ করার আসল উপায় ইসলামের দৃষ্টিতে জীবন সমুদ্রের মাঝখানেই অবস্থিত তার কিনারে নয়। ইসলাম আমাদের সামনে আত্মার উন্নতি ও অবনতির মাপকাঠি কি উপস্থিত করে তাই বিচার্য। বস্তুত এ প্রশ্নের জবাব খিলাফতের পূর্ব বর্ণিত ধারণার মধ্যেই বর্তমান রয়েছে। 'খলিফা' হওয়ার কারণে আল্লাহ তায়ালার সামনে মানুষ তার পরিপূর্ণ জীবনের কার্যাবলীর জবাবদিহি করতে বাধ্য। পৃথিবীতে যে স্বাধীনতা ও বিবিধ উপায়-উপাদান তাকে দান করা হয়েছে, সে সবগুলোকে আল্লাহর মর্জি অনুসারে ব্যবহার করাই তার কর্তব্য। যে শক্তি ও যোগ্যতা তাকে দেয়া হয়েছে, তা সে আল্লাহ তায়ালার অধিক হতে অধিকতর সন্তোষ লাভের জন্য ব্যয় করবে। অন্য মানুষের সঙ্গে তাকে যেসব সম্পর্ক সম্বন্ধ দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে, তাতে সে আল্লাহর মনোনীতি নীতি অবলম্বন করবে। মোটকথা নিজে সমগ্র চেষ্টা-সাধনা ও শ্রম-মেহনত ব্যয় করে পৃথিবী এবং তার মধ্যস্থিত মানুষের জীবনকে এতো সুন্দর ও সুশৃংখল করবে, যতো সুন্দর ও শৃংখলাপূর্ণ অবস্থায় তাকে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা দেখতে চান। মানুষ যতো বেশি দায়িত্ব জ্ঞানের অনুভূতি, কর্তব্য পরায়ণতা, আনুগত্য এবং মালিকের সন্তুষ্টি লাভের আগ্রহ সহকারে এ কর্তব্য পালন করবে, আল্লাহ তায়ালার ততোখানি নৈকট্য সে লাভ করতে পারবে। বস্তুত ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভই হচ্ছে আধ্যাত্মিক উন্নতি। ঠিক এর বিপরীত সে যতোখানি অলস, কর্মবিমূখ এবং কর্তব্যজ্ঞানহীন হবে, অথবা যতোখানি দুর্নীতি, বিদ্রোহী এবং অবাধ্য হবে, আল্লাহর নৈকট্য লাভ হতে সে ততোখানি বঞ্চিত হবে। আর আল্লাহর নিকট হতে দূরে পড়ে থাকলেই ইসলামের পরিভাষায় বলা হয় আধ্যাত্মিক অধপতন।

পার্থিব জীবনেই আত্মার উন্নতি

উপরের ব্যাখ্যায় একথা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী ধার্মিক ও দুনিয়াদার উভয় ব্যক্তিরই কর্মক্ষেত্র এক, এরা উভয়ে একই কর্মক্ষেত্রে কাজ করবে। এবং সত্য বলতে গেলে দীনদার ব্যক্তি দুনিয়াদার অপেক্ষাও অনেক বেশি কর্মব্যস্ত থাকবে। ঘরের চার প্রাচীর হতে শুরু করে আন্তর্জাতিক কন্‌ফারেন্স পর্যন্ত জীবনের যতো ক্ষেত্র এবং ব্যাপারই হোক না কেন, এর যাবতীয় দায়িত্ব দীনদার ব্যক্তি দুনিয়াদার ব্যক্তির শুধু সমান নয় বরং বেশি

পরিমাণে নিজের উপর চাপিয়ে নিবে। তবে যে জিনিস এ উভয় ব্যক্তির পথকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দেয়, তা হচ্ছে আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্কের স্বরূপ। দীনদার ব্যক্তি যাই করবে তা ঠিক এ অনুভূতি নিয়েই করবে যে, আল্লাহর নিকট হতেই তার উপর এ দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার উদ্দেশ্যেই সে কাজ করবে এবং আল্লাহ্ তায়ালার নির্ধারিত আইন অনুসারেই তা করবে। পক্ষান্তরে দুনিয়াদার ব্যক্তি সমস্ত কাজই করবে দায়িত্বহীনভাবে এবং নিজের ইচ্ছামত। এ পার্থক্যই দীনদার ব্যক্তির সমগ্র পার্থিব জীবনকে সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক জীবনে পরিণত করে এবং দুনিয়াদার ব্যক্তির সমগ্র জীবনকে আধ্যাত্মিকতার আলো হতে বঞ্চিত করে।

আধ্যাত্মিক উন্নতির চার স্তর

ইসলাম পার্থিব জীবনের মাঝ দরিয়ায় মানুষের বৈষয়িক উন্নতির যে পথ তৈরি করেছে এখন সংক্ষেপে তার আলোচনা করব। এ পথের প্রথম স্তর হচ্ছে 'ঈমান'। অর্থাৎ মানুষের মন ও মগযে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হওয়া যে, আল্লাহ-ই তার মালিক, আইন রচয়িতা এবং উপাস্য। আল্লাহর সন্তোষ লাভই তার সমস্ত চেষ্টা-সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য এবং আল্লাহর আইন-ই তার জীবনের একমাত্র আইন। এ বিশ্বাস যতোদূর গভীর এবং দৃঢ় হবে, মানুষের মন ততোই পরিপূর্ণ ইসলামী হবে। আর ততোবেশি দৃঢ়তার সাথে মানুষ আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে চলতে পারবে।

এ পথের দ্বিতীয় মনযিল হচ্ছে 'এতায়াত' আনুগত্য, অর্থাৎ কার্যত মানুষের নিজের স্বাধীনতা পরিত্যাগ করা এবং কর্মজীবনে সেই আল্লাহর বন্দেগী ও দাসত্ব কবুল করা যাকে সে নিজের রব বলে মেনে নিয়েছে। কুরআনের পরিভাষায় এ এতায়াতের নাম হচ্ছে 'ইসলাম'।

তৃতীয় অধ্যায় হচ্ছে 'তাকওয়া'। সহজ ভাষায় যাকে আমরা বলতে পারি কর্তব্যজ্ঞান ও দায়িত্ববোধ। মানুষ নিজের জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই একথা স্মরণ রেখে কাজ করবে যে, আল্লাহর সমীপে তার চিন্তা, কথা ও কাজের পরিপূর্ণ হিসেব দিতে হবে এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ প্রত্যেক কাজ হতে সে বিরত থাকবে। আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী প্রত্যেকটি খেদমতের জন্য কোমর বেঁধে লেগে যাবে এবং পরিপূর্ণ সাবধানতার সাথে হালাল-হারাম, সত্য-মিথ্যা এবং ভালো-মন্দের বিচার করে পথ চলবে বস্তুত এটাই হচ্ছে 'তাকওয়া'।

শেষ ও সর্বোচ্চ স্তর

সর্বশেষ ও সর্বোচ্চ মনযিল হচ্ছে 'ইহ্সান'। ইহ্সানের অর্থ আল্লাহর মর্জির সাথে মানুষের মর্জির একাত্মতা। আল্লাহ যা পছন্দ করেন, মানুষও ঠিক তা-ই পছন্দ

করবে। আর আল্লাহ যা পছন্দ করেন না, মানুষের মনও ঠিক তাকে অপছন্দ করবে। আল্লাহ তাঁর নিজের পৃথিবীতে যেসব পাপের অস্তিত্ব দেখতে ভালোবাসেন না, মানুষ নিজেও তা হতে দূরে সরে থাকবে। বরং তাকে বিলুপ্ত করার জন্য মানুষ সমগ্র শক্তি এবং সকল প্রকার উপায়কে নিয়োজিত করবে। আর আল্লাহ তাঁর দুনিয়াকে যেসব কল্যাণ ব্যবস্থায় সুসজ্জিত দেখতে চান মানুষ শুধু তার নিজেকে তা দ্বারা সজ্জিত করেই ক্ষান্ত হবে না, বরং মরণপণ সংগ্রাম করে সারা দুনিয়াতে তাকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা করবে। এ স্তরে পৌঁছলেই মানুষের ভাগ্যে আল্লাহর সর্বাধিক নৈকট্য লাভ ঘটে। এ জন্যই এটা মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির সর্বোচ্চ অধ্যায়।

জাতি ও রাষ্ট্রীয় তাকওয়া এবং ইহ্সান

আধ্যাত্মিক উন্নতির এ পথ আলাদাভাবে কেবল ব্যক্তিদের চলার জন্যই নয়, সমগ্র সমাজ ও জাতির জন্য এটাই একমাত্র পথ। স্বতন্ত্র ব্যক্তির ন্যায় একটি জাতিও ঈমান, এতায়াত এবং তাকওয়ার বিভিন্ন মনযিল অতিক্রম করে ইহ্সানের সর্বশেষ স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। একটা রাষ্ট্রও এর সমগ্র ব্যবস্থা সহকারে 'মু'মিন', 'মুসলিম', 'মুত্তাকী', এবং 'মুহসীন' হতে পারে। বরং প্রকৃতপক্ষে ইসলামের উদ্দেশ্য ঠিক তখনি পূর্ণতা লাভ করতে পারে, যখন একটা জাতিই এ পথে চলতে শুরু করে এবং দুনিয়ার বুকে মুত্তাকী ও মুহ্সিন তাকওয়াপূর্ণ ও ইহ্সানওয়ালা–রাষ্ট্র কায়েম হবে।

আধ্যাত্মিকতার জন্য ইসলামের দীক্ষা পদ্ধতি

ব্যক্তি এবং সমাজের আধ্যাত্মিক দীক্ষা পালনের জন্য এবং এটাকে উচ্চতম আদর্শের উপযোগী করে তৈয়ার করার জন্য ইসলাম যে পন্থা অবলম্বন করেছে সর্বশেষ তার বিশ্লেষণ করব। ইসলামের এ দীক্ষা পদ্ধতির বুনিয়াদী পন্থা চারটি।

প্রথম পন্থা হচ্ছে সালাত। ইহা দৈনিক পাঁচবার মানুষকে নতুন করে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দেয়, আল্লাহর ভয়কে বারবার সতেজ করে দেয়। এতে আল্লাহর প্রেম ও ভালোবাসা মানুষের মনে নিত্য নতুন করে জেগে উঠে। তাঁর আদর্শ ও বিধি-নিষেধ পুনঃ পুনঃ মানুষের সামনে উপস্থিত করে এবং তা অনুসরণ করে চলার কথা বারবার স্মৃতিপটে জাগ্রত করে। সালাত শুধু একটা ব্যক্তিগত ব্যাপারই নয়, তা জামায়াতের সাথেই আদায় করার জন্য ফরয করা হয়েছে, যেন গোটা সমাজেই সমষ্টিগতভাবে এ আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে চলার জন্য প্রস্তুত হতে পারে।

দ্বিতীয় পন্থা হচ্ছে সওম। এটা প্রত্যেক বছরই পূর্ণ এক মাসকাল ধরে স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকটি মুসলিম ব্যক্তিকে এবং সমষ্টিগতভাবে গোটা মুসলিম সমাজকে তাকওয়ার দীক্ষা দেয়।

তৃতীয় পন্থা হচ্ছে যাকাত। এটা মুসলিম ব্যক্তিদের মধ্যে অর্থ দান, পারস্পরিক সহানুভূতি এবং সহযোগিতার ভাব সৃষ্টি করে। আজকালকার মানুষ ভুলবশত যাকাতকে ট্যাক্স বলে মনে করছে। অথচ যাকাতের মূল ভাবধারা ট্যাক্সের ভাবধারা হতে সম্পূর্ণ পৃথক। যাকাতের আসল অর্থ হচ্ছে ক্রমবিকাশ ও পবিত্রতা দান। এ শব্দটি দ্বারা ইসলাম মানুষের মনে এই নিগূঢ় তত্ত্বের অনুভূতি জাগিয়ে দিতে চায় যে, আল্লাহর প্রেমে তুমি তোমার ভাইদেরকে যে আর্থিক সাহায্য করবে, তাতে তোমার আত্মা উন্নতি লাভ করবে এবং তোমার চরিত্র পূত ও পবিত্র হবে।

চতুর্থ পন্থা হচ্ছে হজ্জ। এটা আল্লাহর ইবাদাতের কেন্দ্রস্থল। ঈমানদার ব্যক্তিদেরকে একত্র করে এক বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের সৃষ্টি করে। এবং এটা এমন আন্তর্জাতিক আন্দোলন পরিচালিত করে, যা দুনিয়ার কয়েক শতাব্দী কাল ধরে সত্যের প্রতিষ্ঠা করেছে এবং ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও অনন্তকাল পর্যন্ত তা সত্যেরই প্রতিষ্ঠা করতে থাকবে।

◆◆◆